কথাশিল্পী শরদিন্দু : মন ও শিল্প

প্রমীলা ভট্টাচার্য

পরিবেশক

গ্রন্থনিলয়

৫৭/১বি, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভুমিকা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন গল্পের যাদুকর।

ঝকঝকে ভাষায় তিনি এমনভাবে লিখতেন যার টান পাঠক প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এড়িয়ে যেতে পারত না—এখনও পারে না। তাঁর রচনায় কোথাও মেদ জমতে পায় না, ব্যক্তিত্বের পাত্র উপচে আবেগ ফেনিল হয়ে গড়িয়ে পড়ে না। ফলে পড়ুয়া একটু বুদ্ধিমান না হলে শরদিন্দু তাদের কাছে পুরো ধরা দেন না।

শরদিন্দুর জনপ্রিয়তার পরিধি এবং তাঁর শিল্পগত সম্ভোগের বৃত্ত সমান বিস্তৃত নয়।

বাংলা গোয়েন্দাগল্পকে উঁচু সাহিত্যমানে পৌঁছে দেন শরদিন্দু এবং সে রাজ্যে এখনও তিনিই চক্রবর্তী। এই কাহিনীগুলিতে শিল্পরসিক অপরাধের সঙ্গে অপরাধীর চরিত্রজটের নিবিড় সম্পর্ক অনুধাবন করবেন, সত্যান্বেষীর চরিত্রে মৌল বাঙালি স্বাভাবিকতা এবং বিদেশী শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দাদের চাতুর্য ও বৌদ্ধিক তৎপরতার সহজ মিলন দেখতে পাবেন। তাছাড়া বাংলার বিকশমান রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে রহস্যকাহিনীর অচ্ছেদ্য সম্পর্ক দেখে অনেকেই বিস্মিত হবেন।

শরদিন্দুর দ্বিতীয় বড় কাজ, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে স্থাপিত কয়েকটি গল্প-উপন্যাস। সাহিত্যে হিন্দু রাজবৃত্তের এই পুনর্জন্ম বর্ণাঢ্য সরসতায় যেমন চিত্তলোভন, তেমনি ক্ষণে ক্ষণে দুচারটি ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে পাঠককে দার্শনিক প্রতীতির মুখোমুখি করে।

এমন একজন লেখককে গবেষণার বিষয়রূপে গ্রহণ করায় কিছু দুঃসাহসিকতা আছে। শ্রীমতী প্রমীলা ভট্টাচার্য নিষ্ঠায় এবং সাহিত্যবোধে এই দায়িত্ব পালন করেছেন।

বর্তমান গ্রন্থটি মূলত তাঁর গবেষণারই মুদ্রিত রূপ। কিঞ্চিৎ সম্পাদন ও সংযোজন রয়েছে। আশা করি গ্রন্থটি রসিক মহলে সমাদৃত হবে।

নিবেদন

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কথাসাহিত্য শাখায় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত। তাঁর রচনাবলীর সংখ্যা অনেক, বিষয়-বৈচিত্র্যও কম নয়। সেই বিপুল সাহিত্যসম্ভার "আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড"-এর পক্ষ থেকে 'শরদিন্দু অম্‌নিবাস' নামে দ্বাদশটি খণ্ডে সংকলিত হয়ে শুধু যে রসিক পাঠকের কাছে পৌঁছে গেছে তা নয়, শরদিন্দু-চর্চার পথও বহুলাংশে সুগম করে তুলেছে। অথচ শরদিন্দুর সাহিত্য-কীর্তির উপর বিচ্ছিন্ন ভাবে কিছু আলোকপাত করা হলেও এই জনপ্রিয় লেখকের বহুমুখী কৃতিত্বের সামগ্রিক পরিচয় যথাযথ ভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। অতএব শরদিন্দু-প্রতিভার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার আকাঙ্ক্ষা থেকেই "কথাশিল্পী শরদিন্দু : মন ও শিল্প" শীর্ষক গবেষণা-পত্রটির জন্ম, যার মূল লক্ষ্য নিছক তথ্যসংগ্রহ নয়, লেখকের রচনা সমূহে বিশ্লেষণ করে তাঁর মনোভাব পর্যবেক্ষণ এবং শিল্পকর্মের মূল্য অনুধাবন। বর্তমান গ্রন্থটি উক্ত গবেষণা-পত্রের পরিমার্জিত রূপ।

এই গ্রন্থপ্রকাশের ক্ষেত্রে যাঁর অবদান অবিস্মরণীয় তিনি আমার গবেষণা-পরিচালক পরম পূজনীয় অধ্যাপক ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত। তাঁর কাছ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা, সুচিন্তিত পরামর্শ ও মূল্যবান উপদেশ পাওয়া না গেলে শরদিন্দুর মন ও শিল্পের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সাধনা রয়ে যেত অসম্পূর্ণ। বহু ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি এই গ্রন্থের ভূমিকা রচনার অনুরোধ রক্ষা করেছেন—তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

শরদিন্দু-প্রতিভা অনুসন্ধানের কাজে বহুজনের দ্বারা আমি নানাভাবে উপকৃত হয়েছি, তাঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য—অধ্যাপক ডঃ দিলীপকুমার চ্যাটার্জী (রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক ডঃ সনৎ কুমার মিত্র (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়), শ্রী বুশো মিত্র, অধ্যক্ষা অলকা আমেদ, অধ্যাপিকা সাগরিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা ডঃ খনা মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা সংঘমিত্রা সেনচৌধুরী, অধ্যাপিকা সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য, অধ্যাপিকা শিপ্রা দে ও অধ্যাপিকা তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায়, এঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও সহৃদয়তা আমাকে উৎসাহিত করেছে। এই প্রেরণার মূল্য অপরিসীম।

'গ্রন্থনিলয়'-এর প্রত্যেক সদস্য ও কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। ঐ সংস্থার শ্রী চিন্ময় মজুমদারের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

প্রচ্ছদ-শিল্পী শ্রী-নীতিশ মুখোপাধ্যায়ের শিল্প কুশলতা ও সৌজন্যবোধে আমি মুগ্ধ।

'নায়ক প্রিন্টার্স'-এর কর্তৃপক্ষ ও কর্মীবৃন্দের সহায়তার কথাও অবশ্যস্বীকার্য।

আমার আত্মীয় পরিজন বর্গের অনেকেই আমাকে গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী রাধারানী ভট্টাচার্য—যাঁদের স্নেহাশীর্বাদ ও শুভকামনা আমার জীবন-পথের পরম পাথেয়।

মুদ্রণ-প্রমাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। ভবিষ্যতে সংশোধনের ইচ্ছা রইল।

প্রমীলা ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

স্রষ্টা ও সৃষ্টি

যদিও কবিগুরু লিখেছেন "কবিরে খুঁজ না তার জীবন-চরিতে", কিন্তু সাহিত্যের অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও গবেষকদের পক্ষে এই নিষেধবাণী মান্য করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না, কারণ কবি ও সাহিত্যিকদের প্রেরণা ও সৃষ্টিকে যথাযথ ভাবে অনুধাবন করতে হলে তাঁদের জীবন-পটভূমির দিকে দৃষ্টিপাত না করে উপায় নেই। তাই শরদিন্দুর সাহিত্য-কীর্তির বিশ্লেষণে ও মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রাক্-পর্বে তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী, শরদিন্দু সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য-জগতের পরিবেশ এবং তাঁর প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন।

১৮৯৯ সালের ৩০শে মার্চ (১৩০৫ সনের ১৭ই চৈত্র) উত্তরপ্রদেশের জৌনপুর শহরে, মাতুলালয়ে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। পিতার নাম তারাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মা বিজলীপ্রভা দেবী। মুঙ্গের ট্রেণিং অ্যাকাডেমিতে তাঁর ছাত্র জীবনের সূত্রপাত, তারপর ১৯১৫ সালে 'মুঙ্গের জেলা স্কুল' থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চ শিক্ষা-লাভের জন্য তিনি কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হন। ছাত্রাবস্থাতেই ১৯১৮ সালের ২৯শে জুন একাদশ বর্ষীয়া পারুল দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯১৯ সালে পিতার ইচ্ছায় স্নাতক শরদিন্দু আইন পাঠে ব্রতী হন। কিন্তু কৃতী আইনজ্ঞের পুত্র হয়েও আইন-ব্যবসায় শরদিন্দুর আদৌ প্রবণতা ছিল না। তাই মাঝপথেই আইন পড়া ছেড়ে দিয়ে তিনি কলকাতা থেকে মুঙ্গেরে ফিরে আসেন। এখানেই তাঁর ছাত্র-জীবনের সমাপ্তি নয়—আড়াই বছর পরে আবার তিনি ল-কলেজে ভর্তি হলেন তবে কলকাতায় নয়, পাটনায়। ১৯২৬ সালে পিতৃ-আশাকে সার্থক করে তিনি পাটনা ল-কলেজ থেকে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পিতার সহকারীরূপে ওকালতি শুরু করেন। কিন্তু আইন ব্যবসা তাঁর মনোমত জীবিকা হয়ে উঠতে পারেনি, সাহিত্যের প্রতিই তাঁর আন্তরিক আকর্ষণ ছিল। এই সাহিত্য-প্রীতি তিনি তাঁর মা বিজলীপ্রভা দেবীর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন। অগ্রজ সাহিত্য-স্রষ্টাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ শরদিন্দুর বিশেষ প্রিয় ছিলেন। তাঁর কালিদাস-প্রীতির পরিচয়ও অপ্রতুল নয়। বিদেশী সাহিত্যিকদের মধ্যে আর্থার কোনান ডয়েল, এডগার অ্যালন পো, এডগার ওয়ালেস, আগাথা ক্রিষ্টি, জ্যাক লণ্ডন প্রভৃতির রচনা শরদিন্দুকে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। একদিকে এই পঠনশীলতা, অপরদিকে সাহিত্য-সৃষ্টির প্রবল আকাঙ্ক্ষা—এই দুইয়ের যুগ্ম প্রভাবে ১৯২৯ সাল থেকে আইন-চর্চা ছেড়ে তিনি সাহিত্যকেই জীবিকা রূপে গ্রহণ করেন। কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে কাব্যচর্চায় তাঁর সবিশেষ উৎসাহ ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে গল্প রচনাতেই আত্মনিয়োগ করেন। ক্রমে ক্রমে সেকালের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ পত্রপত্রিকায় তাঁর কথাসাহিত্যগুলি প্রকাশিত হতে থাকে। কলকাতার

'রঙমহল' মঞ্চে, শরদিন্দু-রচিত 'বন্ধু' নাটকটি অভিনীত হওয়ার ফলে রঙ্গমঞ্চের সঙ্গেও তাঁর সংযোগ স্থাপিত হয়।

সেনোলা কোম্পানী তাঁর লেখা 'ডিটেক্‌টিভ' 'উমার বিবাহ' ও 'মিলন অভিসার' প্রভৃতি পালা রেকর্ড করেন।

এইভাবে বাংলা সাহিত্য-রসিক সমাজে শরদিন্দুর নাম যখন নানা সূত্রে ছড়িয়ে পড়ছে, সেই সময় লেখকের জীবনে এক উল্লেখযোগ্য দিক পরিবর্তনের সূচনা হয়—১৯৩৮ সালে বোম্বে টকিজের কর্ণধার হিমাংশু রায়ের আহ্বানে তিনি 'সিনারিও' অর্থাৎ 'চিত্রনাট্য' রচনার কাজে বোম্বাই যাত্রা করেন। ১৯৩৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি বম্বে চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। রূপালী পর্দার উজ্জ্বল মোহে আবিষ্ট লেখক সরস্বতীর সারস্বত সাধনায় আগের মতন একনিষ্ঠ থাকতে পারলেন না ফলে উক্ত সময় সীমায় মহাকালের সোনার তরীতে ঠাঁই পাওয়ার মত উচ্চমানযুক্ত সাহিত্যের সৃষ্টি ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকল। অবশেষে তিনি অনুভব করলেন চলচ্চিত্রের চাহিদানুসারে চিত্রনাট্য রচনার কাজে নিজেকে আবদ্ধ রাখা প্রতিভার অপচয়মাত্র। তাই ১৯৫২ সালের ৫ই নভেম্বর শরদিন্দুবাবু বোম্বাই শহর ছেড়ে চলে এলেন পুণায়। ছিন্ন হল চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে তাঁর সব বন্ধন। রঙ্গলোকের হঠাৎ আলোর ঝলকানি থেকে নিজেকে মুক্ত করে বঙ্গ-সাহিত্যের সভায় আলোচ্য লেখকের এই নিঃশর্ত প্রত্যাবর্তন তাঁর ভক্ত পাঠককুলের পক্ষে নিঃসন্দেহেই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তবে একথা অনস্বীকার্য যে সেকালে ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রধান পীঠস্থান বোম্বাই একালের মত না হলেও যথেষ্ট প্রগতিশীল ও সমৃদ্ধ ছিল। একজন বাঙালী সাহিত্যিকের পক্ষে সেখানে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি অর্জন করা কম কৃতিত্বের ব্যাপার নয়।

বোম্বাই পরিত্যাগের পর পুণার মনোরম পার্বত্য প্রদেশে শরদিন্দুবাবুর জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি অতিবাহিত হয়। তাঁর নিরলস সাহিত্য-সাধনা আমৃত্যু অব্যাহত ছিল। অবশেষে ১৯২২ সালের ২২ শে সেপ্টেম্বর এই কীর্তিমান লেখকের জীবন-নাট্যের ওপর নেমে আসে মহাকালের স্তব্ধ যবনিকা।

শরদিন্দু-জীবনের এই প্রেক্ষাপটের দিকে দৃষ্টিপাত করলে তাঁর অনেক রচনারই নেপথ্য পটভূমিটুকু চিনে নেওয়া যায়। শরদিন্দু এমনই এক সাহিত্যিক নানা সূত্রে যাঁর জীবনে মুঙ্গের-কলকাতা-বোম্বাই ও পুণা শহরে বসবাসের সুযোগ এসেছিল। তাঁর গল্পে, উপন্যাসে উপরোক্ত স্থানগুলির বাস্তব ও সজীব বর্ণনা কাহিনীগুলিকে বৈচিত্র্যময় ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা বোম্বাই প্রবাসকালে চিত্র-জগতের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, উত্থান-পতন এবং উত্তেজনা লেখক হিসেবে তাঁর মেজাজকে কিছুটা প্রভাবিত করতে পেরেছে কিনা তা ভেবে দেখার বিষয়। মূলতঃ ১৯২৫ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত শরদিন্দুর সাহিত্য জীবন বিস্তৃত। এই কাল পরিধিতে তিনি গোয়েন্দা, ঐতিহাসিক, অলৌকিক, সামাজিক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর অজস্র গল্প, অনেকগুলি উপন্যাস, একাধিক নাটক ও চিত্রনাট্য রচনা করেন। কিশোর সাহিত্য সৃষ্টিতেও তাঁর আগ্রহ এবং পারদর্শিতা ছিল।

শুধু বঙ্গ-সমাজেই নয়, বহির্বঙ্গেও তাঁর রচনা যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে 'শরদিন্দু অমনিমাস' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থে 'জীবন কথা' অংশে শ্রীশোভন বসুর মন্তব্য লক্ষণীয়—

"গুজরাতি ভাষায় শরদিন্দুর ছোটগল্পের একটি সংগ্রহ—মরুভূমিয় প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দিতে অনূদিত হয়েছে ঝিন্দের বন্দি ও শজারুর কাঁটা। ইংরাজী, মারাঠি, তামিল ও কান্নাড়িতেও কয়েকটি গল্পের অনুবাদ বেরিয়েছে।"

সুতরাং লেখক হিসেবে শরদিন্দুর প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা অবশ্য স্বীকার্য। অথচ যে সময়ে তিনি আইন চর্চা ছেড়ে সাহিত্য সাধনাকেই জীবনের প্রধান অবলম্বন রূপে গ্রহণ করেছেন সেই ক্রান্তিলগ্নে বঙ্গ-সাহিত্য প্রাঙ্গণ বহু জনাকীর্ণ। রবীন্দ্র ও শরৎ প্রতিভার জ্যোতির্ময় প্রভাবে তখন চারিদিক উদ্ভাসিত তো বটেই এ ছাড়া আবির্ভাব ঘটেছে একগুচ্ছ উদীয়মান লেখকের, যাঁদের লেখনী স্পর্শে বাংলা সাহিত্যর শিরা-উপশিরায় সঞ্চারিত হয়েছে নবীন জীবন-স্পন্দন। বিভূতিভূষণ,তারাশংকর, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, বনফুল, পরশুরাম, অন্নদাশংকর রায় এবং আরও অনেকে নিজ নিজ বিজয় রথে সাফল্যের স্বর্ণ-ভূমির দিকে এগিয়ে চলেছেন। এঁদের পাশাপাশি আছেন সবুজ পত্র, ভারতী ও কল্লোল-গোষ্ঠীর অন্যান্য সাহিত্যিকরাও। এই বহু প্রতিভার জনারণ্যেও প্রবাসী বাঙালী শরদিন্দু তাঁর নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, বিষয়-বৈচিত্র্য ও জীবনবোধের স্বাতন্ত্র্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিতে পেরেছিলেন। তাঁর সমসাময়িক লেখকেরা যখন যুদ্ধোত্তর কালের পটভূমিতে নানা সামাজিক, ও মানসিক সমস্যার রূপায়ণে সচেষ্ট, তখন শরদিন্দু ভিন্ন পথে পদচারণা করেছেন। এমন নয় যে সামাজিক গল্প উপন্যাস তিনি লেখেন নি, কিন্তু তাঁর প্রতিভার সম্যক স্ফূর্তি ঘটেছে গোয়েন্দা, ঐতিহাসিক ও অলৌকিক শ্রেণীর রচনায়। কখনও গোয়েন্দা গল্পের রহস্য-রোমাঞ্চে, কখনও ঐতিহাসিক রোমান্সের অতীতচারিতায় ও বর্ণাঢ্য কল্পনা বিলাসে কখনও বা অতিপ্রাকৃতের বিস্ময় শিহরণে তিনি বাঙালী পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছেন।

শুধু বিষয় বস্তুর নয় তাঁর ভাষা ও রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্যও উল্লেখযোগ্য। শ্রদ্ধেয় ডঃ সুকুমার সেনকে অনুসরণ করে বলা যায়,

"শরদিন্দু বাবুর গল্পের গুণ বহুগুণিত করেছে তাঁর ভাষা। কাহিনীকে ভাসিয়ে তাঁর ভাষা যেন তরতর করে বয়ে গেছে সমাপ্তির সাগর সঙ্গমে। সে ভাষা সাধু না চলিত বলা মুস্কিল। বলতে পারি সাধু-চলিত কিংবা চলিত-সাধু। শরদিন্দুবাবুর স্টাইল তাঁর নিজেরই—স্বচ্ছ পরিমিত, অনায়াস সুন্দর।" (শরদিন্দু অমনিবাস প্রথম খণ্ড,—ত্রয়োদশ মুদ্রণ, ব্যোমকেশ উপন্যাস দ্রষ্টব্য)।

একথা অনস্বীকার্য যে শরদিন্দু মুষ্টিমেয় মননশীল পাঠকের জন্য লেখনী ধারণ করেন নি, তাঁর লক্ষ্যই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, সাধারণজনের উপযোগী উপভোগ্য ও সুস্থ-রুচির কাহিনী পরিবেশন। তিনি অনায়াসেই এই লক্ষ্যে পৌছতে পেরেছেন। তাঁর কোনও কোনও গল্পে, উপন্যাসে—যেমন 'মগ্নমৈনাকে' 'গৌড়মল্লারে' 'বিষকন্যায়' ব্যাপক

ও গভীর জীবন-চেতনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় বটে, কিন্তু অধিকাংশ রচনাই সরস, সরল, সাধারণ পাঠকের ইচ্ছাপূরণের কথা মনে রেখেই যেন সেগুলি লেখা। তবে এ সত্য বিস্মৃত হলে চলবে না যে, আধুনিক যুগে যখন বহু ক্রেতা-পাঠক সাহিত্যের বাজারে ভিড় জমিয়ে থাকেন, তখন দীর্ঘকাল ধরে তাঁদের আকর্ষণ করার মতো প্রচুর কাহিনীর সরবরাহ অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে শরদিন্দুর কৃতিত্ব কম প্রশংসনীয় নয়।

শরদিন্দুর মন ও শিল্পের যথাযথ পরিচয় পেতে হলে তাঁর প্রতিভার সীমাবদ্ধতার প্রতিও দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। গভীর সমাজ-সমস্যা, নর-নারীর মনোজগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, মানব জীবনের, বিশেষতঃ আধুনিক মানুষের জীবনের নানা জটিলতা প্রভৃতি উন্মোচনে শরদিন্দু অসফল। রোমাণ্টিক কল্পনা ও বিস্ময়কে অবলম্বন করতে না পারলে তাঁর বক্তব্য লঘু, অস্বচ্ছ ও অগভীর হয়ে পড়ে। ফলে বহু বিষয়ে তিনি লেখনী পরিচালনা করলেও সব-ক্ষেত্রেই তিনি সমান সাফল্য লাভ করতে পারেন নি—এই সত্যটি মনে রেখে বর্তমান গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় থেকে পঞ্চম অধ্যায় পর্যন্ত শরদিন্দুর উচ্চমান-যুক্ত রচনাগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে অন্যান্য রচনাগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। আশা করি রচনার মান অনুসারে আলোচনার এই পক্ষপাতিত্ব অযৌক্তিক বলে বিবেচিত হবে না।

প্রথম অধ্যায়

গোয়েন্দা-কাহিনী

বাংলা গোয়েন্দা-কাহিনীর পূর্বকথা

সাহিত্য জীবনের, সমাজের দর্পণ। প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-শ্রদ্ধা প্রভৃতি সুপ্রবৃত্তিগুলির পাশাপাশি অপরাধ সম্পাদনের কুপ্রবৃত্তিও মানুষের মনে বিরাজ করে। তাই শুধু গোয়েন্দা কাহিনীতেই নয়, কখনও কখনও কুলীন-সাহিত্যিকদের রচনাতেও অপরাধ এবং অপরাধ অনুসন্ধানের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে ফৌজদারী অপরাধ অর্থাৎ মামলা-খুন-জখম যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করেছে। গোবিন্দলাল রোহিনীকে নিয়ে প্রসাদপুরে অন্তর্ধান করার পরেই ভ্রমরের পিতা মাধবীনাথ সরকার অপরাধীদের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত। তাঁর অনুসন্ধান পদ্ধতিটিও বুদ্ধিদীপ্ত। আলোচ্য প্রসঙ্গে বঙ্কিমভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'জাল প্রতাপচাঁদ'-এর নামও উল্লেখের দাবী রাখে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ডিটেক্‌টিভ' গল্পে পুলিশের 'ডিটেকটিভ কর্মচারী'র সত্যানুসন্ধানের হৃদয়-বিদারক ফললাভের মাধ্যমে রহস্য, কৌতুক ও শ্লেষ পরিবেশিত হলেও চরিত্রটির সতর্ক আচরণ ও অনুসন্ধান পদ্ধতি নিঃসন্দেহেই প্রশংসনীয়। এইভাবে আলোচনা সূত্রে দেখা যায় যে বাংলা সাহিত্যে বহু সামাজিক গল্পে-উপন্যাসেও মানুষের অপরাধ-প্রবণ প্রবৃত্তির কুটিল ছায়াপাত ঘটেছে।

কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে সমাজ সমস্যামূলক সাহিত্যে অপরাধের প্রতিফলন থাকলেও গোয়েন্দা-সাহিত্যের জাতই আলাদা। অভিজাত সাহিত্যে অপরাধ প্রসঙ্গ স্থান পেলেও তার ভূমিকা মুখ্য নয়, গৌণ। কিন্তু গোয়েন্দা-কাহিনীর লেখকেরা অপরাধকেই প্রাধান্য দেন, 'ক্রাইমকে' লক্ষ্য করেই গল্প সাজান। তাঁরা গল্পকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য রহস্য, উৎকণ্ঠা সৃজনকারী উত্তেজক উপাদান বেশী পরিমাণে ব্যবহার করেন—যার প্রভাব রহস্য-রস-পিয়াসী পাঠক-হৃদয় অস্বীকার করতে পারে না। অবশ্য সকল কথা-সাহিত্যের মতই গোয়েন্দা-সাহিত্যেরও সাফল্যের ন্যূনতম শর্ত কাহিনীর যুক্তিনিষ্ঠ বিকাশ ও বিন্যাস এবং ঘটনা সমূহের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক।

এই প্রাথমিক শর্তগুলি মনে রেখে আমরা প্রাক্-শরদিন্দু বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিতে চেষ্টা করব। এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে মনে পড়ে উইলিয়ম কেরির ইতিহাস মালায় সংকলিত দুটি ক্ষুদ্রাবয়ব গল্পের কথা—যেখানে চোরের মূর্খতা ও চোরধরার বিজ্ঞতা অনায়াসেই প্রদর্শিত। মনে হয় কাহিনী দুটির মূল উৎস বিদেশী।

ইতিহাসমালার এই গল্প দুটিকে যদি বাংলা গোয়েন্দা গল্পের উষাভাস ধরা যায়, তাহলে বলতে হয় তার সূর্যোদয় 'বাঁকাউল্লার দপ্তর'-এ। ইংরেজ শাসনের গোড়ার দিকে

যখন এদেশে থানা-পুলিশী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল তখন চোর ডাকাত ধরবার জন্য দেশী লোকের প্রয়োজন হল। সেকালের এই দেশী দারোগাদের মধ্যে একজনের কৃতিত্বের কিছু গল্প পাওয়া গেছে—এঁর নাম বাঁকাউল্লা। ডাকাত, খুনী, জালিয়াৎ, নারীহরণকারী নানা ধরনের শক্তিশালী, দুর্ধর্ষ অপরাধীকে ইনি নানা রকম কৌশলে জব্দ করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে সেই গল্পগুলি বটতলা থেকে ছাপা হয়েছিল 'বাঁকাউল্লার দপ্তর' নামে। বাঁকাউল্লাই বোধকরি আধুনিককালের প্রথম বাঙালী ডিটেক্‌টিভ। এঁর কৃতিত্বের গল্পগুলিই আমাদের প্রথম গোয়েন্দা গল্প—এ কথা মনে রেখেও বলতে হয় বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের সার্থক সূত্রপাত ১৮৯০ সালে প্রকাশিত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের 'দারোগার দপ্তর' সিরিজে। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য গোয়েন্দা কাহিনী-লেখকরা হলেন পাঁচকড়ি দে, দীনেন্দ্রকুমার রায়, যদুনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি। কিছুকালের মধ্যেই এই ধারায় আবির্ভূত হলেন আরও কয়েকজন খ্যাতকীর্তি রচয়িতা—হেমেন্দ্রকুমার রায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'রবার্ট ব্লেক' হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'মাণিক' ও 'জয়ন্ত', মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের 'হুকাকাশি' সুদীর্ঘ কাল বাঙলা পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। ১৯৩২ সালে এলো মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের সাপ্তাহিক রোমাঞ্চ সিরিজ। প্রথমদিকে এর কর্ণধার ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রণব রায়, পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যিকেরা। প্রথমে ছোট গল্প দিয়ে এর যাত্রা শুরু হলেও পরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে লাগল বড় বড় উপন্যাস যার প্রতিটিরই নায়ক গোয়েন্দা প্রতুল লাহিড়ী এবং তার সহকারী বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ওরফে বিশু। কিন্তু এঁদের রচনার অধিকাংশই বিদেশী গল্পের ছায়ানুসরণ বা ভাবানুবাদ অথবা ভাবনির্যাস। দেশের মাটিতে তাদের শিকড় প্রোথিত নয়।

ক্রমে ক্রমে বাংলা ভাষায় গোয়েন্দা-সাহিত্য সৃষ্টির জোয়ার এলেও রসিক পাঠকের মনে কিন্তু একটা প্রশ্ন জেগেই ছিল—বাংলা গোয়েন্দা কাহিনী কি কখনও যথার্থ সাহিত্যের স্বীকৃতি লাভে সমর্থ হবে? উচ্চসাহিত্যের দরবারে সে কি কোনদিন অক্ষয় আসন লাভ করতে পারেব?—এই প্রশ্নের একটি ইতিবাচক উত্তর পাওয়া গেল ১৩৩৯ সনে ৭ই আষাঢ় মাসিক বসুমতীতে 'পথের কাঁটা' নামক গল্পটি প্রকাশিত হওয়ার পর। গল্পের নায়ক সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী যিনি আপাতদৃষ্টিতে সাজে-পোশাকে, আচারে-আচরণে, এক সাধারণ মানুষ—কিন্তু সেই আপাত সাধারণত্বের অন্তরালে লুকিয়ে আছে বুদ্ধিদীপ্ত, অত্যুজ্জ্বল এক ব্যক্তিত্ব যার প্রভায় চমকিত হলেন বাংলা গোয়েন্দা-গল্পের পাঠককুল, চমৎকৃত হলেন বাঙলা সাহিত্য রসিক সমাজ। তাঁরা অনুভব করলেন কি কাহিনী বয়নে, কি চরিত্র চিত্রণে, কি ভাষার কারুকার্যে ব্যোমকেশ-কাহিনী বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে এক নতুন সম্ভাবনার সিংহদুয়ার উন্মুক্ত করে দিল। এক নতুন অঙ্গীকারে জয় করে নিল রহস্য-রোমাঞ্চপ্রিয় পাঠক সমাজের হৃদয়প্রদেশ।

কাহিনী-বিশ্লেষণ

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গোয়েন্দা-কাহিনীগুলি লক্ষ্য করলে স্পষ্ট কতকগুলি

বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে—অপরাধ থাকলেও প্রতিটি কাহিনীতেই অপরাধের কারণ, পটভূমি বা গুরুত্ব সমান নয়। মানুষ অপরাধ করে কিন্তু প্রতিটি অপরাধই একই কার্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ নয়। কারো কারো ক্ষেত্রে অপরাধ প্রবণতা সহজাত প্রবৃত্তি। কেউ বা সমাজ পরিবেশের শিকার হয়ে অপরাধ সম্পাদনে বাধ্য হয়। কেউ বা ঘটনাচক্রে অপরাধ করে ফেলে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপরাধ নিজের বা অন্যের জীবনরক্ষার বিকল্পহীন উপায়মাত্র। অপরাধীদের মধ্যে কেউ খুনী, কেউ চোর কেউবা জালিয়াৎ। এই গ্রন্থে তাই অপরাধের বৈশিষ্ট্য অনুসারেই ব্যোমকেশ কাহিনীগুলির বিন্যাস ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে, রচনাকাল অনুসারে নয়।

॥ ১ ॥

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আলোচনা করা হচ্ছে সেই কাহিনী সমূহের কথা যেগুলিতে অপরাধের কারণ—লোভ, মূলতঃ অর্থলোভ এবং সেই তৃতীয় রিপুর চরিতার্থতা সাধনের জন্য অপরাধী সচেতনভাবেই অন্যায় কর্মে লিপ্ত। ব্যোমকেশ কাহিনীর এই শ্রেণীর অপরাধীরা অধিকাংশই জাত অপরাধী—অর্থাৎ অপরাধ প্রবণতা তাদের সহজাত, স্বতস্ফূর্ত প্রবৃত্তি।

সত্যান্বেষী [১৩৩৯।ঃ উক্ত ধারায় যে গল্পটি সর্বাগ্রে স্মরণীয় তার নাম 'সত্যান্বেষী'।[১] এ কাহিনীর ঘটনাকাল বাংলা ১৩৩১ সন (ইংরাজী ১৯২৪-২৫ সাল) অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে পটভূমিকায় 'সত্যান্বেষী' রচিত। ভারতবর্ষ তখনও বৃটিশের পদানত। কলকাতা শহরে স্থানে স্থানে তখন বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা। সেই নিয়ম-শিথিল সমাজে যে সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তিরা ভদ্রতার মুখোশ পরে একের পর এক পাপকার্য সাধনে ব্যাপৃত, আলোচ্য গল্পের অনুকূল ডাক্তার তাদেরই যোগ্য প্রতিভূ। হোমিওপ্যাথের ছদ্মপেশায় নিযুক্ত, অবিবাহিত অনুকূল বাবু সম্ভবতঃ চীনাবাজার অঞ্চলে একটি দ্বিতল মেস বাড়ির মালিক। সেই বাড়ীরই একতলায় তাঁর অবস্থান। আপাত-দৃষ্টিতে অনুকূলবাবু নিঃসন্দেহেই বিভিন্ন গুণের অধিকারী। তিনি বেশ সরল, সদালাপী লোক। মেসের অধিবাসীদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে সদাতৎপর। অজিতের বর্ণনা অনুসারে আরও জানা যায়—

> "পাড়ার দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে ডাক্তারের বেশ পসার ছিল। সকালে ও বিকালে তাঁহার বসিবার ঘরে বসিয়া সামান্যমূল্যে ঔষধ বিতরণ করিতেন।··· ডাক্তার অত্যন্ত নিরীহ ভাল মানুষ লোক হইলেও ভারি চমৎকার কথা বলিতে পারিতেন। বয়স বছর চল্লিশের ভিতরেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো উপাধিও তাঁহার ছিল না, কিন্তু ঘরে বসিয়া এত বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান তিনি অর্জন করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে বিস্ময়বোধ হইত।"

রচনাকাল অনুসারে 'পথের কাঁটা' শরদিন্দুর প্রথম গোয়েন্দা গল্প হলেও 'সত্যান্বেষী'র গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিষয়ে স্বয়ং লেখকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—"ব্যোমকেশকে নিয়ে একটি সিরিজ লেখার কথা মনে হয়। তখন 'সত্যান্বেষী' গল্পে (২৪ শে মাঘ ১৩৩৯) ব্যোমকেশ চরিত্রটিকে এসট্যাবলিস করি। পাঠকদের সুবিধার জন্য অবশ্য 'সত্যান্বেষী'কেই ব্যোমকেশের প্রথম গল্প বলে ধরা হয়।" (শরদিন্দু অমনিবাস, ২য় খণ্ড দ্বাদশ মুদ্রণ)।

সুতরাং জ্ঞান, বিদ্যা, বিনয় সবই তাঁর ছিল, কিন্তু এই সকল সুপ্রবৃত্তির ছদ্ম আবরণের অন্তরালে বাস করত হিংস্র শ্বাপদের মতো এক নির্মম সত্তা এবং সুতীব্র অর্থলোভ। তাই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার নামে ডাক্তার সাধারণ লোকের চোখে ধুলো দিয়ে দিনের পর দিন চালিয়ে গেছে কোকেনের বেআইনী ব্যবসা। সেই অসাধু অর্থোপার্জনের পথে পদে পদে বিঘ্ন কিন্তু অনুকূল ডাক্তার অপরাধ সম্পাদনে নির্বিবেক, নিঃশঙ্কচিত্ত। তাই একটা পাপকে ঢাকতে গিয়ে, তারই নির্দেশে বা প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে অনুষ্ঠিত হয়েছে ,একের পর এক হত্যাকাণ্ড। আলোচ্য গল্পে দেখা যায় প্রথমে খুন হয়েছে এক ভাটিয়া শ্রেণীর লোক, তারপর সেই হত্যাকাণ্ড দেখে ফেলার অপরাধে নিহত হয়েছেন অশ্বিনীবাবু। এছাড়া ব্যোমকেশ ও অজিতকে হত্যা করার জন্যেও দেখি অনুকূলবাবুর বিশেষ প্রয়াস, যদিও তা সার্থক হয়নি, কারণ অতুল ওরফে ব্যোমকেশ যে তার জন্যেই ঘরের দরজা খুলে রেখে ফাঁদ পেতেছে তা বোঝা এই নরঘাতকটির পক্ষেও সম্ভব হয়নি। এই গল্পে শেষ পর্যন্ত সাধাসিধা অনুকূলবাবুর ছদ্মবেশের আড়াল থেকে যে, "দুর্দান্ত নরঘাতক গুণ্ডা" ভদ্রতার খোলস ছেড়ে বার হয়ে আসে, তাকে দেখে শুধু অজিত নয় বোধহয় সকল শান্তিপ্রিয়, নিরীহ মানুষই শিউরে ওঠেন।

উপসংহার [১৩৪২] ঃ অনুকূল ডাক্তারেকে আবার আমরা পাই 'উপসংহার' গল্পে। 'উপসংহার' নামটি দুদিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমতঃ এখানে আমরা 'অগ্নিবাণ' গল্পের দেবকুমার বাবুর চুরি যাওয়া দেশলাই বাক্স রহস্যের সমাধান পাই। দ্বিতীয়তঃ আলোচ্য গল্পটি 'সত্যান্বেষী'র অনুকূল ডাক্তারের কাহিনীরও উপসংহার। অনুকূলবাবু দাগী অপরাধী। তাই জেল থেকে ছাড়া পেয়েই তার প্রথম লক্ষ্য ব্যোমকেশকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা। এই উদ্দেশ্য নিয়েই সে দেবকুমার বাবুর 'অগ্নিবাণ' চুরি করে তা ব্যোমকেশের মৃত্যুবাণে পরিণত করার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। বাঁদুরে টুপি ও কালো চশমায় নিজের মুখ-চোখ যথাসম্ভব আড়ালে রেখে ট্রামে ব্যোমকেশের দেশলাই বাক্স বদলে দিলেও অল্পের জন্য তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। এরপর 'কোকোনদ গুপ্ত' এই ছদ্ম নামে লেখা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চিঠির মাধ্যমে সে প্রকৃতপক্ষে ব্যোমকেশের বিরুদ্ধে তার তীব্র প্রতিশোধ স্পৃহার কথাই ব্যক্ত করেছে। এছাড়া ব্যোমকেশ বক্সীর নামের সঙ্গে ধ্বনি-গত সাযুজ্য রেখে নিজে অপর ছদ্মনাম গ্রহণ করেছে—'ব্যোমকেশ বোস'। আস্তানা গেড়েছে ব্যোমকেশের হ্যারিসন রোডের বাসার নীচের তলার মেসে, এবং চিঠি ফেরৎ নেওয়ার ছল করে ব্যোমকেশের সঙ্গে দেখাও করেছে—অবশ্য অনুকূল ডাক্তারের মুখাবয়ব তখন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত, -বিকৃত বলাই ভাল। কিন্তু 'উপসংহারে'ও অনুকূলবাবু আবার ভুল করেছে। নিজের অজান্তেই সে ব্যোমকেশকে দুটি সূত্র উপহার দিয়ে গেছে—(এক) কোকোনদ গুপ্তের চিঠি, (দুই) ছদ্মবেশধারী অনুকূল বাবুর হাঁটার ভঙ্গী। 'কোকনদ' নামটি ব্যোমকেশ ও অজিতকে কোকেনের কথা অর্থাৎ অনুকূলবাবুর পূর্ব অপরাধের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। অপরদিকে দু নম্বর ব্যোমকেশবাবুর মুখের চেহারায় যতই পরিবর্তন ঘটে থাকুক না কেন তাঁর হাঁটার ভঙ্গী দেখে ব্যোমকেশ সচকিত হয়েছে। তাই তার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পরেই অজিতের প্রতি ব্যোমকেশের উক্তি—

"কিন্তু ওঁর চলার ভঙ্গীটা যেন পরিচিত, কোথাও দেখেছি। সম্প্রতি নয়—অনেকদিন আগে।"

এই দুটি সূত্রই কার্যকালে ব্যোমকেশকে অনুকূল ডাক্তারের পরিচয় উদ্ঘাটনে সাহায্য করেছে এবং কাহিনীর পরিণামে অশুভ বুদ্ধির পরাজয় ও শুভবুদ্ধির জয় ঘটেছে।

পথের কাঁটা [১৩৩৯] ঃ 'পথের কাঁটা'তেও নরহত্যার পশ্চাতে আততায়ীর প্রবল অর্থতৃষ্ণা ক্রিয়াশীল। কিন্তু এই গল্পের অভিনবত্বগুলি লক্ষণীয়। ব্যোমকেশের বিশ্লেষণ অনুসরণ ক'রে লক্ষ্য করা যায় যে আলোচ্য গল্পে নিহত ও আক্রান্ত প্রত্যেকেই বিগত-যৌবন, অর্থবান এবং অপুত্রক। তাঁদের বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কোনও ক্ষেত্রে ভাগ্নে, কোনো ক্ষেত্রে ভাইপো, কোনো ক্ষেত্রে জামাই আবার কোনো ক্ষেত্রে রক্ষিতা। 'পথের কাঁটা' গল্পের প্রৌঢ়, পুত্রহীন, বিত্তবান ব্যক্তিদের অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে চিরতরে মুছে দিয়ে যারা লাভবান হতে চেয়েছিল, সেই স্বার্থান্বেষীরা কেউই কিন্তু নিজেদের হাত রক্ত-রঞ্জিত করেনি, সাহায্য নিয়েছে এমন একজনের যে অর্থের বিনিময়ে সাগ্রহে তাদের স্বার্থ পূরণ করেছে। অর্থ পিপাসায় উন্মাদ, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য এই পেশাদার হত্যাকারীর নাম প্রফুল্ল রায়। অপরাধ সাধনে ও অপরাধ গোপন রাখার দুরূহ, দুঃসাধ্য কর্মে তার অনায়াস পটুতা বিশেষভাবেই অনুধাবনযোগ্য। তার অপরাধ সম্পাদনের পদ্ধতিটিও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই গল্পে দেখি অজিত লক্ষ্য করে না, কিন্তু ব্যোমকেশের দৃষ্টি এড়ায় না—

"কিছুদিন থেকে কাগজে একটা মজার বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে—'পথের কাঁটা'।

যদি কেহ পথের কাঁটা দূর করিতে চান, সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার সময় 'হোয়াইট ওয়েলেডলে'র দোকানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ল্যাম্পপোস্টে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন"।

ঐ বিজ্ঞাপন অনুসারে নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে থাকার পরবর্তী ঘটনাক্রমও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে অজিতের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। ছবি বিক্রির ছলনায় সেই অত্যন্ত জনবহুল রাজ-পথেও অনায়াসে অজিতের কাছে পেঁৗছে দেওয়া হয় 'পথের কাঁটা' সরিয়ে ফেলার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ—

"আপনার পথের কাঁটা কে? তাহার নাম ও ঠিকানা কি? আপনি কি চান, পরিষ্কার করিয়া লিখুন।...............লিখিত পত্র খামে ভরিয়া আগামী রবিবার ১০ই মার্চ রাত্রি বারোটার সময় খিদিরপুর রেসকোর্সে'র পাশ দিয়া পশ্চিম দিকে যাইবেন। একটি লোক বাইসিক্ল চড়িয়া আপনার সম্মুখ দিক হইতে আসিবে,...... ...বাইসিক্ল আরোহী আপনার হাত হইতে চিঠি লইয়া যাইবে। অতঃপর যথাসময়ে আপনি সংবাদ পাইবেন।"

পথের কাঁটা গল্পের ঘটনা প্রবাহও ব্যোমকেশের অত্যন্ত অনুমানসূত্রে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ব্যোমকেশ অনুভব করেছে যে 'পথের কাঁটা' ও গ্রামোফোন পিন রহস্যের মধ্যে একটা সুনিশ্চিত যোগসূত্র আছে। তার এই ধারণার সত্যতা অচিরেই প্রমাণিত হয়। প্রফুল্ল রায় নিছক পরহিতৈষণাবশত নয়, রীতিমত কাঞ্চনমূল্যের বিনিময়েই অন্যের সুখের

পথে কাঁটা সরাবার যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল তা নিঃসন্দেহে অভিনব। তার আশ্চর্য অস্ত্রটি ছিল একটি বাইসিক্লের বেল,' যার মাথার দিকটি খুলে অনায়াসেই রাখা যায় গ্রামোফোনের ক্ষুদ্র অথচ সুতীক্ষ্ণ পিন। এই বেলের অভ্যন্তরস্থ স্প্রিং অত্যন্ত শক্তিশালী। চাবি টিপলে এক সঙ্গে দুটি কাজ হয়—ঘণ্টিও বাজে, আর স্প্রিং-এর ধাক্কায় ঘণ্টির ছোট ফুটো দিয়ে গ্রামোফোনের পিন মৃত্যুবাণ রূপে উদ্দিষ্ট হতভাগ্যের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়। নরহত্যার এই কৌশলটি "কী ভয়ঙ্কর অথচ কী সহজ!" সুতরাং প্রফুল্ল রায়ের কার্য-পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর ব্যোমকেশের মত আমাদেরও বলতে ইচ্ছা করে—

"কি অদ্ভুত লোকটার মাথা। এ রকম একটা যন্ত্র যে তৈরী করা যায়, এ কল্পনাও বোধকরি আজ পর্যন্ত কারুর মাথায় আসেনি।"

শুধু হত্যার হাতিয়ারের ক্ষেত্রেই নয়, হত্যাকারী হিসেবেও তার চরিত্র অসাধারণ। পেশাদার হত্যাকারী বলেই প্রফুল্ল রায়ের নৃশংস কার্যাবলীর পশ্চাতে শুধু অর্থলিপ্সা ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য নেই। শুধুমাত্র অর্থোপার্জনের জন্য একাধিক নিরীহ মানুষের জীবনদীপ নির্বাপিত করে দেওয়ার এই নিষ্ঠুর জিঘাংসার তুলনা বিরল।

প্রফুল্ল রায়ের অসমসাহসিকতাও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বিবেকবোধ এবং ন্যায়নীতির কোনো পরোয়া না করে, আইনকে ফাঁকি দিয়ে সে দিনের পর দিন তার অদৃশ্য কারবার চালিয়ে গেছে। ব্যোমকেশের বাড়ীতে এসে অজিত ও ব্যোমকেশের সঙ্গে সহজ ভাবেই বাক্যালাপ চালানোর ছলে তাদের মৃত্যুর হাতছানি দিয়ে ডেকে গেছে। আবার জীবনের চূড়ান্ত মুহূর্তে পুলিশের হাতে ধরা না দিয়ে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে। এক কথায় প্রফুল্ল রায় জাত অপরাধী। অপরাধ-প্রবণতা তার মজ্জাগত। ব্যোমকেশের দৃষ্টিতে সে শুধু খুনী নয়, খুনের কৌশলের দিক দিয়ে সে আর্টিস্ট।

অন্যদিকে ব্যোমকেশের অনুসন্ধান পদ্ধতিতে অনুমানের গুরুত্ব যে কতখানি আলোচ্য গল্পটিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। তার অসামান্য দূরদর্শিতাও আমাদের যুগপৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ করে।

ব্যোমকেশ পাপকে ঘৃণা করে, সম্ভবতঃ পাপীকে নয়। তাই প্রফুল্ল রায়ের অসাধারণ বুদ্ধি অসমসাহসিকতা ও দুর্জয় মনোবলের অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে ব্যোমকেশ দ্বিধাবোধ করেনি। এমনকি কাহিনীর শেষ মুহূর্তে বিষমিশ্রিত পান খেয়ে, পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণকেই ব্যোমকেশ প্রফুল্ল রায়ের মত লোকের যথাযোগ্য পরিণতি হিসেবে গণ্য করেছে—

"তুমি কি মনে কর প্রফুল্ল রায় যদি সামান্য খুনীর মত ফাঁসি যেত তাহলে ভাল হত? আমার তা মনে হয় না। বরং এমনি ভাবে যাওয়াই তার ঠিক হয়েছে। সে যে কতবড় আর্টিস্ট ছিল, ধরা পড়েও হাত পা বাঁধা অবস্থায় সে তা দেখিয়ে দিয়ে গেছে।"

এই অভিমতের মাধ্যমে শুধু সত্যান্বেষী হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবেও ব্যোমকেশের স্বাতন্ত্র্যটুকু আমরা অনায়াসেই উপলব্ধি করি।

অর্থমনর্থম [১৩৪০] ঃ 'অর্থমনর্থম' গল্পে অর্থই যে অনর্থের মূল ঘটনাচক্রে এই

সত্যই সুপরিস্ফুট হয়েছে। এই গল্পে নিহত গৃহকর্তা করালীবাবু বিত্তবান, বিপত্নীক, নিঃসন্তান। রুক্ষস্বভাব বিশিষ্ট এই ব্যক্তিটির পাচক-ভৃত্য-পরিবৃত সংসারে প্রকৃত পোষ্য পাঁচজন—মতিলাল, মাখনলাল, ফণিভূষণ, সুকুমার ও সত্যবতী। প্রথমোক্ত তিনজন তাঁর ভাগ্নে এবং শেষোক্ত দুজন তাঁর শ্যালিকার পুত্র ও কন্যা। করালীবাবুর এক বিচিত্র খেয়ালই অলক্ষ্যে তাঁর মৃত্যুবাণে পরিণত হয়েছিল—সেটি হচ্ছে তাঁর ঘনঘন উইল পরিবর্তনের অস্থির অভ্যাস। কিন্তু লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে এই গল্পে করালীবাবুর ঘাতক ফণিভূষণ জাত অপরাধী নয়, বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় তার মনে অপরাধ-প্রবণতা জাগ্রত হয়েছে। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মূল ভিত্তি দুটি (১) সম্পত্তির উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ক্ষেত্রে করালীবাবুর অস্থিরচিত্ততা, (২) শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে ফণিভূষণের একধরনের হীনমন্যতা। সে সুস্থ মানুষের মত স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরা করতে বা কারও সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে না, বইই তার নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সঙ্গী। ফণিভূষণ গ্রন্থপ্রেমিক। তার এই বৈশিষ্ট্যটি পরিস্ফুট হয়েছে সত্যবতীর জবানীতে—

"তিনি ইস্কুল কলেজে পড়েন নি বটে, কিন্তু বেশ ভাল লেখাপড়া জানেন। তাঁর আলমারির বই দেখেই বুঝতে পারবেন—কতরকম বিষয়ে তাঁর দখল আছে।"

—ফণিভূষণের বই পড়ার একটা বিশিষ্টতা ছিল—পাকা গ্রন্থকীটদের মতই তার অভ্যাস ছিল বইয়ে পেন্সিলের দাগ দিয়ে পড়া। এই বৈশিষ্ট্যই পরবর্তীকালে প্রকৃত হত্যাকারীকে চিনে নেওয়ার ব্যাপারে ব্যোমকেশকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। ফণিভূষণ তার মামাকে হত্যা করেছিল রাগের মাথায় নয়, সংকল্প ক'রে সুপরিকল্পিত ভাবেই সে করালীবাবুর জীবন থেকে পৃথিবীর আলো মুছে দিয়েছিল। মামাকে সে ভালবাসতনা, তবে নিরপরাধ সুকুমারকে হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত করার আয়োজন করতে গিয়ে কিছুটা বিবেক-দংশন তাকে সহ্য করতে হয়েছিল বৈকি। তবে ফণিভূষণ তার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে লেখা চিঠিটিতে স্বীকার করেছিল যে সুকুমার ফাঁসি গেলে তার একটা সুবিধা হত, কিন্তু সে সুবিধা কি, তা উল্লেখ করেনি। তবে কি ফণিভূষণের মনে ছিল সত্যবতীর প্রতি অনুচ্চারিত ভালবাসা ? এই কৌতূহল অচরিতার্থই থেকে যায়।

যাইহোক, ফণিভূষণ শারীরিক দিক দিয়ে প্রতিবন্ধী হলেও মানসিক দিক থেকে সে কতখানি সক্রিয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় করালীবাবুকে হত্যা করে সুকুমারকে দোষী সাব্যস্ত করার প্রায় নিখুঁত আয়োজনে। তাকে হত্যাকারী হিসেবে সনাক্ত করার সাধ্য আত্মম্ভরী ইন্সপেক্টর বিধুবাবুর ছিল না কিন্তু ব্যোমকেশের সূক্ষ্ম সত্যদৃষ্টি ও অনুসন্ধান পদ্ধতির অভিনবত্ব তাকে আত্মগোপন করতে দেয়নি। ব্যোমকেশের বিশ্লেষণ অনুযায়ী ফণিভূষণ অপরাধ সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ কয়েকটি ভুল করেছিল,

"প্রথমে সে গ্রের অ্যানাটমির এক জায়গায় পেন্সিল দিয়ে লাল দাগ দিয়েছিল, দ্বিতীয়—সে বাক্স টানবার সময় একটু শব্দ করে ফেলেছিল, আর তৃতীয়—সে আইন ভাল জানত না"।

তবে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কর্ম পন্থার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় সাধারণ

অপরাধীদের তালিকায় সে পড়ে না, কাহিনীর স্রষ্টাও তার জীবনে পরিমাণ নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যে চিত্রিত করেননি, তাকে গতানুগতিক মৃত্যুবরণ করতে হয়নি। স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত সে নিজের হাতেই ক'রে গেছে।

এ গল্পে রহস্যকাহিনী সুলভ চমকটুকুও উপভোগ্য। ব্যোমকেশ নিজেই বলেছে এরকম একটা স্থির মস্তিষ্কে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রে প্রকৃত হত্যাকারীকে সহজে চেনা যায় না, পাঁচজনকে সন্দেহ হয়। ব্যোমকেশ নিজেও করালীবাবুর পোষ্য পাঁচজনকেই সন্দেহ করেছে। এমনকি অনুসন্ধানের প্রথমদিকে সত্যবতীকেও সন্দেহভাজনদের তালিকা থেকে মুক্তি দেয়নি। কারণ তার যুক্তি—

"মেয়েমানুষ যাকে ভালবাসে, তার জন্য করতে পারে না, এমন কাজ নেই।"

তদন্তকারী ইন্সপেক্টর বিধুবাবু এত তলিয়ে ভাবেন না। কারণ আত্মগর্বে স্ফীত, পদমর্যাদা সম্পর্কে অতীব সচেতন বিধুবাবুর তদন্তের স্থূল পদ্ধতিতে অনেক আপাত-তুচ্ছ অথচ গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। যেমন, মৃত করালীবাবুর নাকের চারপাশে ক্লোরফর্ম করার দাগ, তাঁর ঘাড়ে তিনবার ছুঁচ ফোটানোর চিহ্ন, হত্যার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত ছুঁচটিতে পরানো কালো সুতো, সর্বোপরি করালীবাবুর শেষ উইল-এ সাক্ষীর স্বাক্ষরের অনুপস্থিতি। ব্যোমকেশ এই সমস্ত বিষয়ে তাঁকে সচেতন করে দিতে চাইলেও তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ অবজ্ঞায় উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন এবং নিজের সবজান্তা মনোভাবের বশবর্তী হয়ে স্থূল প্রমাণগুলি অবলম্বনে প্রথমে মতিলাল এবং পরে সুকুমারকে দোষী সাব্যস্ত করে তিনি তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করে ফেলেছেন—বিশেষতঃ সুকুমারের বিরুদ্ধে এতগুলি অকাট্য প্রমাণ যে আইনের হাত থেকে তাকে রক্ষা করাই ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। ব্যোমকেশের তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম বুদ্ধির সহায়তায় সেই উজ্জ্বল উদ্ধার সম্ভব হয়েছে। সত্যবতীর কাছ থেকে সুকুমারের নির্দোষিতার কথা জানতে পেরে সে প্রকৃত সত্য অনুসন্ধানে তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে, তার অনন্য সাধারণ পারদর্শিতার সাহায্যে সেই কাজে সফলও হয়েছে।

এই গল্পে ব্যোমকেশের সত্যান্বেষী অভিধার অপর এক তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শুধু কর্মজগতে নয়, নিজের জীবনক্ষেত্রেও সে সত্য অন্বেষণ করেছে, সে সত্য 'সত্যবতী'। গল্পকার শরদিন্দু ব্যোমকেশ ও অজিতের সরস কথোপকথনের মাধ্যমে ব্যোমকেশের 'সত্য' অনুরাগ চিত্রিত করেছেন—

"আমি বলিলাম, সত্য অন্বেষণ তো অনেকদিন থেকেই করছ, কই এত সাজ-সজ্জা তো দেখিনি।"

ব্যোমকেশ একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, "সত্য অন্বেষণ আমি অল্পদিন থেকেই আরম্ভ করেছি।"

"তার মানে?"

"তার মানে অতি গভীর। আমি চললুম।" মুচকি হাসিয়া ব্যোমকেশ দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।"

—বুদ্ধি ও যুক্তির বর্মে সুসজ্জিত সত্যান্বেষীর মনোলোকের নীরস পরিচয় নয়,

জীবনপ্রেমিক ব্যোমকেশের এই প্রেমস্নিগ্ধ পরিচয়টুকুই যেন পাঠকের প্রতি লেখকের একটি প্রীতি-মধুর উপহার।

চোরাবালি [১৩৪০]ঃ ভয়াবহ আর রোমাঞ্চকর ঘটনায় পরিপূর্ণ 'চোরাবালি' শরদিন্দু রচিত উল্লেখযোগ্য গোয়েন্দা কাহিনীগুলির মধ্যে অন্যতম। এই গল্পে পাপের পশ্চাতে শুধুমাত্র অর্থলোভ নেই আছে ধর্মান্ধতাও। উত্তরবঙ্গের প্রসিদ্ধ চোরাবালি অঞ্চলের জমিদার, শিকার-পাগল হিমাংশু রায়ের দেওয়ান শাক্ত মতাবলম্বী, কাপালিক-শিষ্য কালীগতির আপাত-সাত্ত্বিকতার অন্তরালে যে নিষ্ঠুর, কুটিল, পাশবিক প্রবৃত্তি আত্মগোপন করেছিল, ব্যোমকেশের সত্যানুসন্ধিৎসার উজ্জ্বল আলোকসম্পাতে তারই আকস্মিক উন্মোচন।

রক্ষক যখন ভক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করে তখন তাকে সহজে চিনে নেওয়া যায় না। কালীগতির ক্ষেত্রে এই রকমই ঘটেছিল। জমিদার হিমাংশুবাবুর বাইরের চেহারাটা এক নজরে দেখলে যদিও মনে হয় "লোকটা ভীষণ দুর্দান্ত" কিন্তু তাঁর অন্তরের পরিচয় সম্পূর্ণ বিপরীত—এই গল্পে অজিতের বিশ্লেষণ থেকেই জানা যায়—

"বস্তুতঃ লোকটি অত্যন্ত সাদাসিধা অনাড়ম্বর—মনের মধ্যে কোন মারপ্যাঁচ নাই।"

তাই পিতৃবিয়োগের পর জমিদারীর সমস্ত স্বত্বলাভ করেও জমিদার-সুলভ সতর্কতা তাঁর মনে জাগেনি, বরং পিতার আমলের বৃদ্ধ দেওয়ানের প্রতি তাঁর অটুট আস্থা অবিচল থেকেছে। ফলে কার্যতঃ কালীগতির কার্যকলাপের তদারক করার কেউ নেই, জমিদারী পরিচালনার কার্যে তিনিই সর্বেসর্বা। এমন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে দেওয়ান দ্বিধা বোধ করেন নি। প্রথমে কিছু কিছু টাকা তছরূপ করতে শুরু করলেন, কিন্তু তাতে তাঁর লোভ-রিপু তো প্রশমিত হ'ল না উপরন্তু ঘৃতাহুতি-প্রাপ্ত অগ্নির মতো তা শতগুণে বৃদ্ধি পেল। কালীগতি অন্য পথ ধরলেন। জমিদারীর বাঁধা আয়ব্যয়ের মধ্যে পুকুরচুরির সুযোগ কোথায়? তাই তিনি হিমাংশুবাবুর বড়ো বড়ো প্রজাদের সঙ্গে মোকদ্দমা বাঁধিয়ে মামলার খরচের অজুহাতে প্রচুর অর্থ আত্মসাৎ করতে শুরু করলেন। এই পর্যন্ত চুরিই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। এর পরবর্তী পর্যায়ে যুক্ত হল ধর্মান্ধতা। হিমাংশু রায়ের জমিদারীতে এক কাপালিকের আবির্ভাব ঘটল, হিমাংশুবাবু তাঁকে আমল না দিলেও কালীভক্ত দেওয়ান ঠাকুর তাঁর প্রতি বিশেষ আনুগত্য দেখিয়ে কাপালিকের আহার ও বাসস্থানের যথাযোগ্য আয়োজন করলেন। কাপালিক কিন্তু হিমাংশুবাবুর অবজ্ঞাকে সুনজরে দেখেন নি। তাই 'চোরাবালি' ছেড়ে যাওয়ার আগে তিনি শুধু কালীগতিকে মন্ত্রই দেননি, তার সঙ্গে হিমাংশুবাবুর সর্বনাশ সাধনের কুমন্ত্রণাও দিয়েছিলেন। ধর্মান্ধ কালীগতি গুরুর আদেশ অমান্য করেননি, কারণ সে আদেশ তাঁর অর্থগৃধ্নুতারই পরিপোষক ছিল। হিমাংশুবার সম্পত্তি আত্মসাৎ করার জন্য তিনি যে কৌশলটি উদ্ভাবন করলেন তা যেমন সহজ তেমনই কার্যকরী—প্রথমে জমিদারের টাকা চুরি করে তহবিল খালি করে দিলেন, পরে খরচের টাকা না থাকার অজুহাতে মহাজনের কাছ থেকে জমিদারকে ঋণ গ্রহণে বাধ্য করলেন এবং শেষে, মহাজনের কাছ থেকে হিমাংশুবাবুরই টাকায় তমসুক কিনে নিয়ে কালীগতি বিনা খরচে হিমাংশুবাবুর

অজান্তেই তাঁর উত্তমর্ণ হয়ে দাঁড়ালেন। এই ভাবে 'মাছের তেলে মাছ ভাজা'র পদ্ধতিতে জমিদারীকে নিলামে তোলার সমস্ত আয়োজন যখন প্রায় সম্পূর্ণ, নিঃশব্দে কৃতঘ্ন দেওয়ান যখন তাঁরই অন্নদাতার সর্বনাশের পথ দিনে দিনে প্রশস্ত করে চলেছেন, তখন নিয়তির নির্বন্ধে নিঃসম্বল, অঙ্কপাগল হরিনাথ মাস্টারের আগমন, যাকে নিযুক্ত করা হল হিমাংশু-তনয়া বেবির গৃহশিক্ষকরূপে। হরিনাথ তার গণিত-প্রীতির প্রেরণাতেই তার ঘরে রাখা জমিদারীর হিসাব সংক্রান্ত পুরানো খাতাগুলি নাড়াচাড়া করতে গিয়ে আবিষ্কার করল লক্ষ লক্ষ টাকার কারচুপি আর সে কথা জানাল তার পরম বিশ্বাসভাজন দেওয়ানজীকে অর্থাৎ নিজের অজান্তেই সে আমন্ত্রণ করল তার মৃত্যুদূতকে। আপন অপরাধ গোপন রাখার জন্য এবং হরিনাথকে চোর প্রমাণ করার জন্য কালীগতি যে পরিকল্পনা করেছিলেন তা আপাতদৃষ্টিতে নিখুঁত হলেও সত্যান্বেষীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনি, ফলে ব্যোমকেশ ও অজিতকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলার জন্য আয়োজন চলল। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার অভিপ্রায়ে সব জেনেশুনেও ব্যোমকেশ অজিত সব সেই ফাঁদে পা দিল কিন্তু অসাধারণ কূটকৌশল অবলম্বন করে ধরা পড়ল না, কালীগতিকেই ধরিয়ে দিল। তবে এ গল্পে অপরাধের কারণ তত বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়, যত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অপরাধ সাধনের পন্থাটি। কালীগতির হাতিয়ার ছোরা, ছুরি, বন্দুক, ক্ষুর, বিষ—এসব কিছুই নয়- বাঘের ডাক আর চোরাবালি। হিমাংশুবাবুর জমিদারীকে বেষ্টন করে আছে যে বিস্তীর্ণ বালুবলয় তারই কোনও এক স্থানে ছিল খানিকটা চোরাবালি।[২] স্থানীয় সকলেই সে কথা জানত। এমনকি পশুপক্ষীরাও ঐ বালুবন্ধকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করত, কিন্তু বালির সুদীর্ঘ বিস্তৃতির মধ্যে ঠিক কোনখানে সেই মরণ ফাঁদ লুকিয়ে আছে তা আর কেউ না জানলেও কালীগতির অজানা ছিল না, আর ঘটনাচক্রে জেনেছিল ব্যোমকেশ আর অজিত। প্রকৃতির সেই উপাদানকে কালীগতি এক নিষ্ঠুর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করতে চেয়েছেন। তাঁর ছিল জন্তু-জানোয়ারের ডাক নকল করার এক অসাধারণ প্রতিভা। ক্ষুধার্ত বাঘের হিংস্র ডাক ডেকে, হরিনাথকে তিনি বাধ্য করেছিলেন চোরাবালিতে আশ্রয় নিয়ে অতলে তলিয়ে যেতে। ব্যোমকেশ ও অজিতকে শেষ করে দেওয়ার জন্যও অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল। অবশ্য এক্ষেত্রে দেওয়ানজীর প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। ব্যোমকেশের ইঙ্গিতে হিমাংশুবাবুর গুলি ছোঁড়ার শব্দভেদী প্রতিভা কালীগতিকে পাপের বেতন মৃত্যুর মূল্যে চুকিয়ে দিয়েছে।

'চোরাবালি'তে ব্যোমকেশের এক নতুন রূপ ধরা পড়েছে। ব্যোমকেশ পাপের প্রতি

---

২ বিস্তীর্ণ বালুবলয়ের মধ্যে চোরাবালির এই অবস্থানের প্রসঙ্গে স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের লেখা 'দ্য হাউণ্ড অফ্ দ্য বাস্কারভিল্‌স্' রহস্যোপন্যাসের 'গ্রিমপেন পঙ্কভূমি'র [Grimpen Mire] কথা মনে পড়ে যায়। অবশ্য দুটি কাহিনীতে দু'রকম ব্যাপার ঘটেছে—শরদিন্দুবাবুর রচনায় কালীগতির চক্রান্তে নিরীহ হরিনাথ মাস্টার চোরাবালিতে তলিয়ে গেছে আর কোনান ডয়েলের উপন্যাসে নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রকারী স্টেপ্‌লটন কুয়াশাচ্ছন্ন রাতে গ্রিমপেন পঙ্কভূমির পঙ্কিল ক্লেদের তলায় চিরতরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

বিতৃষ্ণ হলেও পাপীর প্রতি সচরাচর বিরূপ নয়, কিন্তু 'চোরাবালির' কালীগতির প্রতি ব্যোমকেশকে রুদ্রতেজে জ্বলে উঠতে দেখি। কেবলমাত্র হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্য জেনেশুনে হরিনাথের মত একটা নিরীহ লোককে মৃত্যুমুখে পাঠিয়ে দেওয়ার অপরাধকে সে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেনি। তাই হিমাংশুবাবুর উক্তিতে ধ্বনিত হয়েছে ব্যোমকেশেরই মনের কথা—

"A tooth for a tooth, an eye for an eye."

ব্যোমকেশের এই অগ্নিমূর্তি নিঃসন্দেহেই এক বিরল ব্যতিক্রম। সুতরাং নানা দিক দিয়েই গোয়েন্দা-গল্প হিসাবে চোরাবালির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

রক্তমুখী নীলা [১৩৪৩] ঃ 'রক্তমুখীনীলা'য় অপরাধীর মনে লোভ তো আছেই, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এক অন্ধ সংস্কার।

এই গল্পের মধ্যমণি স্বরূপ যে নীলাটি রয়েছে, তার ইতিহাস বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। প্রখ্যাত ধনী ও ধার্মিক মহারাজ রমেন্দ্র সিংহের ছিল জহরত সংগ্রহের নেশা, তাঁর বাড়িতে দোতলার একটি ঘরে সংগৃহীত জহরতগুলি কাচের শো-কেসে সাজানো থাকত, সতর্ক প্রহরারও অভাব ছিল না, কিন্তু তবু একদিন কয়েকটি দামী জহরত চুরি হয়ে গেল। তার সঙ্গে অপহৃত হল তাঁর অতি প্রিয় রক্তমুখী নীলাটিও। মহারাজের প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকার মণিমুক্তো চুরি গিয়েছিল কিন্তু নীলাটা হারিয়েই তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছেন কারণ নীলা আসলে নীল হীরে, কিন্তু আমাদের দেশে অন্যান্য হীরের মত নীলার দাম ওজন অনুসারে ধার্য হয় না, ধার্য হয় এর দৈবশক্তির ওপর। বিশেষ করে রক্তমুখী নীলার দৈবশক্তি অসাধারণ। নীলা শনি গ্রহের পাথর, তাই শোনা যায় যে পয়মন্ত নীলা ধারণ করে কেউ ফকির থেকে রাজা আবার কেউ রাজা থেকে ফকির হয়ে গেছে। রক্তমুখী নীলাটিকে কেন্দ্র করে মহারাজ রমেন্দ্র সিংহের মনেও নিশ্চয়ই নীলার শুভ প্রভাব সম্পর্কে গভীর সংস্কার ছিল তা না হলে তিনি নীলা উদ্ধার করার জন্য দুহাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করতেন না। যাইহোক এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর সেই হারানো পয়মন্ত পাথরটি তিনি সেই সময়ে আর ফিরে পাননি। ব্যোমকেশের কাছে তাঁর আগমন অন্য একটি সমস্যার সূত্রে। তাঁর সেক্রেটারী হরিপদর মৃত্যু সংক্রান্ত রহস্য উদ্ঘাটনে পুলিসের ব্যর্থতা লক্ষ্য করেই তিনি সেই ভার দিতে চেয়েছেন ব্যোমকেশের ওপর। সেই গুরুদায়িত্ব পালনের প্রাথমিক পর্যায় হিসাবে ব্যোমকেশ মহারাজ রমেন্দ্র সিংহকে কিছু প্রশ্ন করে এবং সেই সূত্রেই নিজের বাড়ীতে বসে শুধু হরিপদর আততায়ীর নাম বলে দেয় না, তার সঙ্গে মহারাজের বহুদিন পূর্বে, প্রায় দশ বছর আগে অপহৃত রক্তমুখী নীলাটির অপহরণকারীর নামও জানিয়ে দেয়। বলাবাহুল্য দুটি কীর্তির নায়ক একজনই, তার নাম রমানাথ নিয়োগী। ব্যোমকেশের বিবৃতি সূত্রেই আমরা তার কার্য পদ্ধতির বিস্তারিত পরিচয় জানতে পারি। মহারাজ রামেন্দ্র সিংহের জহরত সংগ্রহের নেশা আর রমানাথ নিয়োগীর নেশা জহরত চুরি। চৌর্যবৃত্তিতে পারদর্শী রমানাথ জীবনে অনেক মহার্ঘ মণিমুক্তা চুরি করেছে কিন্তু পুলিশের হাতে ধরা পড়ে জেলে যাওয়ার সময় সে কেবল মহারাজের

বাড়ী থেকে চুরি করা নীলাটিকেই সঙ্গে নিয়ে গেল। কী কৌশলে সকলের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে সে রত্নটিকে নিজের কাছে রেখেছিল জানা যায় না, কিন্তু কেন সে নীলাটিকে হাতছাড়া করতে চায়নি সে বিষয়ে ব্যোমকেশের অনুমান অনুসারে বলা যায় ঐ বিশেষ নীলাটি যেন রামনাথ নিয়োগীকে একেবারে সম্মোহিত করে ফেলেছিল। হয়তো এর অপরূপ সৌন্দর্যে সে গভীর ভাবে মুগ্ধ হয়েছিল। হয়তো মহারাজ রমেন্দ্র সিংহের মতো রমানাথেরও রক্তমুখী নীলার শুভ দৈবপ্রভাবে বিশ্বাস ছিল। যাইহোক্ রমানাথ যখন আলিপুর জেলে তখন পুলিশ কোনও সূত্রে জানতে পারে নীলা তখনও পর্যন্ত নীলা-চোরটির কাছেই আছে।

কিন্তু তার 'সেলটি' পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করেও অভিপ্রেত বস্তুটির সন্ধান পাওয়া গেল না। আসলে তখন সেটি রমানাথের কাছে ছিলনা, ছিল তার সেলের দ্বিতীয় কয়েদী হরিপদ রক্ষিতের কাছে। হরিপদ দাগী আসামী—ছোট বেলার থেকেই সে জেল খাটছে। তাই অভিজ্ঞ আসামী হরিপদ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে টাকা পয়সা লুকিয়ে রাখার জন্য গলার মধ্যে আশ্চর্য কৌশল এক পকেট তৈরী করেছিল—'সেল' তল্লাসীর সময় হরিপদকে রমানাথ তার নীলাটি লুকিয়ে রাখার জন্য দিয়েছিল, ঘটনাচক্রে হরিপদ তার পরদিনই অন্য জেলে বদলি হয়ে যায়—কিন্তু যাওয়ার সময় রমানাথকে নীলাটি ফেরত দিয়ে যায় না। রমানাথের 'কিল খেয়ে কিল চুরি' ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না—মনের মধ্যে তার যে প্রতিহিংসার আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকে, তাকে নির্বাপিত করার সুযোগ আসে দ'শ বছর বাদে—হরিপদ তার ছ মাস আগেই জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে—রক্তমুখী নীলাকে কেন্দ্র করে মহারাজ রমেন্দ্র সিংহের দু হাজার টাকা পুরস্কারের ঘোষণা আগেই তার জানা ছিল। নীলা সম্বন্ধে সম্ভবতঃ তার মনে কোনও সংস্কার ছিল না, সে চেয়েছিল পাথরটির বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ করতে, অথচ অন্যত্র বিক্রি করতে গেলে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তাই জেল থেকে মুক্তি পেয়ে সে সোজা মহারাজের কাছেই এসে হাজির হল, কিন্তু মহারাজ শুধু ধার্মিক ও ধনী নন, তিনি দয়ালু ছিলেন, তিনি হরিপদকে জেলফেরত দাগী আসামী জেনেও প্রথমে টাইপিস্ট ও পরে সেক্রেটারীর পদে নিয়োগ করে সৎভাবে জীবন যাপনের সুযোগ দিলেন। এমন সময় রমানাথের কারাবাসের মেয়াদ ফুরিয়ে গেল—আশ্চর্য যোগাযোগ—জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার মাত্র চারিদিন পরে ভিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে মহারাজের বাড়ীতে এসে সে সাক্ষাৎ পেল তার বাঞ্ছিত ব্যক্তিটির, তারপর হরিপদর বাসস্থান খুঁজে বার করে রাত্রে সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রথমে বুকে ছুরি মেরে তাকে হত্যা করে, অতঃপর উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে তার কণ্ঠনালী ছিন্নভিন্ন করে তার বহু-আকাঙ্ক্ষিত নীলাটি উদ্ধার করেছে। সুতরাং যে রমানাথের নেশা ছিল জহরৎ চুরি করা, মানুষ খুন করা নয়, সেই রমানাথই রক্তমুখী নীলার জন্য নরহত্যায় প্রবৃত্ত হয়েছে। এরপর ব্যোমকেশের তৎপরতায় রমানাথকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বটে, কিন্তু তার ঘর তল্লাস করে একটা ভীষণ দর্শন ছোরা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি—ব্যোমকেশ বুঝেছে সুচতুর রমানাথ নিজ মুখে না জানালে, কিছুতেই সেই রক্তমুখী নীলা ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই ব্যোমকেশ স্থির করেছে—

"এখন অভিনয় করব, রমানাথের কুসংস্কারে ঘা দিয়ে দেখব যদি কিছু পাই,"

রমানাথের মতো দাগী আসামীর বিরুদ্ধে ইচ্ছা শক্তির যুদ্ধে জয় লাভ করতে ব্যোমকেশকেও রীতিমত বেগ পেতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত নীলার অশুভ প্রভাব সম্বন্ধে মর্মান্তিক সত্য ব্যোমকেশের কণ্ঠে দৈববাণীর মতো ধ্বনিত হয়েছে—

"এখনও যদি নিজের ইষ্ট চাও ঐ সর্বনাশা নীলা ফেরত দাও। নীলা নয়—কেউটে সাপের বিষ। যদি হাতে সে নীলা পর তোমার হাতে হাতকড়া পড়বে; যদি গলায় পর ঐ নীলা ফাঁসির দড়ি হয়ে তোমার গলা চেপে ধরবে।"

—রমানাথ তার মনের প্রবল আবেগকে আর চেপে রাখতে পারেনি, নিজের কোটের চামড়ার বোতামটা সজোরে ছিঁড়ে দূরে ফেলে সে চীৎকার করে উঠেছে—

"চাই না—চাই না। এই নাও নীলা, আমাকে বাঁচাও।"

নীলাটি কোটের বোতামের মধ্যে সেলাই করে রাখার পদ্ধতিই প্রমাণ করে অপরাধী রমানাথ নিয়োগী কি অসাধারণ চতুর! এ গল্পের প্রথমে অজিতের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে ব্যোমকেশ রমানাথের সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল—

"বুদ্ধিও যেমন অসাধারণ, সাহসও তেমনি অসীম……

……আজকাল আর এরকম লোক পাওয়া যায় না।"

—এ উক্তি সম্পূর্ণ যথার্থ। অপরাধ সম্পাদনের এমন দুঃসাহস এবং তা গোপন করার এমন আশ্চর্য ক্ষুরধার বুদ্ধি সত্যিই খুব বেশী দেখা যায় না।

ব্যোমকেশ ও বরদা [১৩৪৩] ঃ 'ব্যোমকেশ ও বরদা' গল্পে ব্যোমকেশের সঙ্গে শরদিন্দুর অলৌকিক কাহিনীমালার নায়ক, বিখ্যাত প্রেততত্ত্ব-বিশারদ বরদাও উপস্থিত আছে, আছে শিহরনসৃষ্টিকারী ভৌতিক পরিবেশ, তবু এ গল্প মোটেই ভূতের গল্প নয়—অলৌকিকতার ছদ্ম আবরণে পরিবেশিত হয়েছে বিশুদ্ধ লৌকিক কাহিনী যেখানে ঘটেছে মানব-হৃদয়ের সুপ্ত লোভ, হিংসা, দ্বেষের এক নগ্ন প্রকাশ।

কাহিনীর ঘটনাস্থল মুঙ্গের। সেখানকার পুলিশের ডি. এস. পি. শশাঙ্কবাবু ব্যোমকেশের বাল্যবন্ধু। তাঁরই আমন্ত্রণে ব্যোমকেশ ও অজিতের মুঙ্গের যাত্রা। এ আমন্ত্রণ অবশ্য নিছক সৌহার্দবশত নয়, সম্পূর্ণরূপেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, যদিও অহংকারী, যশোলোভী শশাঙ্কবাবু সে-কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করতে নারাজ। যাই হোক এ গল্পে নিহত বৈকুণ্ঠবাবু যথেষ্ট বিত্তবান ছিলেন। বাজারে তাঁর সোনারূপার দোকান ছিল। কিন্তু তাঁর আয়ের প্রকৃত উৎস ছিল মণিমুক্তার কেনাবেচা। মৃত্যুকালে তাঁর কাছে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার হীরেজহরৎ ছিল, অথচ মানুষটি ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধে, জীবনচর্যার প্রণালী ছিল আশ্চর্য রকমের অনাড়ম্বর। চাঁদা প্রদানের ব্যাপারে তাঁর কৃপণতার ফলে সাধারণের কাছে তিনি 'বায়কুণ্ঠ' অভিধা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সংসারে তাঁর কুরূপা, স্বামী-পরিত্যক্তা কন্যাটি ছাড়া আর কেউই ছিল না। 'জামাতা দশম গ্রহ' এই প্রবাদ বৈকুণ্ঠবাবুর জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হয়েছিল। তিনি অল্প বয়সেই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জামাই বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই বিপথগামী হয়ে পড়ে। মাতাল, দুশ্চরিত্র লোকটি প্রথমে থিয়েটার

যাত্রা করে বেড়াত, তারপর হঠাৎ নাকি এক সার্কাস পার্টির সঙ্গে দেশ ছেড়ে চলে যায়। সে শুধু ছন্নছাড়া নয়, তার মনে দারুণ অর্থতৃষ্ণা। তাছাড়া তার মতো নেশাসক্ত মানুষের অর্থের প্রয়োজনও যথেষ্ট। তাই গোপনে স্ত্রীকে চিঠি লিখে অর্থ সাহায্য চাইলেও তা যখন পাওয়া যায় না, তখন সে হাজির হয় মুঙ্গেরে, যেখানে কেউ তাকে বৈকুণ্ঠবাবুর জামাতা রূপে চেনে না, কারণ তাদের বিয়ে হয়েছিল নবদ্বীপে। তার আগমনের খবর বৈকুণ্ঠবাবু হয়তো জানতেন না। একদিন গভীর রাত্রে, দক্ষ জিমনাস্টিক খেলোয়াড় শৈলেন অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাবুর জামাই তার শ্বশুরের দোতালার শয়নকক্ষে এক অভিনব উপায়ে এসে উপস্থিত হল—রণ্‌পা চড়ে সে দোতালার গরাদহীন জানালার ধারে এসে, জানলা টপ্‌কে ভেতরে প্রবেশ করল। তারপর শ্বশুরের গলা টিপে আগে জেনে নিল সেই ঘরে ঠিক কোথায় হীরে-জহরৎ রয়েছে—জানা হয়ে গেলে শ্বশুরকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করতে সে এতটুকু দ্বিধা করল না। বৈকুণ্ঠবাবুর সমস্ত রত্নগুলি ঐ শোবার ঘরের দেওয়ালেই গর্ত খুঁড়ে রাখা থাকত। তারপর চুনের প্রলেপ দিয়ে সেই ছিদ্র বন্ধ করে দেওয়া হত। কিন্তু সেই অমিত ঐশ্বর্যের সন্ধান জেনেও শৈলেন তা তৎক্ষণাৎ কুক্ষিগত করতে পারল না। কারণ হত্যাকারী হিসাবে ধরা পড়ার ভয়ে তখনকার মতো একটিমাত্র রত্ন বের করে নিয়েই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হল। ইচ্ছে ছিল পরে কোনদিন সময় সুযোগ বুঝে বাকি মণিমাণিক্যগুলি আত্মসাৎ করবে। কিন্তু তার সেই ইচ্ছার পথে প্রথম প্রতিবন্ধক রূপে দেখা দিলেন কৈলাসবাবু যিনি স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় মুঙ্গেরে এসেছেন। কেল্লার ভিতর সুরক্ষিত স্থানে বৈকুণ্ঠবাবুর ব্যবহৃত খালি বাড়ীটি তাঁর বেশ পছন্দ হল, তিনি সেখানে বসবাস শুরু করলেন—শয়ন করতে লাগলেন বৈকুণ্ঠবাবুরই শয়ন কক্ষে। শৈলেনের পক্ষে বৈকুণ্ঠবাবুর সঞ্চিত মণিমুক্তাগুলি হস্তগত করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। ফলে তাকে কৌশলের আশ্রয় নিতে হল। শৈলেনের অনেক গুণ—সে রণ্‌পা চড়তে জানে, আগে থিয়েটার, যাত্রা করেছে সুতরাং অভিনয় ক্ষমতা আছে, এবং নিখুঁত মেকআপের পদ্ধতিও তার জানা আছে—এই বিদ্যাসমূহ মূলধন করে সে সদ্যমৃত বৈকুণ্ঠবাবুর ভূত সেজে স্থানীয় লোকদের বিভ্রান্ত করল এবং কৈলাসবাবুকে বাড়ী ছাড়া করার জন্যে উঠে পড়ে লাগল। এই কাজে নিজের অজান্তেই পরোক্ষভাবে তাকে সাহায্য করলেন প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী বরদাবাবু। তাঁর প্রেতযোনিতে আস্থা এবং অন্যকে সে বিষয়ে শ্রদ্ধাশীল করে তোলার উগ্র উৎসাহ শৈলেনের পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল হল। তার উদ্দেশ্য অচিরেই সিদ্ধ হতো যদি না তার জীবনে দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক রূপে ব্যোমকেশের আবির্ভাব ঘটত। সুতরাং প্রেতের অস্তিত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য শৈলেনকে আরও সক্রিয় হয়ে উঠতে হল। কিন্তু ব্যোমকেশ শুধু রহস্যভেদী গোয়েন্দা নয়, সে সত্যান্বেষী। তাই শশাঙ্কবাবুদের মতো শুধু চোখে দেখা প্রমাণেই তার আস্থা নেই। মনশ্চক্ষে সে অনেক কিছুই দেখতে পায়, অনেক তুচ্ছ জিনিষেই সে খুঁজে পায় সত্যের সঠিক পদচিহ্ন। তাই বৈকুণ্ঠবাবুর শোবার ঘরের দেওয়ালের গায়ে হত্যাকারীর আঙুলের ছাপ শশাঙ্কবাবুর সতর্ক তদন্তে ধরা পড়ে না, কিন্তু ব্যোমকেশ তাকে এক নজরেই চিনে নেয়। মৃতের বাড়ীর বাগানের ছাইয়ের গাদা ঘাঁটতে দেখে শশাঙ্কবাবু বাংলাদেশের গোয়েন্দাদের সম্বন্ধে শ্লেষপূর্ণ কটাক্ষ

করলেও সেখানেই ব্যোমকেশ পায় এই হত্যারহস্য-উন্মোচনের এক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র—সার্কাসের ছেঁড়া পুরানো ইস্তাহারে লেখা, বানান ভুল ভরা একটি ছিন্ন চিঠির খণ্ডাংশ। প্ল্যানচেটের টেবিলে ভূত নামানোর খেলার পর যখন ভূতের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রায় সকলেই সংশয়হীন, এমনকি বরদাবাবুর প্রবল প্রতিপক্ষ, অবিশ্বাসী অমূল্য পর্যন্ত প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, তখন একমাত্র ব্যোমকেশই বুঝতে পারে ভূতের সংকেতগুলি আসলে প্ল্যানচেট-টেবিলে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যেই কারো হীন কারসাজি মাত্র। এছাড়া বৈকুণ্ঠবাবুর আস্থাভাজন বন্ধু উকিল তারাশংকরবাবুর বাড়ীতে বৈকুণ্ঠ-তনয়ার সঙ্গে কথা বলে ব্যোমকেশ অনায়াসেই বুঝতে পারে

"তিনি জানেন কে হত্যা করেছে এবং তাকে আড়াল করবার চেষ্টা করছেন।"

এই সকল সূত্রেরই অনিবার্য যোগফল ব্যোমকেশ কর্তৃক বৈকুণ্ঠবাবুর হত্যা-রহস্যের সমাধান এবং ব্যোমকেশ-প্রতিভায় অবিশ্বাসী, ঈর্ষাপরায়ণ, আত্মাভিমানী শশাঙ্কবাবুর হাতে হত্যাকারীকে সমর্পণ।

এ গল্পে হত্যা-সাধন প্রণালী ও পারিপার্শ্বিক নিঃসন্দেহেই অভিনব, ভৌতিক পরিবেশের নিখুঁত বিবরণ রহস্যকাহিনী পাঠের আগ্রহ ও উৎকণ্ঠাকে দ্বিগুণ পরিবর্ধিত করেছে সন্দেহ নেই। ব্যোমকেশ ও অজিত তো নিজ নিজ ভূমিকায় উপস্থিত আছেই, তাছাড়া প্রেত-বিশ্বাসী বরদাবাবু, অবিশ্বাসী অমূল্য, যশোলোভী শশাঙ্কবাবু, ভদ্রতার মুখোশ-ধারী, ক্রূর শৈলেন এবং আপাতরূঢ় কিন্তু প্রকৃত ভদ্রলোক তারাশংকরবাবু—প্রতিটি চরিত্রই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর। কিন্তু বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ের আচরণ বিস্ময় জাগায়। পলাতক দায়িত্বহীন, চরিত্রহীন, নিষ্ঠুর স্বামীকে পিতার হত্যাকারী জেনে বা অনুমান করেও কেন সে তাকে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল বোঝা যায় না।

মৃত্যুভয়, স্বামী-প্রেম না সতীত্বের সংস্কার—কোন্ কারণটি তাকে শৈলেনের অপরাধ সম্পর্কে নীরব থাকতে প্ররোচিত করেছিল সেই প্রশ্নের উত্তর এই গল্পে নেই।

চিত্রচোর [১৩৫৮]ঃ চিত্রচোর লোভবশতঃ চৌর্যবৃত্তি অবলম্বনের কাহিনী। অবশ্য 'চিত্রচোর' চুরিতেই ক্ষান্ত থাকেনি, মূল অপরাধ গোপন রাখার পূর্ব ব্যবস্থা হিসাবে একাধিক চুরি এবং একটি খুন পর্যন্ত তাকে করতে হয়েছে।

চিত্রচোর অমরেশ রাহা শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, উচ্চপদস্থ। কিন্তু মানব চরিত্রের আদিম রিপুগুলি এমনই তীব্র যে বাইরের শিক্ষা, দীক্ষা, জীবন যাপনের সুস্থ পরিবেশ সব সময় এদের প্রশমিত বা নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। 'চিত্রচোর' সেই সুপরিচিত সত্যকেই আরও একবার নতুন ভাবে প্রমাণ করেছে।

আমাদের আলোচ্য কাহিনীটির পটভূমি কলকাতা নয়, সাঁওতাল পরগণা। সেখানে ব্যোমকেশ রহস্যভেদের কাজে যায়নি, গিয়েছিল দীর্ঘ রোগভোগের পর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে, সঙ্গে অজিত ও সত্যবতী। কিন্তু কথায় বলে "ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে", ব্যোমকেশের ক্ষেত্রে এই প্রবাদ মর্মে মর্মে সত্যি। তাই সাঁওতাল পরগণার সেই ছোট্ট শহরেও অজিতের সাহিত্যের কল্যাণে খ্যাতকীর্তি ব্যোমকেশ শুধু মহীধরবাবুর বাড়ীতে চা-পানের নিমন্ত্রণ পায়নি, তার সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবেই পেয়েছিল এক জটিল রহস্যের

সাক্ষাৎ। স্বাভাবিকভাবেই তার অনুসন্ধিৎসু মন এই গ্রন্থিমোচনে আগ্রহী হয়েছে। সেখানকার ডি. এস. পি. পুরন্দর পাণ্ডে গুণগ্রাহী ভদ্রলোক। তাঁরই অকৃত্রিম সহযোগিতায় ব্যোমকেশ 'চিত্রচোরের' লোলুপ পরিকল্পনাকে বিপর্যস্ত করে দিতে পেরেছে।

এ কাহিনীর অপরাধী অমরেশ রাহা ব্যাঙ্ক ম্যানেজার, অবিবাহিত, দায়-দায়িত্ব মুক্ত ভদ্রলোক কিন্তু ধরা বাঁধা মাইনের ভালো চাকুরীতে তার পরিতৃপ্তি ছিল না। পাঁচটা সাধারণ লোকের মত সাংসারিক কর্তব্য পালনের জন্য টাকার প্রয়োজন তার ছিল না বটে, কিন্তু প্রচুর অর্থ না থাকার জন্য ক্ষোভ ছিল পুরোমাত্রায়। তার উপর ব্যাঙ্কের কাজে সর্বক্ষণ পরের টাকা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে সেই ক্ষোভ পর্যবসিত হল উৎকট লোভে। তাই তার অপরাধ কোন সাময়িক উত্তেজনা বা হঠকারিতার ফল নয়, ব্যাঙ্ক থেকে কোনও সুযোগে বেশ স্ফীত অঙ্কের অর্থ আত্মসাৎ করে পালিয়ে যাওয়ার সুপরিকল্পিত একটি ষড়যন্ত্র তার মনে অনেকদিন থেকেই বাসা বাঁধছিল। চুরি করা অর্থ নিয়ে গুজরাট প্রদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য ফেঁদে বসার মতলবেই সে হয়তো বইয়ের মাধ্যমে নিজে নিজে গুজরাতী ভাষা শিখেছিল। ব্যোমকেশের এই অনুমান সমর্থনযোগ্য যে,

"বাঙালীদের সঙ্গে গুজরাটীদের চেহারার একটা ধাতুগত ঐক্য আছে ভাষাটাও রপ্ত রাখলে কেউ তাঁকে সন্দেহ করতে পারবে না।"

অমরেশবাবুর চতুর সতর্কতার আর একটি দৃষ্টান্ত তার ফ্রেঞ্চ-কাট্ দাড়িটি। সাধারণ অপরাধীরা অনেক সময় আত্মগোপনের প্রয়োজনে ছদ্মবেশ ধারণের জন্য গোঁফ দাড়ি রাখে বা নকল শ্মশ্রু-গুম্ফের সাহায্য নেয় কিন্তু অমরেশ রাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ ধরল। সে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে মুখে ফ্রেঞ্চ-কাট্ দাড়ি রাখতে শুরু করল। ব্যোমকেশের মতে,

"এরকম দাড়ি রাখার সুবিধে, দাড়ি কামিয়ে ফেললেই চেহারা বদলে যায়, তখন চেনা লোক আর চিনতে পারে না। নকল দাড়ি পরার চেয়ে তাই আসল দাড়ি কামিয়ে ফেলা ছদ্মবেশ হিসেবে ঢের বেশী নির্ভরযোগ্য।"

কিন্তু এত আয়োজন সত্বেও অমরেশ রাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো একটি ফটোগ্রাফ এবং একজন চিত্রকর। স্থানীয় বনভোজনের দিন সকলের সঙ্গে রাহাকেও গ্রুপ ফটো তোলাতে হল, এতে তার আন্তরিক সম্মতি ছিল না, কারণ তার জানা ছিল যে অদূর ভবিষ্যতে টাকা চুরির পর এই ছবি তার আত্মগোপনের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে, অর্থাৎ ফটোর সাহায্যে তাকে কোন-না-কোন সময়ে ধরে ফেলা যেতে পারে, কিন্তু লোকের মনে কোন প্রকার সন্দেহ না জাগানোর জন্য মনের অনিচ্ছা গোপন রেখেই অমরেশবাবু সেই পিকনিকের দিন সমবেতভাবে ছবি তোলাতে মৌখিক সম্মতি দিতে বাধ্য হল বটে, কিন্তু তার কাজ অনেক বেড়ে গেল, ডেপুটি ঊষানাথবাবুর বাড়ী থেকে এবং ফটোগ্রাফার নকুলেশ সরকারের স্টুডিও থেকে যথাক্রমে সেই গ্রুপ ফটো এবং তার নেগেটিভটি সরিয়ে ফেলার গুরু দায়িত্বও তাকেই নিতে হল। প্রফেসর সোমের বাড়ী থেকে ফটো চুরির প্রয়োজন হল না—কারণ অমরেশ রাহা বোধ হয় কোন সূত্রে জানতে পেরেছিল যে সোমের সন্দিগ্ধমনা স্ত্রী মালতী দেবীর হাতে পড়ে তা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

যাই হোক, ছবি চুরির এত ঝুঁকি নেওয়া ব্যর্থ হতে বসল চিত্রকর ফাল্গুনী পালের আগমনে। নেশাসক্ত, চালচুলোহীন ভবঘুরে প্রকৃতির এই মানুষটি কিন্তু এক বিরল প্রতিভার অধিকারী—সে একবার কোনো আকৃতি দেখেই তার অবিকল ছবি এঁকে দিতে পারে। ফাল্গুনী পাল অমরেশ রাহাকেও দেখেছিল। সুতরাং প্রয়োজন হলে সে স্মৃতি থেকে ছবি এঁকে ফটোর অভাব পূরণ করে দিতে পারবে। অতএব তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া অর্থলোলুপ ব্যাংক ম্যানেজারের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়ল। বিবেক-শূন্য আততায়ী আত্মস্বার্থ চরিতার্থতার জন্য এই নিষ্ঠুর কার্যটিও নির্দ্বিধায় সম্পন্ন করেছে। মহীধরবাবুর বাড়ীর বাগানের কোণে একটি মাটির ঘরে তখন ফাল্গুনী থাকে—সকলের অলক্ষ্যে তার ঘরে গিয়ে প্রথমে তাকে আফিম মেশানো মদ্য পান করিয়ে অচৈতন্য করে ফেলা হয়েছে—তারপর সেই সংজ্ঞাহীন দেহটিকে বাগানে অবস্থিত কুয়োর মধ্যে ফেলে তাকে হত্যা করা হয়েছে। এর ফলে আপাতদৃষ্টিতে ফাল্গুনী পালের মৃত্যু নেশার ঝোঁকে কুয়োয় পড়ে যাওয়ার একটি অতি সাধারণ দুর্ঘটনা বলেই বিবেচিত হয়। তার দেহের সঙ্গেই কুয়োর জলে পড়েছিল ঊষানাথবাবুর বাড়ীর থেকে উধাও হয়ে যাওয়া রূপালী পরী মূর্তিটাও, যাতে লোকচক্ষে ফাল্গুনী পালকেই চোর প্রতিপন্ন করা যায়। এইভাবে নিজের সংকীর্ণ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অমরেশ রাহা একের পর এক পাপে লিপ্ত হয়েছে—সর্বশেষে নিজের পথ নিষ্কণ্টক মনে করে পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারেই ব্যাংক বড়দিনের ছুটির সুযোগে এক লক্ষ আশী হাজার টাকা নিয়ে পালাতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু যে শহরে ব্যোমকেশ উপস্থিত সেখান থেকে, তার চোখে ধূলো দিয়ে পালানো অত সোজা নয়, কারণ ফটো চুরির থেকে শুরু করে ফাল্গুনী পালের মৃত্যু—কোন ঘটনাকেই সে তুচ্ছ ভাবেনি। ভেতরে ভেতরে তার মন সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। নতুন জায়গায় এসে বেড়ানো ও বাঙালীদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সূত্রে ঐ ছোট শহরেই ছবি চুরি ও অন্যান্য আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনার পশ্চাতে ক্রিয়াশীল কারণগুলি সম্পর্কে ব্যোমকেশ গোপনে অনুসন্ধান শুরু করেছিল। তবে প্রথমে তার কাছে দুটি সমস্যা জট পাকিয়ে গিয়েছিল —এক. ছবি চুরি; দ্বিতীয়. ডাক্তার আর রজনীর গুপ্ত প্রণয়। এ ছাড়া একাধিক চরিত্রের আচার-আচরণ ও চলাফেরাকে কেন্দ্র করে তার মনে সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল—যেমন ডেপুটি ঊষানাথবাবু, প্রফেসর সোম, ডাক্তার ঘটক প্রথম প্রথম এঁদের প্রত্যেককেই পৃথক পৃথকভাবে অপরাধী মনে হয়েছে—অবশেষে প্রকৃত সত্য হয়েছে উদ্‌ঘাটিত। পুরন্দর পাণ্ডের সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যোমকেশ দোষী ব্যক্তিটিকে চোরাই টাকা সমেত অনায়াসেই ধরে ফেলেছে। কিন্তু বহুদর্শী সত্যান্বেষীর হিসেবেও মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়—এক্ষেত্রেও হয়েছে. অমরেশ রাহা ব্যাংক ম্যানেজার, সুতরাং তার কাছে পিস্তল থাকতে পারে এ সম্ভাবনা একবারও ব্যোমকেশের মনে জাগেনি। তাই ব্যোমকেশের অভিজ্ঞতা-জগতের অনেক অপরাধীদের মতই 'চিত্রচোর'ও জীবিত ধরা দেয় না, অবশ্য তার চুরি করা সমস্ত টাকাই পুলিশের হস্তগত হয়।

'চিত্রচোর'-এ মূল কাহিনীর পাশাপাশি একটি প্রণয় কাহিনীর ধারা প্রবাহিত রয়েছে —যা প্রধান কাহিনীকে শুধু বৈচিত্র্যময় করে তোলেনি, রহস্যের গ্রন্থিকে করেছে দৃঢ়বদ্ধ।

এই উপকাহিনীটির নায়িকা সেই শহরের গণ্যমান্য, ধনী বাঙালী মহীধরবাবুর কন্যা রজনী। রজনী তরুণী ও সুন্দরী কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে সে বিবাহের অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বিধবা হয়, তাকে কুমারী বললেও অত্যুক্তি হয় না। রজনীর প্রতি যে দুজন পুরুষ আকৃষ্ট হয়েছেন তাঁদের একজন হলেন প্রফেসর সোম, তিনি বিবাহিত হলেও সন্দিগ্ধমনা, কলহ পরায়ণা, স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য জীবন মোটেই সুখকর নয়। অন্যজন ডাক্তার ঘটক, যিনি অবিবাহিত, এঁর প্রতি রজনীও আসক্ত কিন্তু প্রৌঢ় পিতার কথা ভেবেই ডাক্তারের সঙ্গে পরিণয়ের প্রস্তাবে সে সহজে সম্মতি দিতে পারছিল না। ঘটনাচক্রে শেষ পর্যন্ত তাকে ডাক্তারের প্রস্তাবেই রাজী হতে হল, তবে মহীধরবাবু যাতে কোনমতেই আঘাত না পান, তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে রজনী আর ডাক্তার ঘটক কলকাতায় গিয়ে গোপনে রেজিস্ট্রী ম্যারেজ-এর মাধ্যমে সব দিকে রক্ষা করতে চেয়েছে। ব্যোমকেশ এবং পুরন্দর পাণ্ডে ছাড়া এ বিবাহের খবর আর কেউ জানতে পারেনি। প্রায় বছর খানেক পর 'দুর্গরহস্য' উন্মোচনের সূত্রে সাঁওতাল পরগণার সেই শহরেই অজিত এবং ব্যোমকেশের সঙ্গে ডাক্তার ঘটকের দেখা হয়েছে। তার কাছ থেকে ব্যোমকেশ জেনেছে মহীধরবাবু জীবিত, তাদের বিবাহের খবর তাই তখনও পর্যন্ত গোপনই রাখতে হয়েছে। রজনী পিত্রালয়ে। ব্যোমকেশ অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পিতা হতে চলেছে জানতে পেরে, বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও দাম্পত্য-সুখ-বঞ্চিত ডাক্তার ঘটকের মুখে বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার ছবিটুকু ব্যোমকেশ লক্ষ্য করেছে। তারপর সুস্নিগ্ধ সান্ত্বনা বারিতে তার তপ্ত হৃদয়কে শীতল করতে চেয়েছে—

"বন্ধু মনে ক্ষোভ রাখবেন না। আপনি যা পেয়েছেন তা কম লোকের ভাগ্যেই জোটে। একসঙ্গে দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য আর পরকীয়া প্রীতির তীক্ষ্ণ স্বাদ উপভোগ করে নিচ্ছেন।"

দুর্গরহস্য [১৩৫৯] **:** 'ব্যোমকেশ ও বরদা' গল্পের মতো দুর্গরহস্যেও 'জামাতা দশমগ্রহ'—শৈলেনের মতো মণিলালেরও লক্ষ্য শ্বশুরের সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করা। আপাতদৃষ্টিতে এরা দুজনেই মধুরভাষী, ভদ্র, শান্ত, মার্জিত কিন্তু এদের হৃদয়-গুহায় বাস করে লোভ নামক হিংস্র শ্বাপদ। তবে 'ব্যোমকেশ ও বরদা' গল্পের বৈকুণ্ঠবাবু মেয়ের বিয়ের কিছুদিন পরেই তাঁর দায়িত্বহীন, পলাতক, দুশ্চরিত্র জামাতার সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু দুর্গরহস্যের রামকিশোরবাবু মণিলালের প্রকৃত স্বরূপ জানতে পেরেছেন অনেক পরে—ব্যোমকেশ কর্তৃক রহস্য উদ্‌ঘাটনের সূত্রে। মণিলালকে তিনি নিজের পুত্রদের থেকেও অধিক স্নেহ ও বিশ্বাসের সঙ্গে অন্তরে স্থান দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর নিখুঁত আয়োজনের মাধ্যমে মণিলাল সেই অকৃত্রিম স্নেহের প্রতিদান দিতে চেয়েছিল। অবশ্য ব্যোমকেশের তৎপরতায় সে সুযোগ জামাতা বাবাজী পায়নি। তাই বৈকুণ্ঠবাবুর মতো রামকিশোরবাবুকে জামাইয়ের হাতে প্রাণ দিতে হয়নি।

আবার, একটি ক্ষেত্রে 'দুর্গরহস্যের' সঙ্গে প্রায় এক বছর পরে রচিত 'চিড়িয়াখানা'র সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়— এই উভয় কাহিনীতেই ঘটনাস্থল লোকালয়ের বাইরে নিরালা পরিবেশ, উভয় ক্ষেত্রেই চরিত্রগুলি ঠিক প্রকৃতিস্থ বা স্বাভাবিক নয়। তাদের জীবনচর্যা,

আচার-আচরণ তির্যক ও বঙ্কিম এবং দুটি রহস্য কাহিনীতেই হত্যার মূল কারণ হত্যাকারীর নিষ্ঠুর অর্থপিপাসা।

'চিত্রচোর' গল্পের মতো দুর্গরহস্যেরও খানিক পটভূমি সাঁওতাল পরগনার একটি শহর।

আলোচ্য উপন্যাসটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত। উত্তর খণ্ডের কাহিনীর বর্তমান পরিস্থিতি সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য পূর্বখণ্ডে অতীত ইতিহাসের বর্ণাঢ্য অথচ বিষাদ-করুণ প্রেক্ষাপটটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। রামকিশোরবাবুর বংশের প্রধান পুরুষ জানকীরামের নবাব আলীবর্দীর প্রিয়পাত্র হওয়ার সৌভাগ্যে রাজা খেতাব ও সুবা বিহার শাসনের ক্ষমতালাভ ও সেই সূত্রে প্রভূত ধনসম্পত্তি উপার্জনের কাহিনী, এবং তাঁর অধস্তন চতুর্থ ও পঞ্চম পুরুষ রাজারাম ও তাঁর পুত্র জয়রামের প্রসঙ্গে সিপাহী বিদ্রোহের সমকালীন যুগপরিবেশ ও ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলির মুহুর্মুহু দীপ্ত উদ্ভাসে আলোকিত হয়েছে দুর্গরহস্যের ঘন তমসাবৃত পশ্চাৎপট।

এখানে ব্যোমকেশকে দুটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে—এক. অধ্যাপক ঈশান মজুমদারের অপঘাত মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন, দুই. দুর্গের মধ্যে রামকিশোরবাবুর পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত প্রভূত পরিমাণ স্বর্ণসম্পদ কোন্ স্থানে লুকানো রয়েছে তার সঠিক অবস্থান খুঁজে বার করা। আপাতদৃষ্টিতে এ দুটি পৃথক সূত্র বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এরা যে গভীর সম্পর্কযুক্ত একথা বুঝতে ব্যোমকেশের বিলম্ব হয়নি। হত্যাকারী মণিলাল ইতিহাসের অধ্যাপক ঈশানবাবুর কাছ থেকে জানতে পেরেছিল যে ঐ সোনা দুর্গের মধ্যেই আছে। এই আপাত-নির্লিপ্ত মানুষটি অর্থাৎ মণিলালই রামকিশোরবাবুর অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের বঞ্চিত করে সমস্ত সম্পত্তি নিজে আত্মসাৎ করার জন্যই ঈশানবাবুকে এবং সন্ন্যাসী ঠাকুর ওরফে রামকিশোরের দাদা রামবিনোদকে খুন করেছে, এছাড়া তার স্বার্থের অনুকূল উইলটি রেজিস্ট্রী হয়ে যাওয়ার পর প্রথমে রামকিশোরকে তারপর তাঁর অপরিণত বুদ্ধি নাবালক পুত্র গদাধরকে হত্যা করার পরিকল্পনাও সে করে রেখেছে অবশ্য মণিলালের ক্রূর প্রবৃত্তির প্রথম শিকার তার স্ত্রী হরিপ্রিয়া।

> "স্ত্রীকে সে প্রথমেই কেন খুন করল আপাতদৃষ্টিতে তা ধরা যায় না। হয়তো দুর্বল মুহূর্তে স্ত্রীর কাছে নিজের মতলব ব্যক্ত করে ফেলেছিল, কিম্বা হয়তো হরিপ্রিয়াই কলমে সাপের বিষ ভরার প্রক্রিয়া দেখে ফেলেছিল। মোট কথা প্রথমেই হরিপ্রিয়াকে সরানো দরকার হয়েছিল।"

মণিলাল অর্থলোভবশতঃই একাধিক নরহত্যায় প্রবৃত্ত হয়েছে। কিন্তু শুধু মণিলাল-ই নয়, দুর্গরহস্যের অধিকাংশ চরিত্রই ধনলোলুপ। রামকিশোর, বংশীধর, মুরলীধর এমনকি অধ্যাপক ঈশানবাবু—কারও অর্থগৃধ্নুতা কম নয়। তবে হরিপ্রিয়া যে তার ভ্রাতৃবধূ অর্থাৎ বংশীধরের স্ত্রীকে গভীর রাত্রে জাপানী মুখোশ পরে ভয় দেখিয়ে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়েছে তার কারণ অর্থলোভ নয়, সম্ভবতঃ সেই মধুরভাষিণী, সুরূপা বধূটির প্রতি নারীসুলভ ঈর্ষা। দুর্গরহস্যে তাই একাধিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। ব্যোমকেশ আর অজিতকে সর্পভয় দেখিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এইভাবে অনেকগুলি চরিত্র, তাদের

অস্বাভাবিক কার্যকলাপ, সর্বোপরি দুর্গ আঙিনায় একটি পাথরে খোদাই করা আশ্চর্য সংকেত-লিপি পাঠককে রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় ভরিয়ে রাখে।

মণিলাল যত বড় পাপিষ্ঠই হোক্ না কেন তার ব্যবহৃত হত্যার হাতিয়ারটি সত্যিই অভিনব। "পার্কার" কলম লেখনী হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ কিন্তু প্রয়োজন হলে তাকেও যে ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করা যায় তার জ্বলন্ত প্রমাণ মণিলালের কলমটি। বহুপ্রাণঘাতী এই কলমের দ্বারাই শেষ পর্যন্ত নিজের দেহে সর্প বিষ ছড়িয়ে দিয়ে সে পুলিশের হাত কড়াকে ফাঁকি দিতে পেরেছে অর্থাৎ দুর্গরহস্যেও আততায়ীকে জীবিত অবস্থায় গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

দুর্গতোরণের কাছে পড়ে থাকা কামানের নামই মোহনলাল এবং কামানের মধ্যেই রামকিশোরবাবুর ঈপ্সিত স্বর্ণসম্পদ সঞ্চিত আছে এই সত্য উদ্‌ঘাটনে ব্যোমকেশের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু তার থেকেও বেশী প্রশংসার পাত্র বোধ হয় জয়রাম ও রাজারাম— যাঁরা আসন্ন দুর্যোগের মধ্যেও অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দ্বারা সিপাহীদের ফাঁকি দিয়ে উত্তরসূরীদের জন্য সমস্ত সম্পদ গচ্ছিত রাখার ঐ অসাধারণ কৌশলটি আবিষ্কার করেছিলেন।

পরিশেষে এই কাহিনীর আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করি। দুর্গরহস্যে শরদিন্দুবাবু আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে একটি নারী-হৃদয়ের ধারাবাহিক বিবর্তনের চিত্র আমাদের উপহার দিয়েছেন—সেই নারী তুলসী। প্রথমে সে অপরিণত বুদ্ধির বালিকা মাত্র, তারপর রমাপতিকে কেন্দ্র করে তার নারীসত্তার জাগরণ। তার স্নেহহীন জীবনে রমাপতির প্রীতি-মধুর ব্যবহারে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটল, রমাপতির প্রতি তার সহজ আকর্ষণ ক্রমশঃ অনুরাগে রূপান্তরিত হল। তাই ঘটনাচক্রে রামকিশোরের আশ্রয় থেকে রমাপতিকে অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া হলে অজিতের বর্ণনায় তুলসীর তীব্র প্রতিক্রিয়া সার্থকভাবে ধরা পড়েছে—

> "ঝড়ের আগে শুষ্ক পাতার মত সে যেন উড়িতে উড়িতে আসিয়া আমাদের ঘরের চৌকাঠে আটকাইয়া গেল। তাহার মূর্তি পাগলিনীর মত, দুই চক্ষু রাঙা, টকটক করিতেছে। সে খাটের উপর ব্যোমকেশকে উপবিষ্ট দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহার কোলের উপর আছড়াইয়া পড়িল, চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, আমার মাস্টার মশাইকে তাড়িয়ে দিয়েছে।"

কাহিনীর উপসংহার পর্বে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনের পর ব্যোমকেশের মধ্যস্থতায় রামকিশোরবাবু রমাপতির সঙ্গেই তুলসীর বিবাহ দিতে রাজী হয়েছেন। বিয়ের কিছুকাল পরে এই নব-দম্পতি কলকাতায় এসেছে, সঙ্গে এনেছে ব্যোমকেশের প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ এক অমূল্য উপহার—উপহারটি ছিল সেই রহস্যাবৃত দুর্গের একটি ছোট সংস্করণ যা সম্পূর্ণ খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরী। এই অপ্রত্যাশিত ও অপূর্ব উপহার পেয়ে ব্যোমকেশ যত না খুশী হয়েছে তার থেকে ঢের বেশী খুশী হয়েছে এই সুখী দম্পতিটিকে দেখে। তুলসী তখন যেন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত—হাস্যে, লাস্যে, প্রাণ প্রাচুর্যে উচ্ছল এক নারী, বিবাহিত জীবনের মাধুর্য যার সমস্ত অপূর্ণতাকে পূর্ণ করেছে, বংশগত অস্বাভাবিকতাকে

দূর করেছে। প্রেমের পরশমণির ছোঁয়ায় বালিকা তুলসীর এই চিরন্তনী নারীতে রূপান্তরের স্তরগুলি স্রষ্টা শরদিন্দুর অপরিসীম কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে।

চিড়িয়াখানা ঃ [১৩৬০] লোভের আর এক বিস্ময়কর উদাহরণ—'চিড়িয়াখানা'। ছাব্বিশটি পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত এই রহস্যোপন্যাসটি সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত রুদ্ধশ্বাস কৌতূহল ও উত্তেজনায় পাঠককে শিহরিত করে রাখে। বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ, তাদের বিচিত্রতর জীবনচর্যায় 'চিড়িয়াখানা' শরদিন্দু-প্রতিভার একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

এ কাহিনীর ঘটনা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তীকালের। ঘটনাস্থল চব্বিশ পরগণার মোহনপুরের গোলাপ কলোনী, যে গোলাপ কলোনী মুস্কিল মিঞার ভাষায় 'চিড়িয়াখানা' আবার রসিকবাবুর কাছে 'পিঁজরাপোল'। কিন্তু সাহিত্যিক অজিতের গোলাপ কলোনী দর্শনের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াটি এই রকম—

"আন্দাজ পনেরো-কুড়ি বিঘা জমি কাঁটা-তার দিয়া ঘেরা, কাঁটা-তারের ধারে ধারে ত্রিশিরা ফণি-মনসার ঝাড়। ভিতরে বাগান, বাগানের ফাঁকে ফাঁকে লাল টালি ছাওয়া ছোট ছোট কুঠি। মালীরা রবারের নলে করিয়া বাগানে জল দিতেছে। চারিদিকের ঝলসানো পরিবেশের মাঝখানে গোলাপ কলোনী যেন একটি শ্যামল ওয়েসিস্"।

এখানে মূলতঃ হয় ফুলের চাষ, এ ছাড়া শাক-সব্জির ক্ষেত, ডেয়ারী ফার্মও আছে। এখান থেকে শিয়ালদহ স্টেশন মাত্র এক ঘণ্টার পথ। তাই কলোনীতে উৎপন্ন ঐ সমস্ত শস্য, ফুল এবং অন্যান্য সামগ্রী ট্রেন যোগে কলকাতায় চালান যায়। এই উপায়ে অর্জিত অর্থের উপরেই নির্ভরশীল গোলাপ কলোনীর অনেকগুলি মানুষের জীবন।

গোলাপ কলোনীর প্রতিষ্ঠাতা নিশানাথ সেন এক সময়ে বোম্বাই প্রদেশের বিচার বিভাগে ছিলেন, সেশন জজ পর্যন্ত হয়েছিলেন। তারপর দশ বছর আগে, মাত্র সাতচল্লিশ বৎসর বয়সে রক্তচাপ-আধিক্য হেতু অবসর গ্রহণ করে, বাংলাদেশে এসে ফুলের ফসল ফলাবার জন্য গোলাপ কলোনীর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর স্ত্রীর নাম দময়ন্তী দেবী। নিঃসন্তান এই দম্পতির একমাত্র স্নেহাস্পদ যুবক বিজয় আসলে নিশানাথবাবুর ভাইপো।

গোলাপ কলোনীর অন্যান্য অধিবাসীদের পরিচয় নিতে গেলে দেখা যায় এদের প্রত্যেকেরই জীবনে কিছু না কিছু দাগ আছে। কলোনীর কোচম্যান মুস্কিল মিঞা, কলকাতার তরিতরকারীর দোকানের তত্ত্বাবধায়ক রসিকলাল দে, গো-পালক পানুগোপাল, গো-বদ্যি ব্রজদাস, কেমিস্ট্রির ভূতপূর্ব অধ্যাপক নেপালবাবু, ডাক্তার ভুজঙ্গধর, দর্জিখানার পরিচালিকা বনলক্ষ্মী এদের প্রত্যেকেরই জীবনে এমন এক একটি ইতিহাস আছে যার ফলে সমাজে সুস্থভাবে, সসম্মানে বেঁচে থাকার পথ এদের কাছে চিররুদ্ধ। এমনকি কলোনীর প্রতিষ্ঠাতা প্রাক্তন বিচারক নিশানাথ সেনের প্রকৃত জীবন কাহিনী যখন উদ্‌ঘাটিত হয় তখন দেখা যায় তাঁর অতীতও নিষ্কলুষ নয়—প্রৌঢ় নিশানাথের স্ত্রীরূপে পরিচিত পূর্ণযৌবনা, সুন্দরী দময়ন্তীদেবী তাঁর বিবাহিতা পত্নী নন। নিশানাথবাবু যখন পুনায় জজ ছিলেন সেই সময় লাল সিং নামে খুনের অপরাধে অভিযুক্ত এক পাঞ্জাবী নিশানাথবাবুর

আদালতে আসে, এবং বিচারে প্রথমে তার ফাঁসির হুকুম হয়, এবং পরে আপিলের সাহায্যে প্রাণদণ্ডের আদেশ রদ হলেও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সে এড়াতে পারে না। ঘটনাচক্রে লাল সিং এর উনিশ কুড়ি বছরের অনাথা পত্নীকে নিশানাথবাবু আশ্রয় দিতে বাধ্য হন। হয়তো এই কারণেই তাঁকে অসময়ে অবসর গ্রহণ করে বাংলাদেশে চলে আসতে হয়েছিল। গোলাপ কলোনী সত্যিই বিচিত্র মানুষের চিড়িয়াখানা।

নিশানাথবাবুর মাধ্যমেই এই 'চিড়িয়াখানা'র সঙ্গে ব্যোমকেশের যোগাযোগের সূত্রপাত। গোলাপ কলোনীর এলাকায় হঠাৎ এক ভারী রহস্যময় ব্যাপার ঘটতে সুরু করেছিল। ব্যোমকেশের কাছে আসার মাস ছয়েক আগের থেকে মাঝে মাঝেই মোটরের এক একটি অংশ নিশানাথবাবুর বাড়ীর কাছাকাছি পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত একটা আস্ত খেলনা মোটর সেই অজ্ঞাত সূত্র থেকে উপহার পেয়ে নিশানাথবাবু ব্যোমকেশের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। ব্যোমকেশকে অনেক কথাই তিনি জানিয়েছিলেন, শুধু বাদ দিয়েছিলেন নিজের জীবনের দময়ন্তী-ঘটিত ইতিহাসটুকু। তিনি সন্দেহ করছিলেন মোটর গাড়ীর ভগ্নাংশ উপহার দেওয়ার সঙ্গে দময়ন্তীর স্বামী লাল সিং জড়িত আছে। ব্যোমকেশকে অবশ্য সে সংশয়ের কথা তিনি স্পষ্ট করে বলতে পারেন নি। যাইহোক্ এই সম্পর্কে চিন্তা করে ওঠার আগেই প্রথমে নিশানাথবাবুর এবং তার পরে পানু-গোপালের সন্দেহজনক মৃত্যুতে ব্যোমকেশের পক্ষে এই রহস্য জটিলতর হয়ে উঠল। লাল সিং, নেপালবাবু, রসিক, ব্রজদাসবাবাজী, ভুজঙ্গধর, বিজয় এমনকি দময়ন্তী দেবী—সন্দেহের আওতা থেকে কাউকেই যে বাদ দিতে পারা যায় না। তবে কিছুদিনের মধ্যেই জানতে পারা গিয়েছিল লাল সিং মৃত। তাতে সমস্যা আরও ঘনীভূত হয়েছিল বৈ নয়। অবশ্য এটা বোঝা গিয়েছিল যে খুনীর আসল লক্ষ্য ছিল নিশানাথ সেন, পানুগোপাল তার কার্যকলাপ কিছু দেখতে বা জানতে পেরেছিল বলেই নিকোটিন বিষ প্রয়োগে তাকেও হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু এতগুলি সন্দেহভাজন চরিত্রের মধ্যে কে সেই নিষ্ঠুর হত্যাকারী তা সনাক্ত করা যখন প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে তখন ঐ এলাকার পুলিশ ইন্সপেক্টর প্রমোদ বরাটের সক্রিয় সহযোগিতায়, ব্যোমকেশের প্রখর অন্তর্দৃষ্টির তীব্র রঞ্জন রশ্মিতে ধরা পড়ে একটি নয়, একজোড়া নরঘাতক—একজন পুরুষ, অপরজন নারী—ভুজঙ্গধর ও বনলক্ষ্মী—ব্যক্তিগত পরিচয়ে তারা যে স্বামী-স্ত্রী একথা কলোনীর অন্যান্য অধিবাসীরা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি। গোলাপ কলোনীতে তারা এক-ই সঙ্গে আসেনি। প্রথমে আসে ডাক্তার ভুজঙ্গধর, কুকীর্তির জন্য যে হারিয়েছে তার ডাক্তারীর 'লাইসেন্স'। এর কিছুদিন পরে আসে তার সুযোগ্যা সহধর্মিণী, একাধিক দুষ্কর্মের নায়িকা নৃত্যকালী, অবশ্য তখন তার ছদ্মনাম বনলক্ষ্মী। এই দম্পতি এমনই অভিনয় নিপুণ যে কখনও বোঝা যায়নি তাদের মধ্যে কোনও সম্পর্ক আছে—বরং দুজনের আচার-আচরণেই ফুটে উঠেছে পরস্পরের প্রতি তীব্র বিরূপতা—কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে ভুজঙ্গধর ও বনলক্ষ্মীর মধ্যে যোগাযোগ ছিল। তাই নিশানাথবাবুর মোহান্ধ ভ্রাতুষ্পুত্র বিজয় মারফৎ চতুরা বনলক্ষ্মী নিশানাথ-দময়ন্তীর প্রকৃত সম্পর্কের গোপন ইতিহাস জানতে পারলে ভুজঙ্গধরেরও তা অজানা থাকে না। হিংস্রজন্তু যেমন মনের মত শিকার

পেলে পরম উল্লাসে মেতে ওঠে—নীতি ও রুচি বিগর্হিত কার্যে অত্যধিক আসক্ত, বিত্তলোভী ডাক্তারের হৃদয় ঐ তথ্য পেয়ে তেমনি আনন্দে নৃত্য করে উঠল। নিশানাথ কড়া প্রকৃতির মানুষ, সুতরাং সেখানে ফাঁদ পাততে গেলে তা ব্যর্থ হতে পারে, কিন্তু দময়ন্তী দেবী স্ত্রীলোক, তাঁর নিশ্চয়ই কলঙ্কের ভয় আছে সুতরাং ডাক্তার নিজে নেপথ্যে থেকে, গুপ্ত কথা ফাঁস করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে দময়ন্তীর কাছ থেকে অর্থ শোষণ করতে লাগল। এইভাবে আটমাস চলল, আরও বহুদিনই হয়তো শোষণ চলত—ভুজঙ্গধর মোটরের যন্ত্রাংশ নিক্ষেপ করে দময়ন্তী দেবীর কাছে নির্দিষ্ট স্থানে টাকা দিয়ে আসার সংকেত জানাত। দময়ন্তী সেখানে গোপনে টাকা রেখে আসলেও কোনদিন কারোকে দেখতে পেতেন না। তিনি স্বামীকে এসব কথা না জানালেও অভিজ্ঞ নিশানাথবাবুর মন একটা গণ্ডগোলের আভাস পেয়েছিল। তাঁর মনে সন্দেহ জেগেছিল বলেই তিনি ব্যোমকেশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন এবং তাঁর কলোনীতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু সত্যান্বেষীর সাহায্য নিতে চাওয়ার ফলেই তাঁর মৃত্যু ত্বরান্বিত হল। ভুজঙ্গধর দেখল তার শোষণ ক্রিয়া, বনলক্ষ্মীর আসল পরিচয় সবই বুঝি ধরা পড়ে যায়। সর্বদিক রক্ষা করার একমাত্র উপায় নিশানাথকে হত্যা করা। তাতে এক ঢিলে দুই পাখী মারা হবে। সুনয়না, ওরফে নৃত্যকালীর অর্থাৎ বনলক্ষ্মী তল্লাস বন্ধ হবে, এবং নির্বিঘ্নে দময়ন্তী দেবীর কাছ থেকে অর্থ শোষণ করা যাবে। অথচ এমন উপায়ে হত্যা করতে হবে যাতে হত্যাকারীকে ধরা ছোঁয়া যাবে না। বনলক্ষ্মী ও ভুজঙ্গধর মিলে নিশানাথবাবুর জন্য বড় নিষ্ঠুর মৃত্যুর আয়োজন করেছিল। চিকিৎসা-বিজ্ঞান জানা ছিল বলেই ডাক্তার সেই বীভৎস হত্যাকাণ্ডকেও নিশানাথবাবুর উচ্চ রক্তচাপ হেতু স্বাভাবিক মৃত্যু বলে প্রতিপন্ন করতে পেরেছিল, কারণ ময়না তদন্তে ধরা পড়ার মত কোনও সূত্রই নিহত মানুষটির শরীরে ছিলনা।

কিন্তু অতি বুদ্ধিমানেরও ভুল হয়—এই ভুলই তার পাপকে আত্মগোপন করতে দেয়না—এক্ষেত্রেও দেখা যায়, ভুজঙ্গধর যতই চতুর হোক না কেন সে স্পষ্টতঃ দুটি ভুল করেছিল—ব্যোমকেশের ভাষায় তার ভ্রান্তির স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করা যাক্—

> "কাজ শেষ করে জানালাটা খুলে দিতে ভুলে গিয়েছিল, আর তাড়াতাড়িতে মোজা জোড়া খুলে নিয়ে যায়নি। এ দুটো ভুল যদি সে না করত তাহলে নিশানাথবাবুর মৃত্যু অস্বাভাবিক বলে কারুর সন্দেহ হত না।"

পানুগোপাল ডাক্তারবাবুর কোন্ অপকীর্তির প্রত্যক্ষদ্রষ্টা ছিল জানা যায় না, তবে তাকে চিরতরে চুপ করিয়ে দিতে হত্যাকারীর বিশেষ অসুবিধা হয়নি—পানুর কানের অসুখ ছিল, তাকে নিয়মিত কানে ওষুধ দিতে হত, ডাক্তার ভুজঙ্গধর অনায়াসেই সবার অলক্ষ্যে ওষুধের শিশিতে নিকোটিন বিষ মিশিয়ে তাকে মরণের পথে ঠেলে দিয়েছে।

এ কাহিনীর চরম রোমাঞ্চকর মুহূর্ত এর উপসংহার অংশ—যখন ব্যোমকেশের অকাট্য প্রমাণ ও অভ্রান্ত যুক্তিজালের বন্ধন থেকে আত্মরক্ষার কোন পথই খোলা নেই তখন—

> "ভুজঙ্গধর বনলক্ষ্মীর কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন, তারপর যে অভিনয় হইল তাহা বাংলা দেশের মঞ্চাভিনয় নয়, হলিউডের সিনেমা। বনলক্ষ্মী উঠিয়া ভুজঙ্গধরের কণ্ঠলগ্না

হইল। ভুজঙ্গধর তাহাকে বিপুল আবেগে জড়াইয়া লইয়া তাহার উন্মুক্ত অধরে দীর্ঘ চুম্বন করিলেন। তারপর তাহার মুখখানি দুই হাতের মধ্যে লইয়া স্নেহক্ষরিত স্বরে বলিলেন,—চল, এবার যাওয়া যাক।"

এ পরিণতি শুধু অপ্রত্যাশিত নাটকীয়তায় ভরা নয়, দুটি নর-নারীর তীব্র প্রেমের রক্তিম সংরাগে পূর্ণ। তাদের নৃশংসতার যেমন তুলনা নেই, তেমনি পরস্পরের প্রতি এই প্রগাঢ় ভালবাসার দৃষ্টান্তও মনুষ্যজগতে তুলনাহীন, ব্যোমকেশের মতে ভুজঙ্গধর ও নৃত্যকালীর (বনলক্ষ্মীর) ভালবাসা "বাঘ আর বাঘিনীর ভালবাসা" তাদের শেষ চুম্বন শুধু জীবনের চুম্বন নয়, মরণেরও চুম্বন—যে সূত্রে ডাক্তারের মুখে রাখা সাইনাইডের অ্যাম্পুল চলে যায়, বনলক্ষ্মীর মুখে, মুহূর্তেই এনে দেয় তাদের বাঞ্ছিত যুগল-মৃত্যু। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় মানুষ হিসাবে তারা যত অধঃপতিতই হোক না কেন, শিল্পী হিসাবে তারা সত্যিই উঁচু দরের। তাদের শেষ পরিণাম তাই নরহত্যার অপরাধে দণ্ডিত আসামীর মত গতানুগতিক শাস্তিভোগ নয়, প্রেমে, সংরাগে, শিল্প সুষমায় পরিপূর্ণ এক বিস্ময়কর জীবনালেখ্য॥

মণিমণ্ডন [১৩৬৫] ঃ 'মণিমণ্ডন' গল্পে অপরাধী খুনী নয়, চোর। অবশ্য চুরিটি খুব সাধারণ স্তরের নয়, প্রসিদ্ধ মণিকার রসময় সরকারের বাড়ী থেকে প্রায় সাতান্ন হাজার টাকা দামের জড়োয়ার নেকলেস অপহৃত হয়েছে। সেই সূত্রেই তাঁর বাড়ীতে ব্যোমকেশের ডাক পড়েছে। রসময়বাবু প্রবীন ও বিচক্ষণ ব্যক্তি তিনি এই চৌর্যাপরাধের ব্যাপারে মাত্র একজনকেই সন্দেহ করেছিলেন—সে ও বাড়ীর ভৃত্য ভোলা।

কিন্তু সন্দেহ করলেই তো হয় না—প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাই অথচ ভোলার কাছ থেকে কোনও প্রমাণই পাওয়া যাচ্ছে না। রসময়বাবু ইতিপূর্বেই পুলিশে খবর দিয়েছেন। পুলিশ ইন্সপেক্টর অমরেশ মণ্ডল তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে সারা বাড়িটি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছেন, শুধু তাই নয়, তিনি যতক্ষণ ভোলাকে সওয়াল জবাব করছিলেন ততক্ষণ তাঁর সঙ্গীরা রাস্তার দুপাশ তল্লাস করছিল, বাড়ীর আনাচ-কানাচ, ডাস্টবিন সব অনুসন্ধান করে দেখছিল। রসময়বাবুর পুত্র যুবক মণিময় এদের সঙ্গে ছিল কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। এমনকি মেছুয়াবাজারে ভোলার ভাইদের বাসা তাঁতিপাঁতি করে খুঁজেও নেকলেসটি উদ্ধার করা গেল না। নেকলেস চুরির প্রাথমিক বয়ান শুনে ব্যোমকেশের সন্দেহ হয়েছিল শুধু ভোলাকে নয়, রসময়বাবুর পুত্র ও পুত্রবধূকে। এদের মধ্যে একজন কেউ চুরি করে থাকতে পারে, আবার যে কোন দুজনের মধ্যে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমেও ব্যাপারটি ঘটতে পারে। এইভাবে সংশয়ের ঘন অন্ধকারে ব্যোমকেশ যখন মনে মনে দিক্‌ভ্রান্ত তখন সহসাই তার চোখে পড়ে রসময়ের বাড়ীর দরজার পাশে একটি দেয়ালে গাঁথা ডাকবাক্স আছে, বিদ্যুৎ-চমকের মতো তার মনে পড়েছে ভোলার এক ভাই পোস্ট অফিসে কাজ করে। এত খানা তল্লাসীতেও যার হদিশ পাওয়া যায় না মুহূর্তের মধ্যেই ব্যোমকেশের মন তার সন্ধান পেয়ে গেছে—ব্যোমকেশ অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে ভোলাই সেই বহুমূল্যবান কণ্ঠ-ভূষণটি চুরি করে ডাকবাক্সে ফেলে রেখেছে—তার ভাই ভূতনাথ ডাক পিওনের কাজ করে। রসময়বাবুর বাড়ীর অঞ্চলের ডাকবাক্সগুলি থেকে

চিঠি সংগ্রহ করে পোস্ট অফিসে আনাই তার কাজ। ধূর্ত ভোলা জানত পুলিশ তদন্ত করতে এলেও ডাকবাক্সটা খুঁজে দেখার কথা সহজে কারো মনে আসবে না। তাই ভূতনাথের সঙ্গে পূর্বাহ্ণেই ব্যবস্থা করে রেখেছিল ডাকবাক্স পরিষ্কার করার সময়ে নেকলেসের প্যাকেটটি যেন সে ডাকবাক্সে রেখে যায়। পুলিশের অনুসন্ধান শেষ হলে নেকলেসের প্যাকেটটি বার করে নেওয়া হবে। সরকারী চাকুরে, ভালমানুষ ভূতনাথ লোভে পড়ে এই অসৎ কাজে শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে যায়। সব ব্যবস্থাই ঠিক ছিল কিন্তু ব্যোমকেশের সত্যদর্শন প্রতিভা এতই গভীর যে অমরেশ মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করে সে অপরাধীদের হাতে নাতে ধরে ফেলল ভোররাত্রে, বহুমূল্য অলঙ্কারটি স্থানান্তরিত করার ঠিক পূর্ব মুহূর্তেই।

কাহিনীর সমাপ্তি-অংশে দেখা যায় জহুরী রসময়বাবু ব্যোমকেশের কার্যের মজুরি হিসাবে নয়, প্রতিভার সম্মান-দক্ষিণা হিসাবে পুত্র মণিময়ের মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন একটি মহুমূল্য হীরক অঙ্গুরীয়—যা অচিরেই সত্যবতীর আঙুলে তার যথাযোগ্য স্থান লাভ করেছে।

গল্পটি আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও অতিবাস্তব সমস্যা নিয়ে রচিত বলেই সুখপাঠ্য।

অমৃতের মৃত্যু [১৩৬৬]: স্বাধীনতার রক্ত স্নান শেষ করে দেশ যখন মাথা তুলেছে অমৃতের মৃত্যু সেই সময়কার ঘটনা। ঘটনাস্থল সান্তালগোলা স্টেশন থেকে মাইল খানেক দূরবর্তী বাঘমারি গ্রাম। লেখকের বর্ণনা অনুসারে জানা যায়—

> "যুদ্ধের সময় একদল মার্কিন সৈন্য সান্তালগোলা ও বাঘমারির মধ্যস্থিত জঙ্গলের মধ্যে কিছুকাল ছিল, তারপর যুদ্ধের শেষে তাহারা ফিরিয়া গেল, রাখিয়া গেল কিছু অবৈধ সন্তান-সন্ততি এবং কিছু ক্ষুদ্রায়তন অস্ত্রশস্ত্র।"

স্বাধীনতা-উত্তরকালে সান্তালগোলার সেই অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে সরকারী তদন্তের গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য অজিতকে নিয়ে ব্যোমকেশ সেখানে উপস্থিত হয়েছে। সেই কার্য সম্পন্ন হওয়ার আগেই প্রথমে অমৃতের তারপর সদানন্দ সুরের আকস্মিক মৃত্যু হলে ব্যোমকেশকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে দুটি মানুষের এই অকাল বিনষ্টির কারণ অন্বেষণের কাজে এবং সেই সূত্রেই উদ্ঘাটিত হয়েছে মানুষের সীমাহীন লোভের আর এক বিচিত্র ইতিবৃত্ত।

সান্তালগোলা অঞ্চলটি ধান্য প্রধান। এখান থেকে দেশের অন্যান্য স্থানে ধান-চাল রপ্তানি করা হয়। গোটা দুই চালের কলও আছে—বিশ্বনাথ রাইস মিল তাদের মধ্যে একটি। এই চাল কলের মালিক বিশ্বনাথ মল্লিক এক সময়ে জকির কাজে নিযুক্ত ছিল। বর্তমানে তিনি ধান-চালের নিরীহ ব্যবসার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থেকে বেআইনী অস্ত্রশস্ত্রের চোরাকারবারে লিপ্ত। সান্তালগোলায় অবস্থানরত মার্কিন সৈন্যরা দেশে ফিরে যাওয়ার সময় যে সমস্ত প্রাণঘাতী অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিয়ে ফিরে যেতে পারেনি, বিশু মল্লিক সেগুলি তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে এমন এক জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল যার সন্ধান পাওয়া পুলিশের পক্ষে হয়তো কোনদিনই সম্ভব হত না। কিন্তু অমৃত ও সদানন্দ সুরের মৃত্যুর তদন্ত করতে গিয়েই ব্যোমকেশ সুকৌশলে বুদ্ধির ফাঁদ পেতে আবিষ্কার

করে ফেলল সাধারণের দুরধিগম্য সেই বেআইনী অস্ত্রশস্ত্রের গোপন ভাণ্ডারটি। বাঘমারি গ্রামের বাসিন্দা সদানন্দ সুরের বাড়ীর পিছন থেকেই যে জঙ্গলটা শুরু হয়েছে, তারই মধ্যে একটি শিমূল গাছের উচ্চ কোটরে সুচতুর বিশ্বনাথ মল্লিক তার মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রগুলি নিশ্চিন্তে লুকিয়ে রেখেছিল। অজস্র কাঁটায় ভরা শিমূল গাছটির গুপ্ত কোটরের সন্ধান কারও পাওয়ার কথা নয়, কিন্তু বিশু মল্লিকের পক্ষে মজুত অস্ত্রশস্ত্রের নাগাল পাওয়া খুবই সোজা, কারণ অতীতে সে জকির কাজ করত, ঘোড়া তার শুধু প্রিয় জন্তুই নয়, ঘোড়াকে নিজের কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতেও সে সুদক্ষ, তাই প্রয়োজন হলেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে জঙ্গলের সেই নির্দিষ্ট শিমূল গাছটির কাছে গিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে সোজা উঠে দাঁড়ালেই অভিপ্রেত অস্ত্রগুলির নাগালে পৌঁছানো যায়। শিমূল গাছটি সদানন্দ সুরের বাড়ীর থেকে বিশেষ দূর নয়, তাই বিশু মল্লিকের এই ঘোড়ায় চড়ে বনে যাওয়া এবং তার পরবর্তী রহস্যময় কার্যকলাপ হয়তো সদানন্দ কোনোদিন দেখে ফেলেছিল—অবিবাহিত এই মানুষটি কৃপণ এবং সংবৃতমন্ত্র হলেও তার মনে ছিল সুপ্ত ভোগতৃষ্ণা, তাই বিশু মল্লিকের গোপন কাজ-কারবারের কথা জানতে পেরেই সুর মশাই তাকে তার কুকীর্তি ফাঁস করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে অর্থ শোষণ করতে শুরু করল। বিশু মল্লিক বুঝতে পারল সদানন্দ তার জীবনে মূর্তিমান বিপদ। নির্বিঘ্নে বেআইনী ব্যবসা চালাতে হলে এই পথের কাঁটাটিকে আগে উপড়ে ফেলতে হবে। এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপযুক্ত সুযোগও পাওয়া গেল। সদানন্দ তখন কিছুদিনের জন্য বাঘমারির বাইরে গেছে। বিশু মল্লিক শিমূল গাছের গুপ্ত কোটর থেকে একটি হ্যাণ্ড-গ্রিনেড নিয়ে সদানন্দের বাড়ীতে মরণ-ফাঁদ পেতে এল। পরিকল্পনাটি চমৎকার—সদানন্দ কলকাতা থেকে ফিরে যেই বাড়ীতে ঢুকতে যাবে অমনি বোমা ফেটে তার মৃত্যু ঘটবে অথচ অপরাধীকে সনাক্ত করার কোনো উপায় থাকবে না। কিন্তু অপরাধের পথ নিষ্কণ্টক নয়, আর অমৃতেরও দুর্ভাগ্য, ঘটনাচক্রে বন্ধুদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে সে ঠিক সেই সময়েই জঙ্গলের ঐ শিমূল গাছটির কাছে গিয়েছিল। ব্যোমকেশের অনুমান সদানন্দ সুরের জন্য যখন বুবি-ট্র্যাপ পেতে ফিরে যাচ্ছিল, অমৃত তাকে দেখে ফেলল। দুজনেই দুজনকে চেনে, বিশু মল্লিক বুঝতে পারল অমৃত তাঁর কুকার্যের সাক্ষী হয়ে রইল। সদানন্দের মৃত্যু ঘটলে অমৃতের সাক্ষ্যে তাকে আইনের বাঁধনে ধরা পড়তে হবে। সুতরাং মুহূর্তের মধ্যেই সে মনস্থির করে ফেলল—তার স্বয়ংক্রিয় পিস্তলের গুলিতে অমৃতের দেহে প্রবেশ করল মৃত্যু দূত। তারপর সদানন্দ সুর কলকাতার থেকে ফিরে এসে দরজা খুলে বাড়ী ঢুকতে গিয়ে যখন নিজের অজান্তে বিশু মল্লিকের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে প্রাণ হারাল তখন আততায়ী হিসাবে বিশ্বনাথ মল্লিককে সন্দেহ করার কোনও সূত্রই রইল না। কিন্তু ব্যোমকেশের সত্যানুসন্ধানী প্রতিভার কাছে তাকে হার মানতে হয়েছে। অবশ্য এ প্রসঙ্গে বাঘমারি গ্রামের কয়েকটি তরুণের সক্রিয় সহযোগিতার কথাও উল্লেখ করতে হয়। বলা বাহুল্য, বেআইনী অস্ত্র-শস্ত্রের যে মজুতদারটির খোঁজে সরকারী সূত্রে ব্যোমকেশকে সাস্তালগোলায় আসতে হয়েছিল সে আর কেউ নয় এই বিশু মল্লিক।

এ গল্পে শুধু অমৃত নয়, নিহত হয়েছে সদানন্দ সুরও, তবু নামকরণের ক্ষেত্রে

অমৃতের মৃত্যুকেই প্রাধান্য দেওয়া হল কেন? সম্ভবতঃ এর প্রথম কারণ অমৃত জঙ্গলে দেখা কালোরঙের ঘোড়ার কথা (যাকে সে ঘোড়া-ভূত বলে মনে করেছিল) জানিয়ে পরোক্ষভাবে ব্যোমকেশকে সমস্যা-সমাধানের কাজে অনেকখানি সাহায্য করেছিল। দ্বিতীয়তঃ অমৃতের মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই ব্যোমকেশ তার মূল লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছে। এই অল্পবুদ্ধি যুবকটির বিনাদোষে এই অকালমৃত্যু সহৃদয় সত্যান্বষীকে কতখানি ব্যথিত করেছিল তার পরিচয় ব্যোমকেশের উক্তিটি—"সদানন্দ সুরের মৃত্যুতে আমার দুঃখ নেই, কিন্তু অমৃত ছেলেটা নেহাত অকারণেই মারা গেল।"

এই গল্পের নামকরণের সর্বশেষ কারণ হিসেবে বলা যায় 'অমৃত' ও 'মৃত্যু" এই এই দুই শব্দের মধ্যে যে বৈপরীত্যজনিত চমক আছে লেখক হয়তো তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এই কাহিনীর নাম রেখেছিলেন "অমৃতের মৃত্যু"।

শৈল রহস্য [১৩৬৬] **:** 'শৈল রহস্য' গল্পের সূচনা মহাবালেশ্বরের সহ্যাদ্রি পর্বত থেকে অজিতকে লেখা ব্যোমকেশের চিঠি দিয়ে, যে চিঠিতে মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত এই বিশেষ পার্বত্য শহরটির শীতকালীন নৈসর্গিক চিত্র ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি উন্মোচিত হয়েছে মানবজীবনের এক বিচিত্র ইতিবৃত্ত যার দুর্নিবার আকর্ষণ পাঠকমনকে গল্প শেষ না হওয়া পর্যন্ত তীব্র কৌতূহলে আবিষ্ট রাখে।

আলোচ্য কাহিনীটিতে স্তরে স্তরে উদ্ঘাটিত হয়েছে তৃতীয় রিপুর দহনে দগ্ধ এক বাঙালী দম্পতির কলঙ্কিত কার্যাবলীর পরিচয়। সেই অধঃপতিত নর-নারী হল বিজয় বিশ্বাস—আর তার স্ত্রী হৈমবতী। ব্যোমকেশ সহ্যাদ্রি হোটেলে আসার কিছুদিন আগে একটি মানুষকে হত্যা ক'রে হোটেলের পেছনের গভীর খাদে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে বাস করত এক ব্যাঘ্র-দম্পতি। নিহত মানুষটির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোনো চিহ্নই তারা অবশিষ্ট রাখেনি কিন্তু তার পোষাক দেখে এবং হৈমবতী দেবীর বিবৃতি অনুসারে অনুমান করা গিয়েছিল মৃতব্যক্তি হলেন হোটেলের তৎকালীন দুজন অংশীদারদের একজন, যার নাম বিজয় বিশ্বাস, আর হত্যাকারী অপর অংশীদার মানেক মেহেতা, যে সিন্দুকে রাখা প্রায় দেড়লাখ টাকা নিয়ে উধাও। বিধবা হৈমবতী শূন্য সিঁথি ও হোমজির দেওয়া সামান্য কিছু অর্থ হাতে নিয়ে সাশ্রু নয়নে বিদায় নিয়েছে। মানেক মেহতাই যে হত্যাকারী এ বিষয়ে কোনো সংশয় কারো মনে জাগেনি। কারণ উক্ত ব্যক্তিটি খুব সুনামের অধিকারী ছিল না—বরং বলা যায় নানারকম চোরা কারবারের সঙ্গে জড়িত মানেক মেহেতা আইনের চোখে একজন মারাত্মক অপরাধী। সুতরাং তাকেই বিজয় বিশ্বাসের খুনী হিসাবে ধরে নিতে কেউই অরাজী হয়নি। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা সম্পূর্ণ বিপরীত। মানেক মেহেতা হত্যাকারী নয়, নিহত ব্যক্তি এবং তাকে হত্যার ব্যাপারে শূন্য হোটেলে নির্জন, শীতার্ত রাত্রে যে দুটি নিষ্ঠুর মানুষ বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তারা হল বিজয় বিশ্বাস আর হৈমবতী। এই খুনের একমাত্র কারণ অর্থলোভ।

এই রহস্য উদ্ঘাটনে ব্যোমকেশের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-শক্তি, অজিতের তৎপরতা এবং বিকাশদত্তের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সমস্ত কিছুকেই স্বীকৃতি দেওয়ার পরও

উল্লেখ করতে হয় এমন এক শক্তির কথা বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না। সে শক্তির নাম অলৌকিক শক্তি। হৈমবতী আর বিজয় বিশ্বাসের প্রকৃত কার্যকলাপ, তাদের কলকাতার ঠিকানা সমস্ত কিছুই ব্যোমকেশকে যে জানিয়ে দিয়েছে সে কোনো শরীরী অস্তিত্ব নয়, মানেক মেহেতারই অতৃপ্ত আত্মা। অজিত অলৌকিক শক্তির প্রতি সংশয় প্রকাশ করেছিল, কিন্তু ব্যোমকেশ সেই কায়াহীন অস্তিত্বে অবিশ্বাস করেনি। শেষ পর্যন্ত কলকাতার বাসা থেকে হৈমবতী ও তার ভৃত্যরূপী বিজয় বিশ্বাস পলায়ন করেছে। আইনের হাতে আসামীরা ধরা পড়েনি কিন্তু ব্যোমকেশের বিশ্বাস মেহেতার অতৃপ্ত আত্মার ক্ষোভ দূর হয়েছে কারণ ব্যোমকেশের ব্যাখ্যা অনুযায়ী "ভূত চেয়েছিল মস্ত একটা ধোঁকার টাটি ভেঙে দিতে। তা সে দিয়েছে।" শরদিন্দুবাবু যে ভৌতিক গল্প রচনার ক্ষেত্রেও কত পারদর্শী দিলেন তার আংশিক কিন্তু উজ্জ্বল প্রমাণ মেলে শৈল রহস্যে।

অদৃশ্য ত্রিকোণ [১৩৬৮]ঃ 'অদৃশ্য ত্রিকোণ' যুগপৎ লোভ ও প্রতিশোধস্পৃহার এক অনিবার্য পরিণামের ইতিবৃত্ত। আলোচ্য গল্পের স্থানিক পটভূমি ভারতবর্ষের পশ্চিম অঞ্চলের একটি বড় শহর। ব্যোমকেশ ও অজিত এই কাহিনীতে বর্ণিত মূল ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নয়, তারা পুলিশ ইন্সপেক্টর রমণী সান্যালের কাছ থেকে এর সম্বন্ধে জানার সুযোগ পায়। এ এমন এক চাতুর্যময় অপরাধ যেখানে খুনী কে, তার 'মোটিভ্' কি সমস্তই দিনের আলোর মত স্পষ্ট, আততায়ী পলাতক নয়—সেই শহরেই নিজের বাড়ীতে সে বহাল তবিয়তে আছে, অথচ তাকে ধরবার কোনও উপায় নেই, এমনই নিশ্ছিদ্র তার কর্মপদ্ধতি। আইনের প্যাঁচে যাকে গ্রেপ্তার করা যাচ্ছেনা সূক্ষ্ম বুদ্ধির ফাঁদে ফেলে যদি তাকে ধরা যায় এই প্রত্যাশা নিয়েই রমণী দারোগা, সেই শহরে কোন এক সরকারী কার্যোপলক্ষে আগত, খ্যাতকীর্তি ব্যোমকেশের শরণাপন্ন হয়েছেন। রেবা সরকার আর সুনীল সরকারের এই গল্প ব্যোমকেশকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করছে। কারণ এমন অপরাধী তার মতো অভিজ্ঞ সত্যান্বেষীর জীবনেও দুর্লভ, যে প্রত্যক্ষভাবে ধরা পড়ার মতো তুচ্ছতম সূত্রও ফেলে রাখে না।

অসাধারণ কূটবুদ্ধি সম্পন্ন সুনীলের বাইরের চেহারাটা দেখে অবশ্য তার মনের ভেতরটা বোঝবার উপায় নেই। অজিতের বর্ণনা অনুসারে—

> "সুনীলের বয়স আন্দাজ ত্রিশ বছর, আঁটসাঁট মোটা শরীর, গোল মুখখানা প্যাঁচার মুখের মত থ্যাব্ড়া, মুখ দেখিয়া মনে হয় না বুদ্ধিসুদ্ধি কিছু আছে।"

অত্যন্ত মিতব্যয়ী ও বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন ধনী পিতার একমাত্র পুত্র হওয়া সত্ত্বেও সে যখন ব্যবসায় মন দেওয়ার পরিবর্তে আমোদ-প্রমোদে মত্ত থেকে অর্থের অপব্যয় করতে লাগল তখন শিবপ্রসাদ সরকার ছেলের এই বদখেয়াল দূর করার জন্য সেই চিরাচরিত ব্যবস্থাই অবলম্বন করলেন অর্থাৎ একটি সুন্দরী, শিক্ষিতা, সুরুচিসম্পন্না পাত্রীর সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিলেন। বিয়ের পর প্রথম কিছুদিন সুনীল রূপসী স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত থাকল, তারপর আবার স্বমূর্তি ধরল। এদিকে বৃদ্ধ শ্বশুরকে বাড়ীতে সেবা করে ও কর্মক্ষেত্রে তাঁর কার্যে সহায়তা করে রেবা দিনে দিনে শিবপ্রসাদবাবুর গভীর স্নেহের ও প্রগাঢ় আস্থার পাত্রী হয়ে উঠতে লাগল। পুত্রবধূর প্রতি তাঁর স্নেহ ও আস্থা যে কত গভীর তার প্রমাণ

পাওয়া গেল তাঁর মৃত্যুর পর। জানা গেল তাঁর উইলের মাধ্যমে তিনি সমস্ত বিষয় সম্পত্তি দিয়ে গেছেন রেবাকে, সুনীলকে এক কপর্দকও নয়। তিনি হয়তো একথাও ভেবে থাকতে পারেন যে, এই বিষয় সম্পত্তির কর্তৃত্ব রেবার হাতে থাকলে এগুলি যেমন রক্ষা পাবে অন্যদিকে তেমনি সুনীলও বাধ্য হয়ে স্ত্রীর প্রতি অনুগত থাকবে। কিন্তু এই ব্যবস্থার দ্বারা তিনি যে নিজের অজান্তেই তাঁর স্নেহধন্যা পুত্রবধূর মৃত্যুর বীজ বপন করে গেলেন পরবর্তী কালের ঘটনায় সে সত্যই সুপরিস্ফুট হয়। উইল অনুসারে সমস্ত কর্তৃত্ব হাতে পেয়ে রেবা স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ন্ত্রণের জন্য নানাভাবে তার অর্থলাভের পথ বন্ধ করে দিল। এই ভাবে পিতার উইল তাকে সম্পত্তির থেকে বঞ্চিত করলেও এবং রেবা তার খুশী মত অর্থ অপব্যয়ের পথ রুদ্ধ করে দিলেও সুনীল মুখে একটি প্রতিবাদ পর্যন্ত করল না। কিন্তু মনে মনে এক নির্মম পরিকল্পনা গ্রহণ করল। তাকে তার স্ত্রী এবং অন্যান্যরা যতটা নির্বোধ মনে করত সে মোটেই ততটা বোকা ছিল না। সুবুদ্ধি না থাক দুর্বুদ্ধির অভাব নেই এবং তাকে শাণিত করে তুলেছিল তার বিলাতী রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনী পাঠের নেশা। তাই সে যখন রেবার সমস্ত ব্যবস্থা নীরবে মেনে নিয়ে সুবোধ বালকের মতো শান্ত হয়ে দিন কাটাতে লাগল, তখন কেউ বুঝল না এটা তার ছদ্ম আচরণ মাত্র।

এই ভাবে কিছুদিন চলার পর সুনীল তার পরিকল্পনা মতো কাজ সুরু করল। প্রথমে সে রেবার মনে ডাকাতের কাল্পনিক আক্রমণ সম্পর্কে এক আতঙ্কের সৃষ্টি করল। যার ফলে ভীতত্রস্তা রেবা ভবিষ্যতে কখনও ডাকাতের আক্রমণ ঘটলে সেই বিপর্যয় থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে থানায় শিবপ্রসাদ বাবুর জমা দেওয়া পিস্তলটা ফেরৎ পাওয়ার জন্য আবেদন জানাল। এবং সুনীলের নামে সেই পিস্তলের লাইসেন্স করিয়ে রেবা নিজের অজ্ঞাতসারেই আপন নিয়তিকে যেন আবাহন করে আনল। এর পরের মাস দুয়েক সুনীল সুযোগের প্রতীক্ষায় নিঃশব্দে কাটিয়ে দিল। তারপর এক সন্ধ্যায় সে টাকার টোপ ফেলে শহরের নামকরা পালোয়ান ও গুণ্ডা হুকুম সিংকে রেবা-হত্যার কাজে নিযুক্ত করল। তার নির্দেশমতই রেবাকে শ্বাসরোধ ক'রে হত্যার পর মৃতার গায়ের গয়না নিয়ে হুকুম সিং বাড়ীর বাইরে, আসা মাত্রই গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সুনীল মুহুর্মুহু গুলি ছুঁড়ে তার কুকীর্তির একমাত্র সাক্ষীটিকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিল। তারপর আপাত-নির্বোধ সুনীলের সরল স্বীকারোক্তি থেকে পুলিস জানল ডাকাত রেবাকে হত্যা করেছে আর সুনীল স্ত্রীর এই অপমৃত্যুর আঘাত সহ্য করতে না পেরে সেই হত্যাকারীকে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে প্রতিশোধ নিয়েছে। স্বামী হিসেবে সে অধিকার তার আছে। অতএব হুকুম সিংকে মারার জন্য আইনত কোনও শাস্তিই তার হয় নি। বরং সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি হাতে পেয়ে সেই শহরেই পরম আনন্দে তার দিন কাটছে।

অতএব অদৃশ্য ত্রিকোণে অপরাধীর নিচ্ছিদ্র কৌশলে'ও নিপুণ অভিনয়ে কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই যাতে তাকে হত্যাকারী বলে ধরা যায়, অথচ দারোগা রমনীবাবু নিশ্চিত যে রেবাকে সুনীলই হত্যা করিয়েছে। তাই কৌশলে তার স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য ব্যোমকেশের সাহায্য চান। ব্যোমকেশ ভেবে চিন্তে একটা উপায় স্থির করেছে, রেবার

হস্তাক্ষর নকল করে জাল চিঠির ফাঁদ পেতে সুনীলকে ধরতে চেষ্টা করছে—কিন্তু তার সে প্রয়াস সফল হয়নি। সুনীল প্রথমে নির্বোধের অভিনয় করলেও পরে তার কূট বুদ্ধির কাছে ব্যোমকেশকেও হার মানতে হয়েছে। সুনীল ঘর ছেড়ে বার হবার সময় সদম্ভে বলেছে—

"সুনীল সরকারকে ধরা এত সহজ নয়, যদি ক্ষমতা থাকে,
আমাকে গ্রেপ্তার করুন, তারপর আমি দেখে নেব।"

কিন্তু তার এই দেখে নেওয়া আর হয়ে ওঠেনি, কারণ এই উক্তির পরমুহূর্তেই এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছে—হুকুম সিংয়ের ভাই মুকুন্দ সিং সুনীলকে হত্যা করে ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। রমনীবাবুর সুনীল সংক্রান্ত সমস্যার অভাবনীয় সমাধান ঘটেছে।

এ গল্পের নাম অদৃশ্য ত্রিকোণ কেন ? তার কারণ সুনীল ও রেবা ছাড়াও এ গল্পে আরও একটি চরিত্র আছে। এই তৃতীয় কোণটি হয়তো ব্যোমকেশের কাছেও অদৃশ্যই থেকে যেত যদি না সুনীল বলত—

"রমনী দারোগা রেবার প্রাণের বন্ধু ছিল, যাকে বলে বঁধু। তাই তো
আমার ওপর রমনী দারোগার এত আক্রোশ।"

পরে ব্যোমকেশের প্রশ্নের উত্তরে রমনী বাবু স্বীকার করেছেন যে রেবার সঙ্গে তার যোগাযোগের অভিযোগটি মিথ্যে নয়। একই শহরে একই পাড়ায়, তাঁরা থাকতেন, তাই ছোটবেলার থেকেই রেবাকে তিনি চিনতেন—তখন ছিল শুধুই পরিচয়, সে সম্পর্ক গভীর হল অনেক পরে যখন সুনীলের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলেও স্বামীর অপদার্থতার জন্য রেবার জীবনটা প্রায় ব্যর্থ। রমনী বাবুর সঙ্গে তাঁর দেখাশোনা বিশেষ হত না, তবে রেবা তাঁকে মনের প্রাণের কথা জানিয়ে চিঠি লিখত। এরকম অনেক চিঠিই তাঁর কাছে আছে। কিন্তু আপাত নির্বোধ সুনীল যে তাঁদের এই গোপন সম্পর্কের কথা জানত—তা তিনি অথবা রেবা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেন নি। রমনীবাবুর স্বীকারোক্তি থেকে এ কাহিনীর একটি নূতন দিক উদ্ঘাটিত হয় বটে, কিন্তু সুনীল যে রেবাকে খুন করিয়েছিল তা রমনী বাবুর প্রতি ঈর্ষাবশতঃ নয়, রেবার মৃত্যুর পর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি নিজের দখলে পাওয়ার জন্যই ঐ কাজে সে প্রবৃত্ত হয়েছিল। সুতরাং গল্পের নাম দেখে অথবা রেবা ও রমনীবাবুর সম্পর্কের কথা জেনে এখানে ত্রিভুজ প্রেমের সমস্যা খোঁজা ভুল হবে।

অদ্বিতীয় [১৩৬৮] : 'অদ্বিতীয়' গল্পেও অর্থতৃষ্ণাই প্রধান, তবে এই তৃষ্ণা পুরুষের নয় এক নারীর। প্রমীলা পাল নাম্নী এই যুবতীটি তার স্বামীকে বিষ প্রয়োগে হত্যার অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিতা হয়। কারাবাসের দুবছর পরই সে বর্ধমানের জেলের এক গার্ডকে খুন করে পালিয়ে আসে এবং কলকাতার পূর্বদক্ষিণ অঞ্চলে চিন্তামণি কুণ্ডু নামে পক্ষাঘাতে পঙ্গু আত্মীয় পরিজনহীন প্রৌঢ়ের একটি বাড়ি ভাড়া নেয়। প্রমীলা পাল সম্ভবতঃ জেল থেকে বেরিয়েই পুরুষের ভঙ্গীতে চুল ছেঁটে ফেলেছিল এবং প্রয়োজন হলে নারী সাজার জন্য একটি বিলিতি পরচুলা জোগাড় করে রেখেছিল। চিন্তামনি কুণ্ডুর কাছে যখন সে বাড়ী ভাড়া নিতে আসে তখন পরণে ছিল তার পুরুষের সাজ, তা এমনই নিখুঁত যে চিন্তামণিবাবুর মনে কোন সন্দেহে উদ্রেক করেনি কেবল

কণ্ঠস্বরটি পুরুষের পক্ষে একটু অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল। ছদ্মবেশ-ধারিণী প্রমীলা পাল চিন্তামণি বাবুর কাছে নাম বলেছিল তপন সেন, জানিয়েছিল স্ত্রীর নাম শান্তা— সেও চাকুরীরতা। তারপর তপন আর চিন্তামণি বাবুর সামনে আসেনি। প্রমীলা সকালে শান্তা আর রাত্রে তপন সেজে একাই দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করে চিন্তামণি বাবুর কৌতূহলী চোখদুটিকে অনায়াসেই ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছিল। দিনের বেলা সে বিলাতী পরচুলার সাহায্যে অবলীলাক্রমে তার ছোট করে ছাঁটা চুলকে ঢেকে জীবিকার সন্ধানে বার হত। জীবিকা আর কিছু নয়, দুপুরবেলা বাড়ীর পুরুষদের অনুপস্থিতির সুযোগে ফেরিওয়ালীর ভূমিকায় নানা মনোহারী দ্রব্য নিয়ে গৃহিণীদের মন ভুলিয়ে তাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করা এবং পিস্তল বা ছুরি দেখিয়ে তাদের টাকা পয়সা, গহনা গাঁটি অপহরণ করে নিয়ে এসে নিজের সিন্দুকে জমা রাখা। তার এই কীর্তিকলাপ চারিদিকে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল বটে, কিন্তু সে ছিল ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এমন করেই হয়তো আরও কিছুদিন কেটে যেত। কিন্তু একদিন রাত্রে তার দেখা হয়ে গেল বর্ধমানের এক পুলিস কর্মচারী বিধুভূষণ আইচের সঙ্গে। বিধুভূষণের চোখে ধরা পড়ে প্রমীলা বুঝল তার আর নিস্তার নেই, তাই তার অনুসরণকারী বিধুভূষণকে কৌশলে নিজের বাড়ির সামনে এনে তাকে হত্যা করল—এক্ষেত্রে তার হাতিয়ার একটি সরু, লিক্‌লিকে ছুরি—যা হাজার তদন্ত করেও শান্তা ওরফে প্রমীলা পালের বাসা থেকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় নি—কারণ সেটি একটি রবারের গার্টার দিয়ে ডান পায়ের সঙ্গে আটকানো থাকত, ধরা পড়ার প্রাক্‌মুহূর্তে ক্রোধে উন্মত্ত ও হিংসায় অন্ধ হয়ে সেই ছুরি দিয়েই সে ব্যোমকেশকে হত্যা করতে চেয়েছে, দারোগা বিজয়বাবু তৎপর না থাকলে ব্যোমকেশের সেদিন প্রাণ সংশয় ছিল অনিবার্য।

গল্পের নাম 'অদ্বিতীয়' অর্থাৎ তপন সেন ও শান্তার অস্তিত্ব অদ্বিতীয়, তারা অভিন্ন। কিন্তু অন্যদিক থেকে বলা যায় ব্যোমকেশের মত ভূয়োদর্শী সত্যান্বেষীর অভিজ্ঞতার জগতেও প্রমীলা পাল অদ্বিতীয়া। কারণ সত্যান্বেষণের সূত্রে ব্যোমকেশ এমন দু একটি নারীর সাক্ষাৎ পেয়েছে যারা তাদের সঙ্গী পুরুষকে অপরাধ সম্পাদনে সাহায্য করেছে যেমন 'চিড়িয়াখানা'র বনলক্ষ্মী, 'বহ্নিপতঙ্গের' শকুন্তলা, 'বেনী সংহারের' মোদিনী। 'রুমনাম্বার দুই' গল্পে কন্যার মৃত্যুর জন্য প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করতে গিয়ে জামাই সুকান্ত সোমের জীবনদীপ নিজের হাতে নির্বাপিত করে দিয়েছিলেন লেডী ডাক্তার শোভনা রায়। কিন্তু অত্যন্ত তুচ্ছ কারণে নির্বিচারে নির্দ্বিধায় একের পর এক হত্যা চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি অসংখ্য অপরাধ একই নারীর দ্বারা অনুষ্ঠিত হতে শরদিন্দুবাবুর আর কোনও কাহিনীতে আমরা দেখিনি, প্রকৃতপক্ষে বঙ্গনারী হলেও প্রমীলা পালের নৃশংস ও দুঃসাহসী ক্রিয়াকলাপ অনেকটাই পাশ্চাত্য অপরাধ কাহিনীর নায়িকাদের রোমাঞ্চকর কার্যাবলীর সঙ্গে সাদৃশ্য বহন করে। বঙ্গললনা হিসেবে তাকে মেনে নিতে তাই কষ্ট হয়।

লোহার বিস্কুট [১৩৭৬] : 'লোহার বিস্কুট' গল্পের অক্ষয় মণ্ডল ছিল সোনার চোরাকারবারী। ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আসা চোরাই সোনা সংগ্রহ করা এবং সুযোগ মত বাজারে ছাড়া তার পেশা। এই জাতীয় অবৈধ কাজে যারা লিপ্ত থাকে তাদের জীবন-

পথ কখনও সরল ও মসৃণ হয় না—অক্ষয় মণ্ডলের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। সে তার দুষ্কার্যের অন্যতম সহকারী হরিহর সিংকে হত্যা করে ফেরার হয়েছে। চোরা-কারবারীর জীবনে এ ধরনের ঘটনা নতুন নয় কিন্তু সংগৃহীত সোনা লুকিয়ে রাখার যে কৌশল সে অবলম্বন করেছিল সেটি সত্যই বিচিত্র।

অক্ষয় মণ্ডল অসদুপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিল এবং কলকাতার ভদ্র পাড়ায় একটি বাড়িও তৈরী করিয়েছিল, বাড়ির সমস্ত ছাদটিকে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে সে মুড়ে রেখেছিল, যার ফলে বাঘের শূন্য খাঁচার মত দেখতে সেই ছাদটিই ছিল সারা বাড়ির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুরক্ষিত স্থান, সেই ছাদেরই এক কোণে উঁচু পাদপীঠের ওপর লাল রঙের লোহার চৌবাচ্চা। আপতদৃষ্টিতে জল সরবরাহকারী নিরীহ চৌবাচ্চাটি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অক্ষয় মণ্ডলের লুকানো সোনার গোপন ভাণ্ডার। ঐ জলের চৌবাচ্চার মধ্যেই সে তার সোনার বিস্কুটগুলি লোহার পাতে মুড়ে লুকিয়ে রাখত, এবং প্রয়োজন হলেই ছিপ দিয়ে মাছ ধরার মতো লাঠির আগায় ঘোড়ার নালের আকৃতি বিশিষ্ট একটি শক্তিশালী চুম্বক জলে ফেলে সেই লোহার পাতে মোড়া সোনার বিস্কুটগুলি জল থেকে তুলে আনত। কিন্তু হরিহর সিংকে হত্যা করার পর অক্ষয় মণ্ডল বেশ মুস্কিলেই পড়ে। পালাবার সময় সে সঞ্চিত সব সোনা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেনি, ট্যাঙ্কেই সেগুলি থেকে গেছে। লোহার ডাণ্ডা মোড়া ছাদটিতে বাড়ির বাইরে থেকে প্রবেশ করার কোনো উপায়ই নেই, আবার ও বাড়ীর একতলায় ভাড়াটে কমলবাবুদের চোখ এড়িয়ে বাড়ির ভিতর দিয়েও ছাদে যাওয়া যাবে না, তাই কমলদাসকে সপরিবারে বাড়ী ছাড়া করার জন্য অক্ষয়মণ্ডল আড়ালে থেকে নানা ভাবে চেষ্টা করেছে, কিন্তু কমলবাবুর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দরুণ সেই প্রচেষ্টাগুলি সার্থক হতে পারেনি। এদিকে অক্ষয়মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করার জন্য তার বাড়ীতে কঠোর পুলিসী প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমগ্র পরিস্থিতি আসামীটির পক্ষে মোটেই আশাপ্রদ নয়। এমন সময় কিছুটা আকস্মিক ভাবেই কমলবাবু পরিবারসহ তীর্থযাত্রার এক সুযোগ লাভ করেছেন। এই সুবর্ণসুযোগ এবং ঐ বাসাবাড়ী কোনটাই তিনি সহজে হাত ছাড়া হতে দিতে চাননা। তাই প্রতিবেশী ব্যোমকেশ বক্সীর সঙ্গে এ ব্যাপারে পরামর্শ করতে এসেছেন। ব্যোমকেশ অনুমান করেছে, ব্যাঙ্কের যে কর্মীটি মারফৎ কমলবাবু সপরিবারে তীর্থ দর্শনের প্রেরণা লাভ করেছেন, তার সঙ্গে হয়তো অক্ষয় মণ্ডলের যোগ সাজস আছে, কমলবাবুকে কিছুদিনের জন্য বাড়ি ছাড়া করার ব্যাপারে হয়তো অক্ষয় মণ্ডলের কোনো স্বার্থ আছে। ব্যোমকেশ বাড়িটি ভাল করে দেখে আসবার জন্য সাগ্রহে কমলবাবুর সঙ্গী হয়েছে, সঙ্গে তার প্রিয় বহুদিনের সঙ্গী ছাতিটি যার—

"লোহার বাঁট এবং কামানিতে মরচে ধরেছে কাপড় বিবর্ণ, এবং বহুছিদ্র যুক্ত। এই ছাতা মাথায় দিয়ে রাস্তায় বেরুলে নিজে অদৃশ্য থেকে সন্দেহভাজন ব্যক্তির অনুসরণ করা যায়; ফুটো দিয়ে বাইরের লোককে দেখা যায়, কিন্তু বাইরের লোক ছাতাধারীর মুখ দেখতে পায় না। সত্যান্বেষীর উপযুক্ত ছাতা।"

আলোচ্য গল্পের রহস্য উদ্ঘাটনে ছাতাটির ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, ছাতার নীচে লোহার ডাঁটাটি ঠেকিয়েই ব্যোমকেশ বুঝেছেন অক্ষয় মণ্ডলের বাড়ির ওপরে ওঠার সিঁড়ির

দরজার মাথায় রাখা ঘোড়ার নালের আকৃতি বিশিষ্ট লৌহ-খণ্ডটি আসলে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী চুম্বক। এই অভিজ্ঞতাটুকু তার অন্তর্দৃষ্টি জাগরণে সাহায্য করেছিল। তারপর ব্যোমকেশ ছাদের চৌবাচ্চাটি দেখেই অক্ষয় মণ্ডলের সোনা সঞ্চয়ের প্রকৃত কৌশলটি বুঝতে পেরেছিল, অক্ষয় মণ্ডলকে হাতে নাতে ধরবার জন্যই সে কমলবাবুকে নির্ভয়ে সপরিবারে তীর্থে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেছে, তাঁরা চলে গেল বাড়ির থেকে পুলিস প্রহরা সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছে, তারপর রাত্রের অন্ধকারে দারোগা রাখাল সরকারকে নিয়ে ছাদের কোণে অক্ষয় মণ্ডলের আগমনের অপেক্ষায় নিঃশব্দে সময় কাটিয়েছে। অবশেষে তাদের প্রতীক্ষা সার্থক। বাড়ি খালি দেখে অক্ষয় মণ্ডল সমস্ত সোনা নিয়ে যেতে এসে চোরাই সম্পদসহ ধরা পড়েছে।

লোহার বিস্কুট গল্পে ব্যোমকেশকে বয়সের দিক থেকে বৃদ্ধই বলা চলে, (কারণ "বেণী সংহারে" ব্যোমকেশের বয়স ষাট পেরিয়েছে "লোহার বিস্কুট" তার পরবর্তী সনে প্রকাশিত), কিন্তু তার অনুমান শক্তির স্বচ্ছতা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা যে আগের মতই অম্লান তার প্রমাণ আলোচ্য কাহিনীটিতে অপ্রতুল নয়।

॥ ২ ॥

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কয়েকটি রহস্য-রচনাতে দেখা যায় অপরাধের মূলে রয়েছে অপরাধীর তীব্র কামাসক্তি ও অন্ধ ভোগাকাঙ্ক্ষা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় 'বহ্নি-পতঙ্গ', 'মগ্নমৈনাক' ও 'বেণী সংহার'-এর কথা। এই তিনটি কাহিনীতেই আততায়ীদের চারিত্রিক অসংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাব অপরের জীবনে ঘটিয়েছে নিদারুণ বিপর্যয়।

বহ্নি-পতঙ্গ [১৩৬২] : 'বহ্নি-পতঙ্গে' দীপনারায়ণ সিংয়ের আকস্মিক মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ব্যোমকেশের মনে প্রাথমিক সংশয় জেগেছে 'দুটো মোটিভ পাওয়া যাচ্ছে। এক—টাকা, দুই—স্মরগরল। কোন্ দিকের পাল্লা ভারী এখনও বুঝতে পারছি না।'

এই সংশয় অহেতুক নয়। পাটনা নিবাসী প্রৌঢ় দীপনারায়ণ সিং 'বিহারের একজন প্রচণ্ড জমিদার, সালিয়ানা আয় দশ লাখ টাকা, তার ওপর তেজারতি কারবার আছে।' নিঃসন্তান দীপনারাণবাবু তাঁর দীর্ঘ রোগভোগের পর রোগমুক্তি উপলক্ষ্যে এক সন্ধ্যায় শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নৈশভোজে আপ্যায়িত করেন। পুলিস অফিসার পুরন্দর পাণ্ডের বন্ধু হিসাবে ব্যোমকেশ ও অজিত সেই নৈশ উৎসবে যোগদানের আমন্ত্রণ লাভ করে। সেই আনন্দানুষ্ঠানের পরবর্তী প্রভাতেই যখন পারিবারিক চিকিৎসক ডাক্তার পালিতের হাতে লিভার ইঞ্জেকশন নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দীপনারায়ণ বাবুর মৃত্যু ঘটে তখন আপাতদৃষ্টিতে খুনীর অর্থতৃষ্ণাই এই বিত্তশালী মানুষটির অকাল বিনষ্টির কারণ বলে মনে হতে পারে। এক্ষেত্রে একাধিক নরনারীকেই সন্দেহ করা যায়—যেমন ডাক্তার পালিত, অপুত্রক দীপনারায়ণের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ভ্রাতুষ্পুত্র দেবনারায়ণ, দেবনারায়ণের স্ত্রী চাঁদনী, স্টেটের 'ম্যানেজার' গঙ্গাধর বংশী ও তার পুত্র তথা

'অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার' লীলাধর বংশী, দীপনারায়ণ পত্নী সুন্দরী, সুশিক্ষিতা, কলানিপুণা শকুন্তলা, শকুন্তলার অন্যতম অনুরাগী নর্মদাশংকর—এদের কারোকেই আপাতদৃষ্টিতে সন্দেহের ঊর্দ্ধে রাখা যায় না। তার ওপর চতুর আততায়ী দীপনারায়ণের মৃত্যুকে অর্থ-লোভবশতঃ হত্যারূপে প্রতিপন্ন করার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করেছে। কিন্তু ব্যোমকেশের অন্তর্দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। সে অপরাধী ও তার অপরাধের কারণ দুই-ই অভ্রান্তভাবে চিনে নিতে পেরেছে, বুঝেছে, ধনাকাঙ্ক্ষা নয়, প্রেমাকাঙ্ক্ষা-ই এক্ষেত্রে অনর্থ ঘটিয়েছে। আর যে সূত্রে সে সত্য দর্শন করেছে সে সূত্রটিও চমকপ্রদ— কোনও চিঠি, ডায়েরী বা ফটোগ্রাফ নয় নিহত ব্যক্তির তরুণী ভার্যা শকুন্তলাদেবীর আঁকা কালিদাসের প্রসিদ্ধ নাটক "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্"-এর একটি নাটকীয় মুহূর্তের চিত্ররূপ, যেখানে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা চিরন্তন প্রেমিক-প্রেমিকা, সেই ছবি দেখতে দেখতে ব্যোমকেশের চোখে পড়েছে এক অত্যাশ্চর্য ব্যতিক্রম—শকুন্তলাদেবীর তুলিতে চিত্রিত দুষ্মন্তের চোখের মণি নীল, মুহূর্তেই ব্যোমকেশের কাছে এই হত্যারহস্যের অন্ধকারাচ্ছন্ন পটভূমিটুকু দিনের আলোর মতই স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। সে অনুভব করেছে শকুন্তলা দীপনারায়ণের স্ত্রী হলেও তার একজন 'দুষ্মন্ত' অর্থাৎ গুপ্ত প্রেমিক আছে। আর সেই দুষ্মন্ত চক্ষু তারকা বিশিষ্ট সুদর্শন পুলিস ইন্‌স্পেক্টর রতিকান্ত ভিন্ন আর কেউ নয়। ব্যোমকেশের এই সত্যদর্শন নিছক বুদ্ধির খেলা মাত্র নয়, এ এক বিরল প্রতিভা, যা ভূয়োদর্শী অপরাধ-বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও দুর্লভ। তাই শকুন্তলাদেবীর আঁকা সেই বিশেষ ছবিটির যে স্বাতন্ত্র্য ব্যোমকেশের অনায়াসেই চোখে পড়ে, অজিত ও পুরন্দর পাণ্ডে তা লক্ষ্য করে না।

বহ্নি-পতঙ্গে পাপ-বৃত্তের নায়কটির ক্রিয়াকলাপও কম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নয়। তার কার্যসিদ্ধির ক্ষেত্রে শকুন্তলাদেবীর পরোক্ষ সহযোগিতাও উল্লেখযোগ্য। রতিকান্ত ও শকুন্তলার ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘদিনের। কোনও সামাজিক বাধার ফলে তাদের বাল্যপ্রণয় যৌবনে পরিণয়ের মাধ্যমে সার্থকতা লাভ করতে পারেনি, কিন্তু তাদের দুজনের মনেই থেকে গেছে পরস্পরের প্রতি তীব্র আকর্ষণ। দীপনারায়ণের সঙ্গে শকুন্তলার বিবাহ হওয়ার পরেও প্রকাশ্যে না হলেও গোপনে তাদের মধ্যে চলত অবাধ মেলামেশা, কেউ সে কথা জানতে পারেনি। এমন ভাবেই হয়তো কেটে যেত তাদের জীবনের বহুদিন কিন্তু ভাগ্য বিরূপ, তাই রতিকান্তের সঙ্গে অবৈধ সংসর্গের ফলস্বরূপ শকুন্তলা অবাঞ্ছিত সন্তানের জননী হতে চলল। প্রণয়ীযুগলের পক্ষে এ এক দারুণ সমস্যা। দীপনারায়ণের মত বিত্তবান প্রভাবশালী ব্যক্তি এই পারিবারিক কেলেঙ্কারীকে কখনও প্রশ্রয় দেবেন না। আর তাঁরই সুপারিশের জোরে রতিকান্তর পুলিসের চাকরী, তাই শকুন্তলার সঙ্গে গোপন অন্তরঙ্গতার কথা প্রকাশ পেলে রতিকান্ত ধনে প্রাণে মরবে, অতএব বাঁচার একটাই পথ—দীপনারায়ণ হত্যা। এই উদ্দেশ্যের সফল রূপায়ণের জন্য সে এমন এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যাতে সেই নির্মম অপরাধের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধ ডাক্তার পালিতের ওপর। শুধু তাই নয় সুচতুর রতিকান্ত নিজেকে সুনিশ্চিত ভাবে নিরাপদে রাখার জন্য পুরন্দর পাণ্ডের কাছে স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে দীপনারায়ণ হত্যা রহস্যের তদন্ত-ভার

প্রাপ্তির জন্য আবেদন জানায়। কি ঘৃণ্য ছলনা—যে ভক্ষক সেই রক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ! কিন্তু তার এত সতর্কতা সত্ত্বেও শেষ রক্ষা হয় না। ব্যোমকেশের বুদ্ধির ফাঁদে তাকে ধরা দিতেই হয়। তবে রতিকান্ত ও শকুন্তলাকে বাস্তবে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। ঘটনার শেষ মুহূর্তে রতিকান্তের পিস্তলের গুলি শকুন্তলাকে এবং পুরন্দর পাণ্ডের নিক্ষিপ্ত গুলি রতিকান্তকে যে লোকে প্রেরণ করেছে সেখানে মানুষের তৈরি আইন কার্যকর হয়না। প্রবৃত্তির অসংযম, বাসনার স্বৈরাচার মানব জীবনে যে কী মর্মান্তিক পরিণতিকে অনিবার্য করে তোলে 'বহ্নি পতঙ্গ' রতিকান্ত ও শকুন্তার মাধ্যমে সেই সত্যই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এদের মধ্যে কে বহ্নি ? কে পতঙ্গ ? ব্যোমকেশের মতে "দুজনেই বহ্নি, দুজনেই পতঙ্গ।" অবৈধ প্রণয়ের আত্মধ্বংসীরূপের সুনিপুণ চিত্রণে শরদিন্দু বাবুর প্রশংসনীয় দক্ষতা 'বহ্নি-পতঙ্গ'-এ সুপ্রমাণিত।

মগ্ন মৈনাক [১৩৬৯]ঃ কোনও ব্যক্তিত্বশালী, সম্ভ্রান্ত পুরুষের বহুগুণ থাকা সত্ত্বেও তীব্র নারীসঙ্গ লিপ্সা কিভাবে তাঁর পতনের পথকে প্রশস্ত করে শরদিন্দুর 'মগ্ন মৈনাক'-এ সেই সত্যই রূপায়িত হয়েছে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পনেরো বছর পরে এ কাহিনীর সূত্রপাত। গল্পের মধ্যমণি আটচল্লিশ বৎসর বয়স্ক সন্তোষ সমাদ্দার একদিকে ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন, অপর-দিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। অর্থাৎ বিত্তে ও প্রতিপত্তিতে তাঁর স্থান সমাজের শীর্ষে। চৌরঙ্গী থেকে দক্ষিণে কিছুদূর গেলে একটি উপরাস্তার উপর তাঁর বাগান ঘেরা বিশাল বাড়ী, যেখানে বাস করেন স্বয়ং সন্তোষবাবু, তাঁর স্ত্রী চামেলি সমাদ্দার তাঁদের দুই তরুণ যমজ পুত্র যুগল ও উদয়, চামেলি দেবীর সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে আশ্রিত অনাথ ভাই বোন নেংটি ও চিংড়ি এবং সন্তোষবাবুর সেক্রেটারী রবিবর্মা। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য সম্পর্ক স্বাভাবিক না হলেও রাশভারি সন্তোষবাবু ঘরে এবং বাইরে তাঁর প্রতিপত্তির আসনে বেশ নিশ্চিন্তেই ছিলেন, কিন্তু সেই নিশ্চিন্ততার ভিত টলে উঠল যখন তাঁর বন্ধুকন্যার পরিচয়ে হেনামল্লিক পূর্ববঙ্গ থেকে এসে তাঁর বাড়িতে বসবাস শুরু করল—অজিতের ভাষায়—

> "এই সাতটি মানুষের সংসারে হঠাৎ যেদিন একটি অপরূপ সুন্দরী যুবতীর আবির্ভাব ঘটিল, সেদিন মৃত্যু দেবতার মুখে যে কুটিল হাসি ফুটিয়াছিল তাহা কেহ দেখিতে পায় নাই।"

হেনার আগমণের এই বৃহত্তর তাৎপর্য কেউ তখন উপলব্ধি করতে না পারলেও তাকে কেন্দ্র করে ঐ বাড়ীর বাসিন্দাদের প্রত্যেকের মনেই কিছু না কিছু প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। তবে হেনার উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে নয়, গোপনে সকলের থেকে বেশী বিচলিত হয়েছিলেন সন্তোষবাবু, নিজেই। হেনার প্রতি তাঁর বাহ্যিক আচরণ ছিল স্নেহমধুর, কিন্তু অন্তর জুড়ে ছিল শুধু বিষাক্ত বিরূপতা। কারণ হেনা তাঁর বন্ধু কন্যা নয়, তাঁর পূর্ব প্রণয়িনী মীনা মাতাহারির কন্যা। সন্তোষবাবু ঢাকার অধিবাসিনী, অলোক সামান্যা সুন্দরী মীনাকে লিখেছিলেন অনেকগুলি চিঠি। মীনা সেই চিঠিগুলি সযত্নে রেখে দিয়েছিল। তার মৃত্যুর পর সেই পত্রগুচ্ছ তার কন্যা হেনার হস্তগত হয়।

হেনার বাইরের রূপ যত সুন্দর, অন্তর ততোধিক কুৎসিত। সে স্থির করে কলকাতায় গিয়ে ঐ সব চিঠিগুলি প্রকাশ করার ভয় দেখিয়ে সন্তোষ বাবুর কাছ থেকে টাকা আদায় করবে। এই কাজে তার একজন সঙ্গীও জুটে যায়, তার নাম ওমর শিরাজি। দুজনে পরামর্শ করে কলকাতায় চলে এল, হেনা সন্তোষ বাবুর সঙ্গে দেখা করে তার উদ্দেশ্য খোলাখুলি জানিয়ে দিল, শুধু তাই নয় সন্তোষবাবুকে বাধ্য করল বাড়িতে আশ্রয় ও প্রতি সপ্তাহে তার চাহিদা অনুযায়ী টাকা দিতে। এই ভাবে মাস ছয়েক কাটল। সন্তোষবাবুর প্রতিবাদের কোনো উপায় ছিল না—নিজেরে কৃতকর্মের জালে তিনি নিজেই বন্দী। হেনা একলা নয় যে তাঁর কোনো ক্ষতি করলে সন্তোষবাবুর অপকীর্তির কলঙ্ক চির-দিনের জন্য মুছে দেওয়া যাবে—ওমর শিরাজিও সব কিছু জানে, তাই সন্তোষবাবু তাদের নির্বিচারে শোষণের কাছে নিরুপায় আত্মসমর্পণ করে অসহায় ভাবে দিনাতিপাত করছিলেন। এমন সময় একদিন সকালবেলা শ্রী সমাদ্দার সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পারলেন একটি পাকিস্তানী বিমান সমুদ্রে ডুবে গেছে, এই দুর্ঘটনায় নিহতদের তালিকায় আছে ওমর শিরাজির নাম। হেনা খবরের কাগজ পড়ে না, এ খবর জানতে পারল না। সন্তোষবাবু মনস্থির করে ফেললেন—কোনো সূত্রে শিরাজির মৃত্যু সংবাদ জানবার আগেই হেনাকে শেষ করতে হবে। সেদিনটা ছিল শনিবার, সাধারণতঃ শনিবার তিনি নিজের বাড়ীতে থাকেন না কীর্তন গায়িকা সুকুমারীর বাড়ীতে কীর্তন গান শুনতে যান। সন্তোষবাবু সুকুমারীর সাহায্যে অকাট্য 'অ্যালিবাই' প্রস্তুত রেখে হেনাকে এমন সুপরিকল্পিত ভাবে খুন করলেন যাতে হেনার মৃত্যু নিছক এক দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছুই মনে হবেনা। কিন্তু তাঁর অজ্ঞাতসারে তাঁরই আশ্রিত যুবক নেংটি সেই নির্মম হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী হয়ে রইল। ঘটনার আকস্মিকতায় উত্তেজিত হয়ে নেংটি-ই ব্যোমকেশকে অপরাধীর নাম উল্লেখ না করে হেনা হত্যার সংবাদ জানিয়ে দিল। মুখে সে ব্যোমকেশের সত্যানুসন্ধান প্রতিভার প্রতি যতই উপেক্ষা দেখাক মনে মনে এই বুদ্ধিমান তরুণটি ছিল ব্যোমকেশ অনুরাগী। সে জানত পুলিসের নয়, ব্যোমকেশের দ্বারাই হেনার মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য উন্মোচিত হতে পারে। নেংটির এই বিচক্ষণতাই সন্তোষবাবুকে বিপদে ফেলেছিল। ব্যোমকেশের তৎপরতায় তাঁর আত্মরক্ষার সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হয়ে গেল। এই প্রসঙ্গে অবশ্য ব্যোমকেশের সাহায্যকারী বুদ্ধিমান বিকাশদত্তের সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য। মীনাকে লেখা সন্তোষবাবুর সেই প্রণয়লিপিগুলি ব্যোমকেশের হাতে অক্ষত অবস্থাতেই পৌঁছে গেছে জেনে সন্তোষবাবু একলক্ষ টাকার বিনিময়ে সেগুলি ফেরত পেতে চেয়েছেন—সত্যনিষ্ঠ ব্যোমকেশ এই ঘৃণ্য প্রস্তাব শুধু প্রত্যাখ্যানই করেনি অবিচল কণ্ঠে তাঁকে জানিয়ে দিয়েছে—

"কাল থেকে একটি বিশিষ্ট দৈনিক সংবাদপত্রে আপনার চিঠিগুলির ফ্যাক্‌সিমিলি একে একে ছাপা হবে। প্রস্তুত থাকবেন।"

প্রকৃতপক্ষে হেনাকে হত্যার অপরাধে সন্তোষ সমাদ্দারকে গ্রেপ্তার করার মতো কোনো বাস্তব প্রমাণ ব্যোমকেশের হাতে ছিলনা। তাই সে অন্যভাবে সন্তোষবাবুকে জব্দ করতে চেয়েছিল। কিন্তু সে সুযোগ পাওয়া গেল না। সমাদ্দার মশাই ব্যোমকেশের কাছে

একদিন সময় প্রার্থনা করে বিকেলে পার্ক সার্কাস ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতা দিতে গেলেন। তারপর ভাষণ অন্তে নিজের আসনে ফিরে গিয়ে বিষাক্ত বড়ি মুখে দিয়ে তিনি মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যুর হিমশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করলেন। সেই সভায় উপস্থিত মানুষজন তাঁর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে পারল না, জানলনা তাঁর আসল স্বরূপ। জীবনের শেষ জনসভাতেও তিনি দেশমাতৃকার সুসন্তান রূপে অসংখ্য শ্রোতার হৃদয়ের আবেগ ও শ্রদ্ধা অর্জন করে গেলেন।

কিন্তু তিনি কি এই সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার যোগ্য ? তাঁর মীনাকে লেখা চিঠিতে কি এমন ছিল যার জন্য 'ব্ল্যাক মেল' করতে গিয়ে হেনাকে মরতে হল আর সন্তোষ বাবুকেও লজ্জা গোপনের জন্য আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হল ? তিনি কি চাননি মীনার প্রতি তাঁর গুপ্ত:প্রেমের কথা সকলে জেনে যাক ? না—সেই চিঠিগুলি নিছক প্রণয় লিপি মাত্র নয়। দেশহিতৈষণার ছদ্মবেশে দেশের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতার দলিল। দেশ বিভাগের সময় দুদেশের মধ্যে দৌত্যকার্য্যের কালে সন্তোষবাবু মীনার রূপের কুহকে এমনই মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি নিজের দলের অতিবড় গুপ্ত কথাগুলিও মীনার কাছে প্রকাশ করে ফেলতে লাগলেন। যখন তিনি কলকাতায় থাকতেন তখন তিনি চিঠি লিখে তাকে গুপ্ত সংবাদ জানাতেন। অথচ তিনি নিঃসংশয়েই জানতেন মীনা বিপক্ষদলের গুপ্তচর। তাঁর এই অবিমৃষ্যকারিতা ভারতবর্ষের স্বার্থের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকারক হয়েছিল অজিতের প্রতি ব্যোমকেশের উক্তিতেই তা ধরা পড়ে—

"অবস্থাটা ভেবে দেখ, রাজনৈতিক কূট যুদ্ধ চলছে, ওদের গুপ্ত অভিপ্রায় আমরা কিছুই জানি না, ওরা আমাদের গুপ্ত অভিপ্রায় সমস্ত জানে। ফল অনিবার্য।"

স্বদেশের প্রতি এই রচম বিশ্বাসঘাতকতার পশ্চাতে হয়তো দেশের অন্য কোন নেতার প্রতি সন্তোষবাবুর ব্যক্তিগত ঈর্ষা ক্রিয়াশীল ছিল, কিন্তু তার থেকেও অনেক প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট কারণ সমাদ্দার মশাইয়ের প্রবৃত্তিগত দুর্বলতা, নারীর প্রতি সুতীব্র আকর্ষণ। ব্যোমকেশের ভাষায় বলা যায়—

"সন্তোষবাবু প্রতিভাবান ছিলেন, কিন্তু চরিত্রবান ছিলেন না, ইংরেজিতে কথা আছে— নাবিকদের বন্দরে বন্দরে বৌ, সন্তোষবাবুরও ছিল তাই। তিনি কাজের সূত্রে মাদ্রাজ বোম্বাই দিল্লী সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন, আমার বিশ্বাস প্রত্যেক শহরেই তাঁর একটি করে প্রেয়সী ছিল। বুড়ো বয়সেও তাঁর ও রোগ সারেনি। কলকাতাতে যেমন তাঁর ছিল সুকুমারী ঢাকায় তেমনি মীনা।"

সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সন্তোষ সমাদ্দারের শোচনীয় জীবন পরিণামের জন্য অনেকাংশেই দায়ী তাঁর প্রথম রিপু। তিনি সত্যিই মগ্ন মৈনাক। পুরাণের গল্পে গিরিরাজসুত মৈনাক পর্বত ইন্দ্র কর্তৃক পক্ষচ্ছেদের ভয়ে সেতুবন্ধ রামেশ্বরের কাছে গভীর সমুদ্রে লুকিয়ে ছিল। পর্বত কুলে সে ফেরারী আসামীর মতই পলাতক। সন্তোষ সমাদ্দারের অবস্থাও প্রায় অনুরূপ। তাঁর অগাধ যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি দেশহিতৈষণার অন্তরালে দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে ছিল তাঁর বিশ্বাসঘাতক দ্বিতীয় সত্তাটি। ব্যোমকেশ সেই লুকানো সত্তাটিকে চিনে ছিল, আর দেশবাসীর কাছে তাঁর প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন

করার মত যথেষ্ট উপাদানও তার হাতে ছিল, কিন্তু সন্তোষবাবু যখন আত্মহননের মাধ্যমে স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিজের হাতেই করে গেলেন তখন সহৃদয় সত্যান্বেষী সেই মৃত ব্যক্তির কলঙ্কিত অতীত চারণায় কোনও আগ্রহ বোধ করেনি। সে স্থির করেছে সন্তোষ বাবুর লেখা চিঠিগুলি পুড়িয়ে ফেলবে। কারণ "ও চিঠির কাজ শেষ হয়েছে। সন্তোষ-বাবু প্রায়শ্চিত্ত করেছেন, তাঁর সুনাম নষ্ট করে কারুর লাভ নেই। মগ্ন মৈনাক মগ্নই থাক।"

এই উপন্যাসে শুধু প্রধান চরিত্রগুলিই নয়, পার্শ্বচরিত্র সমূহও সুচিত্রিত। স্বল্প অবকাশেও লেখক সন্তোষবাবুর দুই যমজ পুত্র যুগল ও উদয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মানসিকতার পার্থক্য, হেনাকে কেন্দ্র করে তাদের সূক্ষ্ম রেষারেষি, চরিত্রহীন স্বামীর প্রতি চামেলিদেবীর বিরূপ মনোভাব, যুগল, উদয়, নেংটি ও চিংড়ির প্রতি তাঁর বাৎসল্য, নেংটির প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, রবিবর্মার ধূর্ততা —এ সব কিছুই শরদিন্দুবাবু সুচারুরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'মগ্নমৈনাক' তাই তাঁর উল্লেখযোগ্য গোয়েন্দা কাহিনীগুলির মধ্যে অন্যতম।

বেণীসংহার [১৩৭৫]ঃ এই কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র বেণীমাধব চক্রবর্তী প্রভূত ঐশ্বর্যের মালিক বটে, কিন্তু তাঁর মনে শান্তি ছিল না। বহুদিন আগেই তাঁর পত্নী বিয়োগ ঘটেছে। দক্ষিণ কলকাতার সদর রাস্তার ওপর এক তিনতলা বাড়ীতে পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র, পৌত্রী, কন্যা, জামাতা ও দৌহিত্রী সহ তাঁর বসবাস। ঐ বাড়ীরই নীচের তলায় থাকে দুই যুবক -সংবাদপত্রের চিত্র গ্রাহক সনৎ গাঙ্গুলী ও কোনও এক সমাচার পত্রের সংবাদ বিভাগের কর্মী নিখিল হালদার--এরা দুজনেই বেণীমাধব বাবুর দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

এ ছাড়া সেখানে আরও দুটি প্রাণীর বাস—বেণীবাবুর ভৃত্য মেঘরাজ ও তার স্ত্রী মোদিনী। অকর্মণ্য পুত্র অজয় ও নিষ্কর্মা জামাতা গঙ্গাধর কারো প্রতিই বেণীমাধব প্রসন্ন ছিলেন না, তাঁর অর্থের ওপর পুত্র জামাতার এই একান্ত নির্ভরশীলতায় তাদের স্বার্থপরতা যেমন আত্মপ্রকাশ করেছিল, তেমনি বেণীমাধব বাবুর মনে এই ধারণার জন্ম হয়েছিল যে প্রয়োজন হলে এরা অর্থের জন্য তাঁকে হয়তো হত্যা পর্যন্ত করতে পারে। এই সংশয়-বশতঃ তিনি নিজের জন্য পৃথক রান্নার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে ভৃত্য মেঘরাজের বউ মোদিনীকে বাড়ীতে আনালেন। তার কিছুদিন পরেই তিনি পরিচিত উকিলের সাহায্যে উইল করলেন, এবং উইল সই হওয়ার আগে পুত্র কন্যাকে সপরিবারে নিজের ঘরে ডাকিয়ে এনে তাঁর মৃত্যুর পর বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থা আগের থেকেই জানিয়ে দিলেন। সেই বিলি-ব্যবস্থা অন্ততঃ তাঁর সন্তানদের খুশী হওয়ার মত নয়, কারণ তাঁর মৃত্যুর পর তারা হাতে কোনো নগদ সম্পত্তি পাবে না, ভরণ-পোষণের জন্য মাসোহারা পাবে, অবশ্য সেই অর্থের পরিমাণ এমন ধার্য করা হয়েছে যাতে তাদের কখনও অভাবে পড়তে হবে না। পৌত্রী লাবণি ও দৌহিত্রী ঝিল্লীর জন্য যথেষ্ট অর্থ সংস্থান থাকলেও দুর্বিনীত পৌত্র মকরন্দকে তিনি কিছুই দিলেন না। কিন্তু এ উইলের বোধ করি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শর্তটি হ'ল--

"উইলের শর্ত থাকবে, যদি আমার অপঘাতে মৃত্যু হয় তাহলে তোমরা কেউ আমার এক পয়সা পাবে না, সব সম্পত্তি পাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।"

সুতরাং বেণীমাধব বাবুর এই বক্তব্যে সন্তানদের প্রতি শুধু অপ্রসন্নতা নয়, অবিশ্বাসও পরিস্ফুট হয়েছে। তবে উইলের ব্যবস্থায় অখুশী হলেও তারা প্রত্যক্ষভাবে কোনও প্রতিবাদ করেনি। কিন্তু সেই রাত্রিটি প্রভাত না হতেই অর্থাৎ উইল সই হওয়ার আগেই যখন বেণীমাধব এবং মেঘরাজ উভয়কে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়, তখন স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় যে অর্থলোভই এই হত্যার প্রকৃত কারণ। আততায়ী যেই হোক না তার উদ্দেশ্য হল বেণীমাধব বাবুর শেষ ইচ্ছা আইনসিদ্ধ হওয়ার আগেই তাঁকে সরিয়ে দেওয়া—এবং মেঘরাজকে না মেরে বেণীবাবুর ঘরে ঢোকা সম্ভব নয় বলেই তাকেও হত্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় মেঘরাজ উপলক্ষ্য মাত্র হত্যাকারীর প্রকৃত লক্ষ্য বেণীবাবু। তদন্তকারী ইন্‌স্পেক্টর্ রাখালবাবু এইভাবেই বেণী সংহারের আনুমানিক পটভূমিকা রচনা করে রহস্য সমাধানে অগ্রসর হচ্ছিলেন। কিন্তু ব্যোমকেশের অনুমান পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই সে শুধু স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ কারণগুলি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি, তার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আরও গভীরে পৌঁছে রহস্য-সমুদ্রের অতলে লুকিয়ে থাকা মহামূল্য সত্যটিকে খুঁজে নিতে চায়। সে প্রথমেই খোঁজে সেই তীক্ষ্ণ অস্ত্রটি যা দিয়ে একটি নয়, দুটি মানুষকে নিঃশব্দে খুন করা হয়েছে। ব্যোমকেশের তৎপর অনুসন্ধানে বেণীবাবুর ঘরেই পাওয়া যায় সেই হাতিয়ার অর্থাৎ তাঁর দৈনন্দিন ব্যবহারের ক্ষুরটি, রাখালবাবুর দৃষ্টি এড়াতে পারলেও অস্ত্রটির অস্বাভাবিকত্ব ব্যোমকেশের নজর এড়ায় না ; যে ক্ষুর দিয়ে মেঘরাজ প্রতিদিন বেণীমাধববাবুর দাড়ি কামিয়ে দিত সেখানে বেণীবাবুর না হলেও মেঘরাজের আঙ্গুলের ছাপ নিশ্চয় প্রত্যাশা করা যায়। অথচ ক্ষুরটি একেবারে পরিষ্কার, এবং নিজের অনুমান সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়ার জন্যই ব্যবহার করতে গিয়ে ব্যোমকেশ দেখে ক্ষুরটি একেবারে ধারহীন। তার সন্দেহ থাকে না এই অস্ত্রেই বেণীসংহার ও মেঘরাজ বধ হয়েছে। ব্যোমকেশের দ্বিতীয় কৃতিত্ব মৃত বেণীমাধব বাবুর বাড়ীর প্রতিটি সদস্যের বর্ষাতি সংগ্রহ, কারণ সে সঠিকভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে ক্ষুর দিয়ে কণ্ঠনালী কেটে দুটি ঘুমন্ত মানুষকে হত্যা করলে নিঃশব্দে কাজ হাসিল হয় বটে, কিন্তু আততায়ীর জামা-কাপড়ে প্রচুর রক্ত লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা, তাই পাশ্চাত্য দেশের হত্যাকারীরা এই পদ্ধতিতে হত্যা করার সময়ে বর্ষাতি পরে নেয়, যাতে রক্ত লাগলেও ধুয়ে ফেলা যায়। বহুদর্শী ব্যোমকেশ তাই বেণীমাধব বাবুর বাড়ীর প্রত্যেক পুরুষ ও মহিলার বর্ষাতি সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করতে পাঠায়। ব্যোমকেশের এই উদ্যম অচিরেই ফলপ্রসূ হয় —সনতের বর্ষাতির পকেট থেকে পাওয়া যায় কয়েক ফোঁটা রক্ত যার সাহায্যে তাকে নিঃসংশয়ে বেণীমাধব বাবুর হত্যাকারী হিসেবে সনাক্ত করা যায়। কিন্তু কেন এই নিষ্ঠুরতা ? আশ্রয়দাতা বৃদ্ধ মাতুলের প্রতি কেন এই কৃতঘ্নতা ? অর্থলোভ-ই কি এর কারণ ? না, এখানে অপরাধীকে অপরাধ সম্পাদনে প্ররোচিত করেছে ধনলিপ্সা নয়, নারীসঙ্গ লালসা। দিল্লী থেকে সংগ্রহ করা মেদিনীর অতীত ইতিহাস, সনতের তোলা মেদিনীর ফটোগ্রাফ প্রভৃতি সূত্রগুলি সম্মিলিতভাবে প্রমাণ করে বেণীসংহার নয়, হত্যাকারীর প্রধান উদ্দেশ্য মেঘরাজ বধ। বেণীবাবুর সেবায় ও প্রহরায় নিযুক্ত মেঘরাজের দিবারাত্র ব্যস্ততার সুযোগে সনতের সঙ্গে মেদিনীর এক অবৈধ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। মেদিনী ছোট

জাতের মেয়ে হলেও তার চেহারায় ছিল এক অদ্ভুত মাদকতা, এক সুতীব্র আকর্ষণী শক্তি যা অনায়াসে প্রবৃত্তি-তাড়িত পুরুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে তুলতে পারত। মেদিনীকে দেখে গায়ত্রীর প্রায় প্রৌঢ় স্বামী গঙ্গাধরের পর্যন্ত চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেছিল আর সনৎ একে বয়সে যুবক তার ওপর সে চরিত্রবান পুরুষ নয়, নারীর প্রতি আসক্তি তার মজ্জাগত, সুতরাং মেদিনীকে দেখে সে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়বে এতে আর বিস্ময়ের কী আছে? তাই মেঘরাজকে হত্যা করে সে মেদিনীর ওপর একাধিপত্য স্থাপন করতে চেয়েছিল। অপরদিকে মেদিনীর চরিত্রও নিষ্কলুষ নয়, মেঘরাজ তার স্বামী নয়, তার স্বামী দিল্লী নিবাসী হিম্মৎলাল। টাকার লোভে সে অনায়াসেই নিজের স্বামীকে ছেড়ে মেঘরাজের বউ সেজে কলকাতায় বেণীমাধবের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু তার উচ্চাশা ছিল অপরিসীম, তাই সনৎকে মোহজালে আবদ্ধ করে সে পথের কাঁটা মেঘরাজকে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। খুন সনৎই করেছিল—প্রথমে মূল লক্ষ্য মেঘরাজকে এবং তারপর পুলিসের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য উপলক্ষ্য স্বরূপ বেণীমাধব বাবুকে—যাতে সকলে মনে করে বেণীবাবুর পুত্র, কন্যা, নাতি যেই হোক তাঁকে অর্থের লোভে খুন করেছে। কিন্তু সনৎকে এই কার্যে আগাগোড়া সাহায্য করেছে মেদিনী। এই নারীটিই সনৎকে বেণীমাধব বাবুর পুত্র ও কন্যার সঙ্গে পারিবারিক অশান্তির আভাস দিয়েছিল। অপরাধ সংঘটিত হওয়ার রাত্রে সনৎকে বাড়ী ঢোকার জন্য দরজা খুলে দেওয়া এবং সে খুন করে চলে যাওয়ার পর দরজা বন্ধ করে দেওয়াও মেদিনীর কাজ। সর্বোপরি বেণীবাবুর ক্ষুর চুরি করে মেদিনীই সনৎকে দিয়েছিল। সুতরাং দুটি মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করার অপরাধে সনৎকেই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করা গেলেও মেদিনীর অপরাধ কম নয়। বেণীসংহার-এর সার কথা হিসাবে ব্যোমকেশ কর্তৃক উদ্ধৃত আলেকজাণ্ডার দুমার উক্তি cherchez la femme : অবশ্যই সুপ্রযুক্ত।

এই কাহিনীর অবিশ্বাস, সংশয় ও মৃত্যুকণ্টকিত পটভূমিতে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো যে স্নিগ্ধ প্রেম রসধারাটি সবার অলক্ষ্যে প্রায় নিঃশব্দে প্রবাহিত হয়েছে তা নিখিলের প্রতি ঝিল্লীর ভালবাসা। এই গোপন অথচ গহন প্রেম মাঝে মাঝে বেনামী চিঠির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে নিখিলকে যুগপৎ বিস্মিত ও পুলকিত করেছিল। সেই অদেখা প্রেয়সীকে সে বিবাহ করার জন্য ব্যাকুল। অথচ তাকে সে এখনো চোখেই দেখেনি শুধু পেয়েছে তার পত্রগুচ্ছ—এ রহস্য তার পক্ষে কম যন্ত্রণাদায়ক নয়। প্রায় মৃত্যু যন্ত্রণারই সমতুল্য। সুতরাং এই সমস্যা সমাধানের ভারও সত্যান্বেষীকেই নিতে হয়েছে। ঝিল্লী অবশ্য অপাত্রে হৃদয় দান করেনি। নিখিলের বাবা সার্কাসের পেশাদার ক্লাউন ছিল, নিখিলের কথাবার্তাতেও একটু লঘুভাব বা রঙ্গ-প্রবণতা ধরা পড়ে বটে, কিন্তু মানুষ হিসাবে সে খাঁটি, সহজ ও সরল। তাছাড়া ঝিল্লীর সঙ্গে তার আত্মীয়তার সম্পর্কটি এতই ক্ষীণ ও দূরবর্তী যে তাতে শুধু প্রণয় নয়, পরিণয়েও বাধা নেই। ব্যোমকেশের মধ্যস্থতাতেই ঝিল্লীর অনিচ্ছুক অভিভাবক এই বিবাহে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। সুতরাং মৃত্যুর তিক্ততা দিয়ে এ কাহিনীর সূচনা হলেও সমাপ্তি 'মধুরেণ'।

॥ ৩ ॥

কতকগুলি ব্যোমকেশ কাহিনী প্রধানতঃ প্রতিহিংসা চরিতার্থতার আলেখ্য। এই প্রতিশোধস্পৃহার কারণ কখনও প্রেম, কখনও বাৎসল্য, কখনও বা বিশ্বাসভঙ্গ। 'আদিম রিপু,' 'অচিন পাখি,' 'হেঁয়ালির ছন্দ' 'বুম নম্বর দুই,' ও 'ছলনার ছন্দ' এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। 'শজারুর কাঁটা' ও 'দুষ্টচক্রে'র প্রসঙ্গও এই ধারায় উল্লেখ করা যায়।

আদিম রিপু [১৩৬১]ঃ 'আদিম রিপু' একটি আকর্ষণীয় রহস্য-উপন্যাস যার প্রেক্ষাপটে রয়েছে স্বাধীনতা-পূর্ব যুগ থেকে স্বাধীন-ভারতের শুভ জন্মমুহূর্ত পর্যন্ত সময়-সীমা। বৃটিশ-শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি পাবার জন্য ভারতবাসীর স্বপ্ন ও সংগ্রামকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষায় তো বটেই অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় কত না কাব্য, নাটক, গল্প প্রবন্ধ রচিত হয়েছে—কিন্তু 'আদিম রিপু'-তে লেখক সে যুগের যে পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন তা স্বদেশপ্রেমের আবেগে আর্দ্র নয়, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে পরিপূর্ণ স্বার্থে-দ্বন্দ্বে সংকীর্ণ।

এ কাহিনীর আরও একটি বৈশিষ্ট্য অজিতের ভাষায় পরিস্ফুট করা যাক্—

"বিস্ময়ের সহিত অনুভব করিলাম, আজিকের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নূতন। ব্যোমকেশ হত্যাকারীকে বন্ধুর মতন ঘরে বসাইয়া হত্যার কাহিনী শুনাইতেছে, এরূপ ঘটনা কখনও ঘটে নাই।"

মোট উনিশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই সুদীর্ঘ কাহিনীতে অনেক ঘটনা, অনেকগুলি চরিত্র ভিড় জমিয়েছে। স্থানগত পটভূমি শুধু কলকাতা নয় মাঝে মাঝে পাটনাও। কাহিনীর সূচনা ও সমাপ্তির মধ্যে প্রায় ন-দশ মাসের ব্যবধান। নিহত অনাদি হালদারের আশ্রিতা ননীবালা, বন্ধু, কেষ্টদাস, সেক্রেটারি নৃপেন, ভাইপো নিমাই ও নিতাই ও তাদের উকিল কামিনীকান্ত যে বৃত্ত রচনা করেছে তার মধ্যস্থলে বিরাজ করেছে অনাদি হালদার ও তার পোষ্যপুত্র প্রভাত।

আদিম রিপুতে মৃত অনাদি হালদারের যে চারিত্রিক পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে, তা বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি উদ্রেক করে না। তার মৃত্যুর পর তার বহু অসৎ-কর্মের একমাত্র সাক্ষী কেষ্টদাসের কাছ থেকে কৌশলে ব্যোমকেশ জানতে পেরেছে অনাদি হালদারের অতীত ইতিহাস শুধু পিতৃহত্যার পাপেই কলুষিত নয়, কেষ্টদাসকে দোসর করে বিহারের লালনিয়ায় এক বৃদ্ধ মারোয়াড়ীকেও সে নির্দ্বিধায় হত্যা করে। অর্থ-লোভ-ই এই হত্যাকাণ্ডের মূল প্রেরণা। যুদ্ধের হিড়িকে অসৎ উপায়ে অনাদিবাবু প্রায় আড়াই তিন লাখ টাকা রোজগার করে, এ ছাড়া তার আরও অর্থ এবং কলকাতা শহরে সম্পত্তিও ছিল। কিন্তু অকৃতদার এই মানুষটির অর্থতৃষ্ণা ছিল আমরণ। প্রৌঢ় বয়সে অবশ্য এই অর্থ পিপাসাই কৃপণতায় রূপান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু অনাদি হালদারের চরিত্রে এই একটি মাত্র ছিদ্রই নয়, আরও এক মারাত্মক ত্রুটি ছিল—তা হল কামাসক্তি। প্রৌঢ় বয়সেও নারী-সংসর্গে তার অনীহা ছিল না, কিন্তু বিবাহ বন্ধনে নিজের স্বাধীন জীবনকে শৃঙ্খলিত করার কোনও স্পৃহা সে অনুভব করেনি। আর নারী লোলুপতার রন্ধ্র পথেই তার জীবনে মৃত্যুরূপ কালসর্প প্রবেশ করেছে। অনাদি

হালদারের শত্রু ছিল অনেক, কিন্তু তার হত্যা ঘটনাচক্রে মুহূর্তের উত্তেজনায় ঘটেনি, হত্যাকারী ঠাণ্ডা মাথায়, পূর্বপরিকল্পনা অনুসারেই তাকে হত্যা করেছে। হত্যার জন্য যে সময় বেছে নিয়েছে তাতেই তার কূটবুদ্ধি সুপ্রমাণিত—দেওয়ালীর উৎসব-ব্যস্ত, শব্দ মুখর রাত তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ রচনা ক'রেছে। তার বন্দুক থেকে নিক্ষিপ্ত গুলির আওয়াজ সে রাতে আতস বাজীর শব্দের সঙ্গে অবলীলাক্রমেই মিলে মিশে গেছে। ঘটনাচক্রে অনাদি হালদারের মৃত্যু-রহস্য সমাধানের ভার পড়েছে ব্যোমকেশের ওপর। এক্ষেত্রে আততায়ীকে খুঁজে বার করা অবশ্যই দুরূহ কর্তব্য, কারণ নিমাই, নিতাই, কেষ্টদাস, ননীবালা, নৃপেন এবং প্রভাত—সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তালিকা থেকে এদের কাউকেই বাদ দেওয়া যায় না। অনাদি হালদারকে খুন করার মতো যোগ্য কারণ ও সুযোগ এদের প্রত্যেকেরই ছিল। অনেক অন্বেষণ ও অনুসন্ধানের পর ব্যোমকেশ তার মনশ্চক্ষে সত্যদর্শন করেছে, এবং অপরাধীকে সে হাতে নাতে ধরেছে। কিন্তু যে ধরা পড়েছে, সেই নিরীহ, শান্ত যুবককে হত্যাকারী ব'লে যেন বিশ্বাসই হতে চায় না—সে প্রভাত—পাটনায় এক হাসপাতালে জন্ম লগ্নেই অনাথ যে শিশুটি অবিবাহিত ধাত্রী ননীবালার স্নেহচ্ছায়ায় প্রতিপালিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে আজ যৌবনে উপনীত। তার পুঁথিগত শিক্ষার তেমন অগ্রগতি হয় না বটে, কিন্তু একটি কর্মে ক্রমশঃ সুদক্ষ হয়ে ওঠে,—সে কাজ বই বাঁধাই, আর এই সূত্রেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পাটনায় আগত অনাদি হালদারের সঙ্গে প্রভাতের পরিচয়, তারপর অনাদিবাবুর ব্যবসা সংক্রান্ত বইপত্র বাঁধাই করার জন্য তাঁর বাড়ীতে প্রভাতের আনাগোনা। শান্ত ভদ্র প্রভাতকে ভালোলাগার ফলে অনাদি হালদার এই যুবকটিকে মৌখিকভাবে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করে প্রভাত ও ননীবালা সহ কলকাতায় ফিরে আসে কিন্তু প্রভাতের প্রতি অর্থগৃধ্নু অনাদি হালদারের এই স্নেহ স্বার্থশূন্য নয়, এর পশ্চাতে ছিল এক নিগূঢ় উদ্দেশ্য। পাটনায় প্রভাতকে দিয়ে সে বই বাঁধানোর অজুহাতে যা বাঁধিয়ে নিয়েছিল তা বইয়ের পৃষ্ঠা নয়, যুদ্ধের সময়ে অসৎ উপায়ে অর্জিত প্রায় আড়াই তিন লাখ টাকার নোট। আর এই তথ্য যাতে কোনদিনও প্রকাশ না পায় সেই জন্যই সে প্রভাতকে কাছে রাখতে চেয়েছিল এবং কলেজ স্ট্রীটে একটি বইয়ের দোকানও করে দিয়েছিল। কিন্তু প্রভাতকে আইনানুগ পদ্ধতিতে পোষ্যপুত্র করে নেওয়ার ব্যাপারে অনাদিবাবুর আর তেমন উৎসাহ ছিল না। এই প্রতারণাই কি তবে প্রভাতের পক্ষ থেকে হালদার মশায়কে খুন করার মূল কারণ? অথবা আপাত শান্ত নির্লিপ্ত প্রভাতের মনেও কি ছিল অর্থলোভ? সেই কারণেই কি সে তার আশ্রয়দাতাকে খুন করেছে? এই রকম সংশয়ের কারণও আছে—অনাদি হালদারের স্টীলের আলমারি থেকে সেই টাকা বাঁধানো বইয়ের মধ্যে কয়েকটা বই প্রভাত চুরি করেছিল, ব্যোমকেশ তাই তাকে স্পষ্ট ভাবেই জিজ্ঞাসা করেছে—

"প্রভাতবাবু এই গুলোর জন্যই কি আপনি অনাদি হালদারকে খুন করেছিলেন?"

"প্রভাত দৃঢ় ভাবে মাথা নাড়িল, না ব্যোমকেশ বাবু"

—প্রভাতের খুনের মোটিভ ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রভাতের মনোনীতা পাত্রীকে দেখতে গিয়ে বিবেকহীন অনাদি হালদার প্রভাতের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দিয়ে মেয়ের বাবা

দয়াল হরি মজুমদারকে পাঁচ হাজার টাকায় বশীভূত করে নিজে শিউলিকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। প্রভাত শিউলিকে যথার্থই ভালবেসেছিল, তাই অনাদি হালদারের এত বড় অন্যায়কে সে মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু যত বড় প্রতারণাই হোক না কেন মানুষ খুন করার ইচ্ছা সহজে কার্যকরী করা যায় না। সাধারণ লোক তো কত ক্ষেত্রেই প্রণয়ে ব্যর্থতা বা বিশ্বাসঘাতকতার সম্মুখীন হয়, কিন্তু নর হত্যার পাপে নিজের জীবন কলংকিত করে কজন? আসলে প্রভাত জানত না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সত্য অনুদ্ঘাটিত থাকে না যে 'আগুনের ফুলকি তার রক্তের মধ্যেই ছিল' আবার একটা বরফের মত শীতল কূটবুদ্ধিও সে উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছে। তাই প্রভাত মুখ বুজে বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য-করল না। অনাদি হালদারকে ধনে প্রাণে মারবার 'প্ল্যান' ঠিক করল। কাহিনীর সর্বপ্রধান চমক প্রভাতের পিতৃপরিচয় উন্মোচনে। ব্যোমকেশের মুখে প্রভাত জানতে পারে নির্বিবেক, নিষ্ঠুর অনাদি হালদারই তার জন্মদাতা—সেই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, নির্মম সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রভাতের প্রতিক্রিয়া মর্মস্পর্শী—

> 'প্রভাত টলিতে টলিতে গিয়া আরাম কেদারায় শুইয়া পড়িল, অনেকক্ষণ দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া রহিল'

—প্রভাত তার পিতৃপরিচয় জানত না বলেই সে পিতৃহন্তা, কিন্তু অনাদি হালদার নির্ভুল ভাবে জানত প্রভাত তারই পুত্র, সব জেনেশুনেও সে যখন টাকার জোরে পুত্রের বাঞ্ছিতা পাত্রীটিকে নিজে বিবাহ করার প্রয়াস চালায় তখন আরও একবার প্রমাণিত হয় অনাদি-হালদার মানুষ হিসাবে কতখানি নিম্নস্তরের।

'আদিম রিপু' নামকরণের ইঙ্গিত পাওয়া যায় পিতা-পুত্রের সম্পর্ক সম্বন্ধে ব্যোমকেশের একটি উক্তিতে—"জীব জগতে বাপ আর ছেলের সম্পর্ক হচ্ছে আদিম শত্রুতার সম্পর্ক।" অনাদি আর প্রভাতের পারস্পরিক সম্পর্ক ও জীবন পরিণাম নিঃসন্দেহেই এই মন্তব্যের সপক্ষে একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

তবে 'আদিম রিপুতে' ব্যোমকেশ ভক্তদের সব থেকে বড় প্রাপ্তি বোধ করি ব্যোমকেশের এক নতুন পরিচয়। সহৃদয়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের কত পরিচয়ই না শরদিন্দু সৃষ্টি-সম্ভারে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু 'আদিমরিপুর' শেষ পরিচ্ছেদে নির্লোভ, আদর্শবাদী ব্যোমকেশের যে পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে তা সত্যিই বিস্ময়কর।

এখানে দেখা যায় সে অনাদি হালদারের অসৎ উপায়ে অর্জিত প্রায় দু লাখ টাকা অবলীলাক্রমে অবিচল চিত্তে পুড়িয়ে ফেলেছে। স্বাধীনতার পুণ্যক্ষণে দেশমাতৃকার চরণে তার এই শ্রদ্ধা নিবেদন যে কী গভীর মনোবলের পরিচায়ক সেই সত্য অজিতের স্বীকারোক্তিতেই সুপরিস্ফুট—

> "আমি আর বসিয়া দেখিতে পারিলাম না উঠিয়া গিয়া জানালার সম্মুখে দাঁড়াইলাম। ব্যোমকেশ আমার বন্ধু, তাহাকে আমি ভালবাসি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আজ তাহার চরিত্রের একটি নূতন দিক দেখিতে পাইলাম। সে যাহা করিল আমি তাহা পারিতাম না, নিজের হাতে দুই লক্ষ টাকা পুড়াইয়া ফেলিতে পারিতাম না।"

অচিন পাখি [১৩৬৭]ঃ এই গল্পের সূচনায় ব্যোমকেশকে দেখা যায় সত্যান্বেষণ

কার্যে ব্যস্ত বুদ্ধিজীবী রূপে নয়, পুলিশ অফিসার বীরেনবাবুর কন্যার বিবাহ উপলক্ষে আমন্ত্রিত অতিথিরূপে। সেখানে এককালের নামজাদা পুলিশ অফিসার বৃদ্ধ নীলমণি মজুমদারের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। ব্যোমকেশের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে তিনি তাঁর জীবনের এক অমীমাংসিত, রহস্যময় অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনিয়েছিলেন—নীলমণি বাবুর কাহিনী শুনেই কিন্তু ব্যোমকেশ তাঁর সেই 'অচিন পাখি' কে অনায়াসেই চিনে নিতে পেরেছিল।

ঘটনাটি ঘটেছিল কলকাতার বাইরে সেই মফঃস্বল শহরেই, যেখানে আজ ব্যোমকেশ ও অজিতের নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে আগমন। এখানেই বাস করত সুরেশ্বর আর তার স্ত্রী হাসি। হাসি খোলামেলা স্বভাবের মিশুকে মেয়ে কিন্তু তার পারিবারিক পটভূমি নিষ্কলঙ্ক নয়। সুরেশ্বর যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে হাসিকে বিবাহ করে তখন সে চালচুলোহীন এক দরিদ্র মানুষ। তারপর যুদ্ধের বাজারে অপরিমিত অর্থোপার্জনের ফলে সে শুধু বড়লোকই হয় না মান-সম্মানে সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হওয়ার উচ্চাশা তার মনে জাগতে থাকে, অথচ হাসির মত পারিবারিক দুর্নামযুক্ত একটি মেয়ে যার স্ত্রী তার পক্ষে অমিত ঐশ্বর্য সত্ত্বেও সামাজিক মর্যাদা লাভের পথ সুগম নয়। তাছাড়া সুরেশ্বর হাসির আলমারিতে এমন কিছু গয়না দেখেছিল যা তার দেওয়া নয়, ফলে তার মনে হাসির চারিত্রিক শুচিতা সম্বন্ধেও সন্দেহ জাগতে শুরু করেছিল, সর্বোপরি হাসি ছিল বন্ধ্যা সুতরাং তাদের দুজনের মাঝে কোনও স্নেহের বন্ধনও ছিল না—এ সব কিছুরই সমবেত যোগফল সুরেশ্বর কর্তৃক হাসি-হত্যা। যে পদ্ধতিতে সুরেশ্বর হাসিকে হত্যা করেছিল তা অসাধারণ অথচ অনায়াসসাধ্য। এই পদ্ধতিতে কোনও অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না, কৌশলে প্রতিপক্ষের ডান পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে তারপর হঠাৎ তার দিকে ঘুরে ডান হাতের পোঁচা দিয়ে সজোরে মারলেই তার গলায় তরুণাস্থি (Thyroid cartilage) ভেঙে গিয়ে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু অনিবার্য, অথচ বাইরে থেকে নিহত ব্যক্তির গায়ে কোনও আঘাতের চিহ্ন দেখা যায় না। তার ওপর এই ধূর্ত ব্যক্তিটি আইনের চোখে ফাঁকি দেওয়ার জন্য বন্ধুদের সাহায্যে এমন অকাট্য প্রমাণ প্রস্তুত করেছিল, যে তাকে দোষী জেনেও প্রত্যক্ষ প্রমাণাভাবে নীলমণিবাবু কিছুতেই তাকে গ্রেপ্তার করতে পারলেন না। পরদিন তিনি সুরেশ্বরকে বুদ্ধির ফাঁদে ফেলে অপরাধ স্বীকারে বাধ্য করার পরিকল্পনা নিয়ে তার গৃহে উপস্থিত হয়ে দেখলেন সুরেশ্বর তখন বহুদূরের যাত্রী। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন হাসিকে সুরেশ্বর যে পদ্ধতিতে হত্যা করেছিল, সেই একই পদ্ধতিতে অজ্ঞাত আততায়ী সুরেশ্বরকে খুন করেছে। কিন্তু সেই হত্যাকারীকে নীলমণিবাবু খুঁজে বার করতে পারেননি। তাঁর সুদীর্ঘ, গৌরবোজ্জ্বল কর্মজীবনে এই একটিই ব্যর্থতার কাহিনী, অতঃপর ব্যোমকেশের প্রতি তাঁর প্রশ্ন—"আপনি বলতে পারেন কে আসামী?" ব্যোমকেশ তাঁকে দু-একটি প্রশ্ন করার পর তাঁর বক্র কটাক্ষের উত্তরে দ্বিধাহীন কণ্ঠে জানিয়েছে "সবই বুঝেছি নীলমণিবাবু" ব্যোমকেশের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত হাসিকে খুন করেছিল সুরেশ্বর কিন্তু সুরেশ্বরকে খুন করেছে হাসির পিতা। ব্যোমকেশ তার নাম উল্লেখ করেনি, কিন্তু কোনদিকে দৃকপাত না করে নীলমণিবাবুর হঠাৎ আসর ছেড়ে উঠে চলে যাওয়াই পাঠককে জানিয়ে দেয় এই কাহিনীর অচিন পাখিটি তিনি নিজেই।

কন্যার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই নীলমণিবাবু সুরেশ্বরকে হত্যা করেছিলেন। কারণ হাসি তাঁরই অবৈধ সন্তান, যে পরিচয় কোনওদিনই সমাজে প্রকাশ পায়নি। মেয়ের কাছেও তিনি প্রকৃত পরিচয় দিতে পেরেছিলেন কিনা জানা যায় না কিন্তু প্রায়ই তিনি রাত্রে গোপনে হাসির সঙ্গে দেখা করতেন, তাকে ছোটখাটো গহনাও উপহার দিয়েছিলেন। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে নিজের অজান্তেই তিনি তাঁর এই পরম স্নেহের পাত্রীটির জীবনে অমঙ্গল ডেকে এনেছিলেন। কারণ তাঁর দেওয়া গহনাগুলি দেখেই সুরেশ্বর ভেবেছিল এই অলংকার বুঝি দুশ্চরিত্রা হাসির প্রতি কোনও প্রণয়াসক্ত পুরুষের উপহার। যাইহোক সুরেশ্বর যে হাসির হত্যাকারী, একথা নিশ্চিতভাবে জেনেও প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে না পেরে নীলমণিবাবু তীব্র প্রতিশোধস্পৃহায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে তাকে স্বহস্তে হত্যা করলেন। হাসিকে সমাজের সকলের সামনে আত্মজা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে না পারলেও আজীবন তিনি তাকে নিজ হৃদয়ের স্নেহের সিংহাসনে স্থান দিয়েছিলেন কারণ এ পৃথিবীতে হাসিই ছিল তাঁর একমাত্র রক্তের বন্ধন। সুতরাং তিনি সুরেশ্বরের অপরাধকে ক্ষমা করতে পারেননি। অথচ তাঁর এই অপরাধ তাঁরই কাহিনীকথনসূত্রে ব্যোমকেশ জানতে পেরেছে তা না হ'লে কোনদিন কারো পক্ষেই তা আবিষ্কার করা সম্ভব হত না।

গল্প হিসাবে 'অচিন পাখি' অসাধারণ শিল্প-কৌশল সমৃদ্ধ। এ কাহিনীর একটি মাত্র ছিদ্রপথে ব্যোমকেশ প্রকৃত সত্যের আলোকরেখার সন্ধান পেয়েছে, সেটি হল ব্যোমকেশের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মুহূর্তের অসতর্কতায় নীলমণিবাবুর মুখে উচ্চারিত হাসির মায়ের নাম। বীরেনবাবুর মুখে ব্যোমকেশের প্রশস্তি শুনে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনায় অত্যধিক আস্থাশীল নীলমণিবাবু এ কাহিনীর মাধ্যমে যেন ব্যোমকেশের বুদ্ধি ও অনুমান শক্তিকে পরোক্ষভাবে 'চ্যালেঞ্জ' জানিয়েছেন—তারপর ব্যোমকেশ অপ্রত্যাশিতভাবেই তাঁকে যোগ্য প্রত্যুত্তর দিলে পরাজিত সৈনিকের মতো দ্রুত স্থানত্যাগ, তাঁর প্রতি আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে।

হেঁয়ালির ছন্দ [১৩৭০] **:** 'হেঁয়ালির ছন্দ'ও প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থতার গল্প। এই গল্পেও বাৎসল্যবশতঃ প্রতিহিংসার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে মৃতের নাম নটবর নস্কর। তার বাইরের পেশা দালালী, কিন্তু আসল জীবিকা ছিল অন্যের গুপ্ত কথা বা দুর্বলতার খবর সংগ্রহ করে সেই তথ্য ফাঁস করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে অর্থোপার্জন অর্থাৎ সোজা কথায় 'ব্ল্যাকমেলিং'। কিন্তু ভূপেশবাবুর যে ক্ষতি সে করেছিল তা অপূরণীয়। ভূপেশবাবু এক সময়ে ঢাকার বাসিন্দা ছিলেন। স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে তাঁর জীবন সুখে-শান্তিতে অতিবাহিত হচ্ছিল। কিন্তু নটবর নস্করের নির্মম লোভ তাঁর সেই সুখের সংসার তছনছ করে দিল। ঢাকায় যেদিন দাঙ্গা বাধে সেদিন নটবর ভূপেশবাবুর ছেলেকে তার স্কুল থেকে অপহরণ করল। তারপর সন্ধ্যেবেলা তাঁর বাড়িতে এসে জানাল দশ হাজার টাকা পেলে তবে সে ছেলে ফেরত দেবে। নগদ দশ হাজার টাকা তখন ভূপেশবাবুর কাছে ছিল না কিন্তু সঞ্চিত সমস্ত অর্থ, স্ত্রীর গহনাপত্র যা ছিল নিঃশেষে নটবরের হাতে তুলে দিয়ে একমাত্র সন্তানকে ফিরে পেতে চাইলেন—পাষণ্ড নটবর সব অর্থ সম্পদ নিয়ে চলে গেল

কিন্তু ভূপেশবাবু তাঁর ছেলেকে আর ফিরে পেলেন না। নটবরের দেখাও আর পাওয়া গেল না। তাঁর স্ত্রী পুত্রশোকে প্রাণ ত্যাগ করলেন। নিঃসঙ্গ ভূপেশবাবু কিছুদিনের মধ্যেই ঢাকা ছেড়ে কলকাতায় চলে এসে এক মেসবাড়ীতে ঘর নিয়ে বাস করতে লাগলেন, তাঁর এই দুঃখময় অতীত ইতিহাস যারা জানে না তাদের চোখে ভূপেশবাবু "একটু শৌখিন গোছের লোক। সিল্কের পাঞ্জাবীর উপর গরম জবাহর কুর্তা মাথার চুল পাকার চেয়ে কাঁচাই বেশি, ফিটফাট চেহারা"—মেসের সেরা ঘরটিতে তাঁর বাস। ঘরটি শুধু সুপরিসর নয়, সেই ঘরের ছোটখাট আসবাবগুলি ও তাদের যথাযথ বিন্যাস সমস্তই সুরুচির পরিচায়ক। ভূপেশবাবুর রুচি একটু বিলাত ঘেঁষা। তাঁর বিশেষ নেশা তাস। 'ব্রিজ' তাঁর প্রিয় খেলা। কিন্তু এসব কোনকিছুই তাঁর পুত্রশোক ভুলিয়ে দিতে পারেনি। তাঁর সেই ন-দশ বছরের হারানো, সম্ভবতঃ মৃত কিশোর পুত্রের লাবণ্যভরা মুখচ্ছবি শুধু ফটোর কাগজে নয়, তাঁর মনের মধ্যেও অগ্নিরেখায় আঁকা হয়ে গিয়েছিল—তাই একদিন কলকাতার রাস্তায় নটবরকে দেখতে পেয়ে মনের মধ্যে প্রতিহিংসার লেলিহান শিখা জ্বলে উঠেছে। তিনি সংকল্প করেছেন পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নিতেই হবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। শব্দ গোপন করার জন্য গায়ের শালের ভেতর থেকে গুলি ছুঁড়ে হত্যার কৌশল এবং আত্মরক্ষার জন্য বিশ্বাসযোগ্য 'অ্যালিবাই' তৈরী করে রাখার সতর্কতাই প্রমাণ করে ভূপেশবাবু কত বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তাই পুলিসের নিষ্ক্রিয়তা এবং নটবরের মত একজন অতি সাধারণ ব্যক্তির মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে তাদের নিস্পৃহতার ফলে কখনও হত্যাকারীকে খুঁজে বার করা সম্ভব হত না, কিন্তু ব্যোমকেশের চোখে ধুলো দেওয়া সম্ভব নয়। যদিও ঘটনাটি ঘটার সময়ে সে কলকাতাতেই ছিল না, কিন্তু অজিতের কাছ থেকে সব বিবরণ জেনে এ বিষয়ে সামান্য অনুসন্ধান করেই সে প্রকৃত সত্য আবিষ্কার করে ফেলেছিল। ভূপেশবাবু জানতেন পুলিসের নজর এড়াতে পারলেও ব্যোমকেশকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না। তাই ব্যোমকেশ কর্তৃক সত্য আবিষ্কৃত হওয়ার পর তিনি নিজমুখে অপরাধ স্বীকার করে জানতে চেয়েছেন—'এখন আমার সম্বন্ধে আপনি কি করতে চান?' এর উত্তরে ব্যোমকেশের উক্তি—'সাহিত্য সম্রাট শরৎচন্দ্র কোথায় যেন একবার বলেছিলেন, 'দাঁড়কাক মারলে ফাঁসি হয় না।' আমার বিশ্বাস শকুনি মারলেও ফাঁসি হওয়া উচিত নয়। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

রুম নম্বর দুই [১৩৭১]ঃ 'হেঁয়ালির ছন্দে' ভূপেশবাবুর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করলেও সকল ক্ষেত্রেই ব্যোমকেশ বাৎসল্যজনিত প্রতিবিধিৎসাকে ক্ষমা করতে পারেনি। তার প্রমাণ 'রুম নম্বর দুই' গল্পটি। এই গল্পে আততায়ী পুরুষ নন, নারী। হত্যাকারিণী শ্রীমতী শোভনা রায় পেশায় মহিলা চিকিৎসক। তিনি বহরমপুরের বাসিন্দা কিন্তু চিকিৎসাসূত্রে কলকাতায় যাতায়াত আছে। তাঁর প্রতিহিংসার পাত্র সুকান্ত সোম তাঁরই জামাতা—যে তাঁর একমাত্র কন্যাকে নির্মমভাবে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করেছিল। ঘটনাচক্রে বহুদিন বাদে শোভনা দেবী তার সাক্ষাৎ পেলেন কলকাতার রাসবিহারী এ্যাভেন্যু ও গড়িয়াহাটের সংযোগস্থলে অবস্থিত নিরুপমা হোটেলে। অবশ্য স্বনামে নয়, রাজকুমার বসু এই ছদ্মনামে সুকান্ত সেই হোটেলের দু নম্বর ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল।

নিয়তির পরিহাসে তার ঠিক পাশের ঘরেই অর্থাৎ তিন নম্বর ঘরে উঠেছিলেন শোভনা রায়। সুকান্ত শোভনা দেবীকে দেখতে পায়নি। কিন্তু শোভনা দেবী দীর্ঘ দশবছর পরে তাকে দেখে শুধু চিনতেই পারেন নি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে কন্যার মৃত্যুর শোক আবার তীব্রভাবে জেগে উঠেছিল, তিনি মনস্থির করে ফেললেন সুকান্তকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিতেই হবে। যে অস্ত্রে সুকান্ত সোমকে হত্যা করা হয়েছিল তা চিকিৎসকেরই উপযুক্ত —লম্বা, লিকলিকে একটি সার্জিক্যাল কাঁচি। কিন্তু যে মেয়ের শোকানলে দগ্ধ শোভনাদেবী জামাইকে নিজের হাতে খুন করলেন তার অপরাধও কম নয়। মেয়েটি ছিল আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর। তাই বিধবা মাকে ছেড়ে সুকান্তের সঙ্গে চলে যেতে সে যেমন একটুও দ্বিধা করেনি, তেমনি আবার নিজের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হলো না দেখে স্বামীর দেহের নানাস্থানে ও মুখে নির্মম অস্ত্রাঘাত করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। প্রকৃত-পক্ষে তার চারিত্রিক উগ্রতাই সুকান্তর জীবন, তার সামাজিক প্রতিষ্ঠা—সব কিছু বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। সুকান্তের সুন্দর মুখশ্রী স্ত্রীর ছুরির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে কদাকার রূপ ধারণ করেছিল, প্রাণে সে বেঁচে গেল বটে কিন্তু তার নায়ক-জীবনের সেখানেই পরিসমাপ্তি, ফলে বেঁচে থাকার জন্য 'ব্ল্যাকমেলিং'-এর মতো জঘন্য পন্থা তাকে অবলম্বন করতে হল। সুতরাং কৃতকর্মের জন্য সুকান্ত যথেষ্ট শাস্তি জীবদ্দশাতেই ভোগ করেছিল—তাই তার প্রতি শোভনাদেবীর নিষ্ঠুর আচরণকে ব্যোমকেশ সমর্থন করতে পারেনি।

ছলনার ছন্দ [১৩৭২] : 'ছলনার ছন্দে'ও আততায়ীর তীব্র প্রতিহিংসা অপরাধের মূল কারণ। কিন্তু কাহিনী পরিকল্পনায় কিছুটা অভিনবত্ব আছে—নরেশ মণ্ডল ও গঙ্গাপদ চৌধুরীর পারস্পরিক শত্রুতার পরিণামে প্রাণসংশয় ঘটেছে অশোক মাইতি নামে সম্পূর্ণ নির্দোষ এক তৃতীয় ব্যক্তির।

নরেশ ও গঙ্গাপদর কর্মক্ষেত্র এক হলেও, দুজনের মধ্যে তিলমাত্র সদ্ভাব ছিল না। বদরাগী নরেশ একদিন গঙ্গাপদর সামনেই হঠাৎ এক ভিখারীকে চড় মেরে হত্যা করে বসে। মূলতঃ গঙ্গাপদর সাক্ষ্যেই নরেশের চার পাঁচ বছরের জন্য কারবাস ঘটে। নরেশের অনুপস্থিতির সুযোগে চাকুরীস্থলে গঙ্গাপদ পদোন্নতিও লাভ করে। দিন তার ভালোই কাটছিল—কিন্তু শাস্তির মেয়াদ শেষ হয়ে নরেশের মুক্তিপ্রাপ্তি গঙ্গাপদর জীবনে নতুন সংকটের সৃষ্টি করল। গঙ্গাপদ জানে নরেশ কী প্রচণ্ড রাগী—শত্রুকে সে নির্বিঘ্নে বাঁচতে দেবে না, প্রতিশোধ নেবেই। এমতাবস্থায় গঙ্গাপদ যখন আত্মরক্ষার উপায় অন্বেষণে ব্যাকুল তখন হাওড়া স্টেশনে মীরাট থেকে সদ্য আগত অশোক মাইতিকে দেখে সে যেন অকূলে কূল পেয়েছে। নিজের চেহারার সঙ্গে অশোকের আকৃতির গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করে ধূর্ত গঙ্গাপদ মুহূর্তেই মনস্থির করে ফেলেছে। বাসস্থানের সমস্যায় চিন্তাগ্রস্ত অশোককে সে সাদরে নিজের ভাড়া বাড়ীতে ডেকে এনেছে এবং সেখানে তাকে ইচ্ছামত বসবাসের উদার অনুমতি দিয়ে, নিজে কারখানা থেকে ছুটি নিয়ে আত্মগোপন করেছে। সে চেয়েছে নরেশ মণ্ডল অশোককে গঙ্গাপদ ভেবে তার নির্মম প্রতিহিংসা চরিতার্থ করুক। গঙ্গাপদর পরিকল্পনায় ত্রুটি ছিল না কিন্তু বিধি বাম—তাই নরেশ মণ্ডলের পিস্তল

থেকে ছুটে আসা গুলি অশোকের মাথার খুলি স্পর্শ করলেও শেষ পর্যন্ত সে বেঁচে উঠেছে এবং সত্যানুসন্ধানী ব্যোমকেশ ও দারোগা রাখাল সরকারকে গঙ্গাপদ সম্পর্কে তার জ্ঞাত সকল তথ্যই জানাতে পেরেছে। এক্ষেত্রে নরেশ প্রত্যক্ষভাবে অপরাধী হলেও ব্যোমকেশ গঙ্গাপদকেও গ্রেপ্তারের পরামর্শ দিয়ে বিচক্ষণতার প্রমাণ রেখেছে—কারণ নরেশ অশোককে তার প্রতিপক্ষ গঙ্গাপদ ভেবে খুন করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু ধূর্ত, স্বার্থপর গঙ্গাপদ নিজের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে নিরপরাধ অশোককে সচেতন ভাবেই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিয়েছে। আইনানুসারে তার অপরাধ প্রমাণ সাপেক্ষ, কিন্তু মানবতার মানদণ্ডে এই অপচেষ্টা ক্ষমার যোগ্য নয়।

অপরাধীযুগলকে ফাঁদে ফেলার বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলে ব্যোমকেশের অভিজ্ঞতা ও চাতুর্য সুপ্রমাণিত। দারোগা রাখাল সরকারের সহকারীর ভূমিকায় তার অভিনয় পটুতাও প্রশংসনীয়। তবুও গল্প হিসেবে 'ছলনার ছন্দ' কিছুটা দুর্বল। কোনও রকম রক্তের সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও গঙ্গাপদ ও অশোকের আকৃতিতে যমজ ভাই সুলভ অবিকল সাদৃশ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়, হাওড়া স্টেশনে তাদের যোগাযোগটাও যেন নিতান্তই কাকতালীয়।

আলোচ্য কাহিনীতে আমরা ব্যোমকেশের নিজস্ব নতুন বাড়ীতে বসবাসের সুসংবাদ পাই। জানা যায় সত্যবতী নাকি সেই বাড়ী নিয়ে পুতুল খেলার মতই মেতে আছে। কিন্তু ব্যোমকেশের অভিন্ন হৃদয় সুহৃদ অজিত এ গল্পে আগাগোড়াই অনুপস্থিত, এমন কি তার নামের উল্লেখটুকুও এখানে নেই। তাই 'ছলনার ছন্দ'র ছলনা দূর হওয়ার পরেও পাঠকমনে এক অনপনেয় অভাববোধ থেকেই যায়।

শজারুর কাঁটা [১৩৭৩] শরদিন্দু বাবুর 'শজারুর কাঁটা' পড়বার সময়ে আগাথা ক্রিস্টি'র লেখা 'A. B. C. of murder'—এর কথা মনে পড়ে যায়। উভয় কাহিনীর মধ্যে সাদৃশ্য অবশ্য একটিই তাহ'ল অব্যবস্থচিত্ত আততায়ী কর্তৃক মূল লক্ষ্যে পৌঁছবার আগে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য একাধিক নরহত্যা। 'আগাথা ক্রিস্টি'র উক্ত কাহিনীর নায়ক যেমন প্রকৃত প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করার আগে প্রথমে ফোন-গাইড দেখে A. B. ও C আদ্যক্ষরের নাম ও পদবীধারী তিনজন ব্যক্তিকে একের পর এক হত্যা করেছে, তেমনি শজারুর কাঁটা'য় আততায়ী প্রবাল গুপ্তর মূল লক্ষ্য তার প্রণয়িনী দীপার স্বামী দেবাশিস হলেও তার আগে সে হত্যা করেছে যথাক্রমে এক ভিখারীকে, এক মজুরকে, এবং একজন দোকানদারকে। তার এই নৃশংস ক্রিয়াকলাপ দক্ষিণ কলকাতার জন-জীবনকে আতঙ্ক শিহরিত করে তুলেছে কিন্তু কেউ তাকে ধরতে পারেনি। তবে এটা বোঝা গিয়েছিল যে খুন যে-ই করুক সেই খুনী মানসিক দিক দিয়ে খুব সুস্থ ব্যক্তি নয়। যাইহোক তার এলোপাথারি নরহত্যায় জনজীবনে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল তা যখন প্রায় শান্ত হয়ে এসেছে এমন সময় প্রবাল তার মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করেছে আসল লক্ষ্যে—তার প্রকৃত নিশানা দেবাশিস।

শজারুর কাঁটা'য় হত্যার হাতিয়ারটিও অসাধারণ। কণ্টকাকীর্ণ দেহের জন্য শজারু জীবজগতে বিখ্যাত, কিন্তু তার সুতীক্ষ্ণ ও সবল কাঁটা মারণাস্ত্র হিসাবে যে কতদূর সফল তার প্রমাণ আলোচ্য উপন্যাসে পাওয়া যায়।

অবশ্য রহস্য কাহিনী হলেও 'শজারুর কাঁটা'র স্বাদ অন্যত্র। অপরাধ এখানে আলম্বন নয়, উদ্দীপন বিভাব। তাই এক্ষেত্রে রোমান্সের আমেজ কাহিনীর সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়।

আলোচ্য উপন্যাসটি প্রকৃত পক্ষে দেবাশিস্ আর দীপার জীবন কথা। দীপা কলকাতার এক বনেদী রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে, এ যুগেও যেখানে স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রায় নিষিদ্ধ। কিন্তু এত বাধা নিষেধ সত্ত্বেও সদ্য তরুণী দীপা যার প্রতি প্রণয়াসক্তা হয়েছিল তার সঙ্গে বিবাহে ছিল দুর্লঙ্ঘ বাধা, কারণ তার প্রেমিকের জাত ছিল আলাদা। সুতরাং তাদের পরিবারের পক্ষে এ বিবাহ অকল্পনীয়। উপরন্তু তার প্রণয়ের কথা জেনে তার অভিভাবকেরা বংশের মান-মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তাকে যতশীঘ্র সম্ভব পাত্রস্থ করার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠলেন। দীপার প্রবল আপত্তি ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও একদিন তার গুরুজনদের বিচারে অতি সুপাত্র দেবাশিসের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল। দেবাশিস শুধু পাত্র হিসাবেই সুপাত্র নয়, মানুষ হিসাবেও সৎ, শান্ত, ভদ্র। তার বাড়িটি সুন্দর কিন্তু প্রায় শূন্য কারণ একমাত্র ভৃত্য নকুল ছাড়া দেবাশিসের সংসারে আর কেউ নেই। তাই সেই শূন্যতার মাঝখানটিতে রূপ লাবণ্যে পরিপূর্ণ নবযৌবনা দীপা যখন বধূ হয়ে এল, তখন সুখ স্বপ্নে দেবাশিসের মন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু তার সে স্বপ্ন চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে বিলম্ব হল না। ফুলশয্যার রাত্রেই দীপা তাকে এই নির্মম সত্যটি জানিয়ে দিল যে অভিভাবকদের প্রভাব এড়াতে না পেরে সে দেবাশিসকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে বটে কিন্তু তাকে কোনদিনও সে ভালবাসতে পারবে না, কারণ মন তার অন্যত্র বাঁধা। উদারচেতা দেবাশিস বিবাহ বিচ্ছেদের মাধ্যমে অন্যের বাগ্‌দত্তা দীপাকে মুক্তিদানের প্রস্তাব করে কিন্তু দীপা জানে তার দৃঢ়চেতা, প্রাচীনপন্থী পিতামহ এ খবর পেলে আর বাঁচবেন না। তাই ডিভোর্স সে চায় না। দেবাশিসের দ্বিতীয় প্রস্তাব অনুযায়ী সে বাপের বাড়ীতে ফিরে যেতেও রাজী নয়, কারণ সেখানে তার প্রাক্-বিবাহ প্রেম সম্পর্কটি কোন মতেই প্রশ্রয় পাবে না। মাঝখান থেকে লোক জানাজানি হয়ে সামাজিক অপবাদের সৃষ্টি হবে। সুতরাং দীপা দেবাশিসকে স্বামী হিসাবে স্বীকৃতি না দিলেও তার বাড়ীতেই থেকে গেল। সদ্য বিবাহিত দুটি মানুষের মধ্যে মনের দিক থেকে দুস্তর ব্যবধান। শুধু বাইরের লোককে, বিশেষতঃ চতুর ভৃত্য নকুলকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য দাম্পত্য সম্পর্কের একটা মিথ্যা ঠাট তারা বজায় রাখল। এই অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকেই দেবাশিসের মনে দীপার প্রতি এক প্রগাঢ় ভালবাসা জন্ম নিল। দীপা অন্যের প্রতি আসক্তা জেনেও তার লাবণ্যময় তনুদেহ, সুকুমার অথচ দৃঢ়তা ব্যঞ্জক মুখশ্রী, উদ্যানপ্রীতি, ফুলসাজানোর সূক্ষ্মরুচি ও আভিজাত্য দেবাশিসকে অনিবার্য ভাবেই মুগ্ধ করল। অন্যদিকে দীপার মনেও তার নিজের অগোচরে পরিবর্তন সুরু হয়েছিল। বাইরে সে দেবাশিসকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করলেও বা তার সম্পর্কে ঔদাসীন্য দেখালেও অন্তরের অন্দরমহলে তার অনিবার্য প্রবেশকে প্রতিহত করতে পারেনি। দেবাশিসের প্রতি তার শ্রদ্ধার সূচনা ফুলশয্যার রাতেই। যখন তার স্বীকারোক্তি শুনে দেবাশিস তার প্রেমাস্পদের নাম পর্যন্ত জানতে চাইল না, কোনোভাবেই

স্বামীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইল না, নিজেই অন্যত্র শয়নের প্রস্তাব করল তখন লেখকের ভাষাতেই দীপার প্রতিক্রিয়াটুকু লক্ষণীয়—'দীপা আর দাঁড়াল না দ্রুত ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তার চুলে তখনো ফুলের মালা জড়ানো, গলায় হাতে ফুলের গয়না। সেই অবস্থাতেই সে ফুল-ঢাকা বিছানার ওপর আছড়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। এত সহজে পরিত্রাণ পাবে তা সে আশা করেনি।'

এরপর নানা ঘটনার বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতে দীপার অবচেতন মনে ধীরে ধীরে দেবাশিসের প্রতি অনুরাগের কোরকটি বিকশিত হতে শুরু করেছে কিন্তু দীপার এই রূপান্তর শুধু দেবাশিসের কাছেই নয়, বোধকরি দীপার কাছেও চির অপরিচিত থেকে যেত কারণ দীপার সচেতন মন থেকে প্রথম প্রেমের স্মৃতি ও প্রেমিক প্রবালের প্রতি আনুগত্য সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায়নি কিন্তু প্রবালের অপরাধের অভিঘাতেই সেই আবরণ ঘুচে গেল। দেবাশিস্ নিজের অজ্ঞাতসারেই দীপার প্রেমিক গায়ক প্রবাল গুপ্তের স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে উঠেছিল। উগ্র স্বভাব বিশিষ্ট, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, নৈরাশ্যপীড়িত গায়ক প্রবাল গুপ্ত ছিল কিছুটা অস্থিরচিত্ত জীবনে তার সাধ ছিল অনেক কিন্তু তাদের চরিতার্থ করার মত সাধ্য ছিল না। আর্থিক সম্পদে সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের প্রতি তার ছিল এক সুতীব্র বিদ্বেষ। বিশেষ করে নৃপতির আড্ডার অন্যতম সদস্য দেবাশিসের প্রতি ছিল তার অকারণ ঈর্ষা। তার ওপর ঘটনাচক্রে সেই ঈর্ষার পাত্রটির সঙ্গেই যখন তার প্রেমিকা দীপার বিয়ে স্থির হল তখন ক্ষোভে, ক্রোধে সে দিশেহারা হয়ে পড়ল। এ বিয়ে সে বন্ধ করতে পারল না। তাই মনে মনে একটি সাংঘাতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করল, সে ঠিক করল দেবাশিসকে খুন করে তার বিধবাকে বিয়ে করবে। 'দীপা তখন স্বাধীন হবে, বাপের বাড়ীর শাসন আর থাকবে না। দীপাকে বিয়ে করলে দেবাশিসের সম্পত্তি তার হাতে আসবে। একসঙ্গে রাজকন্যে এবং রাজত্ব। দেবাশিসের আর কেউ নেই প্রবাল তা জানত।'

কুটিল বুদ্ধির অধিকারী প্রবাল বুঝেছিল যে প্রথমেই দেবাশিসকে খুন করা ঠিক হবে না, তাহলে সে যখন দীপাকে বিয়ে করবে তখন সকলের সন্দেহ তার ওপর পড়বে। তাই বিবেকহীন নৃশংস এই আততায়ী তার মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর আগে তার স্বার্থের সঙ্গে অসম্পৃক্ত তিনটি অসহায় দরিদ্র মানুষকে নির্দ্বিধায় হত্যা করল। কিন্তু নিয়তির পরিহাসে তার আসল উদ্দেশ্য চরিতার্থ হল না—দেবাশিসকে সে কৌশলে মৃত্যুর ফাঁদের দিকে নিয়ে আসতে পেরেছিল ঠিকই কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হতে পারেনি। পিছন থেকে অতর্কিত আক্রমণ করে হৃদপিণ্ডে সজোরে শজারুর কাঁটা বিঁধিয়ে হত্যা করার এই কৌশলটি দেবাশিসের প্রাণনাশের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ প্রবাল জানতনা যে প্রকৃতির এক দুজ্ঞেয় খেয়ালে দেবাশিসের হৃদপিণ্ডটা বুকের বাঁপাশে নয়, ডানপাশে আছে—এই আশ্চর্য ব্যতিক্রমই দেবাশিসকে মৃত্যুর অনিবার্য গ্রাস থেকে রক্ষা করেছিল। না, প্রবালের এই নৃশংস চক্রান্তের সঙ্গে দীপা মোটেই যুক্ত ছিল না। এক বিশেষ সূত্রে স্বামীর দেহে হৃদ্পিণ্ডের ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থান সম্পর্কে দীপা অবহিত হয়েছিল, কিন্তু প্রবালকে সে এই তথ্য জানায়নি। প্রকৃতপক্ষে প্রবাল তার সঙ্গে টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখলেও দীপা ঘুণাক্ষরেও তার অসাধু উদ্দেশ্যের কথা বুঝতে পারেনি।

শজারুর কাঁটার আঘাতে আহত দেবাশিসের জীবনের সংকটময় পরিস্থিতিতে দীপা অনুভব করল প্রবাল নয়, দেবাশিসই তার আকাঙ্ক্ষিত মানুষ। শেষ হল দেবাশিসের নীরব প্রতীক্ষা। তাদের জীবনের প্রকৃত মিলনের আনন্দযজ্ঞে যোগদানের জন্য ব্যোমকেশ ও সত্যবতী পেল সাদর আমন্ত্রণ।

আলোচ্য উপন্যাসে লেখক শরদিন্দুর চরিত্রচিত্রণ দক্ষতা প্রশংসনীয়। বিশেষতঃ দেবাশিসকে কেন্দ্র করে নায়িকা দীপার মনোলোকে ক্রমিক পরিবর্তনের স্তরগুলি পরিস্ফুটনে ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। সুখপাঠ্য এই কাহিনীটি তাই আজও অম্লান জনপ্রিয়তার উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত।

দুষ্টচক্র [১৩৭০] ঃ 'দুষ্টচক্র' গল্পটি একটু অন্য ধরনের। এখানে দেখি খাতক অভয় ঘোষালের হাতে খুন হওয়ার ভয়ে মহাজন বিশুপাল তাকে নিজেই খুন করেছে। এই ঘটনাকে ঠিক আত্মরক্ষার্থে খুন হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না কারণ খুন হওয়ার আশঙ্কায় শঙ্কিত বিশুপাল অন্য কোনও উপায়ে বিপদ থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টা না করে নিজেই অভয় ঘোষালকে হত্যা করেছে, এবং তা এমনই সুপরিকল্পিতভাবে যাতে আর যাকে সন্দেহ করা হোক বিশুপালকে সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসাবে ভাবা যায় না। এই ষড়যন্ত্রের কথা জানত মাত্র তিনজন—বিশুপাল, তার স্ত্রী এবং বিশুপালের অনুগত পারিবারিক চিকিৎসক, 'ডাক্তার রক্ষিত'।

বিশুপাল যদিও মহাজনী কারবারের সূত্রে বিপুল অর্থ ও প্রতিপত্তির অধিকারী এবং কেউ কেউ তাকে 'শিশুপাল' বলে কিন্তু লোকটি তেমন অর্থপিশাচ নয়, নিহত খাতক অভয় ঘোষালের বাবা সজ্জন অধর ঘোষালের সঙ্গে তার আলাপ ছিল, কিছুদিন কাজ কারবারও হয়েছিল সেই পূর্ব পরিচয়ের জন্যে বটে, আবার অভয় ঘোষালের অতি সুদর্শন আকৃতি ও সুমধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে বিশুপাল এমন একটি কাজ করল যা সে সচরাচর করেনা অর্থাৎ বিনা জামানতে শুধু হ্যাণ্ডনোটে তাকে ত্রিশ হাজার টাকা ধার দিল। এই ঋণকে কেন্দ্র করেই এ গল্পে জটিলতার সূত্রপাত।

অভয়ঘোষালের 'মুখে মধু হৃদে বিষ'। তার সুন্দর চেহারার সুযোগ নিয়ে সে অনায়াসেই অনেক অপরাধ করে থাকে। বিশুপালের প্রতিও সে সুব্যবহার করেনি। টাকা ধার নেওয়ার পর দীর্ঘদিন কেটে গেলেও যখন অভয় ঘোষাল বিশুপালের টাকা ফেরত দেওয়ার নামও করল না, উপরন্তু নিজের বসত বাড়ী অর্থাৎ শেষ স্থাবর সম্পত্তিটুকুও বিক্রি করার ব্যবস্থা করতে লাগল, তখন বিশুপাল একদিন মরিয়া হয়ে তার বাড়ীতে উপস্থিত হল। আধঘন্টা অবিশ্রান্ত গালিগালাজের পর সে যা লাভ করল তা টাকা নয়, অভয় ঘোষালের নিমেষহীন চাহনি থেকে বিচ্ছুরিত নির্মম জিঘাংসা। এরপর থেকেই বিশুপাল কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতলব ভেঁজেছে। এই জীর্ণ, পলিতকেশ বৃদ্ধের মস্তিষ্ক যে কতখানি সক্রিয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় পরবর্তী কার্যকলাপের মধ্যে। খুন করার ব্যাপারে বিশুপালের একটা সুবিধা ছিল, সে জানত যে অভয় ঘোষাল তাকে খুন করতে চায়, কিন্তু বিশুপাল যে অভয় ঘোষালকে খুন করতে চায়, একথা অভয় ঘোষাল জানত না। তাই সে সাবধান হয়নি। বিশুপাল কিন্তু আত্মস্বার্থরক্ষার্থে যথেষ্ট ব্যবস্থা

গ্রহণ করেছিল। সে বাড়ী থেকে বার হওয়া বন্ধ করল, সিঁড়ির মুখে গুর্খা মোতায়েন করল, নীচের তলায় ভাড়াটে পসারহীন ডাক্তার সুরেশ রক্ষিতকে টাকার টোপে গেঁথে দলে টানল, তার সাহায্যে মেরুদণ্ডের বিশেষ স্থানে 'প্রোকন' জাতীয় ওষুধ ইনজেকশন নিয়ে সাময়িক-ভাবে পঙ্গুত্ব অর্জন করল, ডাক্তার সুরেশ রক্ষিতের মাধ্যমে ব্যোমকেশকে ডাকিয়ে এনে অভয় ঘোষাল সম্পর্কে ভীতির কথা জানাল—এই ভাবে বাইরের লোকের চোখেও নিজেকে উত্থানশক্তি রহিত রোগী হিসাবে প্রমাণ করে একদিন সময় ও সুযোগ বুঝে নিদ্রিত অভয় ঘোষালের পিঠের বাঁদিকে গুণছুঁচের মত শলা বিঁধিয়ে তাকে নিজের হাতে খুন করল। আপাতদৃষ্টিতে বিশ্বপালের অপরাধকে হয়তো সহজে চিনে নেওয়া যেত না, কিন্তু ব্যোমকেশ তার আচরণে গোড়া থেকেই কিছু সন্দেহজনক সূত্র আবিষ্কার করে-ছিল। বিনা কারণে ব্যোমকেশকে একশ' টাকা দেওয়া, পুলিশ ডাক্তার কর্তৃক বিশ্ব-পালের পঙ্গুত্ব যথার্থ কিনা তা যাচাই করার মুহূর্তে তার স্ত্রীর উত্তেজিত ভয়ার্ত চাহনি প্রভৃতি ব্যোমকেশকে সন্দিগ্ধ করে তুলেছিল। তারপর ডাক্তার অসীম সেনকে ফোন করে 'প্রোকন' জাতীয় ওষুধের কথা জানতে পেরে প্রকৃত আসামীকে সে নিঃসন্দেহেই চিনে নিল।

বিশ্বপালের অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। অর্জিত এই হত্যাকে আত্মরক্ষার্থে খুন হিসাবে সমর্থন করতে চাইলেও ব্যোমকেশ স্পষ্ট ভাষায় বলেছে—"আত্মরক্ষার জন্য নরহত্যার অধিকার মানুষের আছে, কিন্তু তিন মাস ধরে ষড়যন্ত্র করে নরহত্যা করলে আইন তা স্বীকার করবে না।" কিন্তু এত কিছু জেনেও ব্যোমকেশ অভয় ঘোষালের এই হত্যাকারীকে আইনের হাতে তুলে দিতে পারেনি। কারণ তার অপরাধ প্রমাণ করার কোনও উপায় ছিল না। তাকে হাতে নাতে ধরাও সম্ভব ছিল না। তাই ব্যোমকেশ অন্য পথ ধরেছে—শাস্তিটা একটু নতুন ধরনের—সে বিশ্বপালের মতো ধনাসক্ত সুদখোর মানুষকে প্রতিরক্ষা তহবিলে একলক্ষ টাকা দানে বাধ্য করেছে। অন্যদিকে চিকিৎসাবিদ্ হয়েও ডাক্তার রক্ষিত যে অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেছে তা কিছুতেই সমর্থন যোগ্য নয়। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে ব্যোমকেশ তাকেও পুলিসের হাতে সমর্পণ করতে পারেনি।

॥ ৪ ॥

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কয়েকটি গোয়েন্দা গল্পে অপরাধের পশ্চাতে অপরাধীর স্বার্থ সিদ্ধির সংকীর্ণতা নেই, আছে প্রিয়জনের কল্যাণ সাধনের মহৎ উদ্দেশ্য। এই শ্রেণীর অপরাধীদের প্রতি বিরূপতা জাগেনা, বরং মনের গভীর জন্ম নেয় সমবেদনা। 'অগ্নিবান' 'রক্তের দাগ', 'কহেন কবি কালিদাস' প্রভৃতি গল্প আলোচ্য প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অগ্নিবাণ [১৩৪২]: 'অগ্নিবাণ'-এর দেবকুমারবাবু শুধু বিজ্ঞানের অধ্যাপক মাত্র নন, তিনি বৈজ্ঞানিক। অর্থ, সহানুভূতি, গবেষণার জন্য অবাধ সুযোগ ও উপযুক্ত উপকরণ, নিষ্কণ্টক যশোলাভের নিশ্চিত সম্ভাবনা প্রভৃতি থেকে বঞ্চিত থাকার ফলেই এই দরিদ্র ভারতবর্ষের শত শত বৈজ্ঞানিকের মত তিনিও যে তাঁর প্রতিভাকে সম্পূর্ণ বিকশিত করতে পারছেন

না সে বিষয়ে ভদ্রলোক যথেষ্ট সচেতন এবং সেই কারণে ক্ষুব্ধও বটে। সুস্থ, সুন্দর, প্রেমপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশের স্নিগ্ধ ছায়াতলে বিশ্রাম লাভ করে হয়তো তিনি কর্মজগতের এই অপ্রাপ্তি ও অপূর্ণতার বেদনাকে ভুলে থাকতে পারতেন, কিন্তু সেখানেও তিনি ভাগ্য বিড়ম্বিত। প্রথম পক্ষের দুটি সন্তান থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রায় প্রৌঢ় বয়সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু সে বিবাহ সুখ বা শান্তি কিছুই তাঁকে দিতে পারেনি। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী শুচিবায়ুগ্রস্তা, কটুভাষিণী। সপত্নীর সন্তানদুটির প্রতি তাঁর নিষ্ঠুর, অমার্জিত উগ্র আচরণ দেবকুমারবাবুকে প্রতি মুহূর্তে উত্যক্ত করে তুলত। এদিকে অপ্রত্যাশিত ভাবে তিনি এক প্রাণঘাতী বিষ আবিষ্কার করে ফেললেন। সেই গবেষণায় সাফল্য লাভ করতে হলে চাই প্রচুর অর্থ। এ ছাড়া সেই আবিষ্কারের ফলাফল নিয়ে হাতে কলমে পরীক্ষা করার সুযোগ চাই, তা না হলে তাঁর সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। ঘরে-বাইরে এত প্রতিকূলতা তাঁর মনকে এক বিচিত্র, কুটিল পথে পরিচালিত করল। ব্যোমকেশের বিশ্লেষণ অনুসরণ করে বলা যায়—

> "নিজের স্ত্রীকে হত্যা করবার ইচ্ছা মানুষের স্বাভাবিক নয়, যখন এ প্রবৃত্তি তার হয়, তখন বুঝতে হবে সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। দেবকুমারবাবুরও সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হয়েছিল। তারপর তিনি যখন এই ভয়ংকর বিষ আবিষ্কার করলেন, তখন বোধহয় প্রথমেই তাঁর মনে হল স্ত্রীর কথা। তিনি মনে মনে আগুন নিয়ে খেলা আরম্ভ করলেন।"

দীর্ঘদিন ধরে দেবকুমারবাবু এই ষড়যন্ত্রের জাল একটু একটু করে বিছিয়ে ছিলেন। প্রথমেই তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার টাকার যুগ্ম জীবন বীমা পলিসি করলেন যাতে স্ত্রীর মৃত্যু হলে ঐ অংকের টাকা তিনি পান, তারপর ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে থাকলেন কারণ তাড়াতাড়ি করলে চলবে না, বীমা কোম্পানীর সন্দেহ হতে পারে। এই-ভাবে এক বছর কেটে গেলে তিনি মনে মনে স্থির করলেন, এই বড়দিনের ছুটিতে স্ত্রীর প্রতি তাঁর মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করবেন। সেই মৃত্যুবাণ বড় বিচিত্র—

> "তাঁর আবিষ্কৃত বিষের প্রকৃতি অনেকটা বিস্ফোরক বারুদের মত, এমনিতে সে অতি নিরীহ, কিন্তু একবার আগুনের সংস্পর্শে এলে তার ভয়ঙ্কর শক্তি বাষ্পরূপ ধরে বেরিয়ে আসে। সে বাষ্প কারুর নাকে কণামাত্র গেলেও আর রক্ষে নেই, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হবে।"

দেবকুমারবাবুর উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এই বিষপ্রয়োগের পদ্ধতিগত অভিনবত্বে। তিনি জানতেন তাঁর স্ত্রী অন্ধকারে ঘুমুতে পারে না, তাই রোজ রাত্রিতে শোবার আগে দেশলাই দিয়ে ল্যাম্প জ্বালেন—এই দেশলাইয়ের বাক্স তার ঘরেই থাকে, আর কেউ তা ব্যবহার করে না। কোনও উপায়ে দেবকুমারবাবু কতকগুলি দেশলাই কাঠির বারুদের সঙ্গে বিষ মাখিয়ে রেখে দিলেন যাতে আজ হোক কাল হোক তাঁর গৃহিণীর মৃত্যু অনিবার্য অথচ সে মৃত্যুকে হত্যা বলে সন্দেহ করার সামান্যতম সূত্রও থাকবে না। হত্যাকারীর নামও কেউ জানতে পারবে না।

কিন্তু নিছক আত্মসুখানুসন্ধানই দেবকুমারবাবুর লক্ষ্য ছিল না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর

জীবনবীমার থেকে প্রাপ্য পঞ্চাশ হাজার টাকা তিনি কিভাবে ব্যয় করবেন সে বিষয়ে তাঁর পরিকল্পনা অনুধাবনযোগ্য—

"....কি ভেবেছিলুম কি হল ! ভেবেছিলুম রেখার ভাল বিয়ে দেব, নিজের একটা বড় ল্যাবরেটরী করব, হাবুলকে বিলেত পাঠাব—'

কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাসে 'সকলি গরল ভেল'। নিজের স্ত্রীকে তিনি মারতে চেয়েছিলেন কিন্তু এমনই অদৃষ্টের খেলা—দু-বার তিনি তাঁর অমোঘ অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করলেন দু-বারই সে অগ্নিবাণ লাগল গিয়ে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র-কন্যার বুকে।

কিন্তু দেবকুমারবাবু কাপুরুষ নন. ছেলেমেয়েকে যে তিনি সত্যিই কতখানি ভালবাসেন তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধনের মধ্য দিয়ে। যে অগ্নিবাণ তিনি নিজেই আবিষ্কার করেছেন, সেই বিষ মাখানো দেশলাই দিয়ে তিনি অনায়াসেই আত্ম-হত্যা করতে পারতেন, তা তিনি করেননি। আইনের কাছ থেকে প্রাপ্য শাস্তি তিনি স্বেচ্ছায় মাথা পেতে নিয়েছেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করার প্রাক্ মুহূর্তে ব্যোমকেশ দেশলাই বাক্সটি ফেরৎ চাইলে তাঁর অনুশোচনাদগ্ধ অন্তর থেকে উৎসারিত হয়েছে মর্মান্তিক স্বীকারোক্তি—

"ভয় নেই আমি আত্মহত্যা করব না। ছেলেকে মেরেছি, মেয়েকে মেরেছি, আমি খুনী আসামীর মত ফাঁসি কাঠে ঝুলতে চাই।"

ট্র্যাজেডির নায়কের মতোই এ কাহিনীর সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির সর্বনাশা ফলাফল তাঁকেই ভোগ করতে হয়েছে, জীবন-সমুদ্র-মন্থনজাত তীব্র হলাহল পান করে তিনি নীলকণ্ঠ হয়েছেন। দেবকুমারবাবুর এই বিড়ম্বিত জীবন-বেদনা পাঠক হৃদয়কে গভীরভাবে আলোড়িত করে।

'অগ্নিবাণ'-এর লেখকের গল্প-বয়ন দক্ষতা প্রশংসনীয়। ক্ষুদ্রাবয়ব এই গল্পে স্বল্প কয়েকটি ঘটনা ও চরিত্রের সাহায্যে তিনি অনায়াসে রহস্য কাহিনীর উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। নন্তুকে লেখা রেখার শেষ প্রণয়লিপিটির মাধ্যমে রেখার সন্দেহ-জনক মৃত্যুকে প্রথমে আত্মহত্যা ও পরে অর্থগৃধ্নু, কটুভাষী, হৃদয়হীন ডাক্তার রুদ্রের কারসাজি বলে মনে হয়। পরে ব্যোমকেশের সহায়তায় প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হলে আমরা বিস্ময়-বিমূঢ়তার মধ্যেই গোয়েন্দা গল্প পাঠের প্রকৃত স্বাদটুকু উপভোগ করার যথেষ্ট সুযোগ পাই। এই গল্পেও ব্যোমকেশের যুক্তি, অনুমানশক্তি এবং অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ক্রমিক স্তরবিন্যাস লক্ষণীয়। অপরাধ অনুসন্ধানের কাজে ব্যাপৃত থাকলেও তার সহানুভূতিশীল মনের পরিচয় এ গল্পেও পাওয়া যায়। সদ্যমৃতা রেখার ঘরটি তদন্ত করার সময় ব্যোমকেশের বিষণ্ণ, অন্যমনস্ক ভাবটিই তার প্রমাণ।

পরিশেষে উল্লেখ করি এ গল্পের নামকরণের সার্থকতার কথা। 'অগ্নিবাণ' নামটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। যে অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করে দেবকুমারবাবু নিজের ও সন্তানদের জীবনে আলো জ্বালতে চেয়েছিলেন, সেই অগ্নি তাঁকে আলো দিল না, নিঃশেষে দগ্ধ করল।

রক্তের দাগ [১৩৬৩]ঃ নরহত্যা নিঃসন্দেহেই নিন্দনীয়। তবু কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই ঘৃণ্য অপরাধের জন্যও অপরাধীকে নিন্দা করা যায় না। কারণ তার প্রতিপক্ষের

মৃত্যু সেখানে সমস্যা থেকে মুক্তিলাভের বিকল্পহীন উপায় মাত্র। 'রক্তের দাগ'-এর পরিস্থিতি অনেকটা এইরকম।

এই গল্পে শুধু ঊষাপতিবাবুর জীবনেই নয়, তাঁর স্ত্রী সুচিত্রাদেবীর জীবনেও সত্যকাম এক দুষ্টগ্রহ। সত্যকাম ঊষাপতিবাবুর পুত্র নয়, সুচিত্রা কুমারী অবস্থাতেই এক অবৈধ প্রণয়ের ফলস্বরূপ তাকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন, কিন্তু সুচিত্রার বিত্তবান ধূর্ত পিতা রমাকান্ত চৌধুরীর চতুর ব্যবস্থাপনায় পরিচিত সমাজের থেকে বহুদূরে জন্ম হল সত্যকামের। দীর্ঘকাল পরে কন্যা ও নাতিসহ সুচিত্রার পিতা যখন স্বদেশে ফিরে এলেন তখন কারও মনে কোনও সংশয় জাগল না, সকলে জানল সত্যকাম ঊষাপতিরই সন্তান। ফুলশয্যার রাতেই যখন ঊষাপতি জেনেছিলেন যে তার সদ্যপরিণীতা সহধর্মিণী অন্তঃসত্ত্বা, তখনই তাঁর মনের দিক দিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে ঘটে গিয়েছিল এক মর্মান্তিক বিচ্ছেদ। অতএব সুচিত্রার অবৈধ সন্তানের পিতা হওয়ার অবাঞ্ছিত ঘটনায় ঊষাপতি নিশ্চয় আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েননি। কিন্তু এই মিথ্যা পরিচয়কে প্রকাশ্যে অস্বীকার করে সুচিত্রাদেবীকে বিপাকে ফেলার মত হীনচেতাও তিনি নন। অর্থাৎ এ কথা অনুমান করা চলে যে ঊষাপতিবাবুর বলিষ্ঠ দেহের অন্তরালে একটি সংবেদনশীল, কোমল মন লুকিয়ে ছিল। সেই কোমলতার স্নিগ্ধ ছায়ায় সত্যকাম হয়তো একদিন আশ্রয় পেত, হয়তো সে ঊষাপতি ও সুচিত্রা—এই দুই বিচ্ছিন্ন ও বিষণ্ণ নর-নারীর মধ্যে মিলন-সেতু রচনা করতে পারত কিন্তু এই সম্ভাবনাগুলির কোনওটাই সার্থক হ'ল না। কারণ সত্যকামের দেহে প্রবাহিত তার চরিত্রহীন, উচ্ছৃঙ্খল পিতার কলুষিত রক্ত, তাই বয়স যত বাড়তে লাগল তার আচার-আচরণে অবাধ্যতা ও স্বেচ্ছাচারিতা ততই প্রকট হয়ে উঠল। তারওপর দাদামশাইয়ের মৃত্যুর পর তরুণ সত্যকাম যখন ঘটনাচক্রে তার জন্মের কলংকিত ইতিহাসটুকু জানতে পারল তখন সে আরও উদ্ধত আরও বেপরোয়া হয়ে পড়ল। ঊষাপতি ও সুচিত্রার প্রতি তার দুর্ব্যবহার ক্রমে ক্রমে কুটিলহিংস্রতায় পরিণত হল। তার যথেচ্ছ অর্থব্যয়ের ফলে সুচিত্রা এম্পোরিয়ামের তহবিল শুধু শূন্য হতে লাগলনা, তার দুশ্চরিত্রতার জন্য দোকানের বহুদিনের সঞ্চিত সুনামও নষ্ট হতে বসল। এই দুর্বিপাকে ঊষাপতি দিশেহারা হয়ে পড়লেন বটে কিন্তু তখনই কোনও সিদ্ধান্ত নিলেন না। অর্থাৎ ব্যবসার ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতি তাঁকে সত্যকাম-হত্যায় প্ররোচিত করেনি কিন্তু যেদিন তিনি বুঝতে পারলেন সত্যকামের ঔদ্ধত্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা সুচিত্রার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে, সেই দিনই ঊষাপতি সত্যকামকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করে ফেললেন এবং লক্ষ্যভেদ করার জন্য যথাযোগ্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। শেষে এক শনিবারের গভীর রাত্রে সত্যকাম যখন বাড়ী ফিরেছে তখন এমন কৌশলে তাকে গুলি করলেন যাতে মনে হয় বাইরের কোনও আততায়ী তাকে পেছন থেকে হত্যা করেছে। সমাজের দুষ্টক্ষত স্বরূপ এই যুবকের মৃত্যু-রহস্য উদ্ঘাটনে পুলিশ যত নিষ্ক্রিয়তাই অবলম্বন করুক না কেন, ব্যোমকেশ নীরব থাকতে পারেনি, কারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী সত্যকাম তার তীব্র অনুভবশক্তির সাহায্যে তাকে হত্যার জন্য ঊষাপতিবাবুর প্রস্তুতির আভাস পেয়েছিল, অথচ তার জন্মরহস্য প্রকাশ হয়ে পড়ার আশংকায় পুলিশের কাছে কোনও কথা জানাতে পারেনি—তাই বেসরকারী ভাবে

তদন্তের জন্য ব্যোমকেশকে অগ্রিম এক হাজার টাকা দিয়ে তার হত্যারহস্য উন্মোচনের ভার দিয়ে গিয়েছিল। অতএব কর্তব্যের খাতিরেই ব্যোমকেশ সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছে কিন্তু অপরাধীকে চিনতে পেরেও তাকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করতে পারেনি। কারণ সে অনুভব করেছে মনুষ্যত্ব মানুষের তৈরী আইনের চেয়ে অনেক বড়। উষাপতি সুচিত্রার মধ্যে আপাত-ব্যবধান যতই থাক, অন্তরে সেই স্ত্রীর প্রতিই এক মমতার নির্ঝরিনী যে হৃদয়ের কোন্ গোপন গুহায় লুকিয়েছিল উষাপতি নিজেই তা জানতে পারেন নি। অপরদিকে মাতৃহীনা, ধনীর দুলালী সুচিত্রার যৌবনে সাময়িক পদস্খলন ঘটেছিল বটে, কিন্তু সারাজীবন ধরে তিনি দুঃখের তপস্যায় সেই ভুলের মাশুল গুণেছিলেন। স্বামীর নীরব উপেক্ষা আর পুত্রের সরব উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁর মনকে সীমাহীন বেদনায় জর্জরিত করেছিল। সত্যকামের মৃত্যুর অভিঘাত এই দুটি দুঃখ-সন্তপ্ত নর-নারীকে হঠাৎ বড় কাছাকাছি এনে ফেলেছে। জীবনের সেই উষর মরুভূমিতে তারা দুজনেই দুজনের একমাত্র অবলম্বন। আজ বেদনার পথ চেয়ে দুটি বিরহ-বিচ্ছিন্ন হৃদয় যখন মিলনের তীর্থে পৌঁছাতে উৎসুক তখন ব্যোমকেশ কি নিঠুর প্রতিবন্ধকতায় সেই সম্ভাবনাকে রুদ্ধ করে দিতে পারে? সত্যান্বেষী তাই সত্যকে জেনেই নিরস্ত হয়েছে। আইনের কর্তব্য পালন করতে গিয়ে মানবতার আদালতে নিজেকে অপরাধী করেনি।

কহেন কবি কালিদাস [১৩৬৮] 'কহেন কবি কালিদাস' একটি উপভোগ্য গোয়েন্দা গল্প। এই গল্পে প্রাণহরি পোদ্দারের হত্যারহস্য-সূত্রেই উন্মোচিত হয়েছে ভুবন ও মোহিনীর জীবন কথা।

ফুলঝুরি কয়লাখনির মালিক মনীশ চক্রবর্তীর আহ্বানে অজিতকে নিয়ে ব্যোমকেশ এসেছিল কোনও এক প্রসিদ্ধ কয়লা-শহরে। তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মনীশবাবুর কয়লাখনিতে কিছুদিন যাবৎ যে প্রচ্ছন্ন উৎপাতগুলি একের পর এক ঘটে যাচ্ছিল গোপনে সেগুলির সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। কিন্তু এখানে এসে সে জড়িয়ে পড়েছে একটি জটিলতর সমস্যার জালে—প্রাণহরি পোদ্দারের মৃত্যু-রহস্য উদ্‌ঘাটনের দায়িত্বও বোমকেশের উপরেই ন্যস্ত হয়েছে—এই কাজটি কম কঠিন নয়। প্রাথমিক ভাবে মনীশ চক্রবর্তী, মৃগেন্দ্র মৌলিক, মধুময় সুর এবং অরিন্দম হালদার কয়লা ক্লাবের এই চার সদস্যকেই প্রাণহরির মৃত্যুর ব্যাপারে সন্দেহ হয় কারণ নিহত ব্যক্তিটির বাড়ীতে জুয়ার আড্ডায় এদের যাতায়াত ছিল। বহু চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ব্যোমকেশ যাকে প্রাণহরির আততায়ী হিসেবে চিনে নেয়, সে ভুবনেশ্বর দাস—আপাত-দৃষ্টিতে যাকে হত্যাকারী রূপে সন্দেহ করা তো দূরের কথা কল্পনাও করা যায় না। ভুবনের ট্যাক্সি চড়েই প্রাণহরি নিয়মিত শহরে আসা-যাওয়া করত বটে, কিন্তু সে যে প্রাণহরির দাসী মোহিনীর স্বামী, এবং প্রাণহরির কাছ থেকে আড়াই হাজার টাকা ধার নিয়ে যে তার ট্যাক্সি কেনা হয়েছে একথা স্থানীয় অধিবাসীরা কেউই জানত না—এই গল্পের চমক এখানেই—আর বিচিত্র এক যোগাযোগের মাধ্যমেই ব্যোমকেশ এই রহস্যের সমাধান সূত্র খুঁজে পেয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুসারে আততায়ীর বাঁ-হাতে ধরা অস্ত্রের আঘাতেই প্রাণহরির মৃত্যু ঘটেছে এই তথ্য জানার পর ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে ট্যাক্সি

সারানোর সময় ভুবনকে বাঁহাতে 'জ্যাক' ঘোরাতে না দেখলে এক্ষেত্রে সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের পক্ষেও বোধ হয় সত্যদর্শন সম্ভব হ'ত না।

কিন্তু কেন এই জিঘাংসা? প্রাণহরির ঋণ যাতে শোধ করতে না হয়ে সেই জন্যই কি ভুবন দাস তাকে হত্যা করে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছে? না, তা নয়। ভুবন উচ্চাভিলাষী বটে, কিন্তু অসৎ নয়। তাই সে ট্যাক্সি চালিয়ে, আর মোহিনী দাসীবৃত্তি ক'রে প্রাণহরির কাছ থেকে নেওয়া ধার শোধ করে দিচ্ছিল। মোহিনীর জুয়াচোর, অর্থগৃধ্নু, বৃদ্ধ মনিবটি যে অত্যন্ত অসাধু এবং মোহিনীর রূপের কুহকে আকৃষ্ট করে সে যে শহরের বিত্তবান যুবকদের জুয়ার আসরে টেনে এনে নিজের অর্থ উপার্জনের পথ প্রশস্ত করে সম্ভবতঃ একথাও ভুবনের অজানা ছিল না, তবু সে প্রাণহরির ঋণশোধ না হওয়া পর্যন্ত মোহিনীকে ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে বলত, কিন্তু তার নিজের ধৈর্যের বাঁধই ভেঙে গেল। যেদিন সে ঘটনাচক্রে জানতে পারল পাপাত্মা প্রাণহরি দু-হাজার টাকার বিনিময়ে অরিন্দম হালদারের কাছে মোহিনীকে বিক্রি ক'রে দিয়েছে। ভুবনের বিচারে অরিন্দম হালদার দোষী নয়, কারণ সে জানে 'দুনিয়ায় পয়সাওয়ালা লম্পট অনেক আছে পরস্ত্রীর ওপর তারা নজর দেয়; তাদের ওপর ভুবনের রাগ নেই।' কিন্তু প্রাণহরির জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচয় পেয়ে তার মাথায় খুন চেপে গেছে। সেই মুহূর্তেই মনে মনে সে অর্থপিশাচ প্রাণহরিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, এবং সেই পরিকল্পনাকে অসাধারণ তৎপরতায় বাস্তবে রূপায়িতও করেছে।

ভুবন বুদ্ধিমান লোক, সে বুঝতে পেরেছিল ব্যোমকেশের দৃষ্টিতে সে অপরাধী হিসেবে ধরা পড়ে গেছে। তাই পুলিশের হাতকড়া ফাঁকি দিতেই সে মোহিনীকে নিয়ে নিয়ে সেই শহর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। ইন্সপেক্টর প্রমোদ বরাটের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও পলাতক সেই ওড়িয়া দম্পতি ধরা পড়েছিল কিনা আমরা জানি না, কিন্তু সহৃদয় ব্যোমকেশ হয়তো চায়নি যে পুলিশ তাদের নাগল পাক। কারণ ভুবন জাত অপরাধী নয়, সে তার দেনাশোধ করার ভয়ে প্রাণহরিকে হত্যা করেনি, সে একাজ করেছে তার স্ত্রীর সম্মানরক্ষার জন্য। সুতরাং সংবেদনশীল ব্যোমকেশের বিচারে বিবেকহীন, মনুষ্যত্বহীন প্রাণহরির প্রাণের তুলনায় সংগ্রামশীল ঐ নর-নারী দুটির জীবনের মূল্য অনেক বেশী। তাই গল্পের উপসংহারে তার বিষাদ ভরা মন্তব্যটুকু উল্লেখযোগ্য—

"ভুবন ও মোহিনী চির জীবন ফেরারী হয়ে থাকবে, যদি না ধরা পড়ে। প্রাণহরি পোদ্দারের নিষ্ঠুর লোভ দু'টো মানুষের জীবন নষ্ট করে দিল, এ কাহিনীর মধ্যে এইটেই সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।"

॥ ৫ ॥

'সীমন্তহীরা', 'মাকড়সার রস', 'খুঁজি খুঁজি নারি'—ব্যোমকেশ কাহিনী-মালার এই গল্পগুলি কিছুটা ভিন্ন স্বাদের। কারণ উল্লিখিত তিনটি কাহিনীতেই সাধারণ গোয়েন্দা গল্প সুলভ খুন, জখম, রাহাজানি নেই, আছে প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিপক্ষের সঙ্গে ব্যোমকেশের বুদ্ধির ও ইচ্ছাশক্তির খেলা।

সীমন্ত হীরা [১৩৩৯]ঃ 'সীমন্ত হীরা'য় অবশ্য একজনের বিনা সম্মতিতে একটি

অমূল্য বস্তু অপহরণের ব্যাপার রয়েছে, কিন্তু অপহৃত বস্তু ও অপহরণকারী উভয়েই এত অসাধারণ যে এই ঘটনাকে কিছুতেই সাধারণ চুরির পর্যায়ে ফেলা যায় না।

এই হীরাটির সঙ্গে যে ইতিহাস জড়ানো তা ব্যোমকেশ জানতে পেরেছে কুমার ত্রিদিবেন্দ্র নারায়ণের কাছ থেকে। উত্তরবঙ্গের এই তরুণ জমিদারটিই ব্যোমকেশকে তাঁর হারিয়ে যাওয়া হীরের অন্বেষণে নিযুক্ত করেছিলেন। হারানো হীরাটির নামই 'সীমন্ত-হীরা' যার তুল্য মহার্ঘ্য পাথর বাংলাদেশে আর একটিও নেই। এর আর্থিক মূল্য সম্ভবতঃ তিন পয়জার, কিন্তু এর শুভ প্রভাবের মূল্য অসাধারণ। ত্রিদিবেন্দ্র নারায়ণদের বংশে হীরাটি দীর্ঘকাল যাবৎ গৃহদেবতার মতই পূজিত হয়ে আসছে। এবং তাঁদের বংশের চিরাচরিত প্রথা অনুসারেই বংশের জ্যেষ্ঠপুত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন, কনিষ্ঠরা কেবল ভরণ-পোষণের টাকা পেয়ে থাকেন। সেই নিয়মানুসারেই পিতার মৃত্যুর পর কুমার ত্রিদিবেন্দ্র-নারায়ণ যখন জমিদারীর অধিকারী হলেন, তখন তাঁর কাকা দিগিন্দ্রনারায়ণ পরম স্নেহভাজন ভ্রাতুষ্পুত্র ত্রিদিবেন্দ্রের কাছ থেকে সীমন্ত হীরাটি চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই ইচ্ছা কুমার ত্রিদিব পূরণ করতে পারেননি। তারপর কলকাতায় যখন একবার রত্ন প্রদর্শনী হল তখন প্রদর্শনীর কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণে সেই বিখ্যাত হীরাটিকে সেখানে পাঠানো হয়। সেই প্রদর্শনীতে রত্নগুলি সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কৌশলে ত্রিদেবের হীরাটি গেল বদল হয়ে। আসল হীরাটির পরিবর্তে যখন অবিকল অনুরূপ দর্শন নকল হীরাটি নিয়ে ত্রিদিবেন্দ্র নারায়ণ জমিদারীতে ফিরে এলেন তখন তিনি নিজেও প্রকৃত তথ্য জানেন না। জানতে পারলেন তখনই, যখন দিগিন্দ্র-নারায়ন নিজেই ত্রিদিবেন্দ্র নারায়ণকে পত্র মারফৎ জানালেন, 'দুঃখিত হয়ো না, তোমরা দিতে চাওনি, তাই আমি নিজের হাতে নিলাম।' হীরাটি যে তিনি অপহরণ করেছিলেন তার পশ্চাতে কিন্তু অর্থলোভ নেই, নেই ভ্রাতুষ্পুত্রের কোনও রকম জাগতিক ক্ষতি করার কুটিল বাসনা। তিনি যে সীমন্ত-হীরার দৈবশক্তি সম্পর্কে সংস্কার আচ্ছন্ন তাও নয় ঐ দুর্লভ রত্নটির প্রতি তাঁর আসক্তি নিতান্তই অহেতুক। তাই অপহরণের পরই ভাইপোকে চিঠি দিয়ে সে কথা জানিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

কিন্তু সীমন্ত-হীরা হারিয়ে ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ যথেষ্ট বিচলিত বোধ করেছেন, পুলিসকে হীরা উদ্ধারের ভার তিনি দিতে চাননি কারণ তাঁদের বংশের সুনাম ক্ষুন্ন করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না, তাই হারানো সম্পদ ফিরে পাওয়ার জন্য তাঁকে ব্যোমকেশের শরণাপন্ন হতে দেখা গেছে। ব্যোমকেশ তাঁর আহ্বানে অজিতকে নিয়ে কুমার ত্রিদিবকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে এক সপ্তাহের মধ্যেই সে হীরাটিকে কুমারের হাতে প্রত্যর্পণ করবে।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে পৌঁছে ব্যোমকেশ বুঝেছে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার মত প্রতিশ্রুতি রক্ষা এত অনায়াস সাধ্য নয়। কারণ তার প্রতিপক্ষ ব্যক্তিটি শুধু বুদ্ধিমান নন, প্রতিভাবানও। দিগিন্দ্র নারায়ণ বিখ্যাত শিল্পী এবং প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিক। শিল্প নৈপুণ্য ও বিজ্ঞান প্রতিভার এমন অত্যাশ্চর্য সমন্বয় সত্যিই দুর্লভ। তাঁর চেহারার মধ্যেও এমন ব্যক্তিত্ব, পৌরুষ ও ভয়ংকরতা মিশিয়ে রয়েছে যাতে সাধারণ লোক তাঁর কাছে যেতেও ভয় পায়, আবার তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়। প্রকৃতপক্ষে এই প্রবল ব্যক্তিত্বশালী

কঠিন ধাতুর মানুষটির কবল থেকে সীমন্ত-হীরা উদ্ধার করা রাবণের অশোকবনে বন্দিনী সীতাকে উদ্ধার করার মতোই দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু এই সবল পুরুষটির অন্তরেও ছিল এক দুর্বলতা, যা সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যোমকেশের অগোচর থাকেনি। এই দুর্বলতা হল তাঁর নিজের সম্পর্কে উগ্র অহংকার যার বশবর্তী হয়ে তিনি অন্যদের মানুষ হিসাবেই গণ্য করতে চাননি। তাই হীরা চুরি করেই শক্তির দম্ভ প্রকাশের জন্য সে খবর কুমার ত্রিদিবকে লিখে জানিয়েছেন, আবার অজিত আর ব্যোমকেশ চাকুরী প্রার্থীর ছদ্ম পরিচয়ে তাঁর বাড়ীতে এলে, তাদের আসল উদ্দেশ্য যে সীমন্ত-হীরার অন্বেষণ সেকথা বুঝতে পেরেও দিগিন্দ্রনারায়ণ কিছুক্ষণ তাদের সঙ্গে 'ইন্টারভিউ' নেওয়ার খেলা খেলেছেন, তার-পর তাদের প্রকৃত পরিচয় নিজের মুখেই ফাঁস করে দিয়েছেন। ব্যোমকেশের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও দুঃসাহসের প্রশংসা করেও সদর্পে বলেছেন. 'আমার মাথায় কতখানি মস্তিষ্ক আছে জানো? ষাট আউন্স—তোমার চেয়ে পাঁচ আউন্স বেশী। অর্থাৎ বনমানুষে আর সাধারণ মানুষে বুদ্ধির যতখানি তফাৎ তোমার সঙ্গে আমার বুদ্ধির তফাৎ তার চেয়েও বেশী।' সুতরাং এই বিশ্লেষণের ওপর আস্থা রেখেই তিনি ভেবেছেন সারাজীবন ধরে খুঁজলেও ব্যোমকেশ কিছুতেই সেই সীমন্ত-হীরাটির সন্ধান পাবে না। তাই তার সারা-বাড়ীটা ইচ্ছামত খুঁজে দেখার উদার অনুমতি তিনি ব্যোমকেশ ও অজিতকে দিয়ে রেখেছেন। ব্যোমকেশ এই অপ্রত্যাশিত সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ বোধ করেছে কারণ দিগিন্দ্রনারায়ণের উগ্র অহমিকাজনিত দুর্বলতাটুকু না থাকলে তার পক্ষে তাঁর অতি সুরক্ষিত বাড়ীটিতে প্রবেশ করার কোনও উপায়ই ছিল না, ইচ্ছামত অনুসন্ধান তো দূরের কথা। প্রথম কয়েকদিনের পরিশ্রম তাদের ব্যর্থ হয়েছে—উল্লসিত হয়েছেন দিগিন্দ্রনারায়ণ। তারপর ব্যোমকেশ বুঝেছে যে দিগিন্দ্রবাবুর টেবিলের ওপর রাখা তাঁরই তৈরী ছোট নটরাজ-মূর্তির মধ্যেই তার লক্ষ্য বস্তুটি লুকিয়ে আছে। অবশেষে বহু কৌশলে বুদ্ধির সূক্ষ্ম প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যোমকেশ দিগিন্দ্রনারায়ণের কবল থেকে সীমন্ত হীরা উদ্ধার করেছে।

গল্পের শেষে দেখি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ত্রিদিবেন্দ্র নারায়ণ বেশ স্ফীত অঙ্কের অর্থ ব্যোমকেশের নামে পাঠিয়েছেন বটে, কিন্তু দিগিন্দ্রনারায়ণের মতো প্রতিভাবান ব্যক্তির সঙ্গে বুদ্ধির খেলায় জয়ী হওয়ার যে আনন্দ তা নিঃসন্দেহেই যে কোনও পার্থিব মূল্যের থেকে অনেক বেশী।

মাকড়সার রস [১৩৪০] : 'মাকড়সার রস' গল্পেও সাধারণ অর্থে যাকে 'ক্রাইম' বলা যায় তা নেই—আছে বুদ্ধির খেলা, তবে তা সুবুদ্ধির নয়, দুর্বুদ্ধির।

এ গল্পের নন্দদুলালবাবু কলকাতার এক বনেদী বংশের বংশধর। অপরিমিত বিত্তের অধিকারী এই প্রৌঢ় যৌবনে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করে পঞ্চাশ বছর হতে না হতেই অর্জন করেছেন পঙ্গুত্ব, হৃদরোগ প্রভৃতি একাধিক ক্লেশদায়ক ব্যাধি। তাঁর সাধ যৌবনের দিনগুলির মতই নানা ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করার অথচ সাধ্য নেই, তাই পৃথিবী শুদ্ধ লোকের প্রতি তাঁর বিরাগ ও বিতৃষ্ণা। স্ত্রী, পুত্র কারোর প্রতিই তিনি প্রসন্ন নন। তাঁর সারাদিনের কাজ দিস্তা দিস্তা পৃষ্ঠায় কালো কালিতে অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ কাহিনী লিখে

চলা এবং মাঝে মাঝে লাল কালিতে গল্পের বিশেষ বিশেষ অংশ রেখাঙ্কিত করা। সর্বোপরি তাঁর বর্তমানের নেশার দ্রব্যটি বিস্ময়কর! মদ, গাঁজা, চণ্ডু, চরস নয়, মাকড়সার রস। এ মাকড়সা অবশ্য আমাদের পরিচিত সাধারণ মাকড়সা নয়, 'ট্যারাণ্টুলা' নামে একজাতীয় বিশেষ মাকড়সা, যার শরীরের রস সামান্য একটু পান করলেই মানব-শরীরের স্নায়ুমণ্ডলের একটা প্রবল উত্তেজনা হয়। ঐ রস একপ্রকার বিষ তাই নিয়মিত এর ব্যবহার করলে অস্বাভাবিক উত্তেজনায় স্নায়ুমণ্ডল অসাড় হয়ে পড়ে এবং তারপরে মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতে মৃত্যু অনিবার্য, বিশেষতঃ নন্দদুলালবাবুর মত ব্যাধিগ্রস্ত, দুর্বল মানুষের পক্ষে মাকড়সার রসের প্রতিক্রিয়া দারুণ ক্ষতিকর। অথচ এই অবুঝ, একজেদী মানুষটি নিজের হিতাহিত বুঝতে নারাজ। অজিতের একদা সহপাঠী মোহন নন্দদুলালবাবুর গৃহ-চিকিৎসক। তার নিষেধের ফলেই প্রকাশ্যে নন্দদুলালবাবুর মাকড়সার রস পান বন্ধ করা হল। কিন্তু তাঁর দুই পুত্র অরুণ ও অভয়, তাঁর স্ত্রী, এবং গৃহচিকিৎসক মোহনের সতর্ক প্রহরা ও আন্তরিক প্রয়াস সত্ত্বেও নন্দদুলালবাবু কি অভাবনীয় কৌশলে তাদের উপস্থিতিতেই নিয়মিত সেই বিষাক্ত পানীয়টি গ্রহণ করে চললেন এই গল্পে সেইটাই আসল রহস্য। তিনি নিজে ঘরের বাইরে যেতে অক্ষম, তাঁর ঘরে সপ্তাহে একদিন রেজিস্ট্রি চিঠি সই করাতে এক ডাক পিওনের আগমন ছাড়া বাইরের আর কারো যাতায়াত নেই, আর সেই পত্রবাহক যে খামটি দিয়ে যায় তাতে একটি সাদা কাগজ ছাড়া আর কিছুই থাকে না, তবু কোন্ সূত্রে যে নন্দদুলালবাবু তাঁর হাতের কাছেই সেই অতি দুর্লভ নেশার বস্তুটি পেয়ে যান তা কিছুতেই আবিষ্কার করা যাচ্ছে না। যদিও এই সমস্যার সঙ্গে নন্দদুলালবাবুই প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, অন্য কারো স্বার্থ জড়িত নেই, তিনি যা করছেন তাতে একমাত্র তাঁরই জীবনহানির আশংকা, কিন্তু তাঁর স্ত্রী ও পুত্রদের পক্ষে তাঁর এই মাদক দ্রব্যের মাধ্যমে তিলে তিলে বিষ পান করার হঠকারিতাকে নিশ্চেষ্ট-ভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়, আর এইরকম একটি চলচ্ছক্তিহীন প্রৌঢ়ের কূট চালে পরাস্ত হওয়াটা পারিবারিক চিকিৎসক মোহনের পক্ষে যেন রীতিমত অপমানকর। তাই অজিত ও ব্যোমকেশের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে সে এই আপাততুচ্ছ সমস্যাটিকে ব্যক্ত না করে পারে না। ব্যোমকেশ তখন অন্য একটি জটিলতর সমস্যার সমাধানের জন্য মানসিকভাবে ভারাক্রান্ত, তাই এই ব্যাপারে সে নিজে তদন্ত কার্যে যেতে পারে না, মোহনের সঙ্গে অজিতকে পাঠায় নন্দদুলালবাবুর গৃহে গিয়ে তাঁকে স্বচক্ষে দেখে আসার জন্য। ব্যোমকেশের এই ঔদাসীন্যে মোহন হয়তো তখনকার মতো মনে মনে ক্ষুণ্ন হয়েছে, কিন্তু তার বিস্ময় নিশ্চয়ই সীমা ছাড়িয়ে গেছে যখন সে অনুভব করেছে ব্যোমকেশের প্রতিভা কী গভীর ও প্রখর যার প্রভাবে ঘটনাস্থলে উপস্থিত না হয়েও শুধু অজিতের বর্ণনা শুনেই সত্য তার মানসপটে উজ্জ্বল রেখায় ফুটে উঠেছে।

যে রহস্য নন্দদুলালবাবুর আত্মীয়-স্বজনদের, চিকিৎসক মোহনের, এমনকি ব্যোমকেশের নিত্য সহচর অজিতের পক্ষেও ভেদ করা সম্ভব হয়নি, ব্যোমকেশ ঘরে বসেই তা সমাধান করে ফেলেছে। অনুমানের সাহায্যে সে নিশ্চিতভাবে বুঝেছে যে মাকড়সার রস আর কোথাও নেই, আছে নন্দদুলালবাবুর লাল কালির শিশিতে, আর যে পিওনটি সপ্তাহে

একবার ঘরে ঢোকে, রেজিস্ট্রি চিঠি দিতে আসার ছল করে, কালির দোয়াত বদলে দেওয়াই তার আসল কাজ, নন্দদুলালবাবু কলমে সেই মাদক দ্রব্য মিশ্রিত কালি ভরে রাখেন এবং সারাদিন গল্প লেখার ফাঁকে ফাঁকে ইচ্ছামত কলমের নিব চুষে মাকড়সার রস পান করে নেন। লোকচক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে নিজের দুরভিসন্ধিকে বজায় রাখার কী আশ্চর্য কৌশল! কিন্তু পত্রবাহকটি দুর্লভ মাকড়সার রস সংগ্রহ করে কোথা থেকে? সেই সূত্রও ব্যোমকেশের অগোচর থাকেনি। সেই অসাধারণ মাদকদ্রব্যটি সরবরাহ করে রেবেকা লাইট নামে এক ইহুদি স্ত্রীলোক যার নামে নন্দদুলালবাবুর তরফ থেকে প্রতি মাসে একশ টাকা মানি অর্ডার মারফৎ পাঠান হয়। নন্দদুলালবাবুর মাকড়সার রস সংগ্রহের এই পদ্ধতিটি এত সহজ বলেই তার রহস্য উদ্‌ঘাটন সাধারণ ব্যক্তিদের পক্ষে এত দুরূহ। এ প্রসঙ্গে ব্যোমকেশ নিজে বলেছে—

"এত সহজ তো বটেই। কিন্তু যে লোকের মাথা থেকে এই সহজ বুদ্ধি বেরিয়েছে তার মাথাটা অবহেলার বস্তু নয়। এত সহজ বলেই তোমরা ধরতে পারছিলে না।"

উপসংহারে বলা যায়, নন্দদুলালবাবুর আচার আচরণে রুচিবিকার ও উগ্র অশালীনতা পরিস্ফুট হলেও এই প্রায় পঙ্গু প্রৌঢ়ের সক্রিয় চাতুর্য্যে গল্পটি যে আগাগোড়া উপভোগ্য হয়ে উঠেছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

খুঁজি খুঁজি নারি [১৩৬৮]: 'খুঁজি খুঁজি নারি' গল্পের রামেশ্বর রায় শুধু বুদ্ধিমান নন, অসাধারণ রসিক। তিনি যেমন প্রাণ খুলে হাসতে পারতেন, তেমনি হাসাতেও পারতেন। ব্যোমকেশের সঙ্গে রামেশ্বরবাবুর যোগাযোগ প্রায় পনেরো বছরের কিন্তু যোগসূত্রটুকু প্রধানতঃ পত্র বিনিময় মারফৎ বজায় ছিল।

রামেশ্বর বাবু বিত্তবান—কলকাতা শহরে তাঁর আট-দশখানা বাড়ী এবং ব্যাঙ্কে অপর্যাপ্ত টাকা—মৃত্যুর আগে রামেশ্বরবাবুর মনে তাঁর আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত কন্যা-জামাতাকে কিছু অর্থ দেওয়ার বাসনা জেগেছে। অথচ, তৎকালীন আইন অনুযায়ী পিতার ইচ্ছাপত্রে (উইল'এ) নির্দেশ না থাকলে পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যার কোনও অধিকার থাকে না। কিন্তু রামেশ্বরবাবুর পক্ষে এই 'উইল' করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী, কুটিলহৃদয়া পুত্রবধূ লাবণ্য এবং পুত্র কুশেশ্বর রামেশ্বরবাবুকে তাঁর বাড়ীতে প্রায় নজরবন্দী করে রেখেছে। তাঁর লেখা, এবং তাঁর নামে আসা সমস্ত চিঠি পত্রই তারা আগে পড়ে নেয়।

রামেশ্বরবাবু বুঝেছিলেন তাঁর ইচ্ছাপত্রে কন্যা নলিনীর জন্য অর্থ বা সম্পত্তির ব্যবস্থা রাখলে পুত্রবধূ লাবণ্য তাঁর মৃত্যুর পর সে 'উইল' কিছুতেই কার্যকর করতে দেবে না। বৃদ্ধ রামেশ্বরবাবু আপাত দৃষ্টিতে যত অসহায় হোন না কেন, তিনি বুদ্ধিবলে বলীয়ান্। সেই বুদ্ধির শাণিত অস্ত্রের দ্বারাই রামেশ্বরবাবু তাঁর পুত্রবধূর সমস্ত সতর্কতা ও প্রহরার দুর্গ ভেদ করে যে অভিনব পন্থায় তাঁর ইচ্ছাকে মুক্তি দিলেন তা সত্যিই বিস্ময়কর।

প্রাজ্ঞ বৃদ্ধটি অনুভব করেছিলেন তাঁর মৃত্যু সমাসন্ন তাই প্রতি বছরের মত সে বছরেও স্বকীয় সরস ভঙ্গীতে ব্যোমকেশ ও অজিতকে নূতন বর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে যে চিঠি লিখেছিলেন তার উপসংহার অংশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইংগিত ছিল—"মৃত্যুর পূর্বে

বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থা করিয়াছি। আপনি দেখিবেন আমার শেষ ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়। আপনার বুদ্ধির উপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে।"

অন্যদিকে ঐ সময়েই নলিনীকে নববর্ষের আশীর্বাদ জানিয়ে লিখেছেন 'যদি ভালো-মন্দ কিছু হয়, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বক্সী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিও'।

রামেশ্বরবাবুর চিঠিতে তাঁর আসন্ন মৃত্যুর ইঙ্গিত পেয়ে ব্যোমকেশ উদ্বিগ্ন হয়েছে—কিন্তু এই চিঠির প্রকৃত তাৎপর্য যে কত সুদূরপ্রসারী ব্যোমকেশ তখনই তা বুঝতে পারেনি, বুঝেছে অল্প কিছুদিন বাদে রামেশ্বরবাবুর মৃত্যুর পর। রামেশ্বরবাবুর জীবিতাবস্থায় ব্যোমকেশের আপ্রাণ প্রয়াস সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু নানা সূত্রে এই সত্যান্বেষী বুঝেছিল যে তাঁর এই বৃদ্ধ বন্ধুটি উইলের মারফৎ নিশ্চয় নিজ কন্যা নলিনীর জন্য কিছু বিষয় সম্পত্তির ব্যবস্থা করে গেছেন, এবং সেই 'উইল' তাঁর বাড়ীতেই আছে। কিন্তু কুটিলবুদ্ধি লাবণ্য কিছুতেই ব্যোমকেশকে উইল খোঁজার জন্য বাড়ীতে ঢোকার অনুমতি দেবে না একথা ব্যোমকেশ আগেই অনুমান করেছে। তাই সে পুলিশের সাহায্য নিয়ে রামেশ্বরবাবুর গৃহে প্রবেশ করেছে। তারপর সারা বাড়ী পুঙ্খানুপুঙ্খ খুঁজেও উইলের চিহ্ন মাত্র না পেয়ে ব্যোমকেশ যখন রীতিমত চিন্তিত তখন এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটেছে—রামেশ্বরবাবুর টেবিলের ওপরে পাওয়া গেছে একটি গঁদের শিশি যার ঢাকনি খুলতেই পেঁয়াজের তীব্র গন্ধে সারা ঘর ভরে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যোমকেশের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় এবং দেহের সমস্ত স্নায়ু সজাগ হয়ে উঠেছে, তার মনে বিদ্যুৎ চমকের মত একটি অদ্ভুত সম্ভাবনার উদয় হয়েছে। লাবণ্যকে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করে সে জানতে পেরেছে রামেশ্বরবাবু আগে কাঁচা পেয়াজ খেতেন না, নববর্ষের কিছুদিন আগের থেকেই তাঁর হঠাৎ কাঁচা পেঁয়াজের শখ হয় কিন্তু দন্তহীন বৃদ্ধের চিবিয়ে খাওয়ার সামর্থ্য ছিল না, তাই ছোট হামানদিস্তায় নিজের হাতে পেয়াজ ছাঁচতেন। ব্যোমকেশ যা জানতে চেয়েছিল তখনই জানা হয়ে গেছে—ইন্‌সপেক্টর ও অজিতকে নিয়ে সে ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ী ফিরে এসে তাকে লেখা রামেশ্বরবাবুর নববর্ষের চিঠিটা খুঁজতে বসেছে—ভাগ্যক্রমে চিঠি অক্ষত অবস্থাতেই পাওয়া গেছে—তারপর আগুনের তাপে চিঠির বিপরীত দিকটা উত্তপ্ত হয়ে উঠতেই সাদা কাগজের ওপর ধীরে ধীরে অক্ষর ফুটতে সুরু করেছে—হ্যাঁ সেইটিই রামেশ্বরবাবুর উইল—পুত্রবধূ ও পুত্রের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য তিনি ব্যোমকেশের চিঠির উল্টোপিঠে পেঁয়াজের রসের অদৃশ্য কালিতে তাঁর বিষয়-সম্পত্তি সম্পর্কিত শেষ ইচ্ছাকে সুকৌশলে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন। সেই ইচ্ছাপত্র অনুসারে কন্যা নলিনী তো তাঁর সম্পত্তির বেশ কিছু অংশ পাবেই, কিন্তু লক্ষণীয় যে উদারচিত্ত বৃদ্ধ পুত্র ও পুত্রবধূর দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করেননি, কুশেশ্বরের জন্যও তিনি যথেষ্ট স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ রেখে গেছেন।

রামেশ্বরবাবু যে প্রকৃত রসিক ছিলেন, অভিনব উপায়ে রচিত এই উইলটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি সূক্ষ্মবুদ্ধির অধিকারী, ব্যোমকেশ-প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ন তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তিনি যে যোগ্য পাত্রেই তাঁর আস্থা ও বিশ্বাস অর্পণ করেছিলেন ব্যোমকেশ তাঁর দেওয়া দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করে তা বুঝিয়ে দিয়েছে, অবশ্য উইলের

অনুসন্ধানকালে পেঁয়াজের রসে ভরা শিশিটি আবিষ্কৃত না হলে ব্যোমকেশের মতো ক্ষুরধার বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও লক্ষ্য বস্তুর সন্ধান পাওয়া সম্ভব হত কিনা সে কথা ভেবে দেখার বিষয়। সর্বোপরি তিনি শুধু নিজ পুত্র কন্যার জন্যই সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়ে যান নি, বয়সের ভার যে তাঁর মস্তিষ্কটিকে স্পর্শ করেনি তা বোঝা যায় যখন দেখি ব্যোমকেশের পারিশ্রমিক হিসাবে পাঁচহাজার টাকার উল্লেখ করতেও তিনি ভোলেন নি। শুভবুদ্ধির অধিকারী, পরিহাস প্রিয়, প্রসন্নচিত্ত এই বৃদ্ধের কার্যকলাপ ব্যোমকেশ ভক্তদের পক্ষে নিশ্চয়ই এক দুর্লভ সঞ্চয়।

॥ ৬ ॥

ব্যোমকেশ ঃ 'সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী' বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীর পাঠক মহলে একটি অতি জনপ্রিয় চরিত্র। নাম ও পদবীর মধ্যে 'ক' ও 'স'-এর অনুপ্রাসজাত ধ্বনি হিল্লোলটুকু রসিকজনের শ্রুতি অগোচর থাকেনা। কিন্তু নামটি কি কোন অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বহন করছে? এই প্রসঙ্গে ব্যোমকেশের নিজের মন্তব্যই আগে শোনা যাক—'উপসংহার' গল্পে ব্যোমকেশ কথা প্রসঙ্গে অজিতকে বলেছে,—

"মানুষের সত্যিকার নামকরণ হয় সম্পূর্ণ খেয়ালের বশে, অধিকাংশ স্থলেই কানাছেলের নাম হয় পদ্মলোচন। যেমন তোমার নাম অজিত, আমার নাম ব্যোমকেশ —আমাদের বর্ণনা হিসাবে নাম দুটোর কোনও সার্থকতা নেই।"

কিন্তু ব্যোমকেশ যাই বলুক না কেন তার নামকরণ ব্যর্থ বা নিরর্থক একথা সম্পূর্ণ মেনে নেওয়া যায় না। এক হিসেবে সে সার্থকনামা, কারণ ব্যোমকেশ শব্দটির অর্থ শিব। সত্য, শিব ও সুন্দরকে যদি অভিন্ন বলে ধরা যায় তা হলে সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী শিব বা মঙ্গলকেই তার কর্মের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। প্রসঙ্গতঃ আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা যেতে পারে, বাংলা-রহস্য-সাহিত্য শাখার অন্যতম জনপ্রিয় এই চরিত্রটিও কিন্তু যোগীশ্রেষ্ঠ মহাদেবের মতই ধীর, স্থির, শান্ত কিন্তু যখন তার অন্তরে ক্রোধবহ্নি জ্বলে ওঠে তখন সে ধ্বংসলীলায় মাতে, অবশ্য বিশ্বসৃষ্টিকে নয়, প্রতিপক্ষের অশুভ শক্তিকে সে আঘাত করে। এই সব কারণেই মনে হয় শরদিন্দুর গোয়েন্দাগল্পমালার নায়ক রূপে ব্যোমকেশের নামটি নিঃসন্দেহেই অর্থবহ।

বাংলা ১৩৩৯ সন থেকে সুরু করে এখনও পর্যন্ত এই সুদীর্ঘকাল পরিধি জুড়ে ব্যোমকেশ বক্সী বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যলোকে অপ্রতিহত মহিমায় বিরাজ করছে। পাঠকের মানসলোকে তার জয়-গৌরব অম্লান, জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। কোন্ যাদুমন্ত্রে ব্যোমকেশ-কাহিনীর প্রতি পাঠকের আকর্ষণ আজও অক্ষুন্ন তা বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ব্যোমকেশ চরিত্র। রহস্য বা গোয়েন্দা কাহিনীতে সাধারণতঃ অপরাধ, অপরাধী এবং গোয়েন্দার কার্যকলাপই মুখ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু ব্যোমকেশের কাহিনীগুলিতে লেখক কী আশ্চর্য কৌশলে ফুটিয়ে তুলেছেন, শুধু এক অপরাধ সন্ধিৎসু ডিটেক্‌টিভকে নয়, দেশ-কাল ও সমাজের ক্রম বিবর্তিত পটভূমিকায় এক সজীব ব্যক্তিত্বকে। ব্যোমকেশের আবির্ভাবকালে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের আসর

রহস্যভেদীদের সমাগমে জনাকীর্ণ কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা মূলতঃ রবার্ট ব্লেক বা শার্ল'ক হোমসের ছায়ামাত্র। তাই জীবনবোধের স্বাতন্ত্র্যে, উপলব্ধি ও অনুসন্ধান পদ্ধতির মৌলিকতায়, অভিরুচি ও জীবনচর্যার স্বকীয়তায় ব্যোমকেশ যখন তার অনন্য কায়া রূপটি নিয়ে উপস্থিত হল, তখন সে যে আবির্ভাব-লগ্নেই বিপুলভাবে জন-সম্বর্ধিত হবে এতে আর বিস্ময়ের কি আছে ?

ব্যোমকেশের জীবন পটভূমিটুকু লক্ষ্য করে মনে হয় এ মন্তব্য অযৌক্তিক নয় যে ব্যোমকেশ একজন স্বপ্রতিষ্ঠ মানুষ। তার বাবা ছিলেন স্কুল মাস্টার, স্কুলে অঙ্ক শেখাতেন আর বাড়িতে সাংখ্য পড়াতেন। মা ছিলেন বৈষ্ণব বংশের মেয়ে, নন্দগোপাল নিয়েই থাকতেন। অজিতের জবানীতে ব্যোমকেশের জীবনের নেপথ্য কাহিনী মর্ম্মস্পর্শী—

"ব্যোমকেশের বাল্য ইতিহাস আমার জানা ছিল। তাহার যখন সতেরো বছর বয়স, তখন তাহার পিতার যক্ষ্মা হয়, মাতাও সেই রোগে মারা যান। আত্মীয় স্বজন কেহ উঁকি মারেন নাই। তারপর ব্যোমকেশ জলপানির জোরে বিশ্ববিদ্যা সমুদ্র পার হইয়াছে, নিজের চেষ্টায় নূতন জীবন-পথ গড়িয়া তুলিয়াছে। আত্মীয়স্বজন এখনও হয়তো আছেন, কিন্তু ব্যোমকেশ তাঁহাদের খোঁজ রাখে না।" (আদিম রিপু)

—এই বিবৃতি থেকে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে তরুণ ব্যোমকেশের চরিত্রের দুটি বিশিষ্ট দিক—আত্মপ্রত্যয় ও মেধা।

অজিতের সঙ্গে ব্যোমকেশের প্রথম পরিচয় 'সত্যান্বেষী' গল্পে। প্রথম সাক্ষাতের সেই অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা অজিতের বর্ণনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে—

"আমিও উঠি উঠি করিতেছি, এমন সময় একটি লোক আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার বয়স বোধ করি তেইশ-চব্বিশ হইবে, দেখিলে শিক্ষিত ভদ্রলোক বলিয়া মনে হয়। গায়ের রং ফরসা, বেশ সুশ্রী সুগঠিত চেহারা, মুখে চোখে বুদ্ধির একটা ছাপ আছে।"

প্রথম দর্শনেই ব্যোমকেশের সম্পর্কে অজিতের এই মূল্যায়ন যে কত অভ্রান্ত সে কথা পরবর্তীকালে বারংবার প্রমাণিত। রহস্যের কুজ্ঝটিকায় ঘেরা অপরাধ জগতে সত্যের অমৃত পথ সন্ধানী সত্যান্বেষীর একমাত্র হাতিয়ার এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির শাণিত তরবারি। এই প্রবুদ্ধ, প্রগাঢ় মানসিক অনুভূতিকেই আমরা তার 'তৃতীয় নয়ন' বলতে পারি। সাধারণ মানুষের দেখা যেখানে শুধু চর্মচক্ষুর দৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ ব্যোমকেশ সেখানে মর্মচক্ষুর সাহায্যে কত অজানাকে জেনে নিতে পারে, চিনে নিতে পারে কত অচেনাকে। শরদিন্দুর লেখা অধিকাংশ গোয়েন্দা কাহিনীতেই দেখা যায় যেখানে পুলিশ ছকে বাঁধা অনুসন্ধান পদ্ধতিতে রহস্যভেদ করতে গিয়ে পরাস্ত সেখানে ব্যোমকেশ এক বা একাধিক আপাত তুচ্ছ সূত্র অবলম্বন করে সার্থক হয়েছে। কখনো ছুঁচের সঙ্গে পরানো কালো রেশমের সুতো (অর্থমনর্থম্), কখনো মৃতের পায়ের মোজা, (চিড়িয়াখানা), কখনো চাবি (মগ্নমৈনাক), কখনো আঁকা ছবি (বহ্নিপতঙ্গ), আবার কখনো কারো বেফাঁস উক্তি (রমু নম্বর দুই)—এই রকম আরো অজস্র উপাদান, যেগুলি ব্যোমকেশের সহযোগী

(অথবা ব্যোমকেশ যাঁদের সহযোগী) পুলিশ, দারোগা বা সহকারী অনুসন্ধানকারীদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, নয়তো অপ্রয়োজনীয় হিসেবে উপেক্ষিত হয়েছে, ব্যোমকেশ অপূর্ব প্রতিভা বলে সেই ভস্মস্তূপের ভিতর থেকেই রহস্য উন্মোচনের পরমাশ্চর্য পরশমণিটিকে আবিষ্কার করেছে। ব্যোমকেশের সত্যানুসন্ধান পদ্ধতির মূল প্রেরণা স্বরূপ তার মুখে এই সূক্তিটি আমরা একাধিকবার উচ্চারিত হতে শুনেছি—

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, মিলিলে মিলিতে পারে লুকানো রতন।"

ব্যোমকেশের অনুসন্ধান পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ ও অনুমান এই দুইয়েরই সম প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যোমকেশ যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয় তেমনই অনুমান শক্তির দ্বারা সে অনায়াসেই অনেক তথ্যগত অপ্রতুলতাকে পূরণ করে নেয়। যুক্তিনিষ্ঠ সেই অনুমানগুলি যে কতদূর যথার্থ তা কালক্রমে প্রমাণিত হয়। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে পড়ছে দুটি বিখ্যাত কাহিনীর কথা—'চিড়িয়াখানা' ও 'মগ্নমৈনাক'। 'চিড়িয়াখানা'য় ডাক্তার ভুজঙ্গধর গোলাপ কলোনীর কর্ণধার নিশানাথ সেনের উচ্চ রক্তচাপের সুযোগ নিয়ে তাঁকে এমন কৌশলে হত্যা করে যে সেই হত্যাকাণ্ড পুলিশের চোখে এমনকি ময়নাতদন্তের রিপোর্টেও স্বাভাবিক মৃত্যু বলে প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু ব্যোমকেশই পর্যবেক্ষণ ও অনুমানের সাহায্যে প্রকৃত সত্য উন্মোচিত করেছে। 'মগ্নমৈনাকে'ও হেনা মল্লিকের মৃত্যু রহস্য-নাট্যের যবনিকা অনুরূপ দক্ষতাতেই উত্তোলিত হয়েছে। রহস্যভেদে অনুমানের গুরুত্ব কতখানি সেই প্রসঙ্গে 'পথের কাঁটা' গল্পে অজিতের প্রতি ব্যোমকেশের তীক্ষ্ণ উক্তি—

"আরে অনুমানই তো আসল প্রমাণ। যাকে তোমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে থাকো তাকে বিশ্লেষণ করলে কতকগুলো অনুমান বৈ আর কিছুই থাকে না।"

অনেক সময়ে দেখা গেছে প্রত্যক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে অপরাধীকে কিছুতেই ধরা যায় না। ব্যোমকেশ বুদ্ধির কৌশলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে বা প্রতিপক্ষের মনের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে যাতে অপরাধী অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। বাধ্য হয়েছে কোনও লুকোনো সম্পদ প্রত্যর্পণে। এই প্রসঙ্গের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত 'রক্তমুখী নীলা' গল্পটি। 'ছলনার ছন্দ' গল্পটিতেও প্রায় অনুরূপ পদ্ধতিই অনুসৃত হয়েছে।

কর্মসূত্রে ব্যোমকেশ একাধিকবার এমন ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিল যেখানে অপরাধ মুখ্য নয়, সত্যান্বেষণ পর্যবসিত হয়েছে বুদ্ধির যুদ্ধে। 'সীমন্ত হীরা', 'মাকড়সার রস', 'খুঁজি খুঁজি নারি' প্রভৃতি গল্পে ব্যোমকেশের বুদ্ধিমত্তার অগ্নিপরীক্ষা পাঠকের পক্ষে পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

শুধু বুদ্ধির দীপ্তি নয়, ব্যোমকেশের স্রষ্টা তাকে আর এক সম্পদেরও অধিকারী করেছেন, সে সম্পদ তার সংবেদনশীল হৃদয়। সাধারণ গোয়েন্দাগল্পগুলিতে দেখা যায় ধৃত অপরাধীর কঠিন দণ্ডলাভ এবং রহস্যভেদীর বিজয়োল্লাসেই কাহিনীর পরিসমাপ্তি। কিন্তু ব্যোমকেশের আচরণে অপরাধীর প্রতি নির্মম হৃদয়হীনতা প্রকাশ পায়না, প্রকাশ পায় এক বিষণ্ণ সহানুভূতি। অনিবার্য প্রবৃত্তিবশে যে মানুষ ইচ্ছায় হোক্, আর অনিচ্ছায় হোক্ অপরাধ করে ফেলে ব্যোমকেশ সব সময়েই তাকে নিষ্ঠুর ঘৃণায় দগ্ধ করেনা।

'সত্যান্বেষী' ও 'উপসংহার'-এর অনুকূল ডাক্তারের, 'চোরাবালি'-র কালীগতির এবং 'মগ্নমৈনাক'-এর সন্তোষ সমাদ্দারের নৃশংস অপরাধে ব্যোমকেশের হৃদয়ে লেলিহান ক্রোধাগ্নি শিখা জ্বলে ওঠে বটে, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ কাহিনীতেই দেখা যায় প্রবৃত্তি তাড়িত মানুষের নির্মম নিয়তির প্রতি ব্যোমকেশের আন্তরিক সহমর্মিতা। শরদিন্দুবাবু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই কৌশল অনুসরণ করেছেন যে যারা প্রথম শ্রেণীর অপরাধী, তারা ব্যোমকেশের সত্যদৃষ্টিতে ধরা পড়লেও আইনের হাতে তাদের লাঞ্ছিত হতে হয় না। প্রধানতঃ আত্মহত্যার মাধ্যমে তারা নিজেদের শাস্তিবিধান নিজেরাই করে যায়। অনেক সময় ব্যোমকেশ তাদের এই পরিণতিকে মনে মনে অভিনন্দন জানিয়েছে, যেমন 'পথের কাঁটা' গল্পের প্রাক্-সমাপ্তি মুহূর্তে ব্যোমকেশকে অজিত প্রশ্ন করেছে—

"আচ্ছা ব্যোমকেশ সত্যি বল, পানের মধ্যে বিষ আছে তুমি জানতে? ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,--জানা এবং না জানার মাঝখানে একটা অনিশ্চিত স্থান আছে, সেটা সম্ভাবনার রাজ্য। কিছুক্ষণ পরে আবার বলিয়া উঠিল, তুমি কি মনে কর প্রফুল্ল রায় যদি সামান্য খুনীর মত ফাঁসি যেত তাহলে ভাল হত? আমার তা মনে হয় না। বরং এমনি ভাবে যাওয়াই তার ঠিক হয়েছে, সে যে কতবড় আর্টিষ্ট ছিল ধরা পড়েও হাত পা বাঁধা অবস্থায়, সে তা দেখিয়ে দিয়ে গেছে।"

'অর্থমনর্থম্'-এ ফণিভূষণ করকে তার প্রার্থিত আধঘণ্টা সময় দিয়ে ফিরে এসে ব্যোমকেশ যখন দেখল ফণী নিজের হাতেই নিজের জীবন-দীপ নিভিয়ে দিয়েছে তখন ব্যোমকেশকে আমরা বলতে শুনি, 'এতটা আমি প্রত্যাশা করিনি। কিন্তু এ ছাড়া তার উপায়ই বা ছিল কি?'

এমন ভাবেই জীবিতাবস্থায় আইনের হাতে ধরা দেয়নি অনেক অপরাধীই, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই ব্যোমকেশ নিজের অনুসন্ধানকে ব্যর্থ বলে মনে করেনি। কারণ অপরাধীর আইনানুগ শাস্তি বিধান নয়, সত্যের স্বরূপ উন্মোচনই তার মূল লক্ষ্য।

ব্যোমকেশের হৃদয়বত্তার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে সেই কাহিনীগুলিতে যেখানে ব্যোমকেশ অপরাধের প্রকৃত পটভূমিকা বিশ্লেষণ করে, অপরাধীকে চিনতে পেরেও তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়নি। কারণ সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের কাছে আইনের সত্য অপেক্ষা হৃদয়ের সত্য অনেক বড় বলে মনে হয়েছে। ব্যোমকেশ জীবন-রসিক, তাই শুষ্ক নীতির বশবর্তী হয়ে জীবনের দাবীকে যে সে সবসময়ে অস্বীকার করেনা তার পরিচয় পাওয়া যায়, 'আদিম রিপু', 'অচিন পাখি', 'রক্তের দাগ', 'দুষ্টচক্র', 'হেঁয়ালির ছন্দ', প্রভৃতি উপন্যাস ও গল্পে। 'আদিম রিপু'তে সে অপরাধীকে নতুন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছে।

ব্যোমকেশ চরিত্রের আর এক আকর্ষণীয় দিক তার রোমাণ্টিক মন। রূঢ়, কঠিন, স্থূল বাস্তবকে নিয়ে তার প্রতিনিয়ত কারবার। তবু মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক সুকুমার প্রবৃত্তিগুলিকে সে কখনো হারিয়ে ফেলেনি। অজিতের প্রতি অকৃত্রিম সখ্যরসে যেমন তার মন চিরসিক্ত, তেমনি মাধুর্যে ভরা তার দাম্পত্য জীবন। 'অর্থমনর্থম্'-এর শেষাংশে লেখক সংক্ষিপ্ত অথচ সরস ভঙ্গিতে ব্যোমকেশ ও সত্যবতীর প্রেমপর্বের মনোগ্রাহী আভাস

দান করেছেন। সত্যবতী বাহ্যিক রূপের বিচারে হয়তো সুন্দরী নয়, কিন্তু সে একটি সুন্দর মনের অধিকারিণী—বুদ্ধিমতী, দয়াবতী, দৃঢ়চেতা। তার এই গুণগুলিই ব্যোমকেশকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। তাই নির্দ্বিধায় তাকে জীবন সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেছে। শুধু নিজের জীবনেই নয়, অন্যের জীবনেও সে সুস্থ, সুরুচিপূর্ণ প্রণয়-অনুভূতিকে সমর্থন জানিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই তার উদার সহযোগিতায় প্রেমিক যুগলের মিলনের পথ প্রশস্ত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'দুর্গরহস্য'-এর তুলসী ও রমাপতি এবং 'বেণীসংহার'-এর ঝিল্লি ও নিখিলের কথা উল্লেখ করা যায়। 'শজারুর কাঁটা'য় দেবাশিস্ ও দীপার প্রকৃত মিলনোৎসবে ব্যোমকেশকে সপরিবারে, সানন্দে যোগ দিতে দেখা যায়।

জীবনচর্যায়, খাদ্যাভ্যাসে, রুচিবোধে, ব্যোমকেশ খাঁটি বাঙালী। ইলিশ মাছের ডিম সহযোগে খিচুড়ি খেতে তার ভালো লাগে। মুরগী তার অন্যতম প্রিয় খাদ্য। অসুস্থ অবস্থায় খাওয়া দাওয়ার নির্মম ধরা বাঁধা ছকে তার মন হয় বিক্ষিপ্ত। নেশা মূলতঃ তাম্রকূট সেবন, তা সে সিগারেটই হোক আর গড়গড়ায় অম্বুরি তামাকই হোক। তার পঠন-পাঠনের বিচিত্র জগৎটির কথাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। ব্যোমকেশ ঠিক কোন্ বিষয়টিকে অবলম্বন করে 'বিশ্ববিদ্যা সমুদ্র' পার হয়েছিল তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়না কিন্তু সর্ব বিষয়ে তার অপার কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার পরিচয় বিভিন্ন সূত্রে বারংবারই পাওয়া যায়। কর্মসূত্রে অপরাধ বিজ্ঞান ও শরীরবিদ্যা সম্পর্কে নানা জ্ঞান তাকে অর্জন করতে হয়েছে। যেখানে নিজের মনে কোন সংশয় জেগেছে সেখানে নিঃসংকোচে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করতে সে পরাঙ্মুখ নয়। যেমন 'দুষ্টচক্র' গল্পে বিশুপালের সাময়িক পঙ্গুত্বের কারণানুসন্ধানের জন্য সে ডাক্তার অসীম সেনকে ফোন করে 'প্রোকেন' জাতীয় ওষুধের কথা জানতে পারে। এই রকম আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এছাড়া খনি বিদ্যা, গ্রহরত্নাদি বিষয়ে জ্ঞান ইত্যাদিও তাকে কর্মোপলক্ষেই অর্জন করতে হয়েছে।

ব্যোমকেশের অবসর বিনোদনের প্রধান সঙ্গী সংবাদপত্র ও গ্রন্থ। অবশ্য অজিতের সাহায্যে দাবা খেলাটাও শিখে নিয়ে সে অজিতকেই গুরু মারা বিদ্যায় পরাস্ত করে। সংবাদপত্রের সংবাদ নয়, বিচিত্র বিজ্ঞাপনই তার মূল পাঠ্য। এই প্রসঙ্গে 'পথের কাঁটা'য় অজিতের প্রতি ব্যোমকেশের মন্তব্য লক্ষণীয়—

> "আসল কাজের খবর থাকে কিন্তু বিজ্ঞাপনে। দেশের কোথায় কি হচ্ছে, কে কি ফিকির বার করে দিনে দুপুরে ডাকাত করছে, কে চোরাই মাল পাচার করবার নূতন ফন্দী আঁটছে,—এইসব দরকারী খবর যদি পেতে চাও তো বিজ্ঞাপন পড়তে হবে। রয়টারের টেলিগ্রামে ওসব পাওয়া যায় না।"

আলোচ্য প্রসঙ্গে ব্যোমকেশের সাহিত্য প্রীতির কথাও নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। যদিও বন্ধু অজিতের মতো সাহিত্যচর্চা তার পেশা নয়, কিন্তু সুসাহিত্য পাঠ তার অন্যতম নেশা। ব্যোমকেশ রবীন্দ্রভক্ত, কিন্তু সে ভক্তি নিছক মৌখিক উচ্ছ্বাসে পর্যবসিত নয়। সে ভক্তির প্রকাশ রবীন্দ্রকাব্য কবিতা থেকে অনর্গল উদ্ধৃতি প্রয়োগ। যেমন 'দুর্গরহস্য'এ ব্যোমকেশ হাত নেড়ে 'বলাকা' কবিতার শেষ পংক্তি আবৃত্তি করেছে, 'হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে।' 'অমৃতের মৃত্যু'তে ব্যোমকেশ হতাশ স্বরে বলেছে 'কৈ আর

পেলাম ? যত দূর চাই, নাই নাই সে পথিক নাই।' ঐ গল্পেই 'বিশ্রান্তি গৃহে ফিরিয়া ব্যোমকেশ আরাম কেদারায় লম্বা হইল, উর্দ্ধে চাহিয়া বোধ করি ভগবানের উদ্দেশে বলিল, কত অজানারে জানাইলে তুমি।' ব্যোমকেশের কাব্য প্রীতির আরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় 'রক্তের দাগ'-এ। অজিত বলেছে,

"ব্যোমকেশ বাংলা সাহিত্যের পুরানো কবিদের লইয়া পড়িয়াছিল, ভারতচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত কবিকে একে একে শেষ করিতেছিল। ভয় দেখাইয়াছিল, অতি আধুনিক কবিদেরও সে ছাড়িবে না।"

ভারতের জাতীয় কাব্য রামায়ণ ও মহাভারত পাঠেও ব্যোমকেশের আগ্রহ অপরিমেয়। 'খুঁজি খুঁজি নারি' গল্পে অজিত আমাদের জানিয়েছে,

"সম্প্রতি ব্যোমকেশ রামায়ণ মহাভারত পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, হাতে কাজ না থাকিলেই মহাকাব্য লইয়া বসে। ইহা তাহার বয়সোচিত ধর্মভাব অথবা কাব্য সাহিত্যের মূল অনুসন্ধানের চেষ্টা বলিতে পারি না। অন্য মতলবও থাকিতে পারে। তবে মাঝে মাঝে তাহার কথাবার্তায় রামায়ণ মহাভারতের গন্ধ পাওয়া যায়।"

'মগ্নমৈনাক'-এ ও রামায়ণ পাঠের প্রসঙ্গ পাই, বলাবাহুল্য অজিতের জবানীতেই—

"দুর্গাপূজা শেষ হইয়া কালীপূজার তোড়জোড় আরম্ভ হইয়াছে, এই সময় একদিন সন্ধ্যার পর ব্যোমকেশ আমাদের বসিবার ঘরে আলো জ্বালিয়া একমনে রামায়ণ পড়িতেছিল। রাজশেখর বসু মহাশয় মূল বাল্মীকি রামায়ণের চুল ছাঁটিয়া দাড়ি-গোঁফ কামাইয়া তরতরে ঝরঝরে করিয়া দিয়াছেন, ব্যোমকেশ কর্মহীন দিবসের আলুনি প্রহরগুলি তাহারাই সাহায্যে গলাধঃকরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল।"

ব্যোমকেশের কাব্যপ্রীতির আর একটি উৎস সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল'— যে বইটি এক সময়ে অজিতই কিনে এনেছিল ব্যোমকেশের জন্যে নয়, খোকার জন্যে। ব্যোমকেশকে অনেক সময়ই রহস্য করে আবোল-তাবোলের ব্যঙ্গ-সরস পংক্তিগুলি আবৃত্তি করতে শোনা গেছে। সব মিলিয়ে বলা যায় যে ব্যোমকেশের বাঙালীয়ানা, তার নিজস্ব রুচিবোধ অভ্রান্ত স্বাক্ষর রেখেছে তার পঠন পাঠনের একান্ত নিভৃত মনোজগতেও।

ব্যোমকেশ চরিত্র সম্বন্ধে এই আলোচনার উপসংহারে আর একটি বিশেষ সূত্র অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল সুদীর্ঘকালে বিস্তৃত গল্পমালার মধ্যমণি ব্যোমকেশের জীবনের কালগত বিবর্তনের প্রতি লেখকের সতর্ক সচেতনতা। বঙ্গ-সাহিত্য সভায় প্রথম প্রবেশ কালে ব্যোমকেশের বয়স তেইশ-চব্বিশ বৎসর। 'অদৃশ্যত্রিকোণ' গল্পে আর একবার ব্যোমকেশের বয়স সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই গল্পে পুলিশ ইন্সপেক্টর রমণীমোহন সান্যালের সম্পর্কে অজিত লিখেছে, "তাঁহার বয়স আমাদের চেয়ে কমই ছিল, বছর চল্লিশের বেশী নয়।"—সুতরাং অনুমান করা যায় ব্যোমকেশ ও অজিতের বয়স তখন চল্লিশের ঊর্দ্ধে। ব্যোমকেশ-স্রষ্টার বিবৃতি অনুসারে 'বেণীসংহার'-এ ব্যোমকেশের বয়স ষাট বছর। সুতরাং রচনা সনের দিক দিয়ে হিসেব করলে বোঝা যায় 'লোহার বিস্কুট' গল্পে ব্যোমকেশের বয়স একষট্টি, কিন্তু বয়সের ভারে যে তার দৈহিক ও মানসিক শক্তির কোন অবক্ষয় হয়নি, অথবা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রশ্রয়ে তার

মন আলস্য-পরায়ণ হয়ে ওঠেনি, যৌবনের দিনগুলির মতই সত্য সন্ধানের ক্ষেত্রে সত্যান্বেষীর আগ্রহ, কর্মতৎপরতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও প্রখর অনুমানশক্তি যে অক্ষুণ্ণই আছে তার সুনিশ্চিত অভিজ্ঞান 'শজারুর কাঁটা', 'বেণী সংহার', 'লোহার বিস্কুট', এবং অসমাপ্ত হলেও 'বিশুপালবধ'।

এইভাবে দীর্ঘকালে পরিব্যাপ্ত রহস্য কাহিনীমালার নায়করূপে একটি মাত্র চরিত্রকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ক্রম বিবর্তিত করার এই সূক্ষ্ম সচেতনতা ও জীবন-রস সমৃদ্ধ বাস্তববোধ নিঃসন্দেহেই স্রষ্টা শরদিন্দুর শিল্প-সাফল্যের অন্যতম প্রধান শর্ত।

অজিত : ব্যোমকেশ কাহিনীমালায় অজিতের ভূমিকা লক্ষ্য করলে অনিবার্যভাবেই মনে পড়ে যায় স্যার আর্থার কোনান ডয়েল সৃষ্ট ডাক্তার ওয়াটসনের কথা। কারণ ওয়াটসনের মত অজিতও কাহিনীর গোয়েন্দা নায়কের সহচর বা তার কীর্তিকলাপের ভাষ্যকার মাত্র নয়, অকৃত্রিম সুহৃদও বটে। তবু অজিতকে ডাক্তার ওয়াটসনের নিছক ছায়া ভাবলে ভুল হবে—এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় ডঃ সুকুমার সেনের মত বিশেষভাবে লক্ষণীয়—

> "অজিত কিন্তু ওয়াটসনের বাংলা সংস্করণ নয়। হোমস্ ও ওয়াটসনের মধ্যে বয়সের বেশ তফাৎ ছিল, মানসিক বৃত্তিতেও অসমতা ছিল। অজিত ব্যোমকেশের প্রায় সমান বয়সী এবং তাহাদের মনোবৃত্তি সমান ভূমির।...পৌরাণিক উপমা টেনে এনে বলা যায় হোমস্ আর ওয়াটসন যেন কৃষ্ণ আর উদ্ধব। ব্যোমকেশ আর অজিত যেন কৃষ্ণ আর সুবল।" [শরদিন্দু অমনিবাস ২ম খণ্ড ত্রয়োদশ মুদ্রণে 'ব্যোমকেশ-উপন্যাস' দ্রষ্টব্য]।

ব্যোমকেশ আর অজিতের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশে ডক্টর সেনের এই মন্তব্য নিঃসন্দেহেই প্রণিধানযোগ্য, তবে তাদের বিরল সৌহার্দর প্রসঙ্গে চকিতের জন্য বাংলা সাহিত্য জগতের আরও দুটি প্রসিদ্ধ চরিত্রের কথা মনে পড়ে যায়। তারা শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত (১ম পর্ব) উপন্যাসে ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত। তাদের উভয়ের মধ্যে যে বিশ্বাসময় সমপ্রাণতা পরিলক্ষিত হয় ব্যোমকেশ ও অজিতের মধ্যেও তা অপ্রতুল নয়, অন্যদিকে বলা যায় নিজের সমস্ত গুণ, কৃতিত্ব ও প্রতিভাকে যথাসম্ভব নেপথ্যে রেখে বন্ধু ইন্দ্রনাথের কীর্তিকলাপ ও তার সর্ববিধ চারিত্রিক অসামান্যকে উজ্জ্বলরূপে উপস্থাপিত করার যে প্রয়াস শ্রীকান্তের মধ্যে দেখা যায়, অজিতের ব্যোমকেশ-কাহিনী কথনের মধ্যেও প্রায় অনুরূপ বৈশিষ্ট্যই পরিস্ফুট হয়। প্রকৃতপক্ষে অজিতের বিশ্লেষণের আলোকেই আমরা ব্যোমকেশ প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ন করতে পারি।

শরদিন্দু অমনিবাসে সংকলিত সর্বপ্রথম গল্প 'সত্যান্বেষী'তেই ব্যোমকেশের সঙ্গে অজিতের প্রথম আলাপের পটভূমিটি জানা যায়। এ ঘটনা বাংলা তেরশ' একত্রিশ সনের। অজিত তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি সবে মাত্র উত্তীর্ণ হয়েছে। তার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল। পিতা ব্যাঙ্কে যে পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করে গেছেন তার সুদ তার একক জীবন ভদ্রভাবে অতিবাহিত করার পক্ষে যথেষ্ট। সে স্থির করেছিল—

কৌমার্য ব্রত অবলম্বন করে সাহিত্য চর্চায় ব্যাপৃত থাকবে। সুতরাং জীবিকা ও জীবন-সঙ্গিনী লাভের গতানুগতিক তাগিদ তার ছিল না। কলকাতায় চীনাবাজার অঞ্চলের কোনও একটি মেসে তার বাস। একদিন মেস বাড়ীর মালিক অনুকূল ডাক্তারের সঙ্গে কথাবার্তার পর সে যখন তখনকার মত বিদায় নেওয়ার উপক্রম করছে এমন সময় এক ব্যক্তির প্রবেশ ঘটেছে। তার বসবাসের জন্য একটি আস্তানার বড় প্রয়োজন, অথচ কোথাও, এমনকি অনুকূল বাবুর মেসেও একটি খালি জায়গা নেই। সেই লোকটি যখন ক্ষুণ্নমনে ফিরে যাওয়ার আগে অনুকূল বাবুর কাছে এক গ্লাস জল চেয়েছে, তখন সেই অতুলচন্দ্র মিত্রের অর্থাৎ ছদ্মনামধারী ব্যোমকেশের প্রতি সহানুভূতিবশতঃ অজিত তাকে নিজের ঘরে স্থান দিতে চেয়েছে। বলাবাহুল্য তার এই সহৃদয়তায় অতুল ওরফে ব্যোমকেশ হাতে স্বর্গ পেয়েছে। 'সত্যান্বেষী' গল্পের আসামী অনুকূল ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করার মুহূর্তে ব্যোমকেশ তার সত্য পরিচয় নিজ মুখে প্রকাশ করার পূর্ব পর্যন্ত অজিত তাকে অতুল নামেই জেনেছে। তারপর দেখা যায় ব্যোমকেশ অজিতকে চা পানের আমন্ত্রণ জানিয়ে শুধু তার হ্যারিসন রোডের বাসায় নিয়েই আসেনি, তার সঙ্গে আন্তরিক আগ্রহে প্রস্তাব দিয়েছে—"ও বাসা তো তোমাকে ছাড়তেই হবে, তা আমার এখানে এলে হত না ? এ বাসাটা নেহাৎ মন্দ নয়।" অজিত ক্ষণকাল চুপ করে থেকে প্রশ্ন করেছে, 'প্রতিদান দিচ্ছ বুঝি ?' ব্যোমকেশ তার কাঁধে হাত রেখে বলছে, "না ভাই, প্রতিদান নয়। মনে হচ্ছে, তোমার সঙ্গে এক জায়গায় না থাকলে আর মন টিকবে না। এই ক'দিনেই কেমন একটা বদ-অভ্যাস জন্মে গেছে।" [সত্যান্বেষী]

সেই সূত্রপাত। এই দুটি অপরিচিত মানুষের মধ্যে জীবন-পথ যে 'বন্ধনহীন গ্রন্থি' বেঁধে দিয়েছিল, তা আমরণ ছিল অটুট। প্রতিদিনের ক্ষণিক সাহচর্যে অজিত শুধু সুহৃদ নয় ভ্রাতা-বন্ধুহীন ব্যোমকেশের পরমাত্মীয়ে পরিণত হয়েছে ব্যোমকেশের জীবন সঙ্গিনীরূপে সত্যবতীর আবির্ভাবের পরও তাদের মৈত্রী-বন্ধন এতটুকুও শিথিল হয়নি, বরং দৃঢ় হয়েছে। অজিত যে ব্যোমকেশের পরিবারেরই একজন হয়ে গেছে তার প্রমাণ 'রক্তের দাগ' গল্পে পাওয়া যায়, সেখানে দেখি খোকাকে অজিতের কাছে রেখে বক্সী-দম্পতি নির্ভাবনায় ভূস্বর্গ-ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছে।

'আদিম রিপু' গল্পে জানা যায় প্রভাতের কলেজস্ট্রীটের বইয়ের দোকানটি কিনে নিয়ে ব্যোমকেশ ও অজিত যৌথভাবে পুস্তক প্রকাশনার ব্যবসায় মনোনিবেশ করেছে। তবে এই গ্রন্থবাণিজ্যে সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ অপেক্ষা সাহিত্যিক অজিতের আগ্রহ স্বাভাবিকভাবেই বেশী। অবশ্য শুধু এই কারণেই যে সে ব্যোমকেশ কাহিনীমালার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তা নয়, স্রষ্টা শরদিন্দু অন্য এক অজুহাতে অজিতকে নেপথ্যে সরিয়ে দিয়েছেন, তাঁর মতে—

> "অজিতকে দিয়ে ব্যোমকেশের গল্প লেখানো আর চলছে না। একে ভাষা সেকেলে হয়ে গেছে, এখনো চলতি ভাষা আয়ত্ত করতে পারেনি, এই আধুনিক যুগেও 'করিতেছি,' 'খাইতেছি' লেখে। উপরন্তু তার সময়ও নেই।…অজিত একদিকে

বইয়ের দোকান চালাচ্ছে অন্য দিকে বাড়ি তৈরীর তদারক করছে, গল্প লেখার সময় কোথায় ?' (১৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত 'বেণীসংহার' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকা।)

তাই 'রুম নাম্বার দুই' থেকে অজিতের মাধ্যমে ব্যোমকেশ-কীর্তির বিবৃতি বন্ধ হয়েছে। 'শজারুর কাঁটা' ও 'লোহার বিস্কুট'—এ অজিত আদ্যন্ত অনুপস্থিত। 'বিশুপালবধ'-এ অবশ্য অজিতের প্রসঙ্গ আছে কিন্তু অজিতের জবানীতে ব্যোমকেশ কাহিনী পাঠের যে এক স্বতন্ত্র স্বাদ আছে তা 'রুম নম্বর দুই', 'ছলনার ছন্দ', 'শজারুর কাঁটা', 'বেণীসংহার,' 'লোহার বিস্কুট', 'বিশুপাল বধ' প্রভৃতি উপন্যাস ও গল্পগুলিতে পাওয়া যায় না।

অজিত ব্যোমকেশের সহকারী নয় বটে এবং অপরাধ বিশ্লেষণে ও রহস্য উদ্ঘাটনে ব্যোমকেশ-তুল্য প্রতিভাও তার নেই। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে সত্য উন্মোচনে নিজের অজান্তেই সে ব্যোমকেশকে উল্লেখযোগ্য সূত্র যুগিয়েছে—যেমন 'দুর্গরহস্য'-এ। এই প্রসঙ্গে উক্ত কাহিনীর ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে স্বয়ং ব্যোমকেশের স্বীকারোক্তি লক্ষণীয়—

"সে যাক। প্রশ্ন হচ্ছে মোহনলাল কে যার জিম্মায় রাজারাম তামাম ধনসম্পত্তি গচ্ছিত রেখে গিয়েছিল ?···আমিও প্রথমটা কিছু ধরতে পারছিলাম না। তারপর অজিত হঠাৎ একদিন পলাশীর যুদ্ধ আবৃত্তি করল—'আবার আবার সেই কামান গর্জন—গর্জিল মোহনলাল' বিদ্যুতের মত মাথায় খেলে গেল মোহনলাল কে। কার জিম্মায় সোনাদানা আছে।"

কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা যায় ব্যোমকেশ অজিতকে অপরাধ উন্মোচনের কাজে সহকারীর দায়িত্ব অর্পণ করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'পথের কাঁটা', 'উপসংহার,' 'চিড়িয়াখানা,' 'শৈলরহস্য' প্রভৃতি গল্প উপন্যাসের উল্লেখ করা যায়।

সুতরাং শুধু সখ্যরসে ব্যোমকেশকে অভিষিক্ত করা বা ব্যোমকেশের কীর্তি-কলাপ লিপিবদ্ধ করাই অজিতের অবদান নয়, কখনও কখনও ব্যোমকেশের কর্মজগতেও অজিতের ভূমিকা ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাই যে কাহিনীগুলিতে অজিত প্রত্যক্ষ পটভূমি থেকে নেপথ্যে সরে গেছে, সেই রচনাগুলি যেন আমাদের মনে এক ধরণের অপূরণীয় অভাববোধের সৃষ্টি করে এবং সেই অনুভূতিই প্রমাণ করে যে ব্যোমকেশের সঙ্গে সঙ্গে অজিতও লাভ করেছে পাঠকের মনোলোকে চির অমরত্বের দুর্লভ সৌভাগ্য।

সত্যবতী ঃ সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ ও সত্যবতী শুধু নামের দিক দিয়েই রাজযোটক নয়, স্বভাব বৈশিষ্ট্যের বিচারেও সত্যবতী এই প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত মানুষটির যোগ্য সহধর্মিনী। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার সঙ্গে কোমল সহৃদয়তায় বাঞ্ছিত সমন্বয় সত্যবতীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। 'অর্থমনর্থম' গল্পে মিথ্যা অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত দাদা সুকুমারকে আইনের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য এই তরুণীটি একই সঙ্গে যে দৃঢ়তা ও বুদ্ধিদীপ্ত মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে তার অন্তরালে সহোদর-প্রীতির মাধুর্যটুকুও ব্যোমকেশের কাছে গোপন থাকে নি। সাধারণ বঙ্গললনাদের তুলনায় অধিক মনোবল সম্পন্না এই নারীটি আক্ষরিক অর্থে সুন্দরী না হলেও সম্ভবতঃ তার বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়েই ব্যোমকেশ তাকে জীবনসঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করেছে।

অবশ্য বিবাহোত্তর জীবনে সত্যবতীকে আমার সাধারণ গৃহবধূদের মতোই স্বামী, সন্তান নিয়ে ঘর সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখি। ব্যোমকেশের বিবাহ-পরবর্তী জীবনে বহু জটিল রহস্যের সমাগম ঘটেছে কিন্তু সত্যবতীকে কোথাও সে সকল গ্রন্থিমোচনের জন্য ব্যোমকেশ:কে সহায়তা করতে দেখিনা বা ব্যোমকেশ কোনও রহস্য জাল ছিন্ন করার কাজে সত্যবতীর সঙ্গে পরামর্শ করেছে এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় না। সত্যবতী ব্যোমকেশের গৃহিণীর পদ অলংকৃত করলেও সচিবের মর্যাদা পায়নি, তবে সমস্যা সমাধানের পর ব্যোমকেশের অভিজ্ঞতার শ্রোতা হিসেবে কখনো অজিতের সঙ্গে, কখনও একা সত্যবতীকে দেখা গেছে।

ব্যোমকেশ কাহিনীমালায় সত্যবতীর মূল ভূমিকা ব্যোমকেশের দাম্পত্য জীবনের সরস মাধুর্যটুকু পরিস্ফুট করা। 'চিত্রচোর' গল্পে পতিপ্রাণা বাঙালী বধূদের মতোই তাকেই স্বামীর স্বাস্থ্যের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হতে দেখি। উক্ত গল্পেই তাদের মান-অভিমান, বিরহ-মিলনের স্বাভাবিক ছবিটি সুচিত্রিত। 'আদিমরিপু'তে দেখি সত্যবতী পুত্রসহ পাটনায়, কিন্তু ঘটনাচক্রে ব্যোমকেশ ও অজিতকে থাকতে হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কবলিত, বিপদসংকুল কলকাতা শহরে। এই অবস্থায় ব্যোমকেশদের জন্য সত্যবতীর দুর্ভাবনা-জর্জর মনের পরিচয় পাওয়া যায় পাটনা থেকে তার ঘনঘন পত্রাঘাতের মাধ্যমে।

অধিকাংশ বাঙালী বধূর মতো সত্যবতীরও অন্যতম শখ দেশভ্রমণ। ভ্রমণস্থল হিসাবে পার্বত্য প্রদেশের প্রতিই তার সমধিক পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করা যায়। 'চিড়িয়াখানা'র সূচনাতেই জানা যায়, 'ব্যোমকেশের শ্যালক সুকুমার সত্যবতীকে ও খোকাকে লইয়া দার্জিলিং গিয়াছে' আবার 'রক্তের দাগ'-এ সত্যবতী ব্যোমকেশের কাছে কাশ্মীর যাওয়ার বায়না ধরেছে।

অর্থলোভ না থাকলেও নারীমনের স্বাভাবিক অলংকার প্রীতির পরিচয় সত্যবতীর চরিত্রে অনুপস্থিত নয়। তাই 'মণিমণ্ডন'-এর উপসংহার পর্বে 'আংটি দেখিয়া সত্যবতীর চক্ষু আনন্দে বিস্ফারিত হইল, 'ওমা, হীরের আংটি! ভীষণ দামী আংটি! হীরেটারই দাম হাজার খানেক'। আংটি নিজের আঙুলে পরিয়া সত্যবতী ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল, 'কেমন মানিয়েছে বল দেখি।' লোহার বিস্কুট'-এ ব্যোমকেশের মুখে অক্ষয় মণ্ডলের স্বর্ণ-সম্পদের হিসাব শুনে 'সত্যবতী কেবল একটি নিশ্বাস ফেলল'।

বহুদিন ভাড়া বাড়ীতে কাটিয়ে পরিণত বয়সে নিজের মনের মতো একটি বাড়ি তৈরী করাতে পেরে সত্যবতী ভারী খুশি, তাই 'ছলনার ছন্দ'-এ জানতে পারি—

"সত্যবতী এই বাড়িটি নিয়ে সারাক্ষণ যেন পুতুল খেলা করছে। আনন্দের শেষ নেই। এটা সাজাচ্ছে, ওটা গোছাচ্ছে, নিজের হাতে ঝাঁট দিচ্ছে, ঝাড় পোঁছ করছে।"

সর্বোপরি, ব্যোমকেশ সুহৃদ অজিতের সঙ্গে সত্যবতীর বিশ্বাস ও বন্ধুত্বের অমলিন সম্পর্কটির কথা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। সত্যবতী সংকীর্ণচিত্তা নারী নয় বলেই তাকে কেন্দ্র ক'রে ব্যোমকেশ ও অজিতের বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে কোনও জটিলতা দেখা দেয়নি, *সত্যবতীর অস্তিত্ব উভয়ের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর তো গড়েইনি উপরন্তু অজিতের প্রতি

তার প্রীতিস্নিগ্ধ আচরণ বঙ্গ-সমাজের দেবর-ভ্রাতৃবধূর চিরন্তন সরস সম্পর্কের প্রতিচ্ছবি রূপেই উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

পুলিস ও ব্যোমকেশ : ব্যোমকেশ বেসরকারী গোয়েন্দা, সত্যান্বেষণ শুধু তার পেশা নয় নেশাও বটে, তাই বিভিন্ন রহস্যের কারণ অনুসন্ধান সূত্রে তাকে বারংবার পুলিসের সান্নিধ্যে আসতে হয়েছে, তাঁদের মধ্যে একদল আছেন যাঁরা ব্যোমকেশ-বিদ্বেষী। কেউ পদমর্যাদার দম্ভে, কেউ ব্যোমকেশের খ্যাতি ও কৃতিত্বে ঈর্ষান্বিত হয়ে, কেউবা নিজের ত্রুটি গোপন করার জন্য, ব্যোমকেশের প্রতি অবজ্ঞা বা উপেক্ষা প্রদর্শন করেছেন। রহস্য-উন্মোচন নয়, ব্যোমকেশের কার্যে বাধা দানই যেন তাঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে আর এক শ্রেণীর দারোগা আছেন, যাঁরা ব্যোমকেশের গুণগ্রাহী। এই ব্যোমকেশ-অনুরাগী পুলিস অফিসারেরা শুধু জটিল তদন্তকার্যে ব্যোমকেশকে সাহায্যই করেননা, প্রয়োজন হলে তার পরামর্শ ও সহায়তাও গ্রহণ করেন। বর্তমান নিবন্ধে সংক্ষেপে ব্যোমকেশ বিদ্বেষী ও ব্যোমকেশ-অনুরাগী এই উভয় শ্রেণীর পুলিসকর্মীদেরই পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে।

ব্যোমকেশ-বিদ্বেষী-পুলিস প্রসঙ্গে যাঁর নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে তিনি 'অর্থমনর্থম' গল্পের বিধুবাবু। ইনি ছিলেন পুলিসের ডেপুটি কমিশনার। স্থূলদেহী, পক্ক গুম্ফ বিশিষ্ট বিধুবাবু বেশ মুরুব্বী গোছের লোক। ব্যোমকেশদের সঙ্গে দেখা হলেই তিনি 'গ্রাম্ভারিভাবে' নানা উপদেশ দিতেন এবং বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতা উভয়দিক দিয়েই যে ব্যোমকেশ তাঁর তুলনায় সর্বাংশে অযোগ্য একথাটাই তিনি নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করতেন। 'অর্থমনর্থম' গল্পের করালীবাবুর হত্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য তিনি যে স্বেচ্ছায় ব্যোমকেশকে ডাকেননি, তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হুকুমেই তিনি যে ব্যোমকেশকে আহ্বান করতে বাধ্য হয়েছেন সে কথা জানিয়ে দিতেও তিনি দেরী করেন নি। এই 'বিধুবাবু'কে তাঁর সহকর্মীরা আড়ালে কেন যে 'বুদ্ধুবাবু' বলে থাকেন তার কারণ তাঁর অপরাধ-অনুসন্ধানের স্থূল পদ্ধতি দেখে সহজেই বোঝা গেছে! মূল সূত্রগুলি লক্ষ্য না করেই তিনি কতকগুলি অগভীর প্রমাণের সাহায্যে প্রথমে মতিলাল ও পরে সুকুমারকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। ব্যোমকেশ তার স্বভাবসিদ্ধ উপায়ে সত্য আবিষ্কার না করলে অপরাধী ফণিভূষণ নিশ্চিন্তে নিরাপদ জীবনযাপন করত, আর সম্পূর্ণ নির্দোষ সুকুমারকে বিনাদোষে নিষ্ঠুর শাস্তি ভোগ করতে হত।

'অমৃতের মৃত্যু' গল্পের দারোগা সুখময় সামন্ত মুখে মিষ্টভাষী, কিন্তু মনটি তাঁর দুর্বুদ্ধিতে ভরা, তিনি প্রকাশ্যে ব্যোমকেশকে সর্ববিধ সহায়তা প্রদানের ভান করলেও নেপথ্যে তার কর্মসিদ্ধির পথে নানারকম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছেন। "পুলিশ যেখানে ব্যর্থ হইয়াছে, একজন বাহিরের লোক আসিয়া সেখানে কৃতকার্য হইবে ইহা বোধ হয় তাঁহার মনঃপূত হয় নাই"—অজিতের এই উক্তিতেই তাঁর ব্যোমকেশ বিদ্বেষের কারণটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিশেষতঃ 'অমৃতের মৃত্যু'র তদন্তে ব্যোমকেশ হস্তক্ষেপ করায় সুখময় সামন্তের আচরণ থেকে মিষ্টতার আবরণ খসে পড়েছে। সেই সময়ে তাঁর রূঢ় ব্যবহারের প্রত্যুত্তরে ব্যোমকেশের দৃঢ়-কঠিন ব্যক্তিত্বের পরিচয় পেয়ে সুখময়বাবু আবার

তাঁর বিনীত বশংবদ রূপটিতেই ফিরে গেছেন—শেষ পর্যন্ত ব্যোমকেশই অমৃতের ও সদানন্দের মৃত্যুরহস্য উন্মোচনের দ্বারা সমস্যার অবসান ঘটিয়েছে।

ব্যোমকেশের বাল্যবন্ধু, মুঙ্গেরের ডি, এস, পি, শশাঙ্কবাবুর মনোভাবটি বড় বিচিত্র। তাঁর আমন্ত্রণেই নিতান্ত ঘরকুণো ব্যোমকেশ অজিতকে নিয়ে কলকাতা থেকে তিনশ মাইল দূরে মুঙ্গেরে উপস্থিত হয়েছে। সে ঠিকই অনুমান করেছিল যে শশাঙ্কবাবুর এই আমন্ত্রণ নিছক বন্ধুবাৎসল্য নয়, এর পশ্চাতে নিশ্চয় কোনও স্বার্থ প্রচ্ছন্ন আছে। প্রকৃত-পক্ষে শশাঙ্কবাবু তাঁর এলাকায় সংঘটিত একটি জটিল রহস্য অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ দাসের মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটনে ব্যর্থ হয়েই ব্যোমকেশের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেন অথচ ঈর্ষা ও আত্মম্ভরিতার বশবর্তী হয়ে এই ধরনের সাহায্যের জন্য ব্যোমকেশের কাছে সরাসরি অনুরোধ জানাতে পারেননি। তিনি চেয়েছিলেন ব্যোমকেশ ঐ খুনের কিনারা করুক, কিন্তু তার কৃতিত্বের অধিকারী হবেন শশাঙ্কবাবু। তাই তারাশংকরবাবুর কাছে এ হত্যার তদন্ত কার্যে ব্যোমকেশের বিন্দুমাত্র যোগাযোগের কথা তিনি স্বীকার করতে চাননি। মনে মনে ব্যোমকেশের ওপর তিনি যত নির্ভর করেছেন বাইরে ততই তার অনুসন্ধান পদ্ধতির প্রতি তাঁর ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর আচরণের মধ্যে এই হীনমন্যতা লক্ষ্য করেই লোক চরিত্র-অভিজ্ঞ ব্যোমকেশ প্রকৃত সত্য জানতে পেরেও তাঁকে কিছু না জানিয়েই কলকাতায় ফিরে আসতে চেয়েছে। কিন্তু শশাঙ্কবাবু যখন কথা প্রসঙ্গে বুঝতে পেরেছেন যে বৈকুণ্ঠ দাসের আততায়ী কে সে-সত্য ব্যোমকেশের অগোচর নেই, তখন তাঁর পক্ষে আর সেই নির্বিকার ঔদাসীন্য বজায় রাখা সম্ভব হয়নি, 'তাহার উরুর উপর হাত রাখিয়া প্রায় অনুনয়ের কণ্ঠে শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'সত্যি বল ব্যোমকেশ কে করেছে?' তারপর শুধু খুনীর নাম জানা নয়, ব্যোমকেশের অনন্যসাধারণ কৌশল-অনুসরণ করে প্রত্যক্ষ প্রমাণসহ অপরাধীকে গ্রেপ্তার করাও শশাঙ্কবাবুর পক্ষে অসম্ভব হয়নি।

'রক্তের দাগ' গল্পের দারোগা ভবানীবাবুকেও ব্যোমকেশের প্রতি সুপ্রসন্ন মনে হয়নি। সত্যকামের মৃত্যুর ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে গেলে ভবানীবাবুর শীতল আচরণ প্রমাণ করে এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য উন্মোচনে ব্যোমকেশের হস্তক্ষেপ তিনি পছন্দ করছেন না। তাঁর প্রকৃত বিরূপতা মৃত সত্যকামের প্রতি। কারণ ভদ্রবেশী শয়তান, দুশ্চরিত্র সত্যকাম আর পাঁচটা মেয়ের মতো তাঁর মেয়ে সলিলাকেও প্রেমের অভিনয়ে বশীভূত করে অধঃপতনের পথে নামাতে চেষ্টা করেছিল। অতএব সত্যকামের মৃত্যুতে তিনি মনে মনে খুশিই হয়েছিলেন, তার আততায়ীকে খুঁজে বার করার জন্য তাঁর কোনও আগ্রহ ছিল না, সুতরাং ব্যোমকেশ সত্য উদ্ঘাটন করুক এটা তিনি চাননি।

'অদ্বিতীয়' গল্পের বিজয় ভাদুড়ী "রোগা লম্বা বেউড় বাঁশের মত চেহারা, কিন্তু অত্যন্ত কর্মতৎপর ও সন্দিগ্ধ চিত্ত ব্যক্তি।" তাঁর পক্ষেও বিধুভূষণ আইচের হত্যাকারীকে চিনে নেওয়া সম্ভবপর হয়নি। তাঁর অনুমান সম্পূর্ণ ভুল পথে চলেছিল। ব্যোমকেশ তার মক্কেল চিন্তামণি কুণ্ডুর পক্ষ অবলম্বন করে তদন্ত কার্যে উৎসাহ প্রকাশ করলে বিজয়বাবু প্রথমে তার প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু কাজের লোক বলেই পরবর্তীপর্যায়ে

ব্যোমকেশের সহায়তা গ্রহণে এবং ব্যোমকেশের সঙ্গে সহযোগিতা স্থাপনে তাঁকে পরাঙ্মুখ দেখি না। এক হিসেবে তিনি ব্যোমকেশ পাঠকদের ধন্যবাদের পাত্র, কারণ 'অদ্বিতীয়'-এর অপরাধ-পারদর্শিনী শান্তা ওরফে প্রমীলা পাল প্রবল প্রতিহিংসায় অন্ধ হয়ে ব্যোমকেশের কণ্ঠ লক্ষ্য করে ছুরি চালালে বিজয়বাবু অসামান্য তৎপরতায় দৃঢ় মুষ্টিতে তার উদ্যত হাতখানি চেপে ধরেছিলেন, তা না হলে সেদিন ব্যোমকেশের প্রাণরক্ষা সম্ভব হত না।

'দুষ্টচক্র' গল্পের দারোগা রমাপতিবাবু আক্ষরিক অর্থে ব্যোমকেশ-বিরোধী নন, আবার তাঁকে সরাসরি ব্যোমকেশ-অনুরাগী হিসাবেও চিহ্নিত করা যায় না। কাজের লোক হিসাবে পুলিস বিভাগে তাঁর সুনাম আছে। তাঁর চেহারা মজবুত, বাচনভঙ্গী অমায়িক, চোখের দৃষ্টি মর্মভেদী। 'দুষ্টচক্র'-এ অভয় ঘোষালের হত্যা রহস্যের তদন্ত কার্যে তিনি ব্যোমকেশের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেননি বরং প্রয়োজনীয় সাহায্যই করেছিলেন।

ব্যোমকেশ অনুরাগী পুলিস-চরিত্রগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম মনে পড়ে সত্যান্বেষী গল্পের নাম-না-জানা সেই দারোগার কথা যিনি অশ্বিনীবাবুর অপঘাত মৃত্যুর পর তদন্ত কার্যে এসে ঐ মেসবাড়ীরই অন্যতম বাসিন্দা, ছদ্মনামধারী ব্যোমকেশের সূক্ষ্ম-বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে মুরুব্বীর মতই প্রশংসা করে বলেছিলেন,—

"আপনি দেখছি বেশ intelligent লোক, পুলিশে ঢুকে পড়ুননা। এ পথে আপনি উন্নতি করতে পারবেন।"

'অগ্নিবাণ ও উপসংহার'-এর বীরেনবাবু ব্যোমকেশের সঙ্গে সুহৃদসুলভ আচরণ করেছেন। 'অচিনপাখি' গল্পে দেখি এই বীরেনবাবুর কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ব্যোমকেশ ও অজিত কলকাতার বাইরে এক মফঃস্বল শহরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে নীলমণিবাবুর বিচিত্র জীবন-কাহিনীর পরিচয় পায়।

'চিড়িয়াখানা'য় গোলাপ কলোনীর স্থানীয় দারোগার নাম প্রমোদ বরাট। তাঁর বয়স বেশী নয়, 'কালোরঙ, কাটালো মুখ, শালপ্রাংশুদেহ পুলিসের ছাঁচে পড়িয়াও তাহার মনটা এখনও শক্ত হইয়া ওঠে নাই, মুখে একটু ছেলেমানুষী ভাব এখনও লাগিয়া আছে। করজোড়ে ব্যোমকেশকে নমস্কার করিয়া তদ্গত মুখে বলিল 'আপনিই ব্যোমকেশবাবু ?' তাঁর এই আচরণেই প্রকাশ পায় যে পুলিসের লোক হলেও তিনি ব্যোমকেশের ভক্ত। সুতরাং গোলাপ-কলোনীর রহস্য উদ্ঘাটন কার্যে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত, সক্রিয় সহযোগিতা যে ব্যোমকেশ লাভ করেছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। কয়েক বছর পরে ব্যোমকেশ কর্মসূত্রে যখন কোনও এক কয়লাখানি শহরে উপস্থিত হয়েছে, তখন তার কার্যসিদ্ধির ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রাণহরি পোদ্দারের মৃত্যু রহস্য সমাধানেও প্রমোদবাবু অকুণ্ঠ চিত্তে সাহায্য করেছেন।

কলকাতার দক্ষিণ অঞ্চলের দারোগা রাখাল সরকার ব্যোমকেশকে 'ব্যোমকেশদা' সম্বোধন করে শুধু তাঁর ব্যোমকেশ প্রীতিই প্রকাশ করেননি, সর্বব্যাপারে একনিষ্ঠ অনুজের মতই নিঃসংকোচে অগ্রজ প্রতিম সত্যান্বেষীর পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ করেছেন। 'রুমনম্বর দুই', 'ছলনার ছন্দ', 'শজারুর কাঁটা', 'বেণীসংহার', 'লোহার বিস্কুট', প্রভৃতি একাধিক কাহিনীতে তাঁর ব্যোমকেশ-অনুরাগ অকপটভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

'মণিমণ্ডন'-এর পুলিস ইনস্‌পেক্টর অমরেশ মণ্ডল, 'খুঁজি খুঁজি নারি'র ইন্সপেক্টর হালদার', 'মগ্নমৈনাক'-এ ব্যোমকেশ বন্ধু এ. কে. রে বা অতুল কৃষ্ণ রায়—এঁরা সকলেই ব্যোমকেশের গুণগ্রাহী।

আলোচ্য প্রসঙ্গে যাঁর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তিনি পুরন্দর পাণ্ডে। 'চিত্রচোর' উপন্যাস থেকে জানা যায় যে সাঁওতাল পরগণার একটি শহরে সদ্য রোগমুক্ত ব্যোমকেশ অজিত ও সত্যবতীসহ বায়ু পরিবর্তনে এসেছে, সেখানেই বিশিষ্ট বাঙালী ভদ্রলোক মহীধর বাবুর বাড়ীতে চা-পানের নিমন্ত্রণের আসরে পুলিশের ডি. এস. পি. পুরন্দর পাণ্ডের সঙ্গে ব্যোমকেশদের প্রথম আলাপ। "ইনি বাঙালী নন, কিন্তু পরিষ্কার বাংলা বলেন, বাঙালীর সহিত মেলামেশা করিতেও ভালবাসেন। লোকটি সুপুরুষ, পুলিসের সাজ-পোশাক দিব্য মানাইয়াছে।" পাণ্ডে রসিক এবং বাক্‌পটু। তাই "ব্যোমকেশের হাত ধরিয়া মৃদু হাস্যে বললেন, 'আপনি এসেছেন, কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য একটি জটিল রহস্য দিয়ে যে আপনাকে সংবর্ধনা করব তার উপায় নেই। আমাদের এলাকায় রহস্য জিনিসটার একান্ত অভাব।" পাণ্ডের এই মনোবেদনা অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি কারণ অচিরেই সেই সাঁওতাল পরগণার ছোট্ট শহরটিতে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার অমরেশ রাহা তাঁর অসাধু কীর্তিকলাপের দ্বারা যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলন। পুরন্দর পাণ্ডে নিজে পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। ব্যোমকেশ সেখানে সত্যান্বেষণে নয়, বায়ু পরিবর্তনের জন্য গিয়েছিল সুতরাং রহস্যময় ঘটনা যদি ঘটেও ব্যোমকেশকে জানাবার কোনও দায়িত্ব পাণ্ডের নেই, কিন্তু অজিতের লেখা ব্যোমকেশ কাহিনীর সূত্রে ব্যোমকেশ তখন খ্যাতকীর্তি ব্যক্তি, তাই অবাঙালী এই পুলিশ অফিসারটির মনে তার বুদ্ধি, যুক্তি, অনুসন্ধান পদ্ধতি সম্পর্কে যথেষ্ট আস্থা ও শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়েছিল। উষানাথ বাবুর বাড়ীতে চিত্রচুরি থেকে সুরু করে যখন যা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছে হয় চিঠির মারফৎ নয়তো নিজে এসে তিনি ব্যোমকেশকে জানিয়েছেন, এবং ব্যোমকেশের নির্দেশগুলি মান্য করেই তাঁর পক্ষে প্রকৃত অপরাধীকে চিনে নেওয়া সম্ভব হয়েছে।

পুরন্দর পণ্ডের সঙ্গে ব্যোমকেশের সৌহার্দ্য নিবিড়তর হয়েছে, 'দুর্গরহস্য'-এ অজিতের বিবৃতি অনুসারে জানা যায়—

> "ব্যোমকেশের শরীর সারাইবার জন্য সাঁওতাল পরগণার যে শহরে হাওয়া বদলাইতে গিয়েছিলাম, বছর না ঘুরিতেই যে আবার সেখানে যাইতে হইবে, তাহা ভাবি নাই। এবার কিন্তু স্বাস্থ্যের অন্বেষণে নয়, পুরন্দর পাণ্ডে মহাশয় যে নূতন শিকারের সন্ধান দিয়াছিলেন তাহারই অন্বেষণে ব্যোমকেশ ও আমি বাহির হইয়াছিলাম।"

সুতরাং পুলিসের লোক হয়েও পাণ্ডের যে ব্যোমকেশের প্রতি ঈর্ষাশূন্য ভালবাসা ছিল তার প্রমাণ জটিল রহস্য সমাধানের জন্য সত্যান্বেষীকে তার এই স্বতঃস্ফূর্ত আমন্ত্রণের মধ্যে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয় কার্যোপলক্ষে ব্যোমকেশরা কয়েকদিন দুর্গে বাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে, পাণ্ডে যে ভাবে তাদের থাকার সুব্যবস্থা ও সুরক্ষার আয়োজন করে দেন তাতে শুধু তাঁর কর্তব্যজ্ঞান নয় ব্যোমকেশের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছাও প্রকাশ পায়। 'বহ্নিপতঙ্গ'-এ জানা যায় পাণ্ডেজির সঙ্গে পাটনায় ব্যোমকেশদের আরও একবার

যোগাযোগ হয়েছিল। তার বছর খানেক আগে পাণ্ডে পাটনায় বদলি হয়ে এসেছেন। ঘটনাচক্রে এই পুনর্মিলনে উভয় পক্ষেই অত্যন্ত আনন্দের সঞ্চার হল। পাণ্ডেজির সঙ্গে দেখা হওয়ার পর ব্যোমকেশদের নিত্য সান্ধ্য আড্ডা বসেছে কখনও পাণ্ডের বাড়ীতে, কখনও বা ব্যোমকেশের বাসায়। বিভিন্ন উপাদেয় আহার্য সহযোগে কখনও নানা কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনায়, কখনও পুরানো স্মৃতি রোমন্থনে তাদের সন্ধ্যাকালীন অবসরটুকু উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। এই রকম একটি সান্ধ্য আসরেই 'বহ্নিপতঙ্গ'র রহস্যচক্রের নায়ক পুলিস ইন্‌সপেক্টর রতিকান্তর সঙ্গে ব্যোমকেশদের সাক্ষাৎ। আলোচ্য কাহিনীতে পুরন্দর পাণ্ডেকে দেখলে বোঝা যায় তাঁর পদোন্নতি হয়েছে বটে, কিন্তু পদমর্যাদার গরিমা তাঁর নিরভিমান, অমায়িক হৃদয়টিকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। ব্যোমকেশের সত্য-উদ্ঘাটন প্রতিভার প্রতি তিনি পূর্বের মতই শ্রদ্ধাশীল। তাই রহস্য উন্মোচনের ক্ষেত্রে বিনা দ্বিধায় তিনি ব্যোমকেশের পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। কাহিনীর শেষে দেখা যায় যখন রতিকান্তের পিস্তলের গুলিতে শকুন্তলার এবং পাণ্ডেজির রিভলভারের গুলিতে রতিকান্তের মৃত্যু হয়েছে তখন অজিত মন্তব্য করেছে 'ওদের জীবিত ধরতে পারলেই বোধহয় ভাল হত'—পাণ্ডেজি মাথা নাড়িলেন—'না, এই ভাল।'

এই সংক্ষিপ্ত উক্তির মধ্য দিয়ে স্নেহভাজন পুলিস ইন্‌সপেক্টর রতিকান্তের নৈতিক পদস্খলন ও মর্মান্তিক জীবন পরিণামের জন্য তাঁর গ্লানি ও বেদনা উভয়ই প্রকাশ পেয়েছে।

পাণ্ডেজি জীবন রসিক। পুলিসের কঠিন কর্তব্য পালনের তিক্ততা তাঁর মনকে রসশূন্য করে ফেলেনি। তাই রন্ধনশিল্পেও তাঁর অনায়াস দক্ষতা লক্ষ্য করা যায়। 'বহ্নিপতঙ্গ'-এর উপসংহার অংশে পাণ্ডেজির বাড়ীতে নৈশভোজের আসরে মুর্গীর কাশ্মীরী কোর্মার এক টুকরো মুখ দিয়েই ব্যোমকেশ গদগদকণ্ঠে বলে উঠেছে—'পাণ্ডেজি, আমি চুরি করব।'

পাণ্ডেজি হাসি মুখে ভ্রূ তুলিলেন, 'কী চুরি করবেন ?'

'আপনার বাবুর্চিকে।'

পাণ্ডেজি হাসতে লাগিলেন, বলিলেন, 'অসম্ভব'।

'অসম্ভব কেন ?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আমার বাবুর্চি আমি নিজেই।'

—এ তথ্য বহু বিস্ময়ের নায়ক ব্যোমকেশকেও বিস্মিত করেছে। এরপর শরদিন্দুর লেখা আর কোনও গল্প বা উপন্যাসে পুরন্দর পাণ্ডের দেখা পাওয়া যায়না বটে, কিন্তু ব্যোমকেশ পাঠকদের মানসপটে তাঁর স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকে।

এই আলোচনার সমাপ্তি পর্বে একটি সাধারণ বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। সরকারী দারোগারা ব্যোমকেশ-বিদ্বেষী বা ব্যোমকেশ অনুরাগী যে শ্রেণীভুক্তই হোননা কেন ব্যোমকেশ কাহিনী মালার স্রষ্টা সব সময়ে তাঁর সত্যান্বেষী নায়কের বুদ্ধি ও প্রতিভাকেই জয়যুক্ত করেছেন। পুলিসের বিচারবুদ্ধি ও অনুসন্ধান পদ্ধতির তুলনায়

ব্যোমকেশের তদন্তরীতির স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সর্বক্ষেত্রেই সুপ্রমাণিত। বিশ্বের অধিকাংশ গোয়েন্দা কাহিনীতেই অবশ্য এই পদ্ধতিই অনুসৃত হয়ে আসছে।

॥ ৭ ॥

ব্যোমকেশ-কাহিনীর কয়েকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য : বর্তমান গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের উপসংহার-পর্বে শরদিন্দু-রচিত গোয়েন্দা কাহিনীগুলির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

অধিকাংশ রহস্য-কাহিনীতেই লেখক পুলিসের নিষ্ক্রিয়তা ও অপরাধ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তাদের ব্যর্থতার পটভূমিতেই ব্যোমকেশের দক্ষতা ও সাফল্যের পরিচয় পরিস্ফুট করেছেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠ গোয়েন্দা-কাহিনীর মতোই শরদিন্দু রচিত এই শ্রেণীর সাহিত্যগুলিতেও অপরাধ ঘটে যাওয়ার পর সন্দেহ ঘনীভূত হয় একাধিক চরিত্রের ওপর, কিন্তু প্রকৃত রহস্য উন্মোচিত হলে দেখা যায়, সন্দেহ ভাজনেরা সম্পূর্ণ নিরপরাধ এবং আপাত নির্দোষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গই প্রকৃত অপরাধী। উদাহরণ স্বরূপ 'অগ্নিবাণ', 'অর্থমনর্থম', 'দুর্গরহস্য', 'চিত্রচোর', 'চিড়িয়াখানা', 'মগ্নমৈনাক', 'আদিমরিপু', 'বহ্নি-পতঙ্গ', 'বেণীসংহার' প্রভৃতি উপন্যাস ও গল্পের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

ব্যোমকেশ কাহিনীগুলি সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সপ্তাহের সাতটি বারের মধ্যে ঘটনা-সংঘটনের দিক দিয়ে সর্বাধিক প্রাধান্য লাভ করেছে 'শনিবার।' 'পথের কাঁটা'র বিজ্ঞাপনে পথ নিষ্কণ্টক করবার জন্য উৎসুক ব্যক্তিকে 'শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার সময় হোয়াইটওয়ে লেডলের দোকানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ল্যাম্পপোস্টে' হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকতে বলা হয়েছে। 'সীমন্ত হীরা'য় কুমার ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণকে ব্যোমকেশ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে—"আজ শনিবার, আগামী শনিবারের মধ্যে আপনার হীরা ফেরৎ পাবেন।" 'চোরাবালি'তে তদন্তসূত্রে জানা যায় দেওয়ান কালীগতির নিষ্ঠুর ফাঁদে পড়ে হরিনাথ মাষ্টারের মৃত্যু হয়েছিল শনিবার অমাবস্যার রাত্রে। 'চিত্রচোর' অমরেশ রাহা তার পূর্ব পরিকল্পনা মত ব্যাঙ্কের টাকা চুরি করে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে শনিবারের রাতে। 'রক্তের দাগ'-এ যে রাত্রে সত্যকাম খুন হয়, সে রাত্রিটা ছিল শনিবারেরই অংশ। 'মগ্নমৈনাক'-এ হেনা মল্লিককে সন্তোষ সমাদ্দার যেদিন খুন করেন সে দিনটাও ছিল শনিবার।

সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে শরদিন্দুবাবুর যে রোমান্সের প্রতি প্রবণতা ছিল তাঁর লেখা একাধিক রহস্য-উপন্যাসে ও গল্পে তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। বহু ক্ষেত্রেই মূল সমস্যার পাশাপাশি তরুণ-তরুণীর হৃদয়াবেগস্পন্দিত মানস আকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়। 'অগ্নিবাণ'-এ রেখা ও নন্দুর প্রেম সম্পর্ক, 'চিত্রচোর'-এ ডাক্তার ঘটক ও রজনীর পারস্পরিক আসক্তি, 'দুর্গরহস্য'-এ তুলসী ও রমাপতির ভালবাসা, 'চিড়িয়াখানা'য় বিজয়ের প্রতি মুকুলের প্রেমানুভূতি, 'বেণী সংহার'-এ নিখিলের প্রতি ঝিল্লির বিচিত্র আত্ম-নিবেদন রহস্য-কাহিনীর সংকীর্ণ, কুটিল, মৃত্যুখচিত পটভূমিতেও জীবনের প্রীতি-স্নিগ্ধ, মধুময় রূপটিকে পরিস্ফুট করেছে। অবশ্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে অপরাধমূলক কাহিনীর যোগ্য

'ডিটেক্‌শনের' অভাব জনিত দুর্বলতাটুকু আবৃত করার জন্য সুচতুর লেখক রোমান্সের এই মধুর ও বর্ণোজ্জ্বল প্রলেপটিকে সযত্নে ব্যবহার করেছেন।

কয়েকটি কাহিনীর সূচনাংশে দেখা যায় এক অদ্ভুত যোগাযোগ—ব্যোমকেশ অজিত বা সত্যবতীর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে যে সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেছে কিছুক্ষণ পরেই ঠিক সেই সমস্যাটি সমাধানের দায়িত্ব তারই ওপর এসে পড়েছে—এরকম সমাপতন ঘটেছে মূলতঃ 'পথের কাঁটা', 'অগ্নিবাণ', 'বহ্নিপতঙ্গ', 'রক্তমুখী নীলা' প্রভৃতির ক্ষেত্রে।

ব্যোমকেশ-কীর্তির একনিষ্ঠ পাঠকদের নিশ্চয়ই আরও একটি কৌতূহলোদ্দীপক বৈশিষ্ট্য নজরে পড়বে তা হল শরদিন্দুবাবুর গোয়েন্দা-রচনাগুলিতে অধিকাংশ পরিণত বয়স্ক, প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ পুরুষ চরিত্রই বিপত্নীক। যেমন 'পথের কাঁটা'য় কৈলাস চন্দ্র মৌলিক' 'অর্থমনর্থম্'-এ করালীবাবু, 'ব্যোমকেশ ও বরদা'য় বৈকুণ্ঠদাস, 'চিত্রচোর'-এ মহীধর বাবু, দুর্গরহস্য-এ রামকিশোর সিংহ, 'কহেন কবি কালিদাস'-এ প্রাণহরি পোদ্দার, 'হেঁয়ালির ছন্দ'-এ ভূপেশবাবু, 'বেণী সংহার'-এ বেণীমাধব চক্রবর্তী এঁরা সকলেই বিপত্নীক তো বটেই—এঁদের মধ্যে অনেকেই আবার অপুত্রক। এ ছাড়া ব্যোমকেশের গল্পে আরও দু-একটি পুরুষ চরিত্রের সাক্ষাৎ আমরা পাই যাঁরা অকৃতদার—যেমন 'পথের কাঁটা'য় আশুতোষ মিত্র, 'অদ্বিতীয়' গল্পের চিন্তামণি কুণ্ডু, 'চিত্রচোর'-এর অমরেশ রাহা, 'অচিন পাখি'র নীলমণিবাবু এবং 'অমৃতের মৃত্যু'র সদানন্দ সুর।

শরদিন্দুর লেখা রহস্য কাহিনীগুলিতে দেখা যায় ব্যোমকেশের সত্যান্বেষণ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সার্থক, কিন্তু অনেক অপরাধীই তার কাছে জীবিত অবস্থায় ধরা দেয়নি। এদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যোমকেশের কাছে আত্মসমর্পণের পূর্বে মানসিক প্রস্তুতির জন্য সময় ভিক্ষা করে সেই সুযোগে আত্মহত্যার দ্বারা সমস্যার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে—উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করি 'অর্থমনর্থম্'-এর ফণিভূষণ কর এবং 'মগ্নমৈনাক'-এর সন্তোষ সমাদ্দারের কথা। আবার অনেকেই আইনের বজ্রবাঁধন এড়াবার জন্য অপরাধ ফাঁস হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যোমকেশের সম্মুখেই অপ্রত্যাশিত পন্থায় মৃত্যুর হিমশীতল আলিঙ্গনে নিজেকে সঁপে দিয়েছে—যেমন—'পথের কাঁটা'র প্রফুল্ল রায়, 'চিত্রচোর'-এর অমরেশ রাহা, 'দুর্গরহস্য'-এর মণিলাল, 'চিড়িয়াখানা'র ভুজঙ্গধর ও বনলক্ষ্মী। 'বহ্নিপতঙ্গ'-এর রতিকান্ত ও শকুন্তলা স্বেচ্ছায় না হলেও ঘটনাচক্রে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়া দুটি দম্পতি পলায়নের মাধ্যমে আত্মরক্ষা করেছে তারা হল 'কহেন কবি কালিদাস'-এর ভুবন ও মোহিনী এবং 'শৈলরহস্য'-এর বিজয় বিশ্বাস ও হৈমবতী।

ব্যোমকেশ-কাহিনীগুলিতে হত্যার হাতিয়ার এবং নরহত্যার পদ্ধতিগত বৈচিত্র্য নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্যতার দাবী রাখে। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে অপরাধীদের পিস্তল, রিভলভার, বন্দুক ইত্যাদি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে দেখা যায়, যথা 'আদিম রিপু', 'রক্তের দাগ', 'বহ্নিপতঙ্গ', 'অমৃতের মৃত্যু', 'হেঁয়ালির ছন্দ', 'ছলনার ছন্দ', 'লোহার বিস্কুট' প্রভৃতি রচনায়। 'অদ্বিতীয়', 'রক্তমুখী নীলা' প্রভৃতি গল্পে আততায়ীদের প্রধান অস্ত্র ছুরি। 'সত্যান্বেষী' ও 'বেণীসংহার'-এ হত্যাকার্য সাধিত হয়েছে দাড়ি কামানোর ক্ষুরের দ্বারা। এছাড়া 'পথের কাঁটা'য় গ্রামাফোনের পিন, 'শজারুর কাঁটা'য় শজারুর কাঁটা,

'অগ্নিবাণ'-এ বিষ মাখানো দেশলাই কাঠি, 'দুর্গরহস্য'-এ সাপের বিষ ভরা পার্কার কলম, 'বহ্নিপতঙ্গ'-এ কিউরারি বিষ, 'চিড়িয়াখানা'য় নিকোটিন বিষ, 'রুম নম্বর দুই'-এ তীক্ষ্ণ ফলাযুক্ত সার্জিক্যাল কাঁচি, 'অর্থমনর্থম্-এ গুণছুঁচ প্রভৃতি অভিনব উপকরণ প্রয়োগ করা হয়েছে মানুষের প্রাণহরণের নিষ্ঠুর কাজে। কোথাও কোথাও আবার অস্ত্র নয়, নির্মম বুদ্ধির কৌশলে উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে—যেমন 'চিড়িয়াখানা'য় ভুজঙ্গ ডাক্তার নিশানাথ-বাবুর উচ্চ রক্ত চাপের সুযোগ নিয়ে তাঁকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়েছে, 'চোরাবালিতে' দেওয়ান কালীগতি বাঘের ডাক ডেকে হরিনাথ মাষ্টারকে ভয় দেখিয়ে চোরাবালির অতলে তলিয়ে যেতে বাধ্য করেছে, 'শৈলরহস্য'-এ বিজয় বিশ্বাস মাণিক মেহ্‌তাকে কৌশলে সহ্যাদ্রি হোটেলের পিছনের দিকের বারান্দায় নিয়ে গিয়ে সুগভীর খাদের ভিতরে ঠেলে ফেলে দিয়েছে, 'মগ্নমৈনাক'-এ সন্তোষ সমাদ্দার হেনা মল্লিককে তিনতলার ছাদ থেকে নীচের বাগানে ফেলে দিয়ে তার মৃত্যুকে নিছক দুর্ঘটনা বলে প্রমাণ করতে চেয়েছে। হত্যার এই বিচিত্র পদ্ধতিগুলি নিঃসন্দেহেই কৌতূহলজনক, কিন্তু ততোধিক বিস্ময়কর সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের অস্ত্র ব্যবহারে অদ্ভুত অনীহা। দু একটি ক্ষেত্রে (যেমন অমৃতের মৃত্যুতে) তাকে আত্মরক্ষার্থে পিস্তল নিয়ে বার হতে দেখা যায় বটে, কিন্তু গুলিগোলা ছুঁড়তে কখনই দেখিনা, অনেক সময় কোনও ক্ষিপ্ত অপরাধী তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে সঙ্গের পুলিস-অফিসারই সেই ঘটনার মোকাবিলা করেন, যেমন 'অদ্বিতীয়' গল্পে শান্তা ব্যোমকেশের কণ্ঠ লক্ষ্য করে ছুরি চালালে দারোগা বিজয়বাবু—'বাঘের মত লাফাইয়া পড়িয়া শান্তার কব্জি ধরিয়া ফেলিলেন'— 'লোহার বিস্কুট' গল্পে অপরাধীকে আয়ত্তে আনবার জন্য ব্যোমকেশকে তার চোয়ালে আঘাত করতে দেখি বটে কিন্তু তা সঙ্গের রিভলভার দিয়ে নয়, তার হাতের ভারী টর্চ দিয়ে। আসলে বাহুবল বা অস্ত্রবল ব্যোমকেশের অবলম্বন নয়, তার প্রধান হাতিয়ার বুদ্ধিবল। এই প্রসঙ্গে ব্যোমকেশ-স্রষ্টার স্বীকারোক্তি প্রণিধানযোগ্য—

> 'আমার মেজাজের সঙ্গে গুলি গোলা খাপ খায়না। তাছাড়া গোয়েন্দা-কাহিনীকে আমি ইনটেলেকচুয়াল লেভেলে রেখে দিতে চাই। ওগুলি নিছক গোয়েন্দা কাহিনী নয়।' [শরদিন্দু অমনিবাস, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বাদশ মুদ্রণ, ব্যোকেশের সঙ্গে সাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্য]

পরিশেষে শরদিন্দু-সৃষ্ট রহস্য-রচনাগুলির অপর একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করি—ব্যোমকেশ-সত্যবতীর প্রণয়, পরিণয় থেকে সুরু করে তাদের দাম্পত্য জীবনের মিলন-বিরহের নানা ছবি ধারাবাহিকভাবে ব্যোমকেশ-কাহিনীগুলিতে ছড়িয়ে আছে যেগুলির মারফৎ স্বামী হিসাবে ব্যোমকেশের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু পিতা ব্যোমকেশের পরিচয় সুপরিস্ফুট নয়। বিবাহের চার বৎসর পর সত্যবতীর সন্তান-সম্ভবনা ঘটেছে, 'দুর্গরহস্য'তে তার পুত্রলাভের সংবাদ পাই। এই কাহিনীর উপসংহার অংশে প্রায় ছ মাস পরের ঘটনা-বিবরণে জানা যায়—

> "সত্যবতী একবাটি দুধ ও ছেলে লইয়া মেঝেয় বসিয়াছে, দুধ খাওয়ানো উপলক্ষে মাতা পুত্রে মল্লযুদ্ধ চলিতেছে।"

'চিড়িয়াখানা'য় জানা যায়—

"ব্যোমকেশের শ্যালক সুকুমার সত্যবতী ও খোকাকে লইয়া দার্জিলিং গিয়াছে।"

'রক্তের দাগ' থেকে জানতে পারি খোকা বড় হয়েছে, পুঁটিরামের সঙ্গে পার্কে বেড়াতে যায়। সত্যবতী ও ব্যোমকেশ কাশ্মীর ভ্রমণে যেতে চায় কিন্তু মুশকিল হয়েছে খোকাকে নিয়েই কারণ ব্যোমকেশের ভাষায়—

"খোকা সবে স্কুলে ঢুকেছে, গরমের ছুটিরও দেরী আছে। ওকে স্কুল কামাই করিয়ে নিয়ে যাওয়া আমার উচিত মনে হচ্ছে না।"

শেষ পর্যন্ত সত্যবতীর পরামর্শ অনুযায়ী একটি সুব্যবস্থা হয়. খোকাকে নিয়ে অজিত কলকাতায় থেকে যায়। ব্যোমকেশ ও সত্যবতী বেরিয়ে পড়ে ভূস্বর্গ ভ্রমণে—এই রকম কয়েকটি প্রসঙ্গে খোকার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় মাত্র। ব্যোমকেশ কাহিনীগুলি রচনা-ক্রম অনুসারে পাঠ করলে ব্যোমকেশের বয়ঃবৃদ্ধির ক্রমিক তথ্যটি পাঠকের অগোচরে থাকে না—সে যুবক থেকে প্রৌঢ় হয়েছে, 'বেণীসংহার'-এ তার বয়স প্রায় ষাট বছর, ততদিনে খোকাও নিশ্চয় পূর্ণ যুবক। কিন্তু শেষের দিকের ব্যোমকেশ-কাহিনীগুলিতে খোকার প্রসঙ্গ প্রায় অনুপস্থিত। যদিও স্রষ্টা-শরদিন্দু নিজেই স্বীকার করেছেন—

"ছেলেকে সাধারণতঃ আমি সামনে আনিনি।"

[শরদিন্দু অমনিবাস ২য় খণ্ড দ্বাদশ মুদ্রণ পৃঃ—৬২৮]

কিন্তু ব্যোমকেশের মত প্রতিভাবান পিতার পুত্রের সম্বন্ধে স্বাভাবিক ভাবেই যে কৌতূহল পাঠকমনে থেকে যায় তা চরিতার্থ হওয়ার সুযোগ পায় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঐতিহাসিক রোমান্স ও ইতিহাসাশ্রয়ী গল্পসমূহ

॥ ১ ॥

বাংলা ইতিহাসাশ্রয়ী কথা সাহিত্যের ধারায় শরদিন্দু

বাংলা উপন্যাসের জন্মসূচনা যদিও সামাজিক বিষয়কে অবলম্বন করেই, তবুও এ মন্তব্য বোধকরি অত্যুক্তি নয় যে ইতিহাসের রথে চড়েই বঙ্গোপন্যাসের জয়যাত্রার শুরু। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্তের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য—

"বাঙ্গালা সাহিত্যে টেকচাঁদ ঠাকুরের আলালের ঘরের দুলালকে প্রথম উপন্যাস বলা হয়। উহা প্রণীত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। এই উপন্যাস সামাজিক হইলেও পরবর্তী প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে উপন্যাস রচনা করাই বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান রীতি ছিল। এই যুগে সামাজিক উপন্যাসের অভাব না থাকিলেও উহাদের প্রাধান্য ছিল না।"

[বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস ১ম সংস্করণ পৃষ্ঠা—১]

ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'-এ এই শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে যে নূতন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিলেন সেই পথের পথিক হয়েছেন তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের বহু বঙ্গ লেখক। তাঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চণ্ডীচরণ সেন, মনোমোহন বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের এই সৌভাগ্য ও প্রতিপত্তি দীর্ঘস্থায়ী কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রভাবে বাংলা উপন্যাসে মানুষের সমাজ জীবনের পরিচয়, নানাবিধ বাস্তব সামাজিক সমস্যা ও মানব চরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বসমূহের মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণের ধারাটি প্রবর্তিত হওয়ার ফলে পাঠক হৃদয়ে ঐতিহাসিক রচনার প্রতি আকর্ষণ ক্রমশ হ্রাস পেতে লাগল। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী গত দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে সুখপাঠ্য ঐতিহাসিক কাহিনী সমূহ রচনা করে এই শ্রেণীর ক্রমক্ষীয়মাণ ধারাটিকে সম্পূর্ণ অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন বটে, কিন্তু জনচিত্তে তেমন প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেননি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যাঁদের প্রতিভার জোয়ারে বাংলা ঐতিহাসিক গল্প-উপন্যাসের মরাগাঙে আবার বান ডাকল তাঁদের মধ্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু অন্যতম নন, তাঁকে প্রধানতম হিসাবে চিহ্নিত করাও বোধ হয় অতিশয়োক্তি নয়।

ইতিহাসাশ্রয়ী বঙ্গ-কথা-সাহিত্যের ধারায় শরদিন্দুবাবুর ভূমিকা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হলে এই শ্রেণীর সাহিত্যের স্বরূপ ও লক্ষণ সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এ কথা অনস্বীকার্য যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের যথার্থ সংজ্ঞা প্রদান করা অত্যন্ত দুরূহ। বহুকাল যাবৎ পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য জগতের বহু ঐতিহাসিক, ঔপন্যাসিক এবং ঐতিহাসিক-ঔপন্যাসিকগণ নানাভাবে এই সাহিত্য শাখাটির পরিচয়-প্রদানের চেষ্টা করেছেন। যুগের বিবর্তনের পটভূমিতে এই সকল অভিমতেরও বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটেছে। সেই সব মতামতের সারসংক্ষেপ করে বলা যায়—

"উহা কেবলমাত্র উপন্যাস নহে, ইতিহাসও নহে। উভয়ের যোগাযোগে রচিত এমন এক মনোজ্ঞ কাহিনী যাহা প্রমাণ করে, যে কাল অতীত হইয়া গিয়াছে তাহা একদা বর্তমান ছিল......ইতিহাস অতীতকালের কঙ্কালের পরিচয় বহন করে। কিন্তু সেই কঙ্কালের উপরে রক্তমাংস সংযোজন করিতে পারে উপন্যাস।"

[অপর্ণা প্রসাদ সেনগুপ্ত ; বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস ১ম সংস্করণ পৃষ্ঠা—২১]

অতএব একথা সর্ববাদিসম্মত যে ইতিহাসকে সাহিত্য পদবাচ্য করে তোলার জন্য ইতিহাসের শুষ্ক তথ্যে জীবনরস সঞ্চারের একান্ত প্রয়োজন। এবং সেই কারণেই এই শ্রেণীর রচনায় কল্পনার প্রবেশাধিকার অপরিহার্য। ড. ক্ষেত্রগুপ্তের প্রসিদ্ধ সমালোচনা গ্রন্থ 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস'-এর প্রথম খণ্ডে ইতিহাস ও কল্পনার সমন্বয়ের অনুপাত অনুসারে ইতিহাসাশ্রয়ী রচনাগুলিকে সুস্পষ্ট তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে,—

যথা ঃ

ক. খাঁটি ঐতিহাসিক।

খ. ঐতিহাসিক রোমান্স।

গ. শুদ্ধ রোমান্স।

ইতিহাসের উপাদানের সঙ্গে অনৈতিহাসিক অথচ ইতিহাস অবিরোধী কল্পনার যে অপরূপ সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটলে সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্ম হয় সেই অসাধারণ শিল্প সাফল্য বাঙলা সাহিত্যে বিরল সংখ্যক উপন্যাসই লাভ করতে পেরেছে—তাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ', রমেশচন্দ্র দত্তের 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' ও 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শরদিন্দুবাবুর ইতিহাস নির্ভর কোনও রচনাকেই কিন্তু অবিসংবাদিতভাবে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তাঁর অধিকাংশ ইতিহাসকেন্দ্রিক কাহিনীতেই বর্ণাঢ্য কল্পনাকুশলতা, বিস্মৃতির তমসাচ্ছন্ন সুদূর অতীতের যুগ ও জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলিকে উদ্ভাসিত করে তোলার অননুকরণীয় দক্ষতা, সর্বোপরি রোমান্টিক চিত্তবৃত্তি সঞ্জাত তীব্র গভীর অতীত প্রীতি প্রভৃতি লক্ষণসমূহের সার্থক প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় বটে, কিন্তু তাঁর রচনায় ইতিহাস গৌণ। কল্পনার প্রাধান্যই অপ্রতিহত। ইতিহাসগন্ধী গল্পগুলির ক্ষেত্রে তো বটেই এমনকি 'কালের মন্দিরা', 'গৌড়মল্লার', 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ', 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' প্রভৃতি সুবিখ্যাত উপন্যাসগুলির ক্ষেত্রেও কোথাও কিংবদন্তী কোথাও ইতিহাসের একটি ছিন্ন সূত্র কোথাও বা একটি সামান্য ইঙ্গিতকে ভিত্তি করে কাহিনীর সুরম্য সৌধ রচিত হয়েছে। শরদিন্দুবাবুর অনেকগুলি ইতিহাসাশ্রয়ী রচনার

ঐতিহাসিকতা নির্ণয় করাই দুরূহ কারণ বহু ক্ষেত্রেই তিনি এমন কোনও ঘটনা বা চরিত্রকে অবলম্বন করেছেন যাদের কথা ইতিহাসে নেই বা থাকলেও তা এতই নগণ্য যে সেই তথ্যের শৃঙ্খল কল্পনাদেবীর স্বাধীন বিচরণে বিন্দুমাত্র বাধার সৃষ্টি করেনা। উদাহরণ স্বরূপ মৃৎপ্রদীপ, বিষকন্যা, রুমাহরণ, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, ইন্দ্রতূলক, শঙ্খকঙ্কণ প্রভৃতি গল্পের কথা উল্লেখ করা যায়। সুতরাং শরদিন্দুবাবুর ইতিহাস-নির্ভর কথা সাহিত্যগুলিকে ঐতিহাসিক রোমান্স আখ্যায় ভূষিত করাই যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচনা করি। তবে বঙ্গসাহিত্যে ইতিহাসাশ্রয়ী কাহিনীর ধারায় শরদিন্দুবাবুর সর্বাপেক্ষা বড় অবদান শুধুমাত্র রচনা প্রাচুর্যের ক্ষেত্রেই নয়, প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রতিভার মোহিনী শক্তির প্রভাবেই পাঠক সমাজের মনোযোগ পুনরায় এই একদা সমৃদ্ধ কিন্তু পরবর্তীকালে অনাদৃত সাহিত্য শাখাটির প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল।

উপরোক্ত তথ্যগুলি স্মরণ রেখে শরদিন্দু বিরচিত ঐতিহাসিক রোমান্স ও ইতিহাসাশ্রয়ী গল্পগুলির বিশ্লেষণে ও মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে।

॥ ২ ॥

ঐতিহাসিক রোমান্স

কালের মন্দিরা [১৩৫৮] ঃ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস 'কালের মন্দিরা'। ১৩৫৮ সনের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত এই উপন্যাসটির পটভূমি নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক, যা স্বয়ং লেখক গ্রন্থটির সূচনাংশে তাঁর 'ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তি'র মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন—

> "১৯৩৮ সালে মুঙ্গেরে থাকা কালে এই কাহিনী লিখিতে আরম্ভ করি। কয়েক পরিচ্ছেদ লেখা হইবার পর সুদূর বোম্বাই হইতে আহ্বান আসিল, জীবনের সমস্ত কর্মসূচী ওলট-পালট হইয়া গেল। তারপর দীর্ঘ দশ বৎসর এ কাহিনী আর লিখিতে পারি নাই। শুধু সময়ের অভাবেই নয়, এ আখ্যায়িকা লিখিবার পক্ষে মনের যে ঐকান্তিক অনন্যপরতা প্রয়োজন তাহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। অতঃপর ১৯৪৮ সালে দৃঢ়ব্রত হইয়া আবার আখ্যায়িকার ছিন্নসূত্র তুলিয়া লইয়াছি এবং আরম্ভের ঠিক বারো বৎসর পরে শেষ করিয়াছি।"

'কালের মন্দিরা'র ঐতিহাসিক উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থের প্রথমভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে। প্রধানতঃ গুপ্ত বংশের শেষ গৌরব শিখা স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে হূণ আক্রমণ এবং স্কন্দগুপ্ত কর্তৃক সেই বহিরাক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধের আপ্রাণ প্রয়াসই 'কালের মন্দিরা'র ইতিহাসগত ভিত্তি, কিন্তু যুদ্ধ বিগ্রহ ও বর্বর হিংসায় পরিপূর্ণ ভারত ইতিহাসের সেই ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ প্রেক্ষাপটটিকে চিত্রায়িত করাই ঔপন্যাসিকের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, তাঁর ভাষায়—

- "এই আখ্যায়িকায় নিছক গল্প বলা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য যদি থাকে তবে তাহা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ব্যক্ত করা যাইতে পারে—

'হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন
শক-হূণ-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন ॥'

অতীতে যাহা বহুবার ঘটিয়াছে ভবিষ্যতেও তাহা ঘটিবে, ইতিহাসের এই আত্মনিষ্ঠায় অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। যাহারা মানুষে মানুষে ভেদবুদ্ধি চিরস্থায়ী করিতে চাহে তাহারা ইতিহাসের অমোঘ ধর্ম লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করে, তাহারা শুধু বিচারমূঢ় নয়—মিথ্যাচারী।" [কালের মন্দিরা]

ইতিহাসকে সশ্রদ্ধভাবে অনুসরণ করেই উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ঔপন্যাসিক লিখেছেন—

"গুপ্ত সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরিল সমুদ্রগুপ্তের পৌত্র কুমারগুপ্তের সময়। তখনও সাম্রাজ্য কপিশা হইতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ পর্যন্ত বিস্তৃত; কিন্তু বহিরাকৃতি অটুট থাকিলেও গজভুক্ত কপিত্থবৎ অন্তঃশূন্য হইয়া পড়িয়াছে।……কুমারগুপ্তের দীর্ঘ রাজত্বকালের শেষ ভাগে উন্মত্ত ঝঞ্ঝাবর্তের মত হূণ অভিযান সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে আঘাত করিল। এই প্রচণ্ড আঘাতে জীর্ণ সাম্রাজ্য কাঁপিয়া উঠিল। কুমারগুপ্ত ভোগী ছিলেন, বীর ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার ঔরসে এক মহাবীর পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল—গুপ্তবংশের শেষ বীর স্কন্দ। তরুণ স্কন্দগুপ্ত তখন যুবরাজ ভট্টারক পদে আসীন।"

স্কন্দগুপ্ত পঞ্চনদ প্রদেশে হূণ অক্ষৌহিনীর সম্মুখীন হলেন। তাঁর প্রবল বিক্রম ও অসাধারণ রণনৈপুণ্যের ফলে হিংস্র হূণেরা আপ্রাণ যুদ্ধ করেও পরাজিত হয়েছিল। কিন্তু তারা নিঃশেষে দূরীভূত হল না। বহুবিস্তৃত গুপ্ত সাম্রাজ্য তৎকালে সম্রাটদের শাসন কার্যে সুবিধার্থেই প্রায় পঞ্চাশটি ক্ষুদ্র বৃহৎ সামন্তরাজ্যে বিভক্ত ছিল, হূণ আক্রমণের সুযোগে সেই রাজ্যগুলিতে আভ্যন্তরীণ গোলোযোগেরও সূচনা হয়েছিল। দেশের বিভিন্নস্থলে বিদ্রোহ, অশান্তি, মাৎস্যন্যায়ের আগুন জ্বলে উঠেছিল। ফলে স্কন্দগুপ্তকে পঞ্চনদ প্রদেশ ছেড়ে শান্তি স্থাপনের জন্য দেশের অন্যান্য প্রান্তেও যুদ্ধে ব্যাপৃত হতে হল। তিনি হূণ আক্রান্ত অঞ্চলটিতে আরও কিছুকাল থাকলে হয়তো ভারতবর্ষ থেকে হূণ জাতিকে চিরতরে উন্মূলিত করতে পারতেন কিন্তু তাঁর পক্ষে দেশের ঐ বিশেষ প্রান্তেই নিরবচ্ছিন্ন অবস্থান সম্ভবপর হল না বলেই—

"কুটিল রোগ যেমন তীব্র ঔষধের দ্বারা বিদূরিত না হইয়া দেহের দুর্লক্ষ্য দুরধিগম্য স্থানে আশ্রয় লয়, কয়েকটা হূণ গোষ্ঠীও তেমনি ইতস্ততঃ সানুসঙ্কট-বন্ধুর স্থানে অধিষ্ঠিত হইল।…… পঞ্চনদ প্রদেশ বাহ্যতঃ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রহিল বটে, কিন্তু ধর্ষিতা নারীর ন্যায় তাহার প্রাক্তন অনন্যপরতা আর রহিল না।"

'বিটঙ্ক নামে এক ক্ষুদ্র গিরিরাজ্য এই সময় একদল হূণের করতলগত হইয়াছিল।' 'কালের মন্দিরা'র ঘটনাস্থল প্রধানতঃ পঞ্চনদ প্রদেশের এই বিটঙ্করাজ্য। রাজ্যব্যাপী নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার গোলযোগে পাটলিপুত্রের সকলে তুচ্ছ বিটঙ্ক রাজ্যের কথা বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল, সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর যাবৎ সেখানে হূণরাজ রোট্টধর্মাদিত্য স্বাধীনভাবেই শাসনকার্য সম্পন্ন করছিলেন। শুধু তাই নয় তিনি হূণ আক্রমণের পূর্ববর্তী বিটঙ্ক

রাজ্যের হিন্দু কুমারী, শ্রেষ্ঠা সুন্দরী ধারাদেবীকে বিবাহ করে এক নূতন রাজবংশেরও সূচনা করেছিলেন। বিটঙ্ক সম্পর্কে বিস্মরণের এই যবনিকা উত্তোলন করলেন, স্কন্দগুপ্তের আমলেরই এক নবনিযুক্ত নবীন পুস্তপাল। তাঁর সউদ্যম অনুসন্ধিৎসায় প্রমাণিত হল যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিটঙ্ক রাজ্যটি থেকে দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কোনও রাজস্ব আসেনি। এই তথ্য সুত্র পরম্পরায় মহারাজ স্কন্দেরও কর্ণগোচর হল কিন্তু তখন সংবাদ পাওয়া গেছে যে আবার নূতন ও সুবিশাল হূণ অনীকিনী ভারতবর্ষ অধিকার করার কুটিল বাসনা নিয়ে প্রবল বেগে অগ্রসর হচ্ছে, অন্যদিকে সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহ প্রশমিত হয়নি, সুতরাং স্কন্দগুপ্তের পক্ষে তখনই বিটঙ্করাজকে দমনের জন্য যুদ্ধ যাত্রা করা সম্ভব হল না, কিন্তু স্থির হল দূতের মারফৎ ঐ ক্ষুদ্র গিরিরাজ্যটির হূণ রাজাকে মগধের আনুগত্য স্বীকার করার জন্য আদেশ প্রেরণ করা হবে। হূণ যদি আনুগত্য স্বীকারে রাজী না হয়, তবে মহারাজ স্কন্দগুপ্ত স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হয়ে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। এই সমস্যা সঙ্কুল পরিস্থিতিতে ঘটনা ধারায় ঘটল এক অপ্রত্যাশিত অথচ গুরুত্বপূর্ণ দিক্‌পরিবর্তন। চষ্টন দুর্গের তৎকালীন অধিপতি কিরাত তার কুটিল স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বিটঙ্করাজ রোট্ট ধর্মাদিত্যকে সুকৌশলে চষ্টন দুর্গে বন্দী করে রেখেছিল। নিষ্ঠুর, বর্বর এবং প্রবল পরাক্রান্ত কিরাতের কবল থেকে পিতাকে উদ্ধারের জন্য অনন্যোপায় হয়ে বিটঙ্করাজ দুহিতা রট্টা যশোধরা পরমবীর স্কন্দের শরণাপন্না হলেন এবং যে বিটঙ্করাজ ছিলেন কার্যতঃ স্কন্দের প্রতিপক্ষ তাকে উদ্ধারের জন্য উদারহৃদয় স্কন্দ অকৃপণ সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। বিটঙ্ক রাজ্যের সঙ্গে তাঁর নতুন সম্পর্ক শুধু রাজনৈতিক আনুগত্যেই সীমাবদ্ধ থাকল না স্থাপিত হল প্রকৃত শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও মৈত্রীর সুদৃঢ় বন্ধন। কিন্তু ভারতবর্ষের সীমান্ত প্রান্তে নব উদ্যমে আগত হূণদের প্রতিরোধ করার জন্য স্বদেশপ্রেমিক স্কন্দগুপ্তকে করতে হয়েছিল আমৃত্যু সংগ্রাম।

'কালের মন্দিরা'য় ইতিহাসকে আশ্রয় করলেও ঔপন্যাসিক শরদিন্দুর সমৃদ্ধ কল্পনা-শক্তির বিকাশ কোথাও প্রতিহত হয়নি। তাই ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ, অস্থির, ঐতিহাসিক প্রেক্ষা-পটেই দুটি তরুণ হৃদয়ের প্রস্ফুটিত অনুরাগ অবাধে সুগন্ধ বিতরণ করেছে। 'কালের মন্দিরা'র প্রণয় বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে যে দুটি চরিত্র তাদের একজন পরিচয়হীন ভাগ্যান্বেষী যুবক চিত্রকবর্মা, [এই চিত্রকবর্মা প্রকৃতপক্ষে বিটঙ্কে হূণ আক্রমণের পূর্ববর্তী হিন্দুরাজার পুত্র, অর্থাৎ রাজপুত্র তিলক বর্মা] এবং অপরজন রোট্ট ধর্মাদিত্য ও ধারাদেবীর আত্মজা রাজকুমারী রট্টা যশোধরা—যার দেহে একই সঙ্গে প্রবাহিত হচ্ছে হূণ ও হিন্দু রক্ত। এই প্রণয় কাহিনী রচনায় ইতিহাসের সঙ্গে রোমান্সের শিল্প সম্মত সমন্বয় ঘটেছে। উপন্যাস মানবজীবনের কোলাহল মুখর বহিরঙ্গণ থেকে পাঠককে মানবহৃদয়ের নিভৃত অন্দরমহলে প্রবেশের সুযোগ দান করেছে।

'কালের মন্দিরা'য় মহারাজ স্কন্দগুপ্তের চরিত্র চিত্রণে রচয়িতার নৈপুণ্য অনস্বীকার্য। তাঁর বিবৃতি থেকেই আমরা জানতে পারি যে আখ্যায়িকাটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক, কেবল স্কন্দগুপ্তের চরিত্র ঐতিহাসিক। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সযত্ন প্রয়াসে একটি যুগের

এই 'ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব' 'কালের মন্দিরা'য় পরিপূর্ণ মানবিক রূপ লাভ করেছে। আলোচ্য উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদে লেখকের বর্ণনা অনুসারে জানা যায়—

"স্কন্দের বয়ঃক্রম এই সময় প্রায় পঞ্চাশ বৎসর, কিন্তু বলদৃপ্ত দেহে কোথাও জরার চিহ্নমাত্র নাই, রমণীর ন্যায় কোমল চক্ষুদুটি যেন সর্বদাই স্বপ্ন দেখিতেছে। তাঁহার সুঠাম দেহ ও লাবণ্যপূর্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়া তাঁহাকে পরাক্রান্ত যোদ্ধা বলিয়া মনে হয় না, কবি ও ভাবুক বলিয়া ভ্রম হয়।"

যুবক স্কন্দ যে একদা চঞ্চলা রাজলক্ষ্মীকে স্থির করবার জন্য—তিনরাত্রি ভূমিশয্যায় শয়ন করে তারপর তাঁর রণ-অভিযান শুরু করেছিলেন—এই ঐতিহাসিক তথ্যটি উপস্থাপিত করতে ঔপন্যাসিক বিস্মৃত হননি। সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য স্কন্দগুপ্তের আপ্রাণ সংগ্রামের মাধ্যমে তাঁর স্বদেশ প্রেম ও শৌর্যের পরিচয় উপন্যাসের নানা প্রসঙ্গে পরিস্ফুট হয়েছে। বিটঙ্ক রাজ্যে দূত প্রেরণ ও উক্ত রাজ্যের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত চষ্টন দুর্গাধিপতি কিরাতের কবল থেকে রোট্টধর্মাদিত্যকে উদ্ধারের জন্য চিত্রক ও গুলিকবর্মার নেতৃত্বে সহস্র অশ্বারোহী প্রেরণের ঘটনায় তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও স্থিরবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। বয়স্য পিপ্পলী মিশ্রের সঙ্গে স্কন্দের বিশ্রম্ভালাপের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায় যে প্রতিনিয়ত প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকলেও তাঁর মনের স্বাভাবিক সরসতা অন্তর্হিত হয়নি। স্কন্দগুপ্তের অবসর বিনোদনের একমাত্র উপায় অক্ষক্রীড়া। এই পাশাখেলায় জয় পরাজয়কে তিনি অনেকক্ষেত্রেই তাঁর ভবিতব্যের ইঙ্গিতবাহী বলে মনে করেছেন। তাই 'কালের মন্দিরা'র তৃতীয় পরিচ্ছেদে তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়—

"পিপুল এস পাশাখেলি, আর একবার ভাগ্য পরীক্ষা করিব। তুমি যদি আমাকে পরাজিত করিতে পার, বুঝিব নিয়তির বিধান অলংঘনীয়।"

সংবেদনশীল ঔপন্যাসিক 'কালের মন্দিরা'য় পরম ভট্টারক মহারাজ স্কন্দগুপ্তের হৃদয়ে সুপ্ত প্রণয়তৃষ্ণার পরিচয়ও দিয়েছেন। রট্টা যশোধরাকে কেন্দ্র করে তাঁর চিত্তচাঞ্চল্য এবং তাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পাওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা তার সমর্থন ইতিহাসে পাওয়া না গেলেও, এই ভাগ্যবিড়ম্বিত, বহুগুণসম্পন্ন মানুষটির প্রণয়ের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা তাঁকে পাঠকের সহানুভূতির পাত্র করে তোলে। যশোধরার প্রতি আকর্ষণ তাঁর চারিত্রিক দুর্বলতার পরিচয় নয়। যোগ্য মানবীর প্রতি যোগ্য মানবের স্বাভাবিক অনুরাগ। স্কন্দগুপ্ত নারীবিদ্বেষী বা বিবাহ বিমুখ ছিলেন না, তিনি 'কখনও মনের সঙ্গিনী পান নাই। পাইলে হয়তো বিবাহ করিতেন।' সাহসিকা, সুন্দরী ব্যক্তিত্বশালিনী রট্টা যশোধরার মধ্যেই স্কন্দ তাঁর মানসী প্রতিমার শরীরী রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাই পিপ্পলী মিশ্র যখন একান্তে তাকে বলেন—

"যদি গার্হস্থ্য ধর্ম অবলম্বন করতে চাও, এই সুযোগ। গৃহিনী, সচিব সখী—এমনটি আর পাইবে না।" 'তখন স্কন্দ স্মিত মুখে নীরব রহিলেন।'

এই মৌন অবস্থা নিশ্চয় সম্মতিরই লক্ষণ। কিন্তু হূণ বিজয়ীর রমণীমন জয়ের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়নি, কারণ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বেই যশোধরা চিত্রকবর্মাকে তার প্রণয় নিবেদন করেছে। তাই তাঁকে রাজকুমারীর হৃদয়-বিগলিত শ্রদ্ধালাভ করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

স্কন্দের এই প্রেমিক সত্তার সূক্ষ্ম ও সংযত পরিচয় তাঁকে ইতিহাসের সীমানা থেকে সাহিত্যের শাশ্বতলোকে স্থাপন করেছে।

'কালের মন্দিরা'য় হূণ জাতির যে পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে তা নিঃসন্দেহেই ইতিহাস সম্মত। শরদিন্দুবাবু সুকৌশলে কাহিনীর প্রথম পরিচ্ছেদেই কপোতকূটের নিকটবর্তী অরণ্যপ্রদেশের প্রান্তসীমায় অবস্থিত জলসত্রের পালিকা সুগোপার সঙ্গে বৃদ্ধ মোঙের কথোপকথন প্রসঙ্গে বক্ষুনদীর তীরবাসী যাযাবর বৃত্তিধারী হূণদের স্বভাবসুলভ অস্থিরতা, গান্ধার সীমান্তে আগমন, ভারতবর্ষের পঞ্চনদ বিধৌত শ্যামল উপত্যকার লোভে দলে দলে এদেশের দিকে ধাবিত হওয়া, বিটঙ্করাজ্য অধিকার কালে হূণজাতির রক্তলোলুপতা, ও নৃশংসতা, কালক্রমে হিন্দুনারীদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে তাদের চারিত্রিক উগ্রতা হ্রাস ও বর্বরতা মুক্তির নানা তথ্য পরিবেশন করেছেন। বিটঙ্ক রাজ্য অভিযানকারী হূণদল প্রধানের বুদ্ধভক্তে পরিণত হয়ে অহিংসাকেই পরম ধর্ম রূপে গ্রহণ করার কাহিনী চণ্ডাশোকের ধর্মাশোকে রূপান্তরিত হওয়ার মতোই বিস্ময়কর কিন্তু অবিশ্বাস্য নয়।

'কালের মন্দিরা'র আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র চিত্রক বর্মা। আখ্যায়িকা সূত্রপাতের পঁচিশ বৎসর আগে বিটঙ্করাজ্যের তৎকালীন হিন্দুরাজার যে শিশুপুত্রটির কোমল দেহটিকে তরবারীর অগ্রভাগে বিদ্ধ করে যুদ্ধোন্মাদ, রক্তপিপাসু, নির্দয় হূণ সৈনিকেরা পৈশাচিক ক্রীড়ায় মত্ত হয়েছিল বিধাতার অপার করুণায় এবং চু-ফাঙ নামে আপাত পাগল এক হূণের ভেষজ বিদ্যায় অত্যাশ্চর্য নৈপুণ্যের বলে সেই মৃতপ্রায় শিশুটিই আজকের বলিষ্ঠ যুবা চিত্রকবর্মা। পিতৃপরিচয়হীন আত্মীয়শূন্য চিত্রক বাহুবল ও মনোবলে বীর সন্দেহ নেই, কিন্তু জন্ম পরিচয় অজ্ঞাত বলেই হয়তো তার নিজের সম্পর্কে কিছুটা গ্লানি এবং স্বভাবে কিঞ্চিত রুক্ষতা ও উগ্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আখ্যায়িকার তৃতীয় পরিচ্ছেদে শশিশেখরকে পরাস্ত করে তার সমস্ত কিছু হস্তগত করার মধ্যে তার তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এই চরিত্রের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বিষয় রট্টা যশোধরাকে কেন্দ্র করে তার তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব। যশোধরাকে দেখে তার চিত্ত মুগ্ধ হয়েছে, কিন্তু ততদিনে সে জানতে পেরেছে তার প্রকৃত পরিচয়। তাই চিত্রকের একটি সত্তা রট্টার প্রতি অনুরাগে বিহ্বল হলেও অন্যসত্তা তাকে শত্রুকন্যা জেনে প্রতিহিংসায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদে চিত্রকের অন্তরের এই দ্বৈত সত্তার পরিচয় চিত্রণে ঔপন্যাসিকের পারদর্শিতা পরিস্ফুট হয়—

> "এই সকল অলস কথাবার্তার মধ্যে চিত্রক দেখিল, রট্টা প্রাকারে কুড্যার উপর এমন-ভাবে বসিয়া আছেন যে তাঁহাকে একটু ঠেলিয়া দিলে কিম্বা আপনা হইতে ভার-কেন্দ্র বিচলিত হইলে তিনি প্রাকারের বাহিরে বিশ হাত নীচে পড়িবেন, মৃত্যু অনিবার্য। চিত্রকের বুকের ভিতর দুষ্ট বাষ্পের মত একটা অশান্ত উদ্বেগ পাক খাইতে লাগিল। তৃতীয় ব্যক্তি এখানে নাই, রট্টা যদি পড়িয়া যান কেহ কিছু সন্দেহ করিতে পারিবে না। যে বর্বর হূণ তাহার সর্বস্ব অপহরণ করিয়াছে, যাহার হস্তে তাহার পিতা নৃশংসভাবে হত হইয়াছিলেন, এই যুবতী তাহারই কন্যা—

চিত্রকের চোখে জ্যোৎস্নার শুভ্রতা লোহিতাভ হইয়া উঠিল। রট্টার কিন্তু নিজের সংকটময় অবস্থিতির প্রতি লক্ষ্য নাই, তিনি স্বচ্ছন্দে নির্ভয়ে কুড্যের উপর বসিয়া আছেন। চিত্রক সহসা যেন নিজেকে ব্যঙ্গ করিয়াই হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'রাজকুমারি, আপনি কুড্য হইতে নামিয়া বসুন। ওখান হইতে নিম্নে পড়িলে প্রাণহানির সম্ভাবনা।"

চিত্রকের এই ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় উপন্যাসে আরও একবার উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। কাহিনীর একাদশ পরিচ্ছেদে যশোধরার বন্দী পিতাকে উদ্ধারের জন্য যাত্রা করে দুর্গম পথে রাজকুমারীর পাশাপাশি অশ্বচালনা কালে—

"চিত্রকের মুখ কিন্তু গম্ভীর, ভ্রূকুঞ্চিত। সে তাহার অশ্বের নিভৃতোর্ধ্ব কর্ণের প্রতি চাহিয়া বসিয়া আছে। ভাবিতেছে, নিয়তি বার বার তাহাকে প্রতিহিংসার সুযোগ দিতেছে। অদৃষ্টের এ কোন ইংগিত? প্রতিশোধের সুযোগ হাতে পাইয়া সে ছাড়িয়া দিবে? হিংসার উত্তরে প্রতিহিংসা লওয়া ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম। তবে কেন সে লইবে না?"

কিন্তু সেই অবিরাম পথ চলাকালেই তাদের মধ্যে স্থাপিত হয় এক নিবিড় ঐক্য, দুটি মন এক সূত্রে বাঁধা পড়ে। চিত্রকের অন্তরে ইতিপূর্বে যশোধরার প্রতি রূপমুগ্ধতা জেগেছিল, এই অভিযানকালে তার সহজ, সাবলীল, সরস অথচ নিরহংকার আচরণে চিত্রক অভিভূত। চিত্রকের চিত্তে এতক্ষণে যশোধরার প্রতি প্রকৃত প্রেমের উন্মেষ ঘটে, তাই সে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিতে পারে—

"আমি ক্ষত্রিয়, বৈরতা আমার স্বধর্ম, কিন্তু রট্টার সহিত বৈরতা করিব কেন? সে আমার অনিষ্ট করে নাই। তাহার পিতার অপরাধে তাহাকে দণ্ড দেওয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম নয়। যদি প্রতিশোধ লইতে হয় তাহার পিতার উপর লইব।" [কালের মন্দিরা, একাদশ পরিচ্ছেদ]

এর ফলে এক অপরিসীম আনন্দের জোয়ারে তার দ্বন্দ্বজর্জ্জর অন্তর নির্মল হয়ে উঠে। পরবর্তীকালে অবশ্য চিত্রককে প্রিয়তমার পিতাকে হত্যা করার নিষ্ঠুর কর্তব্যও সম্পাদন করতে হয়নি কারণ কিরাতের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে চিত্রক জানতে জানতে পেরেছে যশোধরার পিতা রোট্ট ধর্মাদিত্য নয়, তাঁর প্রধান সহকারী তুষফাণ অর্থাৎ কিরাতের পিতাই চিত্রকের পিতাকে হত্যা করেছিল। জীবনের প্রথম পর্ব নানা বিপর্যয় বিড়ম্বনার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হলেও ভাগ্য ও পুরুষকারের বাঞ্ছিত সমন্বয়ে শেষ পর্যন্ত চিত্রক তার রাজ্য এবং প্রণয়িনী রাজকন্যাকে লাভ করেছে। কিন্তু প্রকৃত বীরত্ব তার রক্তে আছে বলেই সে নিশ্চেষ্ট আরামে জীবন কাটাতে চায়নি, মহারাজ স্কন্দগুপ্তের সঙ্গে মিলিত হয়ে দেশ থেকে হূণ আক্রমণ দূর করার কঠিন কার্যে আত্মনিয়োগ করেছে। শুধু রোমাণ্টিক নায়ক হিসাবে নয়, পৌরুষদৃপ্ত ক্ষত্রিয় হিসাবেও চিত্রকের চরিত্র পাঠক হৃদয়কে আকর্ষণ করে।

যশোধরার চরিত্রে সাহসিকতা, তেজস্বিতা রাজকন্যাসুলভ আত্মমর্যাদাবোধ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পরিদৃষ্ট হয়। কাহিনীর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তার পুরুষ বেশে আবির্ভাব মণিপুর রাজদুহিতা চিত্রাঙ্গদার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। চিত্রকের প্রতি তার অনুরাগরঞ্জিত হৃদয়টির

সর্ববিধ পরিচয় লেখক সযত্নে অংকন করেছেন, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দুর্গম পর্বত গুহায় রাত্রিযাপন কালে চিত্রকের কাছে তার আত্মনিবেদনের সংযত অথচ সুমধুর মুহূর্তটির বর্ণনা—

"চিত্রক উদ্‌গত হৃদয়াবেগ দমন করিয়া বলিল—'রাজকুমারি—' অস্ফুট কণ্ঠে রট্টা বলিলেন—রাজকুমারী নয়, বলো রট্টা। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া চিত্রক কম্পমান কণ্ঠে বলিল 'রট্টা'। 'বলো রট্টা যশোধরা।' 'রট্টা যশোধারা।"
কিছুক্ষণ নীরব। তার পর রট্টা বলিল, 'আজ অন্ধকার আমার লজ্জা ঢাকিয়া দিয়াছে তাই বলিতে পারিলাম। আমি তোমার। জন্ম জন্মান্তরে আমি তোমার ছিলাম। এ জন্মেও তোমার। পরজন্মেও তোমার হইব।' [কালের মন্দিরা ঃ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ]

স্কন্দগুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাতের পর যশোধরার প্রতি স্কন্দগুপ্তের দুর্বলতা অনুভব করে যদিও চিত্রক বিমর্ষ মনে ভেবেছে, 'চতুঃসাগরা পৃথ্বীর একচ্ছত্র অধীশ্বর, তাঁহার একমাত্র মহিষী—এ প্রলোভন কোন নারী ছাড়িতে পারে ? [কালের মন্দিরা ঃ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ] কিন্তু তার এই ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত যশোধরা কর্তৃক স্কন্দগুপ্তের প্রণয় প্রত্যাখ্যান এবং চিত্রকের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্যেই সেকথা প্রমাণিত হয়।

আর দুটি নারী চরিত্রের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হয়—তাদের একজন কপোত-কূটের মালাকার বনিতা ও প্রপাপালিকা সুগোপা, অন্যজন স্কন্দগুপ্তের তাম্বুল করঙ্কবাহিনী লহরী। সুরসিক সুগোপাই তার সখী যশোধরা ও ভ্রাতৃপ্রতিম চিত্রকবর্মার মধ্যে মিলনসেতু রচনার প্রয়োজনীয় কার্যটি সমাধা করেছে। তার হারানো মায়ের জন্য বেদনাবোধ ও তাঁকে ফিরে পেয়ে ব্যাকুল বিহ্বল প্রতিক্রিয়ায় সুগোপার সুকোমল নারী হৃদয়টি যথাযথ প্রকাশ লাভ করেছে।

আলোচ্য উপন্যাসের লহরী, অর্থাৎ মহারাজ স্কন্দগুপ্তের তাম্বুল করঙ্কবাহিনী, 'সেবারস সমুপজাত নন্দা' নারীটি আমাদের মনে বাণভট্টের 'কাদম্বরী কথা'র পত্রলেখা চরিত্রের স্মৃতি বহন করে আনে।

পিপ্পলী মিশ্র ও শশিশেখর আখ্যায়িকার শৃঙ্গার ও বীর রসের পাশে হাস্যরসের শুভ্র স্রোতটিকে প্রবাহিত রাখার কার্যে সহায়তা করেছে।

'কালের মন্দিরা'র প্রতিটি পরিচ্ছেদের নামকরণে ঔপন্যাসিক রসবোধ সুপরিস্ফুট। নামগুলি শুধু পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, গভীর ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধও বটে।

পরিশেষে, এই উপন্যাসের সুখশ্রাব্য ও ঐশ্বর্যশালী ভাষার কথা অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন। ঐতিহাসিক উপন্যাসের সার্থকতার ক্ষেত্রে ভাষা নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কারণ ঔপন্যাসিক যে যুগে, যে কালে কখনও উপস্থিত ছিলেন না ইতিহাসজ্ঞান, কল্পনাশক্তি ও ভাষার বর্ণাঢ্য অনুলেপনের সাহায্যে তাঁকে সেই বিগত যুগ ও জীবনচিত্রকে সজীব ও উজ্জ্বল রেখায় চিত্রিত করতে হয়। সুতরাং যে কালের ইতিহাস সেই যুগের উপযোগী ভাষা ব্যবহার একান্ত প্রয়োজনীয়, তা নাহলে সেই যুগ পরিবেশটিকে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। স্রষ্টা শরদিন্দু যে এ বিষয়ে কতখানি পারদর্শী তার প্রমাণ আলোচ্য ঐতিহাসিক আখ্যায়িকাটির ভাষা বিন্যাসেই সুমুদ্রিত।

উপসংহারে একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায় বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসাশ্রিত কাহিনী ধারায় শরদিন্দুর আর্বিভাব যে কী গভীর সম্ভাবনাপূর্ণ 'কালের মন্দিরা'য় তার অভ্রান্ত সংকেত পাঠকের অশ্রুত থাকে না।

গৌড়মল্লার [১৩৬১] ঃ 'গৌড়মল্লার' শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা আর একটি সুখপাঠ্য ঐতিহাসিক উপন্যাস। এই উপন্যাসটি রচনার প্রেরণা সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

> "প্রাচীন বাংলাদেশ লইয়া গল্প লিখিবার ইচ্ছা অনেকদিন হইতেছিল, কিন্তু বাংলা-দেশের বিশিষ্ট আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার মত মালমশলা কোথাও পাই নাই। নীহাররঞ্জনের বইখানি পড়িয়া যে অপূর্ব উপাদান পাইয়াছি তাহাই অবলম্বন করিয়া উপন্যাস আরম্ভ করিয়াছি। শশাঙ্কদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বাংলাদেশে যে শতাব্দীব্যাপী মাৎস্যন্যায় আরম্ভ হইয়াছিল, তাহারই সূচনা আমার গল্পে আছে। বাঙালীর জীবনে ইহা মহাক্রান্তিকাল। আধুনিক বাঙালীর জন্ম এই সময়।"
>
> (ডায়েরী, ২৭শে জুলাই, ১৯৫০)

আলোচ্য উপন্যাসের ভূমিকায় ঔপন্যাসিক 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' প্রণেতা শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় ছাড়াও আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, শ্রীসুকুমার সেন ও শ্রীসুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। কারণ এই চারজন বাঙালী মনীষীর লেখা তথ্যগত উপকরণ 'গৌড়মল্লার'-এর কায়াগঠনে বিশেষ সহায়তা করেছে।

শরদিন্দুবাবুর লেখা প্রথম ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস 'কালের মন্দিরা'য় পতনোন্মুখ গুপ্ত সাম্রাজ্যে দুর্ধর্ষ, দুর্মদ হূণ জাতির আক্রমণের পটভূমিকায়, এক অমিতবীর্য পুরুষসিংহের ঐকান্তিক সংগ্রামশীলতার কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে, কিন্তু 'গৌড়মল্লার'-এ চিত্রিত হয়েছে বাঙালীর ইতিহাসের নৈরাজ্য ও দুর্যোগপূর্ণ এক বিষাদখিন্ন, বেদনামলিন সন্ধিলগ্ন। এক্ষেত্রে কাহিনীর পটভূমি গৌড়াধিপ শশাঙ্কের মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্তীকাল থেকে শুরু করে বিংশ বৎসর অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ঘটনার বিস্তার। এই সময়ে বাঙালীর চরিত্র, সংস্কৃতি, গ্রাম্য জীবন, নাগরিক জীবন কিরূপ ছিল আলোচ্য উপন্যাসে ঔপন্যাসিক তাই অঙ্কন করার চেষ্টা করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে 'গৌড়মল্লারে' চরিত্র নির্মাণে ইতিহাসের প্রভাব বিশেষ পরিস্ফুট হয়না— প্রধান চরিত্রগুলি অনৈতিহাসিক বলা চলে। এই গ্রন্থে কয়েকটি নাম পাওয়া যায় যেগুলির সঙ্গে আমাদের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পরিচয় ঘটে, যেমন শশাঙ্ক, শীলভদ্র; ভাস্করবর্মা, জয়নাগ প্রভৃতি কিন্তু তাঁদের উপন্যাসে বর্ণিত কার্যকলাপে কল্পনারই আতিশয্য পরিলক্ষিত হয়।

গৌড়কেশরী শশাঙ্ক 'গৌড়মল্লার'-এ প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত নন, থাকার কথাও নয়, কারণ তাঁর মৃত্যুর পরেই এই কাহিনীর শুরু। কিন্তু নানা প্রসঙ্গে শশাঙ্কের যে পরিচয় উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে তা অবশ্য বহুলাংশেই যথার্থ। ময়ূরাক্ষী, মৌরী ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলেই যে শশাঙ্কের মহাসমৃদ্ধ রাজধানী কর্ণসুবর্ণ অবস্থিত ছিল একথা

সকল ঐতিহাসিক একবাক্যে স্বীকার করেন। উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে—

"শশাঙ্ক একদিকে যেমন দুর্ধর্ষ বীর ছিলেন অন্যদিকে তেমনি অসামান্য কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন ; ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তিনি এক হাতে পূর্ববঙ্গের রাজ্যগৃধ্নু নৃপতিবৃন্দকে এবং অন্য হাতে প্রতিহংসা পরায়ণ হর্ষবর্ধনের বিপুল রাজশক্তিকে রুখিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় শত্রু গৌড়রাজ্যে পদার্পণ করিতে পারে নাই।"

উপন্যাসের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে শীলভদ্রের সঙ্গে বজ্রের কথোপকথন প্রসঙ্গে জানা যায়—

"তখন হর্ষবর্ধনের সঙ্গে শশাঙ্কদেবের যুদ্ধ চলছে। হর্ষবর্ধন ছিলেন বৌদ্ধ, তাই যুদ্ধের উত্তেজনায় শৈবধর্মী শশাঙ্ক গৌড়ের বৌদ্ধদের উপর কিছু উৎপীড়ন আরম্ভ করেছিলেন।"

গৌড়াধিপ শশাঙ্কের অসাধারণ শৌর্য এবং সুতীব্র বৌদ্ধবিদ্বেষ—উপন্যাসে বর্ণিত উভয়-তথ্যই ইতিহাস সম্মত। তবে নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ মহাজ্ঞানী শীলভদ্রের সঙ্গে শশাঙ্কদেবের আলোচনা এবং সেই বৌদ্ধ পণ্ডিতেরই মধ্যস্থতায় শশাঙ্কের বৌদ্ধ বিদ্বেষ প্রশমিত হওয়ার ইঙ্গিত ইতিহাসের পক্ষে অভিনব।

সুদীর্ঘ ত্রিশ বর্ষব্যাপী রাজ্য শাসন অন্তে পরিণত বয়সে শশাঙ্কদেবের মৃত্যু হলে গৌড় ও মগধের অধিকার নিয়ে তীব্র প্রতিযোগিতার সূত্রপাত। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে—

"শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অথবা পিতৃব্যপুত্র মাধবগুপ্ত মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।"

অপরদিকে 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্প'-এর গ্রন্থকার মানব নামে শশাঙ্কের এক পুত্রের উল্লেখ করেছেন, যিনি নাকি আট মাস পাঁচদিন গৌড়েশ্বর রূপে রাজত্ব করেছিলেন।

"মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের বিবরণ হইতে মনে হয়, ভাস্করবর্মার কর্ণসুবর্ণাধিকারের পর শশাঙ্ক পুত্র মানব পিতৃরাজ্য পুনরধিকারে একটা চেষ্টা করিয়া থাকিবে, এবং সে চেষ্টা হয়তো ক্ষণস্থায়ী সার্থকতাও লাভ করিরা থাকিবে। কিন্তু তাহার পরই কর্ণসুবর্ণ জয়নাগের করায়ত্ত হয়, এবং তিনি মহারাজাধিরাজ আখ্যায় স্বতন্ত্র নরপতিরূপে পরিচিত হন।"

কিন্তু নীহাররঞ্জন রায়ের মতানুসারে—

"অন্য কোন সাক্ষ্যে এই তথ্যের উল্লেখ নাই, কাজেই ইহা সত্য হইতে পারে, নাও হইতে পারে।"

শশাঙ্কদেবের পুত্ররূপে মানবদেবের অস্তিত্ব সম্পর্কে যত সংশয়ই থাকুক না কেন, শরদিন্দুবাবু তার সম্পর্কে 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্প'-এর ঐ ক্ষীণ সূত্রটিকে অবলম্বন করেই কাহিনীর প্রয়োজনে তাঁর অতুলনীয় কল্পনার অমিত শক্তিবলে, মানবদেবকে একটি সম্পূর্ণ নিয়তিতাড়িত চরিত্ররূপে পাঠকের মনোমন্দিরে প্রতিষ্ঠা দান করেছেন। গৌড়মল্লারে মানবদেব দীর্ঘদেহী, শৌর্যশালী, সরলপ্রাণ ও উদারচিত্ত কিন্তু পিতা শশাঙ্কদেবের তুল্য দূরদর্শিতা ও কূটনৈতিক বুদ্ধির একান্ত অভাবহেতু গৌড়ের সিংহাসন রক্ষা করা মানবের

পক্ষে সম্ভব হয়নি। পরম প্রতিদ্বন্দ্বী কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে, শত্রুর পূর্বে কর্ণসুবর্ণে পৌঁছে রাজ্য রক্ষার জন্য শেষ চেষ্টা করার উদ্দেশ্য নিয়ে মানব কজঙ্গলের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে গোপনে, অশ্বারোহণে পলাশবনের মধ্য দিয়ে বেতসগ্রামের সীমানায় পৌঁছেছিলেন। আসন্ন সন্ধ্যার পটভূমিতে ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত মানবের সঙ্গে জনম-দুঃখিনী রঙ্গনার আকস্মিক সাক্ষাৎ উভয়ের জীবনেই ক্রান্তিলগ্নের সূচনা করেছে। রঙ্গনার মধুর রূপ, ততোধিক মধুর আচরণে এই পল্লীদুহিতার প্রতি মহারাজের হৃদয় গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। বেতসকুঞ্জে নিসর্গকে সাক্ষী রেখে গান্ধর্ব বিবাহ দ্বারা রঙ্গনাকে জীবন-সঙ্গিনীর স্বীকৃতি দান করেছেন এবং পরদিন প্রত্যূষেই রঙ্গনার কাছে পুনরায় প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি দান করে মানব কর্ণসুবর্ণের পথে অগ্রসর হয়েছেন। ভাস্করবর্মা কর্তৃক পরাস্ত হওয়ার পর শশাঙ্ক পুত্রের জীবন-ইতিহাস অশ্রুসজল। বহু দুঃখ ভোগের পর দৃষ্টিহীন দৈবতাড়িত মানবদেব তাঁর একমাত্র গন্তব্যস্থান বেতসগ্রামের পথের সন্ধান লাভ করেছেন। নিয়তির খেয়ালে অন্ধ মানবের প্রতি সহানুভূতিশীল পথপ্রদর্শক তাঁরই অপরিচিত আত্মজ বজ্রদেব। অবশেষে বহু প্রতিকূল ঘটনার তীব্রস্রোত অতিক্রম করে বেতসগ্রামেই পিতা পুত্রের আকাঙ্ক্ষিত মিলন ঘটেছে। বর্ণিত ঘটনাবলীর প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই ইতিহাস অনুপস্থিত, রোমান্সেরই অপ্রতিহত প্রাধান্য। কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার সঙ্গে শশাঙ্কর শত্রুতা ঐতিহাসিক সত্য। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তিনি কিছুদিনের জন্য কর্ণসুবর্ণে রাজত্ব করেছিলেন—উপন্যাস বর্ণিত এই তথ্য সম্ভবতঃ 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্প' গ্রন্থসূত্রে প্রাপ্ত। কিন্তু ভাস্করবর্মার ভোগোন্মত্ত অপদার্থ পুত্র অগ্নিবর্মার রাজত্বকালের যে চিত্র উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে, তার কোনও সূত্রই ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

শীলভদ্র ঐতিহাসিক চরিত্র। উপন্যাসে তাঁর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

"শীলভদ্র সমতটের এক ব্রাহ্মণ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন"—এই তথ্য ইতিহাস সমর্থিত। নালন্দা মহাবিহারের মহাধ্যক্ষ, প্রাজ্ঞ, দূরদর্শী এই বৃদ্ধ পণ্ডিতের যে পরিচয় উপন্যাসে উদ্ঘাটিত হয়েছে তার যাথার্থ্য অনস্বীকার্য। কিন্তু কাহিনীতে শীলভদ্রের যে ভূমিকা অর্থাৎ কর্ণসুবর্ণের নিকটবর্তী রক্তমৃত্তিকা বা রাঙামাটির সংঘারামে তাঁর সঙ্গে বজ্রের সাক্ষাৎ, তাঁর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কথোপকথন, ঘটনাচক্রে 'একদিনের রাজা' বজ্রদেবের কর্ণসুবর্ণ থেকে তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে রক্তমৃত্তিকায় প্রত্যাবর্তন ঘটলে বজ্রের নিরাপত্তার জন্য শীলভদ্র কর্তৃক তাকে নিজ পরিব্রাজক দলের অন্তর্ভুক্ত করে নির্বিঘ্নে বেতসগ্রামের নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছে দেওয়া এই সকল ঘটনাই কল্পনা প্রসূত বটে, কিন্তু এই দয়াবান, তীক্ষ্ণবুদ্ধি বৌদ্ধ পণ্ডিতের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গ সংগতিপূর্ণ।

'গৌড়মল্লার'-এ কাহিনীর আশ্রয়স্থল দুটি—বেতসগ্রাম ও কর্ণসুবর্ণ নগর।

বেতস নামে কোনও গ্রাম হয়তো সেকালে ছিল না, কিন্তু নামটি কাল্পনিক হলেও গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার দিক দিয়ে বেতসগ্রাম সে যুগের গ্রামীণ সমাজের সুযোগ্য প্রতিনিধি। গৌড়দেশের এক প্রান্তসীমায় অবস্থিত এই ক্ষুদ্র, আভীর অধ্যুষিত গ্রামখানি শুধু রাজধানী কর্ণসুবর্ণ থেকে বহুদূরবর্তীই নয়, নাগরিক বৈভব ও জটিলতা থেকেও সম্পূর্ণ মুক্ত। সেযুগের কৃষি নির্ভর পল্লীকেন্দ্রিক

সভ্যতায় বঙ্গদেশের অসংখ্য সাধারণ গ্রামাঞ্চলের মত বেতসগ্রামেও গোপ, কামার, কুমার, তন্তুবায় প্রভৃতির বাস। তাই শুধু আহার্য বস্তু নয়, জীবনযাত্রা নির্বাহের সকল প্রয়োজনীয় সামগ্রীই পল্লীতে প্রস্তুত হতো, গ্রামীণ সমাজকে নগরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হত না। এই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলির তাই নগরের সঙ্গে গভীর সংযোগ রক্ষার প্রয়োজন ছিল না। কদাচিৎ গ্রামের কোনও অধিবাসী বাণিজ্যিক স্বার্থে অর্থাৎ গ্রামে প্রস্তুত পণ্যদ্রব্যাদি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নগরে যাত্রা করত, এবং কার্যশেষে কেউ বধূর জন্য রূপার কর্ণফুল, কেউ শিশুর জন্য রঙীন খেলনা নিয়ে গ্রামেই ফিরে আসত। এইভাবে বহির্জগতের সঙ্গে সূক্ষ্ম যোগসূত্র বজায় রেখে যে পল্লীগুলির জীবনযাত্রা নির্বিঘ্নে অতিবাহিত হত, বেতসগ্রাম তাদেরই প্রতিভু। রাজা-রাজধানী-রাজনীতির প্রভাব পল্লীবাংলার নিস্তরঙ্গ নিরুচ্ছ্বাস জীবনকে যে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারত না উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদে সদ্য পরিচিত মানবের মুখে শশাঙ্কদেবের মৃত্যুর কথা শুনে রঙ্গনার নিরুত্তাপ প্রতিক্রিয়া থেকেই তা প্রমাণিত হয়—

> "অবিশ্বাস করার মত মনের অবস্থা রঙ্গনার নয়। বিশেষতঃ গ্রামে রাজা-রাজড়ার খবর কয়জন রাখে? কোন রাজা মরিল, কে নূতন রাজা হইল—এ সকল সংবাদ গ্রামাঞ্চলে বহু বিলম্বে আসে, আসিলেও বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে না।"
>
> [গৌড়মল্লার ঃ চতুর্থ পরিচ্ছেদ]

তবে দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ, বিশৃঙ্খলা বা নৈরাজ্য উপস্থিত হলে গ্রামীণ সমাজ যে সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত থাকত তা নয়—অন্ততঃ যুদ্ধের জন্য গ্রাম থেকে সৈন্য সংগ্রহের প্রয়োজনে রাজপুরুষের আগমন শান্ত পল্লী জীবনকে চঞ্চল করে তুলত। আবার অনেক সময় রণোন্মাদ, বন্য স্বভাব বিশিষ্ট সৈনিকেরা আদিম রক্তলিপ্সার বশবর্তী হয়ে লুঠপাট অগ্নি-সংযোগ প্রভৃতি নিষ্ঠুরতার কশাঘাতে গ্রামের তরঙ্গহীন জীবনে সাময়িকভাবে বিপর্যয় সৃষ্টি করত। 'গৌড়মল্লার'-এর দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদে এই ঘটনা সমূহের চিত্রায়ন লক্ষ্য করা যায়। মাঝে মাঝে কিছু বহির্ঘটনা গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনে সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি করলেও তার অন্তর্নিহিত প্রশান্তি, স্থৈর্যকে বিনষ্ট করতে পারত না।

বেতসগ্রামকে উপলক্ষ্য করে ঔপন্যাসিক সেকালের গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে লিখছেন—

> "গ্রামে জাতিভেদ বেশী প্রখর নয়, সকলে একত্র পানাহার করে; তবে বিবাহের সময় জাতি দেখিতে হয়। তাহাতেও খুব বেশী কড়াকড়ি নাই,……এইরূপ শৈথিল্যের কারণ, যে সময়ের কথা সে সময় জাতের বন্ধন বাঙ্গালীর সর্বাঙ্গে এমন নাগপাশ হইয়া বসে নাই।" [গৌড়মল্লার ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ]

এই বিবৃতি যথার্থ।

অবশ্য সেযুগে পল্লী সমাজস্থ মানুষদের মধ্যে যে শাস্ত্র ও শিক্ষা নিরপেক্ষ একধরনের নৈতিক সংস্কার বর্তমান ছিল, বিশেষতঃ নারী পুরুষের অবৈধ সম্পর্কের ফল হিসাবে সন্তানের জন্ম হলে জন্মদাত্রীকে সাময়িক অপবাদ ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হত—এই বাস্তব সত্যটি উদ্ঘাটিত করতে লেখক বিস্মৃত হননি।

বেতসগ্রামের ঘনকৃষ্ণবর্ণ দারুকের পত্নী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা গোপা-বৌ 'দুগ্ধফেনশুভ্রা' এক কন্যা প্রসব করলে আপাত নির্লিপ্ত, নিরীহ গ্রামবাসীদের মনেই বিশেষ কৌতূহলের সঞ্চার হয়, তাদের নীরব প্রশ্নই ধ্বনিত হয় গ্রামের মহত্তর মহাশয়ের কণ্ঠে—

"সকলে জানতে চাইছে তোমার মেয়ে এমন ফরসা হল কি করে ?"

সন্তানের গাত্রবর্ণ পিতা অথবা মাতা অপেক্ষা ব্যতিক্রমধর্মী হলে যে সবযুগেই প্রতিবেশী মানুষদের মনে এক হীন সংশয়ের সৃষ্টি হয় তার পরিচয় পাওয়া যায় আর একটি অতি প্রসিদ্ধ আধুনিক বাংলা উপন্যাসেও। কালো কুবেরের ধবল পুত্র হলে—

"নকুল শয়তানী হাসি হাসিয়া পরিহাস করিয়া বলিল, তুই ত দেখি কালাকুষ্ঠি কুবির, গোরাচাঁদ আইল কোয়ান থেইকা ?"

(মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'পদ্মানদীর মাঝি')

তবে 'গৌড়মল্লার'-এ নীচবর্ণ অধ্যুষিত বেতসগ্রামে নীতি নিয়মের বিশেষ আতিশয্য ছিল না, লঘু পাপে গুরু দণ্ড নয়, বরং গুরু অন্যায়ে লঘু প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ছিল। রঙ্গনা দারুকের সন্তান নয়, রাজপুরুষ কপিলদেবের অবৈধ কন্যা এ কথা তার গাত্রবর্ণেই প্রমাণিত হলেও সমাজ গোপাকে গুরু শাস্তি দিতে চায়নি, পাঁচকাহন দণ্ড দিলেই তার অপরাধ স্খালন হত, কিন্তু বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারিনী, কঠিন-স্বভাবা গোপা মহত্তর মশায়ের কাছে দণ্ড দিয়ে প্রকারান্তরে নিজের অপরাধকে স্বীকার করতে রাজী হয়নি বলেই বেতসগ্রামের সমাজ তার প্রতি বিরূপ হয়েছিল। গ্রামবাসীদের প্রতিকূলতায় হয়তো শেষ পর্যন্ত গোপাকে কন্যা সহ বেতসগ্রাম ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে হত, কিন্তু গ্রামের দেবস্থানের পূজারী চাতক ঠাকুরের আনুকূল্যে তারা সেই দুর্ভাগ্যের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিল। তবে গ্রামবাসীদের হৃদয়ে তাদের স্থান হয়নি। মায়ের অপরাধে সুন্দরী, সুচরিত্রা, নম্র-স্বভাবা রঙ্গনা চিরদিন পল্লীসমাজের কাছ থেকে উপহাস, উপেক্ষা আর অবজ্ঞা লাভ করেছে।

'গৌড়মল্লার'-এ চাতক ঠাকুরের প্রতি বেতসগ্রামের জনসাধারণের ভক্তি ও আনুগত্য সেযুগর মানুষের ধর্মভীরু স্বভাবের উজ্জ্বল প্রমাণ। রাজা শশাঙ্ক রাজনৈতিক কারণে বৌদ্ধ-বিদ্বেষী হয়ে পড়লেও সে যুগে সমাজে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মেরই সহাবস্থান ও সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। আলোচ্য উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই ইতিহাস সচেতন লেখক সেযুগের ধর্মীয় অবস্থার একটি অতিবাস্তব চিত্র পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন—

"গ্রামের বাহিরে অশ্বত্থমূলে যে দেবস্থান আছে সেখানে দুইটি দেবতার প্রস্তরমূর্তি পাশাপাশি দণ্ডায়মান রহিয়াছে দেখা যায়। একটি চক্রস্বামী বিষ্ণুর বিগ্রহ, অন্যটি শাক্য মুনি বুদ্ধের মূর্তি। গ্রামবাসীরা তিল তুলসী দিয়া চক্রস্বামীর অর্চনা করে, দুগ্ধতণ্ডুল দিয়া শাক্যমুনির সন্তোষ বিধান করে, কাহারও প্রতি পক্ষপাত নাই।"

শুধু গ্রাম জীবনে নয়, নগরজীবনেও এই দ্বিবিধ ধর্মের নিরুপদ্রব সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। 'গৌড়মল্লার'-এ একদিকে রাজধানী কর্ণসুবর্ণের সন্নিকটে রক্তমৃত্তিকা বৌদ্ধবিহারের অবস্থান, অন্যদিকে নগরমধ্যে কামেশ্বরশিবের সুউচ্চ মন্দির। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচিত

'বেণের মেয়ে' শীর্ষক ঐতিহাসিক উপন্যাসেও সেকালের জীবনে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মেরই সমপ্রভাব চিত্রিত হয়েছে—

"সেকালে বেণেদের যে ঠিক কি ধর্ম ছিল বলা যায় না। তাহারা ব্রাহ্মণ দিয়া দশকর্মও করাইত, আবার বুদ্ধের মন্দিরে ধূপ ধুনাও দিত।"

শুধু সেযুগের ধর্মবোধের পরিচয় নয়, সেকালের গ্রামীণ সংস্কৃতির বাস্তব, বর্ণোজ্জ্বল চিত্রও উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে বেতসগ্রামের ইক্ষু উৎসবের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। ইক্ষুরস থেকে প্রস্তুত গুড়ই গৌড়দেশের প্রাণবস্তু—'গুড় হইতেই দেশের নাম গৌড়'। তাই প্রাচীন বাংলায় আখ চাষের সমৃদ্ধি কামনা করে আখবাড়ীর ও আখমাড়াই কলের এক কল্পিত দেবতার সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর নাম পণ্ডাসুর। 'গৌড়মল্লার'-এ ঔপন্যাসিক ইক্ষুদেবতা পণ্ডাসুরের নাম উল্লেখ করলেও তার পূজার পদ্ধতিগত বর্ণনা দেননি, কিন্তু তাঁর পূজাকে কেন্দ্র করে গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে যে উৎসব-মত্ততা ও হর্ষ-বিহ্বলতার চিত্র অঙ্কন করেছেন তা কাল্পনিক হলেও পার্বণ প্রিয় বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে নিঃসন্দেহেই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সেকালের পল্লী অঞ্চল ছিল আত্মনির্ভর, স্বয়ংসম্পূর্ণ।

"ধান্য, ইক্ষু, গোধন এই তিনটি গ্রামের প্রধান সম্পদ। ধান্য হইতে যে চাউল হয় তাহা গ্রামেই থাকে, বাঙালী চিরদিনই অন্নভোজী জীব, ভাত তাহার অন্ন, ভাত তাহার পানীয়, বাঙালীই প্রথম ভারতে ভাত হইতে তীব্র পানীয় প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিল।"

উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে বেতসগ্রাম সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের এই মন্তব্য অতিরঞ্জিত বর্ণনামাত্র নয়, প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার সজীব চিত্র। সেকালে বাঙালীর অন্নবস্ত্রের অভাব ছিল না। সর্বযুগেই বাঙালী মৎস্যপ্রিয় জাতি। তখনকার দিনেও—

"মোরলামৎস্য সহযোগে ওগ্‌গরা ভত্তা অতি উপাদেয় ভোজন বিলাস বলিয়া পরিগণিত হইত।" (গৌড়মল্লার ঃ তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

কিন্তু যুগ সচেতন লেখক সেকালের বাংলার শুধু সমৃদ্ধির চিত্রই আঁকেননি, বিপর্যয়ের দুরবস্থাকেও যে সাফল্যের সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত করেছেন, 'গৌড়মল্লার'-এর অষ্টম পরিচ্ছেদে তা পরিলক্ষিত হয়। ঔপন্যাসিকের বর্ণনা অনুসারে বোঝা যায় দেশে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা-সূত্রে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে গ্রামবাংলাও রক্ষা পেতনা। বিশেষতঃ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড়ের সিংহাসনকে কেন্দ্র করে অন্তর্বিপ্লব, এবং বঙ্গের "সাগর সমুদ্ভবা বাণিজ্য লক্ষ্মীর" সাগরে নিমজ্জন রূপ বহিরাঘাত—এই দুই প্রতিকূলতার ঝড়ে বাঙলার আর্থিক সমৃদ্ধি একেবারে ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়েছিল। সমগ্র দেশের সঙ্গে ক্ষুদ্র বেতসগ্রামও এই ঘনায়মান দুরদৃষ্টের অংশভোগ করেছিল।

কিন্তু যত অর্থনৈতিক দুরবস্থাই ঘটুক না কেন—"সেকালে বাংলাদেশে খাদ্যদ্রব্য দুর্মূল্য ছিল না, বিশেষতঃ সম্প্রতি বহির্বাণিজ্যে মন্দা পড়ায় দেশজাত সকল বস্তুই সুলভ হইয়াছিল। সোনা রূপারই অভাব হইয়াছিল, অন্নবস্ত্রের অভাব কখনও হয় নাই।" (গৌড়মল্লার ঃ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ)

তাই কর্ণসুবর্ণে পদার্পণ করে ক্ষুধার্ত বজ্র আহার্যের সন্ধানে ময়রার দোকানে উপস্থিত হয়ে, কয়েকটি কড়ি ও ক্ষুদ্র ধাতুমুদ্রার বিনিময়ে প্রচুর মিষ্টান্নভোজনের সুযোগ লাভ করেছে।

অন্নবস্ত্রের অভাব থাক বা না থাক "অরাজকতার দেশে সাধুও তস্কর হয়" বজ্রের প্রতি শীলভদ্রের এই উক্তি যে কত সত্য 'গৌড়মল্লার'-এ বর্ণিত নানা ঘটনায় তা সহজেই প্রতিপন্ন হয়। পিতার স্মারক স্বরূপ বজ্রের বাহুতে বাঁধা, স্বর্ণনির্মিত বহুমূল্য অঙ্গদটি হস্তগত করার জন্য কবি বিম্বাধর ও শৌণ্ডিক বটেশ্বরের হীন ষড়যন্ত্রই প্রমাণ করে নৈরাজ্যের যুগে বাঙালীর নৈতিক চরিত্র কতটা অধঃপতিত হয়েছিল।

কর্ণসুবর্ণের বজ্রের জীবনযাত্রার বর্ণনা অনুসারে জানা যায় নাগরিকদের মধ্যে কেউ কেউ অক্ষক্রীড়া, ভর্জিত পর্পট ও ইল্লীশ মৎস্য সহযোগে সুরাপান প্রভৃতি ব্যসনের মাধ্যমে, কতকাংশ আবার হাতীঘাটে গান, পঞ্চালিকার নাচ, অহিতুণ্ডিকের সাপ খেলানো, মায়াবী ইন্দ্রজাল প্রভৃতি শ্রবণ ও দর্শনের দ্বারা সান্ধ্যকালীন অবকাশ উপভোগ করত। যোগ্য রাজার পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সাহিত্য সংস্কৃতির অবনতি ঘটেছিল, আলোচ্য উপন্যাসে অদ্ভুতদর্শন কবি বিম্বাধর সেযুগের সংস্কৃতি জগতের বাস্তব প্রতিনিধি।

সর্বোপরি সেই 'মাৎস্যন্যায়'-এর যুগে রাজা ও রাজনীতি বিষয়ে শুধু গ্রামীণরাই নয়, নাগরিকগণও ছিল সমান নির্লিপ্ত ও নিস্পৃহ। রাজধানীতে অবস্থান করলেও এক রাজার স্থলে অন্য রাজার সিংহাসন অধিকারের ঘটনায় তারা বিন্দুমাত্র উত্তেজনা অনুভব করত না তাই অগ্নিবর্মার মৃত্যু সংবাদ এবং মানবদেবের পুত্র বজ্রদেব গৌড়ের সিংহাসনে অভিষিক্ত হওয়ার ঘোষণা শ্রবণ করেও—

> "নাগরিকেরা কিন্তু জয় ঘোষণা করিতেছে না। তাহারা উৎসুক নেত্রে শোভাযাত্রা নিরীক্ষণ করিতেছে, কিন্তু এই রাজ পরিবর্তন ব্যাপারে নিজেদের অংশভাক্ মনে করিতেছে না। কোন রাজা মরিল, কোন নূতন রাজা আসিল, এ বিষয়ে তাহাদের কৌতূহল থাকিতে পারে কিন্তু তদধিক কিছু নয়। কে যাইবে রাজা মহারাজার ব্যাপারে মাথা গলাইতে ? নিরুপদ্রবে বাঁচিয়া থাকিতে পারিলেই যথেষ্ট।"
>
> (ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ)

এই গ্রামীণ ও নাগরিকগণ ছাড়াও আছে বঙ্গদেশের দীর্ঘকালের অধিবাসী আরও এক মানবগোষ্ঠী—ভীল, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি। এরা বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ। 'গৌড়মল্লার'-এর বিচক্ষণ ঔপন্যাসিক এদের জীবনচিত্র অংকন করতেও বিস্মৃত হননি। কাহিনী বয়নের সূত্রে নিপুণ কৌশলে এক বনচর ভীল এবং এক অরণ্যবাসী শবর পরিবারের সংক্ষিপ্ত অথচ সজীব চিত্র তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। উপন্যাসের সপ্তম পরিচ্ছেদে বজ্রের সঙ্গে ভিলের প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনা—

> "ভিল্ল জাতীয় এক বনচর মাঝে মাঝে গ্রামে আসিত। উত্তরের জঙ্গল হইতে হরিণ বা ময়ূর মারিয়া গ্রামে লইয়া আসিত, মাংসের বিনিময়ে গুড় ও তণ্ডুল লইয়া যাইত। মসীকৃষ্ণ দেহের বর্ণ, পরিধানে পশুচর্ম, কেশের মধ্যে কঙ্কপত্র, মুখে সরল হাসি, ধনুক কাঁধে লইয়া সে যেদিন বজ্রের সম্মুখে দাঁড়াইল, বজ্র অপলক নেত্রে তাহার

পানে চাহিয়া রহিল, বজ্রের বয়স তখন নয়-দশ বৎসর, ভিলকে সে পূর্বে কখনও দেখে নাই।"

ভিলের সঙ্গে বজ্রের এই পরিচয়ের ফল হয়েছিল সুদূর প্রসারী—গৌরকান্তি কিশোর বজ্রের সঙ্গে কৃষ্ণকায় সরল প্রাণ ভিল যুবকের অসম মৈত্রীর ফল হিসেবে তারা পরস্পর পরস্পরের কাছে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেছিল—ভিলের অব্যর্থ শরসন্ধানে মুগ্ধ হয়ে বজ্র তার কাছে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করেছিল, বিনিময়ে ভিল যুবককে শিখিয়েছিল বঁড়শির সাহায্যে মৎস্য শিকার করতে। এই ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শিতার দ্বারা কর্ণসুবর্ণের দুর্গে অবস্থানরত রাজা বজ্র অলক্ষ্য থেকে তীর নিক্ষেপ করে শুধু কোকবর্মাকেই হত্যা করেনি অন্তত কিছুক্ষণের জন্য জয়নাগের দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল।

পিতার সন্ধানে কর্ণসুবর্ণে যাওয়ার পথে বনমধ্যে শবর কচ্ছুর সঙ্গে বজ্রের সাক্ষাৎ ও তার পারিবারিক জীবনের যে পরিচয় উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে মূল কাহিনীর পক্ষে তা অপরিহার্য না হলেও যুগচিত্র পরিস্ফুটনের ক্ষেত্রে এর মূল্য অপরিসীম। চর্যাপদের একাধিক কবিতায় এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এই শবরদের জীবনযাপন পদ্ধতির যে নানা বর্ণনা বিধৃত রয়েছে সেগুলির থেকে জানা যায় শবরেরা সাধারণতঃ পর্বত বা অরণ্যের অধিবাসী, মৃগয়াজীবী ও সর্পবিশারদ। 'গৌড়মল্লার'-এ শরদিন্দু কচ্ছু ও তার দুই স্ত্রী রত্তি ও মিত্তির মাধ্যমে শবর শ্রেণীর সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে সুকৌশলে চিত্রিত করেছেন।

বজ্রের সহযোগিতায় নবজীবন প্রাপ্ত কৃতজ্ঞ কচ্ছু কর্তৃক তার জীবনদাতার প্রতি বিনীত আবেদন—

"আমি বনের মানুষ কি দিয়ে তোমার পূজা করব, আমার দুই বৌ আছে এদের মধ্যে যাকে তোমার ভাল লাগে তাকে তুমি নাও, আজ রাত্রের জন্য সে তোমার বৌ।"

(গৌড়মল্লার)

এই উক্তি শবর চরিত্রের পক্ষে অসঙ্গত নয়। এই প্রসঙ্গে 'বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস' গ্রন্থের লেখক অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্তের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

"বজ্রকে কচ্ছুর একরাত্রির জন্য একটি স্ত্রীর উপর অধিকার দানের প্রস্তাব মানবমনের চিরন্তন অনুভূতি, কৃতজ্ঞতা ভিন্ন আরও একটা প্রথার ইঙ্গিত। একসময়ে অতিথির তৃপ্তি বিধানের জন্য গৃহস্থের সকল দ্রব্য এমনকি স্ত্রীও ব্যবহৃত হইত। গুরুপ্রসাদী প্রথার ন্যায় ইহাও পুরাতন দিনের একটি কদর্য প্রথা। অনুরূপ প্রথার প্রচলন ইয়োরোপেও একসময় ছিল।"

শুধু যুগপরিবেশ রচনার জন্য নয়, উপন্যাসটির গঠন শৈলীর জন্যও 'গৌড়মল্লার'-এর স্রষ্টা তাঁর পাঠককুলের অভিনন্দনযোগ্য। আলোচ্য ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাসটির কাহিনী সরল ও একমুখী। ষড়বিংশতি পরিচ্ছেদে সুবিভক্ত রচনাটির বিষয়বস্তু এইরূপ নায়ক বজ্রের জন্মের পটভূমি, বজ্রের জন্ম, বাল্য ও কৈশোরের উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ, বিংশতি বৎসরের যুবক বজ্রের পিতৃপরিচয় লাভ ও পিতার সন্ধানে কর্ণসুবর্ণ যাত্রা, সেই সূত্রে নগরজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হওয়া, পরিশেষে বেতসগ্রামেই প্রত্যাবর্তনের

অনবদ্য কাহিনী। লেখকের অননুকরণীয় লিপিকৌশল ও অতুলনীয় বর্ণনাভঙ্গী পাঠককে সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত কৌতূহলে আবিষ্ট করে রাখে। বিশেষতঃ পিতার অন্বেষণে বজ্রের বেতসগ্রাম ত্যাগের পর থেকেই কাহিনী বিবিধ ঘটনার স্রোতাভিঘাতে তীব্র গতিশীলা তরঙ্গিনীর মতোই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। আলোচ্য কাহিনীর চরম নাটকীয় মুহূর্তে নবম পরিচ্ছেদের প্রথমেই ঘনিয়ে এসেছে, যখন বজ্রের সহানুভূতিপূর্ণ, সহৃদয় আচরণ অনুভব করে অন্ধ মানব বলল—

> "তুমি বড় সৎ, বড় দয়ালু। তোমার নাম কি ? বজ্রের একবার ইচ্ছা হইল নিজের নামের সঙ্গে নবলব্ধ পিতৃ-পরিচয়ও অন্ধকে জানাইয়া দেয়। কিন্তু সে প্রলোভন সম্বরণ করিয়া কেবল বলিল—আমার নাম বজ্র। তারপর দুইজনে ছাড়াছাড়ি হইল। কেহ কাহাকেও চিনিল না অদৃষ্ট প্রেরিত হইয়া বিপরীত মুখে চলিল।"

'কালের মন্দিরা'র মতো 'গৌড়মল্লার'-এও প্রতিটি পরিচ্ছেদেরই নামকরণ করা হয়েছে। নামগুলির মাধ্যমে ঔপন্যাসিক পরিচ্ছেদ-বিবৃত ঘটনাবলীর ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিত দান করে পাঠকের কৌতূহল ও উৎকণ্ঠাকে পরিবর্ধিত করে তুলেছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে 'শরদিন্দু অম্নিবাস'-এর তৃতীয় খণ্ডের গ্রন্থ পরিচয় অংশে শোভন বসুর লেখা থেকে জানা যায় প্রথমে এই উপন্যাসটির নাম ছিল 'মৌরী নদীর তীরে'। কয়েক পরিচ্ছেদ লেখার পর নতুন নাম হয়—"গৌড়মল্লার।" এই নাম পরিবর্তন শিল্প সম্মত, কারণ যদিও কাহিনীর দুই প্রধান ঘটনাস্থল—বেতসগ্রাম ও কর্ণসুবর্ণ উভয়ই মৌরী নদীর তীরে অবস্থিত, যদিও উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের সূচনা মুহূর্তেই ঔপন্যাসিক ময়ূরাক্ষীর সখীনদী এই ময়ূরী বা মৌরীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, চতুর্দশ পরিচ্ছেদে বজ্রের কর্ণসুবর্ণ বাসকালে মৌরী নদীর প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে, তবুও "মৌরী নদীর তীরে" নামটির মধ্যে সেকালের বঙ্গদেশের ও বঙ্গ সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত সুরটি যেন সঠিকভাবে ঝংকৃত হয় না। সে তুলনায় সংক্ষিপ্ত, সংহত অথচ ব্যঞ্জনাময় 'গৌড়মল্লার' অনেক সার্থক, সুখশ্রাব্য ও সুন্দর নাম। উপন্যাসের ভাববস্তু যেন নামটির মধ্যে অনায়াসেই আত্মপ্রকাশ করেছে।

বজ্রই 'গৌড়মল্লার'-এর নায়ক। তার চরিত্রটিই উপন্যাসের পুরুষচরিত্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুপরিস্ফুট। বজ্রকে কেন্দ্র করেই কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। সে 'কালের মন্দিরার' স্কন্দগুপ্তের মতো একটি জাতির ভাগ্যবিধাতা নয়, জীবন সম্পর্কে কোনো ব্যাপক জিজ্ঞাসা আদর্শ, বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার নেই, কিন্তু মায়ের প্রতীক্ষাকে সার্থক করে তোলার জন্য তরুণ বজ্রের পিতৃ অন্বেষেণে যাত্রার মধ্যে তার যুবধর্ম ও প্রবল পৌরুষকে অস্বীকার করা যায় না, কর্ণসুবর্ণে পৌঁছে কুটিল ঘটনা স্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করা তার পক্ষে সব সময়ে হয়তো সম্ভব হয়নি, বরং বলা যায় অনেক সময়েই তাকে আমরা প্রতিকূলতার তরঙ্গে ভেসে যেতে দেখেছি। কর্ণসুবর্ণে এসেও পিতার সংবাদ সংগ্রহের জন্য তাকে সচেষ্ট হতে দেখিনি, সেখানে সে কর্মহীন আলস্যে কখনও নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করেছে, কখনও বা তার মন বেতসগ্রামের প্রীতিস্নিগ্ধ পরিবেশে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়েছে। ঘটনাচক্রে কোদণ্ড মিশ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হলে পিতামহের সিংহাসনে উপবেশন

করার চিন্তা বজ্রের দূরতম কল্পনাতেও স্থান পেতনা। কিন্তু রাজা হওয়ার পর জয়নাগ ও কোকবর্মার সম্মিলিত ও সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর হাত থেকে দুর্গরক্ষার মুহূর্তে বজ্রের অব্যর্থ শরসন্ধান প্রতিভা, যুদ্ধ পরিচালনা কালে তার রাজোচিত শৌর্য ও আভিজাত্য অবিস্মরণীয়। তার রাজত্বের আয়ুমাত্র একদিবস। কিন্তু সেই একদিনের রাজা বজ্রদেবকে 'গৌড়কেশরী' শশাঙ্কদেবের সুযোগ্য পৌত্ররূপে প্রতিষ্ঠাদানের জন্য বজ্রের স্রষ্টা ঔপন্যাসিক শরদিন্দু তাকে শৈশব থেকেই রাজকীয় মানসিক গুণাবলী ও দৈহিক সৌষ্ঠবের অধিকারী করে গড়েছেন—উপন্যাসের সপ্তম পরিচ্ছেদেই লেখক জানিয়েছেন,—

"বজ্রের প্রকৃতি যে সাধারণ শিশু হইতে পৃথক তাহা তাহার জন্মকাল হইতে লক্ষিত হইয়াছিল। সে বেশী কাঁদে না, আঘাত লাগিলে বা ক্ষুধা পাইলেও কাঁদে না। যখন কথা বলিতে শিখিল, তখনও অধিক কথা বলে না, যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু বলে। সে চঞ্চল নয়, চুপ করিয়া একস্থানে বসিয়া থাকে, অন্য শিশুদের ছুটাছুটি লক্ষ্য করে কিন্তু অকারণে ছুটাছুটি করে না। · ···

অথচ সে মেধাবী তাহার মন সর্ব বিষয়ে সজাগ ও সচেতন। দেহের দিক দিয়া যেমন সমবয়স্ক বালকদের তুলনায় অধিক বৃদ্ধিশীল, মনের দিক দিয়াও তেমনি।"

কৈশোরকাল থেকেই বজ্র অন্যায়ের প্রতি বজ্রতুল্যই কঠোর, কিন্তু প্রেমিকা গুঞ্জার কাছে সে মাধুর্যের প্রতীক 'মধুমথন'। বেতসগ্রামের স্নিগ্ধ পটভূমিতে লালিত বজ্র ও গুঞ্জার পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে নাগরিক প্রেমের জটিলতা নেই, আছে সবুজ বনানীর মতোই সজীব, নবীন, সংকোচহীন গভীর প্রণয়।

কিন্তু এই প্রেম পর্বেও বজ্রের সংযম ও গভীরতা লক্ষণীয়। গুঞ্জাকে কেন্দ্র করে তার অনিয়ন্ত্রিত উচ্ছ্বাস বা অসংগত প্রগল্ভতা, পরিলক্ষিত হয়না। বেতসগ্রাম পরিত্যাগের প্রাক্-মুহূর্তে নিসর্গকে সাক্ষী রেখে বজ্র গুঞ্জাকে কথা দিয়েছিল যে নগর জীবনের শত প্রলোভনের মধ্যেও সে কখনও গুঞ্জাকে বিস্মৃত হবে না, অন্য কোনও নারীদেহ সে স্পর্শ করবে না—প্রাণপণে সে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। বনমধ্যে শবর কচ্ছু তার প্রীতি সম্পাদনার্থে দুটি স্ত্রীর মধ্যে একটিকে তার সেবায় একরাত্রের জন্য উৎসর্গ করতে চাইলে।'

"বজ্র গাঢ়স্বরে বলিল আমার বৌ আছে। তাকে গ্রামে রেখে এসেছি। অন্য বৌ আমার দরকার নেই।" [গৌড়মল্লার]

কর্ণসুবর্ণের বটেশ্বরের গৃহে বাসকালে গভীর রাত্রে তার কক্ষে আগতা অভিসারিকা কুহুকে সে নির্বিকার চিত্তে প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছে। তবে উপন্যাসের পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদে তার যে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় তা বিশ্লেষণযোগ্য

"বজ্র কুহুকে দুইবাহু দিয়া বুকের কাছে তুলিয়া লইল, তাহার অধরে চক্ষে ললাটে চুম্বন করিয়া নামাইয়া দিল।"

কুহুর প্রতি বজ্রের এই আচরণ দেহকামনার নির্লজ্জ প্রকাশ নয়, নাগরিক জীবনে একমাত্র সমব্যথিনী, শুভার্থিনী নারীর প্রতি প্রীতির নিষ্কলুষ অর্ঘ্য।

উপন্যাসের একবিংশ পরিচ্ছেদে দেখা যায় কর্ণসুবর্ণের রাজপুরীতে বজ্রের জীবনে নেমে এসেছে এক অভিশপ্ত রজনী। বশীকরণ ধূপের ধোঁয়ায় বজ্রকে আচ্ছন্ন করে বিকীর্ণকামা রাণী শিখরিণী নিজের ভোগলালসা চরিতার্থতার নারকীয় লীলায় মেতে উঠেছে—কিন্তু সেই বিশেষ মুহূর্তেও অচৈতন্য বজ্রের মগ্নচৈতন্য জুড়ে বিরাজ করেছে গুঞ্জা—তার কুঁচবরণ কন্যা।

উপন্যাসের ষড়বিংশ পরিচ্ছেদে বহু পথ অতিক্রম করে যে বজ্র গুঞ্জার কাছে ফিরে এসেছে সে পূর্বের অনভিজ্ঞ গ্রাম্য যুবক নয় বটে, কিন্তু তার মন তেমনি অপাপবিদ্ধ। পিতামহ অপেক্ষা পিতার বৈশিষ্ট্যই তার শোণিতে বহমান। তাই হিংসা কুটিল, স্বার্থদ্বেষপূর্ণ নগর জীবন অপেক্ষা 'ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড়' বেতসগ্রামই তার কাছে শ্রেয় মনে হয়েছে। পিতা মানবদেবের মতো সেও হয়তো অনুভব করেছে—

"রাজৈশ্বর্য চিরন্তন নয়, মনুষ্যত্ব চিরন্তন। আমাদের নাম লোকে ভুলে যাক ক্ষতি নেই, আমাদের মনুষ্যত্ব যেন যুগযুগান্তর ধরে গৌড়বঙ্গের অন্তরে বেঁচে থাকে।"

'গৌড়মল্লার'-এর কোদণ্ড মিশ্রের চরিত্রটি যে ইতিহাস প্রসিদ্ধ কৌটিল্য চাণক্যের আদর্শে চিত্রিত হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না, কারণ ঔপন্যাসিক স্বয়ং শশাঙ্কদেবের এই মন্ত্রী সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,—

"চাণক্য যেমন নন্দবংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন, তিনিও তেমনি বর্মবংশ শেষ না করিয়া ছাড়িবেন না।"

ঘটনাচক্রে অগ্নিবর্মার মৃত্যু ও বজ্রের সিংহাসনে অভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে তার সেই সংকল্প সিদ্ধ হয়েছে—প্রতিশোধস্পৃহায় বহু বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করার পর বর্মবংশ উচ্ছেদ করার আনন্দে ও তৃপ্তিতে তিনি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হয়েছেন। অসাধারণ নাটকীয় এই পরিসমাপ্তি।

বেতসগ্রামের উদারহৃদয়, আত্মউদাসীন পুরোহিত চাতক ঠাকুরের চরিত্রটি মর্মস্পর্শী। কিন্তু এই চরিত্রায়নে কিছু অলৌকিকতা পরিলক্ষিত হয়। মাঝে মাঝেই তাঁর ভাব সমাধিস্থ হওয়া ও দিব্যদৃষ্টি লাভ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

কবি বিম্বাধর ও শৌণ্ডিক বটেশ্বর অধঃপতিত নাগরিক সমাজের আদর্শহীন, লক্ষ্যভ্রষ্ট প্রতিনিধি।

ব্যসন পরায়ণ, ভোগোন্মত্ত রাজা অগ্নিবর্মা সর্বকালের ব্যাভিচারী রাজার সার্থক প্রতিভূ। মূর্তিমতী কামনার লেলিহান শিখা স্বরূপিণী রাণী শিখরিণীর বিকৃত রুচি, সংকীর্ণ সম্ভোগ তৃষ্ণা, চরিত্রহীন স্বামীর প্রতি প্রতিশোধ স্পৃহা—আমাদের সহানুভূতি বা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে না। কিন্তু উগ্র ভোগপরায়ণা নারীরূপে তার আচার আচরণ অত্যন্ত জীবন্ত।

বেতসগ্রামের গোপা বৌ-এর চারিত্রিক দৃঢ়তা ও ব্যক্তিত্ব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নারী হয়েও যে তার দেহে মনে এক ধরনের পুরুষ সুলভ রুক্ষতা ও কর্কশতা পরিলক্ষিত হয় এ বৈশিষ্ট্য অস্বাভাবিক নয়। গোপার মত যাদের বিরূপ ভাগ্যের বিরুদ্ধে আজীবন একাকিনী সংগ্রাম করতে হয়, সামাজিক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়, তাদের

এই চারিত্রিক কাঠিন্য অবশ্যম্ভাবী।

গোপার কন্যা রঙ্গনাও দুঃখিনী কিন্তু সে তার জননীর বিপরীতস্বভাবা। রাজপুরুষ কপিলদেবের অবৈধ সন্তান হিসেবে সে সমাজের উপেক্ষা ও অনাদরের পাত্রী কিন্তু ভাগ্যের এই নিষ্ঠুরতা তার চরিত্রের মাধুর্যকে বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন করতে পারেনি। রঙ্গনার রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক মন্তব্য করেছেন—

"মাথার আকুঞ্চিত কেশ হইতে পায়ের রক্তিমাভ নখ পর্যন্ত যেন কালিদাসের শকুন্তলা-রূপোচ্চয়েন বিধিনা মনসা কৃতানু।"

কিন্তু শুধু রূপসৌন্দর্যের ক্ষেত্রেই নয় রঙ্গনার জীবন সাধনা ও দুঃখভোগের ক্ষেত্রেও শকুন্তলার সঙ্গে তার সুগভীর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কালিদাসের শকুন্তলা-দুষ্মন্তের মতোই রঙ্গনা ও মানবের প্রথম সাক্ষাৎ নিসর্গের পটভূমিকায়, প্রথম দর্শনেই উভয়ের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি অনুরাগ সঞ্চারিত হয়েছে। প্রকৃতিকে সাক্ষী রেখে তেমনি গান্ধর্ব বিবাহ। তারপর মানব চলে গেলে দুঃসহ বিচ্ছেদে সুদীর্ঘকাল শকুন্তলার মতোই রঙ্গনার একাগ্রচিত্তে, অচঞ্চল তপস্যায় জীবন অতিবাহিত করা। উগ্র ব্যক্তিত্বে নয়, স্বভাবের স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে রঙ্গনা পাঠক হৃদয়ে সমবেদনার আসনটি অধিকার করে।

'গৌড়মল্লার'-এর আর একটি উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্র কুহু। রাণী শিখরিণীর নিজস্ব পরিচারিকা নাগরিকা কুহু জীবনে পুরুষের জন্য প্রণয়াভিসার করেছে বহুবার, কিন্তু সেই প্রগলভা, চটুলা কামিনী বজ্রের সান্নিধ্যে এসেই জীবনে প্রথম প্রকৃত প্রেমের স্বাদ অনুভব করেছে। বজ্রের প্রতি স্বার্থসংকীর্ণ কামনা রূপান্তরিত হয়েছে কল্যাণধর্মী প্রেমে। উপন্যাসের চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে দেখা যায় কুহু বজ্রকে রণসাজ পরিয়ে দিয়েছে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনানুসারে কুহুর তৎকালীন প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়—

"বুকে পিঠে লোহার সাঁজোয়া, মাথায় লোহার শিরস্ত্রাণ, কটিতে তরবারী। পরাইতে কুহুর দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এতদিনে পাপিষ্ঠা কুহু ভালবাসিয়াছে। শুধু দেহের আসক্তি নয়, এই সরল স্বল্পবাক অনাগরিক মানুষটি তাহার হৃদয় জয় করিয়া লইয়াছে।"

বজ্রের কাছ থেকে চিরবিদায়ের মুহূর্তে কুহুর আবেগ বিহ্বলতা, তার অশ্রু লাঞ্ছিত প্রণয়িনী মূর্তিটি পাঠক-হৃদয়ে গাঢ় রেখায় আঁকা হয়ে যায়।

আলোচনার সমাপ্তি পর্বে একথা স্বীকার করতেই হয় যে 'গৌড়মল্লার'-এ একটি গ্রাম ও একটি নগরকে কেন্দ্র করে শশাঙ্ক পরবর্তীকালে 'মাৎস্যন্যায়' কবলিত গৌড়বঙ্গের সামগ্রিক যুগচিত্রটি পরিস্ফুটনে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় যে বিস্ময়কর নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা নির্দ্বিধায় প্রশংসার্হ। প্রয়োজনীয় ইতিহাস নিষ্ঠার সঙ্গে প্রগাঢ় কল্পনা শক্তির বাঞ্ছিত সমন্বয়ের মাধ্যমে লেখক অতীত বঙ্গের এক বিস্মৃত অধ্যায়কে সাহিত্যের শাশ্বতলোকে প্রতিষ্ঠা দান করেছেন। এই কৃতিত্বের জন্য তিনি সর্বযুগের বঙ্গবাসীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাভাজন॥

তুমি সন্ধ্যার মেঘ [১৩৬৫] : রচনাকালের বিচারে 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ' শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় ইতিহাসাভিত্তিক উপন্যাস। নয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত আলোচ্য

আখ্যায়িকাটিও মূলতঃ বাঙলা ও বাঙালীর ইতিহাস। আলোচ্য উপন্যাসের সূচনাংশে কাহিনীর ঐতিহাসিক পটভূমিকা সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য—

"এই কাহিনীতে দীপঙ্কর, রত্নাকরশান্তি, নয়পাল, বিগ্রহপাল, লক্ষ্মীকর্ণদেব, বীরশ্রী, যৌবনশ্রী, জাতবর্মা, বজ্রবর্মা, যোগদেব ও তিব্বতীয় আচার্য বিনয়ধরের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়। দীপঙ্করের শান্তি প্রচেষ্টা এবং বিগ্রহপালের সহিত যৌবনশ্রীর বিবাহও ঐতিহাসিক ঘটনা।"

ঔপন্যাসিক প্রদত্ত এই তথ্যের যাথার্থ্য নির্ণয়ের জন্য আমরা দুটি প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারি। এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে 'বাঙালীর ইতিহাস'-এর প্রথিতযশা গ্রন্থকার 'নীহাররঞ্জন রায়'-এর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য—

"মহীপালের পুত্র জয়পালের (আঃ ১০৩৮-১০৫৫) রাজত্বকালে বঙ্গ ও গৌড় কলচুরীরাজ কর্ণ বা লক্ষ্মীকর্ণের হস্তে পরাজয়ের অপমান স্বীকার করে, কিন্তু তিব্বতী সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, এই যুদ্ধে জয় পরাজয় মীমাংসিত হয় নাই। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের (অতীশ) মধ্যস্থতায় দুই রাষ্ট্রের মধ্যে একটি সন্ধিশান্তির প্রতিষ্ঠায় এই যুদ্ধ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু, জয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে (আঃ ১০৫৫-৭০) কর্ণ বোধ হয় দ্বিতীয়বার বাংলাদেশ আক্রমণ করেন এবং অন্ততঃ বীরভূম পর্যন্ত অগ্রসর হন···এই দ্বিতীয় আক্রমণের পরিণতিই বোধ হয় তৃতীয় বিগ্রহপাল এবং কর্ণকন্যা যৌবনশ্রীর বিবাহ।"

লক্ষণীয় নীহাররঞ্জন রায়ের মতে মহীপালের পুত্র ও বিগ্রহপালের পিতার নাম 'জয়পাল', 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ'-এ উক্ত পালরাজ 'নয়পাল' নামে উল্লিখিত। অবশ্য শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'জয়পাল' নয়, 'নয়পাল' নামটিই ব্যবহার করেছেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থে রায় শরৎচন্দ্র দাস বাহাদুর সম্পাদিত 'বুদ্ধিস্ট টেক্স্ট সোসাইটির' পত্রিকা থেকে গৌড়েশ্বরের সঙ্গে কর্ণদেবের যুদ্ধের বিবৃতি উদ্ধৃত করেছেন—

"দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যখন বজ্রাসনে অর্থাৎ মহাবোধিতে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় মগধরাজ নয়পালের সহিত তীর্থিকধর্মাবলম্বী কর্ণ্যরাজের বিবাদ হইয়াছিল। কর্ণ্যরাজ মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি নগর অধিকার করিতে না পারিয়া কতকগুলি বৌদ্ধ বিহার মন্দিরাদি ধ্বংস করিয়াছিলেন। পরে নয়পালের সেনা জয়লাভ করিলে কর্ণ্যরাজের সেনাগণ যখন নিহত হইতেছিল তখন শ্রীজ্ঞান তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় যুদ্ধ স্থগিত হইয়া সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল।"

লক্ষ্মীকর্ণদেব বা কর্ণদেব কর্তৃক দ্বিতীয়বার গৌড় আক্রমণ বৃত্তান্তও সমর্থিত হয়েছে 'বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থে। মূলতঃ বিক্রমাঙ্কদেবচরিত (১/৭৪) ও রামচরিত (১/৯ টীকা)—এই দুই সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অবলম্বনে গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেন—

"চেদীবংশীয় কর্ণদেব ও কল্যাণের চালুক্যবংশীয় আহবমল্লের পুত্র বিক্রমাদিত্য তৃতীয়

বিগ্রহপালের রাজ্যকালে গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। কর্ণদেব পরাজিত হইয়া তাঁহার যৌবনশ্রী নাম্নী কন্যার সহিত বিগ্রহপালের বিবাহ দিয়াছিলেন।"

'তুমি সন্ধ্যার মেঘ'-এ কিন্তু অতীতে সংঘটিত এই সমস্ত ঘটনাবলীর অবিকল প্রতিরূপ খুঁজে পাওয়া যায় না। অবশ্য এক্ষেত্রে ইতিহাসের হুবহু প্রতিফলন আশা করাও অযৌক্তিক। কারণ ইতিহাসকে উপন্যাসে পরিণত করতে হলে অর্থাৎ বাস্তব তথ্যের সঙ্গে জীবন সত্যের সমন্বয় ঘটাতে হলে ঔপন্যাসিকের কল্পনা বিস্তারের স্বাধীনতা অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে; কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসে সেই স্বাধীনতা গ্রহণের সীমা যথেষ্ট পরিব্যাপ্ত। উপন্যাসকে অগ্রগতি ও উপভোগ্য পরিণতিদানের উদ্দেশ্যে লেখক তাঁর মৌলিক চিন্তা-শক্তিকে প্রভূত প্রশ্রয় দান করেছেন, তাই কাহিনীর স্থানে স্থানে ইতিহাসে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর সঙ্গে উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাধারার উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়।

উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম থেকে অষ্টম উপ-পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ঘটনাবলী বর্ণনার ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক ইতিহাসকে যথাযথভাবে অনুসরণ করেছেন। পালরাজ ও চেদিরাজের মধ্যে বংশানুক্রমিক শত্রুতা, নয়পালের আমলে লক্ষ্মীকর্ণ কর্তৃক প্রথমবার গৌড় আক্রমণের প্রচেষ্টা এবং উভয় রাজার মধ্যে সন্ধি সম্পাদনে অতীশ দীপঙ্করের সক্রিয় ভূমিকা—উপন্যাসে বিবৃত এই ঘটনাসমূহ নিঃসন্দেহে ইতিহাসভিত্তিক, তবে শরদিন্দু-সৃষ্ট চেদিরাজ লক্ষ্মীকর্ণ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ সন্ধি প্রস্তাবে রাজি হননি। এর পশ্চাতে এক নিগূঢ় অথচ কৌতুকজনক কারণ লুকিয়ে ছিল। উপন্যাসে দেখা যায় পালরাজাদের অধিকৃত অঙ্গদেশ জয় করতে এসে ভগ্নমনোরথ হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য লক্ষ্মীকর্ণ সৈন্যসহ বিক্রমশীলা মহাবিহারে প্রবেশ করলেন। চেদিরাজের দাম্ভিক ব্যবহারে ও তাঁর সৈন্যদের বর্বর আচরণে সেই বৌদ্ধসংঘের আচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তাঁদের বিহার পরিত্যাগ করার আদেশ দিলেন। কিন্তু সেই আদেশ পালনের জন্য যখন দুর্বিনীত লক্ষ্মীকর্ণের বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখা গেলনা তখন তিব্বত থেকে আগত বৌদ্ধ ভিক্ষু বিনয়ধর সৈন্যসহ চেদিরাজকে বিতাড়নের জন্য এক অভাবনীয় কৌশল অবলম্বন করলেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্য উপঢৌকন স্বরূপ আনিত অগ্নিকন্দুক গুলি (আধুনিক পেটো ?) তিনি নিক্ষেপ করতে শুরু করলে, সেগুলির থেকে বিচ্ছুরিত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ এবং গগনভেদী শব্দ উপস্থিত সকলের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। অগ্নিকন্দুকের ব্যবহার ভারতবর্ষে তখনও সম্পূর্ণ অপরিচিত। ফলে এই অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতায় লক্ষ্মীকর্ণের সৈন্যরা তো ভয়চকিত হৃদয়ে পরিত্রাহি চীৎকার করতে করতে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পলায়ন শুরু করেছিলই, স্বয়ং লক্ষ্মীকর্ণের প্রতিক্রিয়াও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। –

"মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ অন্ধকারে দাঁড়াইয়া একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। একী বীভৎস ব্যাপার। বৌদ্ধরা কি পিশাচসিদ্ধ ? এরূপ প্লীহা চমকপ্রদ শব্দ ও আগুনের খেলা প্রেত পিশাচ ছাড়া আর কে সৃষ্টি করিতে পারে ? লক্ষ্মীকর্ণদেব যুদ্ধক্ষেত্রে কখনও ভয় পান নাই, কিন্তু আজ তাহার হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া উঠিল।"

['তুমি সন্ধ্যার মেঘ'—প্রথম পরিচ্ছেদ,—পাঁচ]

সুতরাং উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চেদিরাজের 'সভয় হইল আজি ভয়শূন্য হিয়া।' মুখে তিনি যতই আস্ফালন করুননা কেন, হৃদয় তাঁর পূর্ব অবস্থায় ছিল না। তাই উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের অষ্টম অধ্যায়ে যখন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান চেদিরাজবংশ ও পালরাজবংশের মধ্যে সুদীর্ঘকালীন শত্রুতার এক চিরস্থায়ী সমাধানের সূত্র হিসেবে কুমার বিগ্রহের সঙ্গে মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করলেন, তখন—

> "লক্ষ্মীকর্ণ আরও কয়েকবার অসংলগ্নভাবে অসম্ভব বলিয়া ক্রমশঃ নীরব হইলেন। তাঁহার বিরাগপূর্ণ অসম্মতি ভেদ করিয়া কূটবুদ্ধি ও পিশাচভীতি আবার মাথা তুলিল।"

পালবংশের সঙ্গে কুটুম্বিতা সূত্রে মৈত্রী বন্ধনের আবদ্ধ হওয়ার বিন্দুমাত্র স্পৃহা চেদিরাজের ছিল না। কিন্তু অগ্নিকন্দুকের ভয়েই তিনি সেই মনোভাব গোপন করে তখনকার মতো আত্মরক্ষা করার জন্য এক কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি জানালেন কুলপ্রথা অনুসারে তাঁকে তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা যৌবনশ্রীর স্বয়ংবরের আয়োজন করতেই হবে। সুতরাং বিগ্রহপালের সঙ্গে যৌবনশ্রীর বিবাহ প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হতে তিনি অপারগ। অবশেষে স্থির হল—

> "মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ কন্যার স্বয়ংবর সভায় কুমার বিগ্রহকে আহ্বান করবেন। কন্যা যদি কুমারের গলায় বরমাল্য দান করে তাহলে দুই রাজবংশের মধ্যে কুটুম্বমৈত্রী স্থাপিত হবে।"

বলাবাহুল্য অগ্নিকন্দুকের মাধ্যমে লক্ষ্মীকর্ণকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলার ঘটনা যেমন ঔপন্যাসিকের কল্পনাপ্রসূত তেমনি যৌবনশ্রীর স্বয়ংবর প্রসঙ্গও ঐতিহাসিক সত্য নয়। বিগ্রহপালের সঙ্গে যৌবনশ্রীর বিবাহ ইতিহাসসম্মত ঘটনা হলেও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' অনুসরণে বোঝা যায় এ ঘটনা ঘটেছিল বিগ্রহপালের রাজত্বকালে চেদিরাজ কর্তৃক দ্বিতীয়বার গৌড় আক্রমণের পর, স্বয়ংবর প্রথার মাধ্যমে এ বিবাহ সংঘটিত হয়েছিল এমন সাক্ষ্য ইতিহাস দেয় না।

উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম অধ্যায়ে জানা যায় লক্ষ্মীকর্ণ কন্যা যৌবনশ্রীর স্বয়ংবরের আয়োজন করেছেন, বহু রাজা এবং রাজপুত্রদের উদ্দেশে নিমন্ত্রণ লিপি প্রেরিত হয়েছে, কিন্তু বিগ্রহপালের কাছে চেদিরাজের পক্ষ থেকে কোনও আমন্ত্রণ এসে পৌঁছাল না। এই অপমানের ফলে পালরাজ পরিবারে দ্বিবিধ প্রতিক্রিয়া ঘটল···

> "নয়পাল রাগে ফুলিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুই করিতে পারলেন না।" অপরদিকে 'বিগ্রহপাল সকল সংবাদই পাইতেছিলেন, তাঁহার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি অনঙ্গপালকে গিয়া বলিলেন 'চল অনঙ্গ, ত্রিপুরী যাই। বুড়ো শেয়ালের মেয়েটাকে কেড়ে নিয়ে আসি।' [দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—'এক']

এর পরবর্তী ঘটনা মহারাজ নয়পালকে প্রকৃত উদ্দেশ্য না জানিয়েই দুই মিত্রের জল-পথে, নৌকা যোগে দেশভ্রমণের ছলে চেদিরাজধানী ত্রিপুরী যাত্রা। এই দুই লঘুচিত্ত রঙ্গপ্রিয় যুবকের চেদিরাজ্য যাত্রা থেকে কাহিনীর পরিচালনরজ্জু মূলতঃ ইতিহাস বিধাতার কাছ থেকে কল্পনা দেবীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে—নদীবক্ষে বিগ্রহপালের সঙ্গে

লক্ষ্মীকর্ণের জ্যেষ্ঠ-জামাতা বংগাল যুবরাজ জাতবর্মার পরিচয়, পাল রাজকুমারের প্রকৃত উদ্দেশ্য জেনে তার সঙ্গে জ্যেষ্ঠা চেদিরাজকন্যা বীরশ্রীর এক প্রীতি-মধুর সম্পর্কের সূত্রপাত, ত্রিপুরী পৌঁছেই নদীর ঘাটে যৌবনশ্রী ও বিগ্রহপালের আকস্মিক সাক্ষাৎ এবং পরস্পরের হৃদয়ে পূর্বরাগের সঞ্চার, লক্ষ্মীকর্ণের গুপ্তচর লম্বোদরের গৃহে মধুকর ছদ্মনামে অনঙ্গপালের এবং জ্যোতিষী রন্তিদেবের গৃহে বিগ্রহপালের আশ্রয়লাভ, বীরশ্রীর মধ্যস্থতায় বিগ্রহ ও যৌবনশ্রীর মিলন, লম্বোদর-শ্যালিকা তথা চেদিরাজদুহিতার সহচরী বাঙ্কুলির সঙ্গে অনঙ্গের প্রণয়, লক্ষ্মীকর্ণ-পরিকল্পিত বিগ্রহপালের মর্কটমূর্তি নির্মাণের ভার ঘটনাচক্রে শিল্পী মধুকর অর্থাৎ অনঙ্গের উপর ন্যস্ত হওয়া, স্বয়ংবর সভায় পিতৃআদেশ অগ্রাহ্য করে বিক্রমাদিত্যের পরিবর্তে মগধ যুবরাজের সেই মর্কট মূর্তিতেই যৌবনশ্রীর মাল্য দান, এবং লম্বোদরের প্রতিবন্ধকতায় বিগ্রহপালের যৌবনশ্রীকে স্বরাজ্যে আনয়নের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাওয়া, বেদনাবিদ্ধ মনে বন্ধু অনঙ্গ ও বন্ধুপত্নী বাঙ্কুলি সহ বিগ্রহপালের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও চেদিরাজ লক্ষ্মীকর্ণের নির্মম রোষে যৌবনশ্রীর দুঃসহ কারাবাস প্রভৃতি ঘটনাগুলি লেখকের রোমান্সপ্রীতি ও কল্পনাকুশলতার নিদর্শন। এমনকি 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ'-এর সপ্তম পরিচ্ছেদের পঞ্চম উপপরিচ্ছেদে লক্ষ্মীকর্ণের স্পর্ধায় নয়পালের রোষ ও পুত্রবধূকে তার পিতার কবল থেকে রক্ষা করার জন্য চেদিরাজ্যে দূত প্রেরণ ও পাটলি-পুত্রে সমরায়োজন এ সমস্তই কাল্পনিক, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

দ্বিতীয়বার গৌড় আক্রমণে এসে লক্ষ্মীকর্ণর মানসিকতার পরিবর্তন ও পালরাজার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের কারণটিও অনৈতিহাসিক। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ইতিহাসের তথ্য অনুসারে দ্বিতীয়বার মগধ আক্রমণে এসে পরাজিত চেদিরাজ কর্ণদেব তৎকালীন পালরাজা তৃতীয় বিগ্রহপালের সঙ্গে কন্যা যৌবনশ্রীর বিবাহ দিয়ে সন্ধিস্থাপন করেছিলেন। কিন্তু উপন্যাসের উপসংহার অংশে ঔপন্যাসিক এক চমকপ্রদ নাটকীয়তার সৃষ্টি করেছেন—বিগ্রহপাল ও লক্ষ্মীকর্ণের মধ্যে যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে চেদিরাজ সারথি সম্পৎ জানিয়েছে—

'আয়ুষ্মান্ ও রথ চালাচ্ছেন কুমারী যৌবনশ্রী।'

'কী। যৌবনশ্রী। মহারাজ হতভম্ব হইয়া চাহিলেন। হাঁ, যৌবনশ্রীই বটে। রথ চালাইতেছে সারথিবেশিনী যৌবনশ্রী আর রথের রথী—বিগ্রহপাল।

মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ ক্ষণেকের জন্য দারুব্রহ্মের ন্যায় রথে বসিয়া রহিলেন।…অতঃপর মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের মনে যে প্রতিক্রিয়া হইল তাহা অদ্ভুত।'

এই প্রতিক্রিয়ার ফলেই এক অভাবনীয় পরিণতি—

"মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ কন্যা ও জামাতাকে দুইটি মার্জার শাবকের মত অবহেলে তুলিয়া নিজের দুই স্কন্ধে স্থাপন করিলেন এবং উদ্দাম তাণ্ডব নাচিতে শুরু করলেন। তাঁহার কণ্ঠ হইতে মেঘগর্জনের ন্যায় শব্দ বাহির হইতে লাগিল— 'ধন্য! ধন্য! ধন্য! আমার কন্যা! আমার জামাতা! ধন্য! ধন্য! ধন্য!'।" [নবম পরিচ্ছেদ—পাঁচ]

শুধু ঘটনাবিন্যাসে নয় আলোচ্য উপন্যাসের চরিত্র চিত্রণেও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। এই আখ্যায়িকার ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির মধ্যে

সর্বপ্রসিদ্ধ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। প্রাজ্ঞ, পণ্ডিত স্থিতধী, বিনয়ী ও দূরদর্শী এই বৌদ্ধ আচার্য শুধু বিক্রমশীলা মহাবিহারের প্রাণপুরুষ রূপেই নয়, অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ, মূঢ়তা ও অনৈক্যে বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষের একজন প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী মনাষী রূপেও এ উপন্যাসে প্রতিভাত হয়েছেন। অহিংসার পূজারী হলেও অন্যায়ের সঙ্গে তিনি কখনও আপোষ করেন নি। চেদিরাজ লক্ষ্মীকর্ণের অহমিকাপূর্ণ আচরণ, ও পবিত্র বিহার ভূমিতে তাঁর সৈন্যদের অসঙ্গত বর্বরতার প্রতিবাদ করতে দীপঙ্কর বদ্ধপরিকর হয়েছেন। চেদি ও পাল রাজবংশের মধ্যে দীর্ঘকালীন বৈরিতার অবসান ঘটানোর জন্য তাঁর সক্রিয় প্রয়াস প্রশংসনীয়। তিনি যে তিব্বতের রাজার অনুরোধ রক্ষার্থে তিব্বতে যাত্রা করেছিলেন এবং সেখানে ত্রয়োদশবর্ষ যাপন করেন ও দেহরক্ষা করেন—এ তথ্য যথার্থ হলেও তিনি ভারতবর্ষ থেকে তুরস্কদের বিতাড়নের জন্য চৈনিক বিজ্ঞানবিদ্‌দের নিকটে অগ্নিকন্দুক নির্মাণের গূঢ় বিদ্যা শিক্ষাকল্পেই তিব্বত গিয়েছিলেন—উপন্যাসে বিবৃত এই বক্তব্যটি সম্ভবতঃ ঔপন্যাসিকের স্বকপোলকল্পিত।

কাহিনীকালে পালরাজ নয়পাল অস্তাচলগমনোদ্যত সূর্য হলেও তাঁর লুপ্ত শৌর্য ও আত্মসম্মানবোধ, রাজকীয় আভিজাত্য ও কূটবুদ্ধির পরিচয় আমাদের অগোচর থাকে না। প্রতিপক্ষ চেদিরাজকে বিপাকে ফেলার কোনও সূত্রই যে তাঁর কাছে উপেক্ষণীয় নয় তার প্রমাণ 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ'-এর প্রথম পরিচ্ছেদের অষ্টম উপপরিচ্ছেদে যখন অতীশ দীপঙ্কর বিগ্রহপালের সঙ্গে লক্ষ্মীকর্ণের কন্যার বিবাহ প্রস্তাব করলেন, তখন—

> 'নয়পালও নেত্রদ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া আপত্তি করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু লক্ষ্মীকর্ণের লম্ফঝম্ফ দেখিয়া তাঁহার মন বিপরীতমুখী হইল। লক্ষ্মীকর্ণের যখন আপত্তি তখন তাহার কন্যার সহিত তিনি বিগ্রহের বিবাহ দেবেন। স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি'

স্বয়ংবর সভায় যৌবনশ্রী বিগ্রহপালের মূর্তিতে বরমাল্য অর্পণ করে তাকেই পতিত্বে বরণ করেছেন জেনে পুত্রবধূকে উদ্ধারের জন্য চেদিরাজ্যে দূত প্রেরণ ও লক্ষ্মীকর্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতির মধ্যে দিয়ে তাঁর প্রখর আত্মসম্মানজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। পাল-রাজারা বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, সেই ঐতিহ্য অনুসারে নয়পালও বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রেও তাঁর বিশ্বাস ছিল। তখন পাল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের যুগ। নতুন করে সাম্রাজ্য বিস্তার বা নব নব রাজ্য অধিকার দূরের কথা, পূর্বপুরুষের অর্জিত সম্পদ ও প্রতিপত্তি রক্ষা করাই ছিল তাঁদের সমস্যা। বিশেষতঃ প্রায় প্রৌঢ় রাজা নয়পাল রাজ্য শাসন ও রাজ্য বিস্তার অপেক্ষা পাশাখেলা বা বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের সাহচর্যে গোপন বীরাচার অভ্যাস, বশীকরণ, মারণ, উচাটন, যাগযজ্ঞের প্রতিই অধিক আগ্রহী ছিলেন। তার ফলে সৈন্যরা অনেক সময় বহিরাক্রমণের মোকাবিলার জন্যে প্রস্তুত থাকত না। সামগ্রিক বিচারে ঔপন্যাসিক নয়পালকে তাঁর ঐতিহাসিক পটভূমিতে যথাসম্ভব প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা করেছেন।

নয়পাল-তনয় বিগ্রহপালের আচরণে যুবরাজ সুলভ শৌর্যবীর্য অপেক্ষা যৌবন চাপল্য লঘুচিত্ততা, সৌন্দর্য পিপাসা ও প্রণয় আকাঙ্ক্ষা অধিক পরিস্ফুট। যৌবনশ্রীর স্বয়ংবর সভায় বিনা নিমন্ত্রণে উপস্থিত হয়ে তাকে অপহরণ করে আনার পরিকল্পনায় পাল

যুবরাজের পিতৃশত্রুর প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা সুস্পষ্ট। বিগ্রহপাল লঘুচিত্ত হলেও অন্যের গুণগ্রাহী, এই প্রসঙ্গে উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদের পঞ্চম উপপরিচ্ছেদে লেখকের মন্তব্য লক্ষণীয়—

"বিগ্রহপাল প্রথম দর্শনে যৌবনশ্রীর প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন, তারপর যৌবনশ্রীর কোমল মধুর প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া প্রীতির রসে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে কিন্তু এতখানি চরিত্রের দৃঢ়তা যৌবনশ্রীর আছে তাহা তিনি কল্পনা করেন নাই।… বিগ্রহপাল এতদিন যৌবনশ্রীকে শুধুই ভালবাসিয়াছেন ; এখন শ্রদ্ধা সম্ভ্রমে তাঁহার অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল।"

যৌবনশ্রীর স্বয়ংবর অন্তে প্রকাশ্যে তার প্রণয়ের স্বীকৃতি লাভ করেও ঘটনাচক্রে তাকে ত্রিপুরীতে ফেলে রেখেই পাটলিপুত্রে প্রত্যাবর্তনের দুর্ভাগ্যে মুহ্যমান, প্রিয়া বিচ্ছেদ-কাতর বিগ্রহপালের বিষাদ আন্তরিকতার গুণেই মর্মস্পর্শী। তবে একথা অনস্বীকার্য যে আলোচ্য উপন্যাসে বিগ্রহপালের চরিত্রে যুবরাজসুলভ শৌর্য নয়, রোমাণ্টিক নায়ক তুল্য বৈশিষ্ট্যগুলিই প্রকট।

বিগ্রহপালের বয়স্য শিল্পী অনঙ্গপালের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সহজ সরস আচরণ উপভোগ্য। যৌবনশ্রী ও বিগ্রহপালের মিলন সম্পাদনে তার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

বংগাল দেশের যুবরাজ লক্ষ্মীকর্ণের জ্যেষ্ঠ জামাতা জাতবর্মার চরিত্রটিও সুচিত্রিত। তাঁর সহৃদয়তা, জীবনরসিকতা, পত্নী প্রেম এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্থির বুদ্ধি প্রশংসনীয়।

চেদিরাজ লক্ষ্মীকর্ণের চরিত্র চিত্রণে ঔপন্যাসিক তাঁর কল্পনাকে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়েছেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' অনুসরণে জানা যায় নয়-পালের আমলে চেদিরাজ কর্ণদেব মগধ আক্রমণ করেছিলেন কিন্তু মগধ অধিকার করতে না পেরে কতকগুলি বৌদ্ধ বিহার ও মন্দির ধ্বংস করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন—এই তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে লক্ষ্মীকর্ণ বা কর্ণদেব কিছুটা হঠকারী ও নিষ্ঠুর স্বভাব বিশিষ্ট ছিলেন, কিন্তু উপন্যাসিক সম্ভবতঃ তাঁর আখ্যায়িকার রোমাণ্টিক নায়ক-নায়িকা বিগ্রহপাল ও যৌবনশ্রীর প্রণয়ের প্রতিবন্ধক রূপে লক্ষ্মীকর্ণকে চিত্রিত করার জন্য তাকে আকৃতি ও প্রকৃতি উভয় দিকেই অসভ্য, বর্বর, হৃদয়হীন, দৈত্য সদৃশ করে এ'কেছেন। মাতা অম্বিকাদেবীর প্রতি নির্মম আচরণ, কন্যা যৌবনশ্রীকে কারাগৃহে রুদ্ধ করে রাখা, স্বয়ংবর সভায় মগধরাজপুত্র বিগ্রহপালকে অপমান করার হীন কৌশল, জামাতা জাতবর্মার প্রতি অশোভন ব্যবহার, সর্বোপরি দ্বিতীয়বার মগধ অভিযানকালে উপায়ান্তর না দেখে বিগ্রহপালকে জামাতারূপে স্বীকৃতিদানের ঘটনা আত্মসুখাভিলাষী লক্ষ্মীকর্ণের কোপন স্বভাব ও স্বার্থপরতার উদাহরণ রূপে উল্লেখ করা যায়। তাঁর ব্যবহারে পৌরুষ ও শৌর্য অপেক্ষা অহমিকা ও আস্ফালনই অধিক প্রকট হয়। ইতিহাসের কর্ণদেবের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও পরাক্রম উপন্যাসের চেদিরাজের চরিত্রে সুলভ নয়।

পার্শ্বচরিত্রসমূহের মধ্যে লম্বোদর ও রন্তিদেবের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

চেদিরাজ গুপ্তচর লম্বোদর তার বৃত্তির জন্যই অপরের প্রতি কিছুটা সন্দিগ্ধ চিত্ত, সবসময়েই তার প্রভু লক্ষ্মীকর্ণের সন্তুষ্টি বিধানে মনোযোগী। তার জীবন সম্পর্কে

দৃষ্টিভঙ্গী খুবই স্পষ্ট ও বাস্তব। গৃহিণী বেতসী অসুস্থা, রোগজীর্ণা, তাই শ্যালিকা বান্ধুলিকেই সে ভবিষ্যতে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করার জন্য মনে মনে কৃতসংকল্প অথচ তাদের গৃহে অনঙ্গপাল ওরফে মধুকর সাধুর আগমনের পর থেকে প্রাণ প্রাচুর্যেভরা, স্নেহ প্রীতিপূর্ণ সেই অতিথিটির সংস্পর্শে এসে বেতসীর মানসিক ও শারীরিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে লম্বোদরের দরের সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্ব অনায়াস নৈপুণ্যে চিত্রিত। স্বয়ংবর সভার শেষে বান্ধুলিকে নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে অনঙ্গপাল পলায়ন করলে, প্রতিহিংসায় ক্ষিপ্ত লম্বোদর বিগ্রহ ও যৌবনশ্রীর পলায়নের পথে দুর্লংঘ্য বাধার সৃষ্টি করেছে। মূলতঃ তার প্রতিবন্ধকতার জন্যই যৌবনশ্রীর পক্ষে বিগ্রপালের অনুগমন করা সম্ভব হয়নি। লম্বোদর কিন্তু তার সঠিক ঠিকানায় পৌঁছাতে পেরেছে বান্ধুলিকে হারিয়ে, সে বেতসীর কাছেই প্রত্যাবর্তন করেছে।

জ্যোতিষী রন্তিদেব রঙ্গপ্রিয়, চতুর, কূটকৌশলী। বিগ্রহপালকে তিনি যে শুধু ত্রিপুরী নগরীতে বসবাসের উপযুক্ত আশ্রয় দিয়েছিলেন তা নয়, লক্ষ্মীকর্ণ মাতা অম্বিকা-দেবীর আদেশে তিনি পাটলিপুত্রে গিয়ে বিগ্রহপালকে যৌবনশ্রীর মগধ-আগমন সম্ভাবনার কথা জানিয়ে তাদের মিলনের পথ প্রশস্ত করেছিলেন।

আলোচ্য উপন্যাসে মুখ্য নারী চরিত্র যৌবনশ্রী ও বীরশ্রী—উভয়েই চেদিরাজ-দুহিতা। কিন্তু স্বভাব বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে দুজনের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। একজন যেমন শান্ত গম্ভীর, অন্যজন তেমনি উচ্ছল ও হাস্য কৌতুকময়ী।

অনূঢ়া যৌবনশ্রী গভীর ও গম্ভীর প্রকৃতির। বিগ্রহপালের সঙ্গে প্রথম দর্শনেই তার মনে পূর্বরাগের সঞ্চার ঘটেছে, এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনী বীরশ্রীর সহায়তায় মগধরাজপুত্রের সঙ্গে নিভৃত সাক্ষাতে সেই প্রণয় দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু অপ্রলভা এই রাজকুমারী প্রণয়চাপল্যে আত্মমর্যাদা বিস্মৃত হয়নি, বিগ্রহপাল স্বয়ংবরের পূর্বেই তাকে অপহরণ করে স্বদেশে নিয়ে যেতে চায় শুনে তার প্রতিক্রিয়া,

> "বাহুবলে কন্যা হরণ করা আর চোরের মত কন্যা চুরি করা এক কথা নয়। রাবণ তস্করের মত সীতাকে চুরি করেছিল, অর্জুন শত শত রাজাকে পরাস্ত করে কৃষ্ণাকে লাভ করেছিলেন।" [চতুর্থ পরিচ্ছেদ—আট]

তাই মিতবাক, সংযত চরিত্রা রাজকুমারী প্রণয়িনীসুলভ লজ্জা পরিত্যাগ করে দৃঢ়কণ্ঠে বিগ্রহপালের কাছে তার দৃপ্ত অভিমতটি ব্যক্ত করে—

> "কিন্তু যতক্ষণ সর্বসমক্ষে ভারতের সমস্ত রাজন্যবর্গের সমক্ষে তোমার গলায় মালা না দিচ্ছি ততক্ষণ আমি তোমার সঙ্গে পালিয়ে যাব না। তাতে আমার পিতৃকুলের, আমার শ্বশুরকুলের অপমান হবে। ভুলে যেওনা কুমার কোন মহিমাময় রাজকুলে তোমার জন্ম, অমরকীর্তি ধর্মপাল, দেবপাল, মহীপাল তোমার পিতৃপুরুষ।"
>
> [চতুর্থ পরিচ্ছেদ—আট]

এই কল্যাণবোধ ও সুগভীর আত্মমর্যাদার প্রেরণাতেই চেদিরাজদুহিতা প্রবল পরাক্রান্ত পিতার নির্দেশ অমান্য করে প্রকাশ্য রাজসভায় অনিমন্ত্রিত বিগ্রহপালের মর্কট মূর্তিতে মাল্যদান করে তার অনমনীয় মনোবলের পরিচয় দিয়েছে।

আবার, পিতার নির্দেশে কারাগৃহে-বন্দিনী, প্রিয় বিচ্ছেদ-বিধুরা যৌবনশ্রীর বিরহিণী মূর্তিটিও অনিন্দ্যসুন্দর। কাহিনীর উপসংহারে বিগ্রহপালের সারথীরূপিনী যৌবনশ্রীর ক্ষাত্রতেজ পূর্ণ নারী রূপটি মহাভারতের সুভদ্রাহরণকালে সুভদ্রার স্মৃতি বহন করে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে সাধারণ রোমাণ্টিক নায়িকাদের তুলনায় যৌবনশ্রী কিছুটা স্বতন্ত্র ও উচ্চস্তরের।

চেদিরাজের অপর কন্যা বীরশ্রী সুরসিকা, প্রাণপ্রাচুর্যময়ী ও পতিসোহাগিনী। ভগিনী যৌবনশ্রীর মত গভীর ও গম্ভীরভাব তার মধ্যে দেখা যায় না। বিগ্রহপালের প্রতি তার স্নেহ উপভোগ্য। কাহিনীর পরিণতি সম্পাদনে তার চাতুর্য ও সক্রিয় সহযোগিতা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। চরিত্রটির প্রাণবন্ত আচরণে উপন্যাসের পরিবেশ সজীব ও সরসতায় পূর্ণ হয়ে থাকে।

গৌণ নারীচরিত্রগুলির মধ্যে লম্বোদরশ্যালিকা ও চেদিরাজদুহিতার সহচরী বান্ধুলি সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। শিল্পী অনঙ্গপালের প্রতি তার প্রীতিসঞ্চারের স্তর পরম্পরা সযত্নে অঙ্কিত।

অপরদিকে তার জ্যেষ্ঠা ভগিনী বেতসী যদিও মূল কাহিনী ধারার সঙ্গে যুক্ত নয় বা কাহিনীর পরিণতি সম্পাদনে তার বিন্দুমাত্র ভূমিকা নেই কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বিতা এই নারীর ক্ষুদ্র কাহিনীটি নিঃসন্দেহেই মর্মস্পর্শী।

নয়পাল ভার্যা মহারানীও কাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নন, কিন্তু তাঁর মাধ্যমে আমরা পালরাজ অন্তঃপুরের কিছু পরিচয় লাভ করে থাকি। বান্ধুলি ও বীরশ্রীর প্রতি সস্নেহ আচরণ তাঁর নিরভিমান কোমল নারীহৃদয়টিকে আমাদের কাছে উন্মোচিত করে।

চেদিরাজমাতা অম্বিকাদেবীর চরিত্র তাৎপর্যপূর্ণ। প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্না এই নারীকে তাঁর স্বামী গাঙ্গেয়দেব যথেষ্ট সমীহ করতেন। অম্বিকাদেবী প্রজাবৎসলা ছিলেন। তাঁর পুত্র লক্ষ্মীকর্ণ তাই রাজা হয়েও স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারেননি, কিন্তু লক্ষ্মীকর্ণের রাজত্বলাভের কিছুকাল পরেই অম্বিকাদেবী পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়িনী হলেন। দেহ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ল বটে, কিন্তু মন তাঁর পূর্বের মতোই সক্রিয়। শয্যায় আবদ্ধ থেকেও পুত্রকে সময়ে-অসময়ে আহ্বান করে তাঁর নির্মম কার্যের জন্য ভর্ৎসনা করতেন। পৌত্রীদের প্রতি তাঁর ছিল নিবিড় স্নেহ। বীরশ্রী তাই নিঃসংকোচে তাঁকে বিগ্রহপাল ও যৌবনশ্রীর প্রণয়ের কথা জানিয়েছে এবং কিভাবে উভয়ের মিলন ঘটানো যায় সে সম্পর্কে তাঁর উপদেশ প্রার্থনা করেছে। চেদিরাজ কর্তৃক দ্বিতীয়বার মগধ অভিযানকালে অম্বিকা-দেবীর সুচিন্তিত ও বুদ্ধিদীপ্ত পরামর্শ অনুসারেই যুদ্ধের পূর্বে যৌবনশ্রীকে গোপনে বিগ্রহপালের শিবিরে আনয়নের সমস্ত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়েছিল। সুতরাং প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী রাজমাতা অম্বিকাদেবীর ঐতিহাসিক মূল্য অকিঞ্চিৎকর হলেও উপন্যাসে তাঁর অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

'তুমি সন্ধ্যার মেঘ'-এ ঘটনা বিন্যাস ও চরিত্র চিত্রণে ইতিহাসের প্রাধান্য না থাকলেও প্রায় নয়শতাব্দী পূর্বের ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ যথাযোগ্য নিষ্ঠায় পরিস্ফুট করা হয়েছে। লেখক পালরাজাদের অবক্ষয়ের যুগে অনৈক্য বিচ্ছিন্ন,

আত্মকেন্দ্রিকতায় দুর্বল ভারতীয় রাজাদের শৌর্যহীনতার পরিচয় স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের তৃতীয় উপপরিচ্ছেদে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের দুর্ভাবনার মধ্য দিয়ে—

> "ভারতবর্ষের শতাধিক রাজা নিজ নিজ স্বার্থরক্ষা করিতে ব্যস্ত। যে সব রাজারা যুদ্ধ করিতে ভালবাসে তাহারাও বহিরাগত বর্বর আততায়ীর কথা ভাবে না, নিজের প্রতিবেশী রাজার গলা কাটিতে পারিলেই সন্তুষ্ট। চাণক্যনীতি। এই চাণক্যনীতি দেশের সর্বনাশ করিয়াছে।.........তুরস্কগণ নিষ্ঠুর যোদ্ধা, তাহার উপর ঘোর বিশ্বাস-ঘাতক। তাহাদের ধর্মজ্ঞান নাই, যুদ্ধে তাহাদের কে পরাস্ত করিবে?.........আজ যদি একজন একচ্ছত্র চক্রবর্তী সম্রাট থাকিত। অশোকের মত—হর্ষবর্ধনের মত—ধর্মপাল, দেবপালের মত। কিন্তু সেদিন আর নাই। একটি সিংহের পরিবর্তে ভারতবর্ষ জুড়িয়া এক পাল ফেরু।"

অতীশ দীপঙ্করের এই বিশ্লেষণ যে কতদূর সত্য তার প্রমাণ আলোচ্য উপন্যাসে বর্ণিত মগধরাজ ও চেদিরাজের বংশানুক্রমিক শত্রুতা ও আত্মবিধ্বংসী কলহের লজ্জাজনক ইতিহাস।

পালরাজারা রাষ্ট্রপরিচালনাকার্যে এক বিশেষ নীতি অবলম্বন করতেন। সে সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের বর্ণনা অনুসারে জানা যায়,—

> "পালরাজাদের কোনও স্থায়ী রাজধানী বা মহাস্থানীয় ছিল না। পাল রাজ্যকালের আরম্ভে ধর্মপাল ও দেবপাল প্রাগজ্যোতিষ হইতে কাশ্মীর পর্যন্ত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। একস্থানে বসিয়া এই বিপুল ভূভাগ শাসন করিবার সুবিধা ছিল না। তাই তাঁহারা সৈন্য সামন্ত অমাত্য সচিব শ্রেষ্ঠী পরিষৎ সঙ্গে লইয়া সাম্রাজ্যের এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পর্যটন করিয়া বেড়াইতেন।" [প্রথম পরিচ্ছেদ—পাঁচ]

উপন্যাসে দেখা যায় রাজা নয়পালের আমলে পালরাজ্য সঙ্কুচিত হয়ে মগধের সীমানায় আবদ্ধ হয়ে পড়লেও স্থানান্তর গমন ও পর্যটনের পুরাতন রীতি পরিত্যক্ত হয়নি। পাটলিপুত্রে রাজার স্থায়ী পীঠ থাকলেও মাঝে মাঝে তিনি রাজ্য পরিদর্শনে বার হতেন। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের চতুর্থ উপপরিচ্ছেদে জানা যায় নয়পাল পাটলিপুত্রে কিছুদিন অবস্থান করার পর

> "সপরিবারে সেনা পরিবৃত হইয়া চম্পানগরীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন—চম্পা অঙ্গদেশের প্রধানা নগরী।"

পালরাজারা বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিলেন, এবং সেই বৌদ্ধধর্ম প্রকৃতপক্ষে যে বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ধর্ম উপন্যাসে বিবৃত এই তথ্যও ইতিহাসসম্মত। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীরা ভগবান বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম থেকে তাদের ধর্ম পৃথক।

পাল আমলে বাঙালী শিল্প-সংস্কৃতিতে যথেষ্ট পারদর্শী ছিল। সেকালে বাঙালীর শিল্পখ্যাতি সুপ্রসিদ্ধ ছিল। তাই অনঙ্গপালের মৃৎশিল্পীর ছদ্মপরিচয় স্বয়ং লক্ষ্মীকর্ণের কাছেও অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়নি। বঙ্গালদেশও শিল্প সঙ্গীতের পীঠস্থান ছিল। উপন্যাসে বঙ্গাল যুবরাজ জাতবর্মা ছিলেন সুদক্ষ বংশীবাদক। নদীবক্ষে তাঁর নৌকা

থেকে ভেসে আসা সুমধুর সঙ্গীত ধ্বনি বিগ্রহ ও অনঙ্গকে মুগ্ধ করেছিল। জাতবর্মা ও বীরশ্রী দুজনেই সঙ্গীত-বিদ্যায় নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন।

চেদিরাজ ময়ূরমাংস ভক্ষণে অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু চেদিরাজ্যে মৎস্য আহারের তেমন প্রচলন ছিল না। রাজকুমারী বীরশ্রী বঙ্গালদেশের বধূ হওয়ার পর মৎস্য ভক্ষণের অভ্যাস আয়ত্ত করেছেন। অন্যদিকে চেদিরাজ্যে অনঙ্গপালের মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য লম্বোদর-গৃহিণী বেতসী যথেষ্ট আয়োজন করে—

"আহার্য শুধু ঘৃত তণ্ডুল নয়, অড়রের ডাল, শাক-শিম্বির ব্যঞ্জন, নিম্বের তিক্ত, তিন্তিড়ির অম্ল, দধি ও পর্পট।" [চতুর্থ পরিচ্ছেদ—তিন]

এই আহার্য তালিকায় মৎস্যের অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। অনঙ্গ বঙ্গসন্তান। তাই লম্বোদর গৃহে বাসকালে একাধিক ঘটনায় তার মৎস্যপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

সে যুগের সমাজেও নারীরা প্রধানতঃ সংসার পরিচালনা কার্যে ব্যস্ত থাকতেন। তবে তাঁরা সব সময়ে অন্তঃপুরেই বন্দিনী থাকতেন তা নয়। পর্দা প্রথা ছিলনা বলেই মনে হয়। নারীরা স্বাধীনভাবেই চলাফেরা করতে পারতেন। উপন্যাসে বাঙ্কুলিকে আমরা প্রয়োজনমত একাকিনী রাজপুরীতে যেতে এবং গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে দেখি। বীরশ্রী ও যৌবনশ্রীকে রাজপথে রথ চালাতে দেখা যায়। রক্ষী বা প্রহরী ছাড়াই তারা মন্দিরে পূজা দিতে গেছে।

সেকালেও বঙ্গ মগধের বাইরে দক্ষিণ বা পশ্চিম ভারতে সিঁথিতে সিঁদুর পরার রীতি ছিল না। বিবাহিত রমণীরা কণ্ঠে মঙ্গল সূত্র ও ললাটে কুঙ্কুমের টিপ পরতেন।

উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের পঞ্চম উপপরিচ্ছেদে শরদিন্দুবাবু সেকালের নরনারীর সাজসজ্জা ও প্রসাধনের প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"তৎকালে স্ত্রী ও পুরুষের প্রসাধন অনেকটা একই প্রকার ছিল, বিলাসী পুরুষেরা অঙ্গদ কুণ্ডল পরিতেন, লাক্ষারসে নখ ও অধর রঞ্জিত করিতেন, চোখে কাজল দিতেন। গলায় হার থাকিত। পায়ে ময়ূরপঙ্খী পাদুকা।"

'তুমি সন্ধ্যার মেঘ'-এ নানাপ্রসঙ্গে যুগচিত্রের প্রতিফলন ঔপন্যাসিকের ইতিহাস জ্ঞান ও ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার বিশেষ শিল্প সচেতনতাকেই প্রমাণ করে। তবে যুগ-পরিবেশ চিত্রণে এই সাফল্য সত্ত্বেও ঘটনা-বিন্যাস ও চরিত্র সৃজনে কল্পনার অত্যধিক প্রাধান্যের জন্য আলোচ্য রচনাটিকে "ঐতিহাসিক রোমান্স" আখ্যায় ভূষিত করাই যুক্তিসঙ্গত।

তুঙ্গভদ্রার তীরে [১৩৭২]ঃ 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাসগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই গ্রন্থটির জন্য লেখক শুধুমাত্র ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত রবীন্দ্র-পুরস্কারই লাভ করেননি, অর্জন করেছিলেন ব্যাপক জনপ্রিয়তার দুর্লভ সম্মান। রসজ্ঞ সমালোচক ও সুধীবৃন্দের দ্বারা উচ্চপ্রশংসিত এই কাহিনীটি স্বয়ং লেখকের মতে "Fictionised history নয়, Historical fiction."

'কালের মন্দিরা', গৌড়মল্লার' ও 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ'—এই তিনটি উপন্যাসেই শরদিন্দুর উপজীব্য ছিল প্রধানতঃ পূর্ব ভারতের ইতিবৃত্ত। আলোচ্য উপন্যাসে তিনি তাঁর

দৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করেছেন সুদূর দাক্ষিণাত্যে, ভারত ইতিহাসের এক বর্ণোজ্জ্বল প্রেক্ষাপটের দিকে, যেখানে একদিন তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে,—

"বিরূপাক্ষের পাষাণ মূর্তি ঘিরিয়া এক প্রাকারবদ্ধ দুর্গ-নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল। নগরের নাম ছিল বিজয়নগর।" [তুঙ্গভদ্রার তীরে—ঊর্মিমর্মর]

গ্রন্থের ভূমিকাংশে ঔপন্যাসিকের মন্তব্য—

"এই কাহিনীর ঐতিহাসিক পটভূমিকা Robert Sewell-এর A Forgotten Empire এবং কয়েকটি সমসাময়িক পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত। Sewell-এর গ্রন্থখানি ৬৫ বছরের পুরাতন। তাই ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদিত সাম্প্রতিক গ্রন্থ" The Delhi Sultanate পাঠ করিয়া Sewell-এর তথ্যগুলি শোধন করিয়া লইয়াছি।"

"উপন্যাসের ঘটনাকাল খৃঃ ১৪৩০-এর আশেপাশে। তখনো বিজয়নগর রাজ্যের অবসান হইতে শতবর্ষ বাকি ছিল।"

মূলতঃ দ্বিতীয় দেবরায়ের রাজত্বকালে সুশাসিত, সৌভাগ্যসমৃদ্ধ বিজয়নগরই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু, কিন্তু উপন্যাসের প্রথম পর্বের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেবরায়ের পূর্বপুরুষগণের অর্থাৎ বিজয়নগরের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য নরপতিদের কথা বিবৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা সঙ্গমবংশীয় হরিহর ও বুক্কের বিচিত্র জীবন কথা, বুক্কের পৌত্র রাজা প্রথম দেবরায়ের অসাধারণ রাজ্যশাসন প্রতিভা, রণপাণ্ডিত্য, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও মুসলমান প্রতিপক্ষের আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য সৈন্য-বাহিনীর সুসংগঠন, দেবরায়ের দুইপুত্র রামচন্দ্র ও বিজয়রায়ের অপদার্থতা এবং বিজয়রায়ের স্বল্পকালীন রাজত্বের পর তাঁর জীবিতাবস্থাতেই তাঁর পুত্র দ্বিতীয় দেবরায়ের সিংহাসনারোহণ —এ সমস্ত তথ্যই ইতিহাস অনুমোদিত। তবে বীরবিজয়ের বন্ধন-বিলাসিতার যে পরিচয় উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে তা অভিনব।

আলোচ্য উপন্যাসের প্রধান ঐতিহাসিক পুরুষ দ্বিতীয় দেবরায়ের চরিত্রচিত্রণে, লেখকের ইতিহাস-আনুগত্য বহুলাংশেই পরিলক্ষিত হয়। রাজা দেবরায়ের আমলই বিজয়নগর রাজ্যের সুবর্ণযুগ। সকল ইতিহাসবিদ্‌ই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে দ্বিতীয় দেবরায়ই বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নৃপতি। উপন্যাসের প্রথম পর্বের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ঔপন্যাসিক তাঁর পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে লিখেছেন,

"দেবরায়ের বয়স বর্তমানে পঁয়ত্রিশ বছর। তাঁহার দেহ যেমন দৃঢ় ও সুগঠিত, চরিত্রও তেমনি বজ্রকঠিন। গম্ভীর মিতবাক্ সংবৃতমন্ত্র পুরুষ।"

'তুঙ্গভদ্রার তীরে'র দ্বিতীয় পর্বের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কলিঙ্গ রাজকুমারীদের স্বাগত জানাবার ক্ষণে রাজার বর্ণনা—

"তারপর সভাগৃহ হইতে মহারাজ দেবরায় বাহির হইয়া আসিলেন। তপ্তকাঞ্চনদেহ, মুখে সৌম্য প্রশান্ত গাম্ভীর্য, পরিধানে পট্টবস্ত্র ও উত্তরীয়, কর্ণে মণিময় কুণ্ডল, বাহুতে অঙ্গদ। যৌবনের মধ্যাহ্নে মহারাজ দেবরায়ের দেহ যেন লাবণ্যচ্ছটা বিকীর্ণ করিতেছে।"

মহারাজের আকৃতি ও প্রকৃতির বিবরণ অলঙ্কার শাস্ত্রের ধীরোদাত্তগুণসম্পন্ন নায়কেরই সমতুল্য। দ্বিতীয় দেবরায় যে সুশাসক, প্রজাবৎসল, বিচক্ষণ নৃপতি ছিলেন সে পরিচয় উপন্যাসের বহুস্থলেই পরিস্ফুট হয়েছে, বিশেষতঃ কাহিনীর দ্বিতীয় পর্বের অষ্টম পরিচ্ছেদে তাঁর সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের সশ্রদ্ধ মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

> "মহারাজ দেবরায়ের হৃদয়ে প্রচুর স্নেহরস ছিল। তাঁহার কর্মবহুল ভাবনাবহুল জীবনের কেন্দ্রস্থলে অধিষ্ঠিত ছিল এই স্নেহবস্তুটি।
>
> তাঁহার সর্বপ্রধান প্রেমাস্পদ ছিল বিজয়নগর রাজ্য। তিনি যুদ্ধ করিতেও ভালবাসিতেন, কিন্তু কেবল যুদ্ধের জন্যই যুদ্ধ ভালবাসিতেন না, রাজ্যের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। প্রজাদের প্রতি আন্তরিক প্রীতি যাহার নাই সে কখনো আদর্শ রাজা হইতে পারে না। দেবরায় প্রজাদের প্রাণাধিক ভালবাসিতেন।"

শুধু প্রজানুরঞ্জন ও আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখা নয়, আদর্শ রাজার কর্তব্য বহিঃশত্রুর আক্রমণের হাত থেকে স্বরাজ্যকে রক্ষা করার জন্য নিরবচ্ছিন্ন তৎপরতা ও সতর্কতা— আলোচ্য উপন্যাসে রাজা দেবরায়ের চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্যও অনুক্ত থাকেনি। উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের নবম পরিচ্ছেদে ধন্নায়ক লক্ষ্মণ মল্লপের সঙ্গে রাজার নিভৃত বিশ্রম্ভালাপের সূত্রে জানা যায় বিজয়নগরের প্রবল প্রতিপক্ষ নিকটবর্তী বহমনী রাজ্যের তৎকালীন সুলতান আহমদ শা'র দীর্ঘদিন যাবৎ নীরবতা রাজা দেবরায়কে চিন্তিত করে তুলেছে কারণ তিনি জানেন—

> "ওরা ধূর্ত এবং শঠ, কপটতাই ওদের প্রধান অস্ত্র। ওদের বিরুদ্ধে লড়তে হলে আমাদেরও কপট এবং শঠ হতে হবে, ধর্মযুদ্ধ চলবে না। যুদ্ধে আবার ধর্ম কী? যুদ্ধ কর্মটাই তো অধর্ম। ধর্মযুদ্ধ করতে গিয়েই ভারতবর্ষ উৎসন্নে গেল।"

তিনি সঠিক অনুমান করেছেন—

> "আহমদ শা আমাদের গুপ্তচরদের চোখে ধুলো দিয়ে চুপিচুপি গুপ্ত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।"

প্রত্যুত্তরে লক্ষ্মণ মল্লপ যখন জানিয়েছেন যে বিজয়নগরের সুশিক্ষিত, সুদক্ষ সেনাবাহিনী 'তুঙ্গভদ্রার' শতক্রোশব্যাপী তীর সীমান্তে থানা দিয়ে বসে আছে, যবনের সাধ্য নেই তাদের ভেদ করে রাজ্য আক্রমণ করে, তখন মহারাজকে আমরা সাধারণ নরপতিদের মত আত্ম-তুষ্টিতে স্ফীত হতে দেখিনা, দেখি—

> "রাজা ঈষৎ হাসিলেন—আমি জানি আমরা প্রস্তুত আছি। তবু সতর্কতা শিথিল করা চলবে না। প্রস্তুত থাকা অবস্থাতেও নিশ্চিন্ততা আসে। দু-একদিনের মধ্যে আমি উত্তর সীমান্তে সেনা পরিদর্শনে যাব।" [দ্বিতীয় পর্ব, নবম পরিচ্ছেদ]

অতএব "এই স্নেহসর্বস্ব অপিচ বজ্রাদপি কঠোর রাজাটিকে প্রজারা যেমন ভালবাসিত, শত্রুরা তেমনি ভয় করিত।" এই উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বমণ্ডিত, ইতিহাসবিশ্রুত পুরুষটির চরিত্র-চিত্রণে ঔপন্যাসিক ঐতিহাসিক তথ্য ও ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতাকে নিষ্ঠার সঙ্গেই মর্যাদা দিতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ভূমিকাংশেই তিনি আমাদের অবহিত করেছেন যে "আমার

কাহিনীতে ঐতিহাসিক চরিত্র থাকলেও কাহিনী মৌলিক। এই কাহিনীর প্রয়োজনেই দ্বিতীয় দেবরায়ের চরিত্র-নির্মাণেও স্থানে স্থানে কল্পনার অনুপ্রবেশ পরিলক্ষিত হয়। যেমন উপন্যাসের প্রথম পর্বের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন যে ম্লেচ্ছশক্তির গতিরোধ করার একমাত্র উপায় হিসাবে আভ্যন্তরীণ কলহে বিচ্ছিন্ন হিন্দুরাজ্যগুলিকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে রাজা দেবরায় কখনও কৌশলে কখনও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে একটি একটি করে হিন্দুরাজকন্যাকে বিবাহ করতে শুরু করেছিলেন —এ তথ্য সম্ভবতঃ ইতিহাসসম্মত নয়। তবে সেকালে রাজন্যবর্গের মধ্যে এই জাতীয় বিবাহ মোটেই বিরল ছিল না। বরং রাজনৈতিক কূটকৌশলরূপ প্রশংসার্হ কার্যই বিবেচিত হ'ত।—লেখক কাহিনীগত প্রয়োজন চরিতার্থতার জন্য দ্বিতীয় দেবরায়ের ক্ষেত্রে তা আরোপ করেছেন। উপন্যাসে বর্ণিত দেবরায়ের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি—যেমন রানীদের প্রতি তাঁর আবেগউচ্ছ্বাসহীন পক্ষপাতশূন্য ভালবাসা, কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার কম্পনদেবের প্রতি স্বতোৎসারিত স্নেহ, পুত্র মল্লিকার্জুনের প্রতি সুগভীর বাৎসল্য, বাগদত্তা বধূ বিদ্যুন্মালা সামান্য রাজকর্মচারী অর্জুনবর্মার প্রতি প্রণয়াসক্তা জেনে অর্জুন ও বিদ্যুন্মালার প্রতি রাজোচিত আচরণ, প্রাণরক্ষক অর্জুনের প্রতি যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা, মণিকঙ্কণার প্রতি অপ্রগল্ভ অথচ মধুর প্রীতি—এ সমস্তই ঔপন্যাসিকের কল্পনা-প্রসূত হলেও প্রশংসনীয়, কারণ এই মানবিক গুণগুলিই রাজা দ্বিতীয় দেবরায়কে ইতিহাসের ধূসর, বিবর্ণ জগৎ থেকে উদ্ধার করে সাহিত্যের অমরলোকে প্রতিষ্ঠা দান করেছে।

বিজয়নগর রাজ্যের ধন্নায়ক লক্ষ্মণ মল্লপের চরিত্রটিও ইতিহাসভিত্তিক। উপন্যাসে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "ইনি একাধারে রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ও মহাসচিব। পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক দৃঢ় শরীর পুরুষ অত্যন্ত সাদাসিধা বেশবাস, মুখ দেখিয়া বিদ্যাবুদ্ধি বা পদমর্যাদার কোনো পরিচয়ই পাওয়া যায় না।" [দ্বিতীয় পর্ব, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ]

ইতিহাস বলে—

> "......to control and regulate trade, he appointed his right hand man, Lakkanna or Lakshman, to the "Lordship of the southern sea", that is, to the charge of overseas commerce"
> An advanced history of India' (4th edition Page 361) by R. C. Majumder ; H. C. Roychowdhury & Kalikinkar Dutta.

আলোচ্য উপন্যাসে লেখক বিজয়নগর রাজ্যের নৈসর্গিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় উদ্ঘাটনে প্রখর ইতিহাসবোধ ও কল্পনার সুষম বিন্যাসের স্বাক্ষর রেখেছেন।

উপন্যাসের প্রথম পর্বের নবম পরিচ্ছেদে বিজয়নগরের রাজধানীর সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্যের বর্ণোজ্জ্বল বিবৃতি থেকে জানা যায়—"নদীর দক্ষিণ কূলে শতবর্ষ ধরিয়া যে মহানগরী গড়িয়া উঠিয়াছে তা যেমন শোভাময়ী তেমনি দুষ্প্রধর্ষা। সমকালীন বিদেশী

পর্যটকের পাণ্ডুলিপিতে তাহার গৌরব-গরিমার বিবরণ ধৃত আছে।"

স্বচ্ছ সরোবর, ক্ষুদ্র পর্বত, সংকীর্ণ উপত্যকা ফুল ও ফলে পূর্ণ উদ্যান বাটিকায় সজ্জিত সেই সুরম্য মহানগরীটি যে পর পর সাতটি প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল—এই বর্ণনা লেখকের নিছক কল্পনা বিলাস মাত্র নয়, দ্বিতীয় দেবরায়ের রাজত্বকালে আগত পারস্যের রাষ্ট্রদূত আবদুর রাজাকের ভ্রমণবৃত্তান্তে এর সমর্থন মেলে।

বিজয়নগরের স্বর্ণ সম্পদ ও অতুল বৈভবের কথা ইতিহাস স্বীকৃত, উপন্যাসে তারই ব্যঞ্জনাঋদ্ধ বিবৃতি পাওয়া যায় বিভিন্ন প্রসঙ্গে—যেমন উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের প্রথম পরিচ্ছেদে নগরীর রাজপথের বর্ণনা—

"তোরণের প্রহরীরা পথ ছাড়িয়া দিল, মিছিল সপ্তম পুরীতে প্রবেশ করিল। সাত কোটার মধ্যে এক কোটা। ইহার ব্যাস চারিক্রোশ, ইহার মধ্যে চৌত্রিশটি প্রশস্ত রাজপথ আছে। তন্মধ্যে প্রধান রাজপথের নাম পানসুপারি রাস্তা। নাম পান-সুপারি রাস্তা হইলেও আসলে ইহা সোনা-রূপা-হীরা জহরতের বাজার। এই মণি-মাণিক্যের হাটের মাঝখানে রাজভবনের অসংখ্য হর্ম্যরাজি।"

দ্বিতীয় পর্বের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রাজসভার বর্ণনা—

"বহুস্তম্ভযুক্ত রাজসভার আকৃতি নাট্যমণ্ডপের ন্যায়, তিনভাগে সভাসদ্‌গণের আসন, চতুর্থ ভাগে অপেক্ষাকৃত উচ্চমঞ্চের উপর সিংহাসন। পাথরে গঠিত হর্ম্য, কিন্তু পাথর দেখা যায় না, কুড্য ও স্তম্ভের গাত্র সোনার স্তবকে মোড়া। মণি-মাণিক্য-খচিত স্বর্ণ-সিংহাসনটি আয়তনে বৃহৎ, তিনচারিজন মানুষ স্বচ্ছন্দে পাশাপাশি বসিতে পারে। সিংহাসনের পাশে সোনার দীপদণ্ড, সোনার পর্ণ-সম্পুট, সোনার ভৃঙ্গার। চারিদিকে সোনার ছড়াছড়ি। সেকালে এত সোনা বোধকরি ভারতের অন্যত্র কোথাও ছিল না।"

আবদুর রাজকের বর্ণনানুসারে আরও জানা যায় যে বিজয়নগর সাম্রাজ্যে উন্নত ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এবং এখানকার অধিবাসীগণ ছিলেন সুখী ও সমৃদ্ধিশালী। 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিজয়নগরের নাগরিকদের বিলাসপূর্ণ অথচ নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রার একটি বিশ্বাসযোগ্য চিত্র অংকিত হয়েছে—

"সায়ংকালে পান-সুপারি রাস্তায় উচ্চকোটির নাগরিক নাগরিকার সমাগম হইয়াছে। যানবাহন বেশি নাই, পদচারীই অধিক। সকলের পরিধানে বিচিত্র সুন্দর বস্ত্র ও অলঙ্কার। তাহাদের ত্বরা নাই, সকলে মন্থর চরণে চলিয়াছে। কেহ পানের দোকানে পান কিনিয়া খাইতেছে, কেহ পানশালায় শীতল শরবত পান করিতেছে, মেয়েরা ফুল কিনিয়া কণ্ঠে কবরীতে পরিতেছে।"

তারা অন্নচিন্তামুক্ত বলে আমোদপ্রিয়ও বটে। পথপার্শ্বে কিরাত পায়রা ও বাজপাখির খেলা দেখাতে শুরু করলে বহুজন-সমাগম ঘটে, আবার যুবকরা বারবিলাসিনীদের গৃহে আনন্দে মত্ত হতে দ্বিধাবোধ করে না। বিজয়নগরের নাগরিকদের জীবনে সুখস্বাচ্ছন্দ্য, নিষ্কণ্টতা কোন কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু কেউ অন্যায় অসাধু কার্যে প্রবৃত্ত হলে তাকে দণ্ড ভোগ করতে হত বিশেষতঃ বিজয়নগরে শত্রু-রাজ্যের কোনও গুপ্তচর ধরা

পড়লে তার শাস্তি ছিল নিষ্ঠুর মৃত্যু।

বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ থেকে জানা যায় বিজয়নগরে নারীরা সম্মানের অধিকারিণী ছিলেন। রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে মহিলারা সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। উপন্যাসে এই নারী-মর্যাদার পরিচয়টুকুও অনুদ্ঘাটিত থাকে না। শরদিন্দুর বর্ণনা অনুসারে জানা যায় রাজপুরীর প্রতিহারিণীর সংখ্যা ছিল সাতশত, সভাগৃহের দ্বিতলে আরোহণের সোপান-মুখে শস্ত্র হস্তে দুইটি তরুণীর অবস্থান।

উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের চতুর্থ অধ্যায়ে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন—

"এখানে নারীদের পর্দা বা অবগুণ্ঠন নাই, তাহারা সহজ স্বচ্ছন্দতার সহিত পথে বাহির হয়, তাহাদের চোখের দৃষ্টি নম্র অথচ নিঃসংকোচ, তাহারা পরপুরুষ দেখিয়া ভয় পায় না।"

ইটালীয় পর্যটক "নিকোলোকণ্টি" বিজয়নগরে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। উপন্যাসেও দেখি কুমার কম্পন নিহত হওয়ার পর তাঁর দুই পত্নী কৃষ্ণাদেবী ও গিরিজা দেবী সহমৃতা হয়েছেন। সমাজে দেবদাসী প্রথা প্রচলিত ছিল। উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের সপ্তম পরিচ্ছেদে পম্পাপতির মন্দিরে সন্ধ্যা-আরতিকালে অর্জুন ও বলরাম প্রত্যক্ষ করেছে দশজন দেবদাসীর সম্মিলিত স্বর্গীয় নৃত্য। সেকালে দেবভোগ্যা দেবদাসীদের বিবাহ হত না—উপন্যাসের চতুর্থ পর্বের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিজয়নগর রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের একটি গুহায় খোদিত শিলালিপির উল্লেখ আছে, সেখানে লেখা ছিল 'দেবদাসী তনুশ্রী গৌড় নিবাসী শিল্পী মীনকেতুকে কামনা করিয়াছিল।' তনুশ্রীর এই প্রণয়-বেদনার প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় আর এক দেবদাসীর কথা—সুতনুকা প্রত্নলেখে উল্লিখিত যে নারীটি কামনা করেছিল দেবদত্ত নামে বারানসীবাসী এক রূপদক্ষকে।

বিজয়নগর ছিল দাক্ষিণাত্য-সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান। রাজারা শিল্প ও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ঔপন্যাসিকের ভাষায়—

"চিরদিনই দাক্ষিণাত্য দেশ নৃত্যগীতাদি কলায় পারদর্শী। সেকালে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর সহিত কর্ণাট রাগ দেশ রাগ গুর্জর রাগ এবং জয়মঙ্গল রাগের বিশেষ সমাদর ছিল।

'তুঙ্গভদ্রার তীরে'তে যে কেবলমাত্র বিজয়নগরেরই সমাজ, সংস্কৃতির পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে তা নয় কাহিনীর প্রসঙ্গক্রমে কলিঙ্গ রাজপরিবারের কিছু পরিচয় ও সেকালের নৌযাত্রার সজীব চিত্র উপন্যাসটিকে উপভোগ্য করে তুলেছে।

আবার এই কাহিনীটির বিভিন্নস্থলে মুসলমানদের হিন্দু বিদ্বেষ ও ধর্মান্ধতার স্বরূপটিও যথাযথ ভাবে উন্মোচিত হয়েছে। বহমনী রাজ্যের অন্যতম প্রধান প্রদেশ গুলবর্গায় হিন্দুদের বলপ্রয়োগের মাধ্যমে, গোমাংস ভক্ষণ করিয়ে মুসলমানে রূপান্তরিত করার নির্মম চিত্র আঁকা হয়েছে অর্জুনবর্মা ও তার পিতার জীবনবৃত্ত প্রসঙ্গে। বলরাম কর্মকারের বিবৃতিতে সেকালের বাংলাদেশেও যবনশক্তির পৈশাচিক অত্যাচার ও শাসনতান্ত্রিক অব্যবস্থার চিত্রটি সুপরিস্ফুট।

'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসে শুধু যুগচিত্র পরিস্ফুটনেই নয়, ঘটনা বিন্যাসেও লেখকের নৈপুণ্য লক্ষ্য করা যায়। চারটি পর্বে ও চৌত্রিশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই আলেখ্যটি মূলতঃ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে উদ্ভাসিত, নরনারীর রোমাণ্টিক প্রণয়ের শাশ্বত ইতিবৃত্ত। এই হৃদয়াবেগকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন চরিত্রের বিচিত্র অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত উপন্যাসকে গতি-চঞ্চল ও তরঙ্গ-সংকুল করে তুলেছে। বৈমাত্রী ভগিনী মণিকঙ্কণা সহ কলিঙ্গ রাজকুমারী তথা বিজয়নগর রাজ দ্বিতীয়দেবরায়ের ভাবীবধূ বিদ্যুন্মালার জল-পথে কলিঙ্গ থেকে বিজয়নগর যাত্রার বর্ণনা দিয়ে কাহিনীর সূত্রপাত। উপন্যাসের প্রথম পর্বেই ঔপন্যাসিক সুকৌশলে দুটি ঘটনার মাধ্যমে বৈচিত্র্যের বীজ বপন করে দিয়েছেন। প্রথম ঘটনাটি হল কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার সঙ্গমস্থলে বলরাম কর্তৃক মৃতপ্রায় অর্জুনবর্মার উদ্ধার এবং দ্বিতীয়টি—নদীবক্ষে আকস্মিক ঝড়ের আঘাতে বিদ্যুন্মালার জলমগ্ন হওয়া এবং অর্জুনের দ্বারা রাজকুমারীর প্রাণরক্ষা। এই ঘটনাদ্বয় একদিকে পাঠকমনে কৌতূহল ও উৎকণ্ঠার সঞ্চার করে, অন্যদিকে অর্জুনবর্মা ও বিদ্যুন্মালার প্রণয় কাহিনী ইতিহাসের শুষ্ক কাঠামোয় জীবনের উষ্ণ স্পন্দন ছড়িয়ে দেয়। এ ছাড়া রাজা দ্বিতীয় দেবরায়ের প্রতি মণিকঙ্কণার অযাচিত, স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসা, মণিকঙ্কণার প্রতি রাজারও ক্রমবর্ধমান প্রীতিদৌর্বল্য এবং বলরাম ও রাজপরিচারিকা মঞ্জিরার প্রেমাকর্ষণে কাহিনীর শৃঙ্গার রস ঘনীভূত হয়েছে।

আলোচ্য উপন্যাসে চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রেও ঔপন্যাসিক প্রশংসনীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। উপন্যাসের মধ্যমণি রাজা দেবরায়ের বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

মধ্যম রাজ ভ্রাতা বিজয়রায়ের যুদ্ধপ্রিয়, রাজানুগত চরিত্রটি স্বল্প পরিসরে সুচিত্রিত।

কনিষ্ঠ রাজভ্রাতা, সুকুমার কান্তি কম্পনদেবের আপাত মধুর আচরণের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ভ্রাতৃবিদ্বেষী, ঈর্ষা কুটিল রূপটির উন্মোচন কাহিনীর পক্ষে দ্বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে—প্রথমতঃ কুমার কম্পন কর্তৃক ছুরিকাঘাতে দেবরায়ের প্রাণ-নাশের চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেওয়ার ফলে অর্জুনের পদোন্নতি ঘটেছে, সে রাজদূত থেকে রাজার দেহরক্ষীতে পরিণত হয়েছে—এই ঘটনা উপন্যাসের পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ রাজার দেহরক্ষীর কাজে নিযুক্ত হওয়ার ফলে অর্জুনকে দিনের অধিকাংশ সময়েই রাজপুরীতে অবস্থান করতে হয়, সাক্ষাৎ হয় বিদ্যুন্মালার সঙ্গে। এই ঘটনাসূত্রেই একদিন অর্জুন ও রাজকন্যার গোপন সাক্ষাৎ ও অন্তরঙ্গ কথোপকথন রাজদাসী পিঙ্গলার দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচর হয় এবং যথাসময়ে উভয়ের মধ্যে সেই ঘনিষ্ঠতার সংবাদ পরিবেশিত হয় রাজার কাছে, যার ফলে কমলা সরোবরের তীরবর্তী সংকেত গুহায় রাজার কাছে প্রত্যক্ষ-ভাবে ধরা পড়ে যায় দুটি মিলন তৃষিত-নরনারী—অর্জুনবর্মা ও বিদ্যুন্মালা। দ্বিতীয়তঃ কুমার কম্পনের ভ্রাতৃহত্যার প্রয়াস মণিকঙ্কণার সৌভাগ্যের দ্বারোদ্ঘাটন করে। রাজার জীবনের সেই অপ্রত্যাশিত বিপদবিভ্রান্ত মুহূর্তে প্রেমমাধুর্যময়ী মণিকঙ্কণা সেবা ও সহানুভূতির মাধ্যমে লাভ করে তার প্রিয়তমের হৃদয় সাম্রাজ্যে প্রবেশের অধিকার। এই প্রসঙ্গে উপন্যাসের চতুর্থ পর্বের প্রথম পরিচ্ছেদে লেখকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—

"প্রত্যেক মানুষেরই অন্তরের নিমগ্ন প্রদেশে একটি নিভৃত রস-সত্তা আছে, রাজার সেই

রস-সত্তা মনিকঙ্কণার সান্নিধ্যে উন্মোচিত হয়। মণিকঙ্কণার সহিত রাজা একটি নিবিড় অন্তরঙ্গতা অনুভব করেন। ইহা পতি-পত্নীর স্বাভাবিক প্রীতির সম্বন্ধ নয়, যেন তদপেক্ষাও নিগূঢ়—ঘনিষ্ঠ একটি রসোল্লাস।" [তুঙ্গভদ্রার তীরে]

'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসে অর্জুনবর্মার চরিত্রটি সযত্নে অঙ্কিত। ঔপন্যাসিক তাকে বহুবিধ বৈশিষ্ট্যে ভূষিত করেছেন, স্বধর্মে নিষ্ঠ, দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন এই যুবকটির দৈহিক বলিষ্ঠতা ও চারিত্রিক শুচিতা প্রশংসনীয়। যদুকুলোদ্ভব এই ক্ষত্রিয় তরুণটি দেহে মনে ক্ষাত্র তেজে পূর্ণ বলেই বিধর্মী শাসকের অত্যাচারকে মেনে নিয়ে কাপুরুষের মতো প্রতিকূল ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারেনি। সংগ্রামশীলতা তার অন্যতম মানস-বৈশিষ্ট্য, তাই সে তার প্রধান অস্ত্র বংশদণ্ড দুটি নিয়ে অকূল পাথারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, সন্তরণের সাহায্যে স্বাধীন হিন্দুরাজ্যে বিজয়নগরে পৌঁছানো তখন তার একমাত্র লক্ষ্য। গুলবর্গায় স্থিত হতভাগ্য পিতার জন্য গভীর উৎকণ্ঠা ও ভালবাসা, বন্ধু বলরামের প্রতি অকৃত্রিম সখ্যরস এবং বিজয়নগর ও বিজয়নগরের রাজার প্রতি তার ভক্তি ও আনুগত্যের নানা পরিচয় আমাদের মুগ্ধ করে। কিন্তু আলোচ্য চরিত্রটির সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য তার অন্তরে প্রেম ও কর্তব্যের মধ্যে সুতীব্র দ্বন্দ্ব। আকস্মিক ঝড়ে নৌকার পাটাতন থেকে নদীবক্ষে নিক্ষিপ্ত নিমজ্জমানা কলিঙ্গরাজকুমারী বিদ্যুন্মালাকে জলস্রোত থেকে উদ্ধারের পর, এক জ্যোৎস্নালোকিত, জনহীন দ্বীপে একত্রে রাত্রিযাপন কালে রাজকুমারীর অপরূপ দেহলাবণ্য, এবং তার সরল, প্রীতি মধুর ব্যবহার অর্জুনকে মুগ্ধ করেছিল সত্যি কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা তার স্মৃতিলোকে এক অমূল্য রত্নের মতই চিরজীবন সযত্নে সঞ্চিত থাকত, কলিঙ্গরাজকুমারী তথা বিজয়নগররাজের ভাবী বধূর সঙ্গে প্রণয় সম্পর্ক স্থাপনের বিন্দুমাত্র অভীপ্সা যে তার সুদূরতম কল্পনাতেও স্থান পায়নি তার প্রমাণ উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অর্জুনবর্মার আত্মচিন্তার মধ্যেই নিহিত—

"এই সকল চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে রাজকুমারী বিদ্যুন্মালার স্নিগ্ধগম্ভীর মুখখানি তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। রাজকুমারীর মনে গর্ব অভিমান নাই, অর্জুনের ন্যায় সামান্য ব্যক্তির জীবনকথা শুনিতেও তাঁহার আগ্রহ। ঈশ্বর কৃপায় তিনি রাজেন্দ্রাণী হইয়া সুখে থাকুন।"

বিদ্যুন্মালাকে কেন্দ্র করে অর্জুনের মনে কোনও বাসনা বিহ্বলতা ছিল না বলেই বিজয়নগরে আসার কিছুদিনের মধ্যেই রাজকর্মচারীরূপে নিযুক্ত হওয়ার সৌভাগ্যে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। বন্ধু বলরামকে নিয়ে প্রসন্ন হৃদয়ে সে নানা আনন্দ উপভোগে মেতে উঠেছে। তারপর এক সন্ধ্যায় ঘটেছে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা—রাজকুমারী বিদ্যুন্মালা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজহস্তে ধৃত মল্লীমালিকাটি তার কণ্ঠে পরিয়ে দিয়ে তাকে পতিত্বে বরণ করলে বিস্ময়বিমূঢ় অর্জুন "ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিল, তারপর প্রায় চিৎকার করিয়া উঠিল—'রাজকুমারী এ কি করলেন।" তারও পরে—

"অর্জুন মিনতির স্বরে বলিল—রাজকুমারি, আপনি ক্ষণিক বিভ্রমে ভুল করে ফেলেছেন। আপনার মালা ফিরিয়ে নিন। আমি প্রাণান্তেও কাউকে কিছু বলব না।" (তৃতীয় পর্ব, চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

অর্জুনের কাছে বিদ্যুন্মালার প্রেম ফুলের মালা নয় বজ্রের জ্বালা—এই প্রেম তাকে একই সঙ্গে দিয়েছে "গভীর দুঃখ ও বিজয়োল্লাস।" কিন্তু অর্জুন কিছুতেই ভুলতে পারে না—

"সে রাজার ভৃত্য রাজার বাগদত্তা বধূর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে কোন স্পর্ধায়"। [তৃতীয় পর্ব, চতুর্থ পরিচ্ছেদ]

তাই পরদিন সন্ধ্যায় নিভৃত সাক্ষাত মুহূর্তে সে বিধুর কণ্ঠে বিদ্যুন্মালাকে বলেছে—

"..তিনদিন আগে আমি সজ্জন ছিলাম, আজ আমি কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতক। রাজা আমাকে ভালবাসেন, আমাকে পরম বিশ্বাসের কাজ দিয়েছেন ; আর আমি প্রতি মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছি। তুমি আমার এ কী সর্বনাশ করলে ?" (তৃতীয় পর্ব, চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

এইভাবে কর্তব্যের তাড়নায়, বিবেকের দংশনে অর্জুন যত জর্জ্জরিত হয়েছে উপন্যাসের চরিত্র হিসেবে তার আকর্ষণ তত বৃদ্ধি পেয়েছে।

অর্জুনের প্রবল পৌরুষও প্রশংসনীয়। অর্জুনের বাসকক্ষে বিদ্যুন্মালার গোপন অভিসার যখন রাজার কাছে ধরা পড়েছে, তখন প্রায় নির্দোষ অর্জুন আত্মরক্ষার জন্য সমস্ত দায়িত্ব রাজকুমারীর উপর চাপিয়ে দেওয়ার কোনও চেষ্টাই করেনি। রাজা প্রকৃত ঘটনা জানতে চাইলে—'সে একবার মুখ তুলিয়া আবার মুখ নত করিল, ধীরে ধীরে বলিল—'আমিও সমান অপরাধী মহারাজ।' [চতুর্থ পর্ব, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ]

কুমার কম্পনের নিক্ষিপ্ত ছুরিকার নিশ্চিত আঘাত থেকে রাজা দেবরায়ের প্রাণরক্ষার সুকৃতি বশতঃই অর্জুন মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে বটে, কিন্তু তার পরিবর্তে তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে মাতৃভূমিতুল্য প্রিয় বিজয়নগর থেকে নির্বাসনদণ্ড। রাজাদেশ শিরোধার্য করে বন্ধু বলরামের সঙ্গে সে বিজয়নগর ত্যাগ করেছে বটে, কিন্তু রাজ অবরোধে বন্দিনী বিদ্যুন্মালার চিন্তায়, তার দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে অর্জুনের মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। বিচ্ছেদের কঠিন আঘাতেই বিদ্যুন্মালার প্রতি সম্ভ্রমের আবরণ ও রাজার প্রতি কর্তব্যবোধের পাষাণভার চূর্ণ করে নবোন্মোষিত প্রেম অর্জুনের হৃদয়ে আপনার অমোঘ অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে। তাই বহমনীরাজ কর্তৃক বিজয়নগর আক্রমণের গুপ্ত প্রস্তুতির সংবাদ রাজা দেবরায়কে জানাতে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে আমরা অর্জুনকে বলতে শুনি—

"বিজয়নগরকে বেশি ভালোবাসি, কি রাজাকে বেশি ভালোবাসি, কি বিদ্যুন্মালাকে বেশি ভালোবাসি, তা জানিনা। কিন্তু আমি যাব।" [চতুর্থ পর্ব, চতুর্থ পরিচ্ছেদ]

অর্জুনের এই নিজপ্রাণ তুচ্ছ করে বিজয়নগরের কল্যাণসাধনের আন্তরিক প্রয়াসের যথোচিত মূল্য দিতে মহারাজ দ্বিতীয় দেবরায় কার্পণ্য করেননি। তিনি শুধু তার নির্বাসন দণ্ডাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়ে তাকে তুরঙ্গবাহিনীর সেনানীপদে নিযুক্তই করেননি, তার সঙ্গে বিদ্যুন্মালার বিবাহের পথও প্রস্তুত করে দিয়েছেন। অবশ্য লোকসমাজে রাজকন্যার মর্যাদা রক্ষার্থে বিদ্যুন্মালাকে নাম গোপন করে মণিকঙ্কণারূপে পরিচিত হতে হয়েছে। যে অসাধারণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও মনোবল আশ্রয় করে অর্জুন একদিন অনির্দেশ্য

ভবিষ্যতের পথে ভেসে গিয়েছিল, সেই মানসিক শক্তি, শুভবুদ্ধি ও প্রবল পৌরুষের দ্বারাই সে অর্জন করেছে ভাগ্যদেবতার প্রসন্নতা, প্রমাণ করেছে, 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'।

অর্জুনের অভিন্নহৃদয় বন্ধু বলরাম কিন্তু প্রকৃতিগত দিক দিয়ে অর্জুনের কিছুটা বিপরীতধর্মী। অর্জুন স্বল্পভাষী, চিন্তাশীল, অন্তর্মুখী চরিত্র, বলরাম লঘুচিত্ত, রসিক, বচনপটু এবং কিছুটা বহির্মুখী স্বভাব-বিশিষ্ট। কিন্তু একটি বিষয়ে এদের মধ্যে গভীর মিল লক্ষ্য করা যায়—এই দুই যুবকই নিজ নিজ দেশে মুসলমান শাসনে উৎপীড়িত হয়ে ভাগ্যান্বেষণের জন্য দাক্ষিণাত্যের সুসমৃদ্ধ হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর যাওয়ার জন্য উৎসুক হয়েছিল। বলরামই তুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্ণা নদীর সঙ্গমস্থলে দুরন্ত স্রোতে নিমজ্জমান অর্জুনকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল। সে শুধু সন্তরণেই পটু ছিল না আর একটি গুপ্ত বিদ্যা তার জানা ছিল—বহনযোগ্য লঘুভার আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণে বলরাম সুদক্ষ। উপন্যাসের ভূমিকাংশে লেখক আলোচ্য কাহিনীতে আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণের এই প্রসঙ্গটি যে ইতিহাস বিরোধী নয় সে সম্পর্কে কিছু তথ্যের অবতারণা করেছেন—

"অনেকের ধারণা পোর্তুগীজদের ভারতে আগমনের (খৃঃ ১৪৯৮) পূর্বে ভারতবর্ষে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচলন ছিল না। ইহা ভ্রান্ত ধারণা। ঐতিহাসিকেরা কেহ কেহ অনুমান করেন, সুলতান ইলতুৎমিসের সময় ভারতবর্ষে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার ছিল। পরবর্তীকালে স্বয়ং বাবর শাহ তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়া গিয়াছেন যে বাঙ্গালী যোদ্ধা আগ্নেয়াস্ত্র চালনায় নিপুণ ছিল। এই কাহিনীতে আগ্নেয়াস্ত্রের অবতারণা অলীক কল্পনা নয়। তবে বাবর শাহের আমলেও ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্র ভারতে আবির্ভূত হয় নাই।"

যাই হোক, কামান-নির্মাণের গুপ্তবিদ্যার গুণেই বলরাম অনায়াসে মহারাজ দ্বিতীয় দেবরায়ের প্রীতি ও জীবনধারণের উপযুক্ত বৃত্তি অর্জন করেছে। বিজয়নগরেই সে বংশী-বাদনে পারদর্শিনী, মিতভাষিণী, মধুরস্বভাবা মঞ্জিরাকে প্রণয়িনীরূপে লাভ করেছে। তবু বন্ধুর প্রতি ভালবাসা ও কর্তব্যবোধ বলরামের কাছে জীবনের অন্য সকল আকর্ষণের ঊর্ধ্বে, তাই রাজ-আদেশে বিজয়নগর থেকে নির্বাসিত অর্জুনকে সে একাকী, অজানার পথে ছেড়ে দিতে পারেনি, নিজের সমস্ত সুখ-সম্ভাবনা বিসর্জন দিয়ে সে অর্জুনের পাশে দাঁড়িয়েছে। বহমনী রাজ্যের গুপ্ত আক্রমণের প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত করে দেওয়ার ক্ষেত্রে বলরামের অবদান অসামান্য। এই প্রসঙ্গে তার দুঃসাহস, মনোবল, সূক্ষ্মবুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রশংসার যোগ্য। কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে দেখা যায় অসাধ্য সাধনের পুরস্কার স্বরূপ তার মঞ্জিরা-প্রাপ্তি ঘটেছে।

তুঙ্গভদ্রার তীরে উপন্যাসে এই সকল প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছাড়া বলরাম কর্মকারের আরও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। শরদিন্দুর লেখা পূর্ববর্তী তিনটি উপন্যাসেই লেখকের উপজীব্য ছিল বাঙলা ও বাঙালীর ইতিহাস। আলোচ্য উপন্যাসের ঘটনাস্থল সুদূর দাক্ষিণাত্য হলেও ঔপন্যাসিক তাঁর বঙ্গপ্রীতির দুর্বার প্রভাবকে প্রতিহত করতে পারেননি। তাই বলরাম কর্মকারের মাধ্যমে "তুঙ্গভদ্রার তীরে"তেও মাঝে মাঝে তিনি ভাগীরথী বিধৌত বঙ্গদেশের শ্যামল পরিবেশকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। অথচ উপস্থাপনার গুণে

কোথাও তা কৃত্রিম বা আরোপিত বলে মনে হয় না। মুক্তপ্রাণ, সংগীতপ্রেমী বলরাম উপন্যাসের প্রথম পর্বে নদীবক্ষে, দ্বিতীয় পর্বে সংকেত গুহার আবাসে একাধিকবার মৃদঙ্গ সহযোগে গেয়ে উঠেছে 'বাংলার রবি, জয়দেব কবি'র লেখা 'গীতগোবিন্দম্' কাব্যের কান্তকোমল পদাবলী।

আবার দ্বিতীয় পর্বের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অর্জুনের সঙ্গে বলরামের কথোপকথন প্রসঙ্গে তার মৎস্য-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়, যার ফলে 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ'-এর অনঙ্গ পালের কথা অনিবার্যভাবেই আমাদের মনে পড়ে।

'তুঙ্গভদ্রার তীরে'র অপরাপর পুরুষ চরিত্রগুলি অর্থাৎ কলিঙ্গ কন্যাদের মাতুল চিপিটক মূর্তি, কলিঙ্গ দেশ ও বিজয় নগরের রাজবৈদ্যদ্বয় এ উপন্যাসে মূলতঃ হাস্যরস পরিবেশন করেছেন। কৃশদেহ ও স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন চিপিটক মূর্তি, প্রসন্নচিত্ত, ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি বিশিষ্ট, সংসার উদাসীন বৃদ্ধ বৈদ্য রসরাজ এবং বিজয়নগরে রাজবৈদ্য সরল, আনন্দমগ্ন দামোদর স্বামী—এঁরা প্রত্যেকে আপন আপন বৈশিষ্ট্যে ও আচরণে উপন্যাসকে কৌতুকরসে সরস করে রেখেছেন, তবে চরিত্র হিসাবে এঁরা গতানুগতিক বা type চরিত্র।

কলিঙ্গ রাজদুহিতাদের চরিত্র বর্ণনার ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক রোমান্টিক প্রণয়াদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। তবে প্রায় বিপরীত-স্বভাবা ভগিনীদ্বয়ের চারিত্রিক পার্থক্যগুলি আদ্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সুচিত্রিত। উপন্যাসের প্রথম পর্বের প্রথম পরিচ্ছেদেই ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন—

> "বিদ্যুন্মালা ও মণিকঙ্কণার বয়স প্রায় সমান, দু এক মাসের ছোট বড়। কিন্তু আকৃতি ও প্রকৃতিতে অনেক তফাৎ। আঠারো বছর বয়সের বিদ্যুন্মালার আকৃতির বর্ণনা করিতে হইলে প্রাচীন উপমার স্মরণ লইতে হয়।......তাঁহার প্রকৃতিতেও একটি মধুর ভাবমন্থর গভীরতা আছে যাহা সহজে বিচলিত হয় না। অন্তঃসলিলা প্রকৃতি বাহির হইতে অন্তরের পরিচয় অল্পই পাওয়া যায়।"
>
> "মণিকঙ্কণা ঠিক তাহার বিপরীত......তাহার প্রকৃতিও বড় মিষ্ট, মোটেই অন্তর্মুখী নয়, বাহিরের পৃথিবী তাহার চিত্ত হরণ করিয়া লইয়াছে। মনে ভাবনা-চিন্তা বেশী নাই, কিন্তু সকল কর্মে পটীয়সী,..."

আদর্শ স্বামী সম্পর্কে দুই ভগিনীর দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বিপরীত। বিদ্যুন্মালার মতে এক পত্নী বিশিষ্ট রাজা রামচন্দ্রই স্বামী হিসেবে আদর্শ. বহুবল্লভ রাজা দ্বিতীয় দেবরায়ের চতুর্থী স্ত্রী রূপে পরিগণিত হওয়ার সম্ভাবনাকে সে আদৌ সৌভাগ্যজনক বলে মনে করে না। অন্যদিকে মণিকঙ্কণার মতে,—

> "আমার বুকে ভালবাসা ভরা আছে। যিনিই আমার স্বামী হবেন তাঁকেই আমি প্রাণ-ভরে ভালবাসব"। (প্রথম পর্ব, তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

বিজয়নগরে পৌঁছে রাজ-সন্দর্শনের পর দুই রাজকন্যার মনের গতি সম্পূর্ণ ভিন্ন—

> "মণিকঙ্কণার মন স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, সেখানে জটিলতা কুটিলতা নাই। সামাজিক বিধিব্যবস্থার প্রতি বিদ্বেষ নাই, সে মহারাজ দেবরায়কে দেখিয়া পলকের মধ্যে হৃদয় হারাইয়াছে এবং হৃদয় হারানোর আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া আছে।"

অপরদিকে বিদ্যুন্মালার মন প্রথম থেকেই এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিবাহের প্রতি বিমুখ ছিল। তাই—

"মহারাজ দেবরায়কে দেখিয়া বিদ্যুন্মালার হৃদয় বিচলিত হইল না।"

[দ্বিতীয় পর্ব, অষ্টম পরিচ্ছেদ]

নদীগর্ভে প্রায় নিমজ্জমান, অপরিচিত যুবক অর্জুন বর্মাকে দেখামাত্রই কোনো এক অজানা কারণে তার প্রতিই বিদ্যুন্মালার কুমারী হৃদয় আকৃষ্ট হয়েছে। অবচেতন মনে প্রণয় সঞ্চারের অস্ফুট পূর্বাভাস উপন্যাসের প্রথম পর্বের সপ্তম পরিচ্ছেদে ঔপন্যাসিক সুকৌশলে বিদ্যুন্মালার স্বপ্ন-দর্শনের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন।

অর্জুনের প্রতি রাজকুমারীর প্রথম দর্শনেই সেই পূর্বরাগ জ্যোৎস্নালোকিত নির্জন দ্বীপে অর্জুনের বিচিত্র জীবনকথা শ্রবণের মাধ্যমে অনুরাগে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বিদ্যুন্মালার এই প্রেমানুভূতি সম্পর্কে অপরপক্ষ সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সুতরাং প্রণয়ের যত কিছু প্রতীক্ষা, অভিমান, আশাভঙ্গ সমস্ত প্রতিক্রিয়াই লেখক বর্ণনা করেছেন বিদ্যুন্মালার অন্তরের দিকে লক্ষ্য রেখে। তাই ব্রতপালনের উদ্দেশ্যে পদব্রজে পম্পাপতির মন্দিরে পূজা দিতে যাবার সময় পথপার্শ্বে অর্জুনকে দেখে—

"মণিকঙ্কণা চকিত হাস্যে দশনপ্রান্ত ঈষৎ উন্মোচিত করিল। বিদ্যুন্মালা হাসিলেন না, তাঁহার মুখখানি রক্ত সঞ্চারে একটু উত্তপ্ত হইল মাত্র। কেহ জানিল না যে তাঁহার হৃৎপিণ্ড ক্ষণিকের জন্য দুরু দুরু করিয়া উঠিয়াছে।"

[দ্বিতীয় পর্ব, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ]

এইভাবে প্রায় প্রত্যহই পূজো দিতে যাওয়ার সময় অর্জুনের সঙ্গে বিদ্যুন্মালার সাক্ষাৎ হতে লাগল। রাজকুমারীর পক্ষে তাকে ভুলে যাওয়া সম্ভব হল না। প্রেম দিনে দিনে তিলে তিলে বর্ধিত হল। একদিকে এই ক্রমবর্ধমান অনুরাগ, অন্যদিকে রাজার সঙ্গে বিবাহের প্রায় সমাগত লগ্ন এই দুই-এর দ্বন্দ্ব আপাত-শান্ত বিদ্যুন্মালাকেও অস্থির করে তুলছে। প্রেমাস্পদকে নিজের অন্তরের কথা জানাবার অন্য কোনও পথ না পেয়ে সেই অপ্রগল্ভা রাজদুহিতা লজ্জা সঙ্কোচ ভুলে তার প্রতি শ্রদ্ধা, সম্ভ্রমে বিগলিত অর্জুনের কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান ক'রে স্বয়ংবরা হয়েছে। এই স্বভাব-বিরুদ্ধ আচরণের পর তার অনিবার্য প্রতিক্রিয়াটুকু পাঠকের কাছে জানাতে লেখক বিস্মৃত হননি—

"তিনি একটি পাষাণ পট্টের উপর বসিয়া পড়িলেন। প্রগল্ভতা তাঁহার প্রকৃতি-সিদ্ধ নয়, তাই এইটুকু অভিনয় করিয়া তাঁহার দেহমনের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল।" [তৃতীয় পর্ব, চতুর্থ পরিচ্ছেদ]

বিদ্যুন্মালার এই স্বয়ংবরা রূপটি আমাদের মনে "কালের মন্দিরা"র রট্টা যশোধরার স্মৃতি বহন করে আনে। আবার যশোধরার মতো বিদ্যুন্মালার চরিত্রেও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লক্ষ্য করা যায়। উভয় নায়িকাই যা সত্য ব'লে অন্তরে গ্রহণ করেছে কোন কিছুর বিনিময়েই তাকে পরিত্যাগ করবে না, তাই যে প্রণয়কে কেন্দ্র করে অর্জুনবর্মার চিত্ত প্রেম ও কর্তব্যের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, বিদ্যুন্মালা কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাকে রাজার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করেনি। অর্জুনের প্রতি নবাঙ্কুরিত প্রেম যে তার মধ্যে

ব্যক্তিত্বের জাগরণ ঘটিয়েছে সেই পরিচয় পাওয়া যায় উপন্যাসের তৃতীয় পর্বের চতুর্থ পরিচ্ছেদে।

"অর্জুন বলিল, 'তুমি মহারাজ দেবরায়ের বাগ্‌দত্তা।' বিদ্যুন্মালা বলিলেন, 'আমি কাউকে বাগ্‌দান করিনি। রাজায় রাজায় রাজনৈতিক চুক্তি হয়েছে, আমি কেন তার দ্বারা আবদ্ধ হব?'

'...... আমার হৃদয় আমি যাকে ইচ্ছা দান করব।"

অর্জুনের সঙ্গে নিভৃত মিলন মুহূর্তে দেবরায়ের কাছে ধরা পড়ার পরও কলিঙ্গরাজ তনয়ার এই আত্মমর্যাদাবোধ বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন হয়নি, তার প্রাণাধিক প্রিয় অর্জুনকে রাজরোষ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রকৃত সত্য স্বীকার করতে সে দ্বিধা করেনি—

"রাজাধিরাজ আমি অর্জুনবর্মাকে প্রলুব্ধ করেছিলাম, কিন্তু উনি আমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে সম্মত হননি। ওঁর অপরাধ নেই, আমি অপরাধিনী আমাকে দণ্ড দিন।" [চতুর্থ পর্ব, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ]

এ আবেদনে কর্ণপাত না করে রাজা দেবরায় যখন রাজকুমারীকে মহলে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিহারিণীদের আহ্বান জানিয়েছেন, তখন সেই সংকটময় মুহূর্তেও বিদ্যুন্মালার আচরণে রাজসুতাসুলভ প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ লক্ষ্য করা যায়—

"বিদ্যুন্মালা একবার রাজার দিকে একবার অর্জুনের দিকে চাহিলেন, তারপর অধর দংশন করিয়া গর্বিত পদক্ষেপে দাসীদের সঙ্গে প্রস্থান করিলেন। তিনি রাজকন্যা, দাসী-কিঙ্করীর সম্মুখে দীনতা প্রকাশ করা চলিবে না।"

[চতুর্থ পর্ব, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ]

বিদ্যুন্মালার চরিত্রটি আদ্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বিদ্যুন্মালার তুলনায় মণিকঙ্কণার জীবন ও চরিত্র অনেকাংশেই জটিলতামুক্ত। মহারাজ দেবরায়কে দেখামাত্রই তার হৃদয় তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। অন্তরাল থেকে রাজার রূপদর্শন, তাঁর কণ্ঠস্বর শ্রবণের মাধ্যমে মণিকঙ্কণার ভালবাসা আরও দৃঢ়, আরও গাঢ় হয়েছে। অপরদিকে রাজার অন্য রাণীদের সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় ও প্রীতি বিনিময়ের স্বতঃস্ফূর্ত চেষ্টা প্রমাণ করে এই যুবতীটি অসাধারণ প্রাণপ্রাচুর্যময়ী। রাজতনয় শিশু মল্লিকার্জুনের প্রতি তার স্নেহ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত রাজার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছে। সেবা ও সরসমধুর ব্যবহারের দ্বারা সে তাঁর হৃদয় জয় করেছে। কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে দেখা যায় মণিকঙ্কণার মনোরথ পূর্ণ হয়েছে। বিবাহের পূর্বে লোকচক্ষুকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য নাম পরিবর্তনের শর্ত শুনে সে বিগলিত হাস্যে "মহারাজের কোলের উপর লুটাইয়া পড়িল।" প্রকৃতপক্ষে এই বাধাহীন, দ্বিধাহীন উচ্ছ্বাস তাকেই মানায়।

অল্প পরিসরে 'মঞ্জিরা' নাম্নী মিতবাক, শান্ত, স্নিগ্ধ তরুণীটি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বলরামের সঙ্গে সংগীতের মাধ্যমে তার আত্মিক সংযোগ স্থাপন ও পূর্বরাগ পর্বের সংক্ষিপ্ত অথচ সংযত পরিচয়টুকু উপভোগ্য।

আর একটি স্ত্রী চরিত্রের প্রসঙ্গ উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তার

নাম মন্দোদরী। অতিস্থূলা, নিদ্রালসা, তাম্বুলরসিকা, ওড্রদেশজা এই নারী প্রকৃতপক্ষে কলিঙ্গরাজ দুহিতা বিদ্যুন্মালার ধাত্রী, দীর্ঘ অষ্টাদশ বৎসর যাবৎ সে এই পদে সমাসীনা, বিদ্যুন্মালার বিবাহ উপলক্ষে রাজকুমারীদের অভিভাবিকারূপে সেও বিজয়নগর চলেছে। বিধবা মন্দোদরীর অন্তরে জীবন সম্ভোগের যে এক বিচিত্র আকাঙ্ক্ষা সুপ্ত ছিল সে সম্পর্কে ঔপন্যাসিক আমাদের উপন্যাসের প্রথম পর্বের তৃতীয় পরিচ্ছেদেই অবহিত করেছেন—

"মন্দোদরী জানিত ইহারা পরিহাস করিতেছে, কিন্তু তাহার অন্তরের এক কোণে একটি লুক্কায়িত আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহা এই ধরনের রসিকতায় তৃপ্তি পাইত।"

[প্রথম পর্ব, তৃতীয় পরিচ্ছেদ]

তাই আকস্মিক ঝঞ্ঝাঘাতে নদীবক্ষে নিমজ্জিত হয়ে ধাত্রী মন্দোদরী ও মাতুল চিপিটক-মূর্তি যখন মূল বাহিনীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক দ্বীপে স্বামী-স্ত্রীর ছদ্ম পরিচয়ে আশ্রয় লাভ করেছিল তখন কলিঙ্গ রাজশ্যালক চিপিটকমূর্তি সেই গ্রাম্য জীবনযাত্রার থেকে মুক্তি পেয়ে কলিঙ্গ ফেরার প্রত্যাশায় দিন গুণেছে, কিন্তু মন্দোদরীর প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত—

"মন্দোদরীর মনে কোনো খেদ নাই। সে একটি স্বামী পাইয়াছে, গ্রাম্যবধূরা তাহাকে রাঁধিয়া খাওয়ায়⋯ · আর কী চাই? গ্রামে তাহার মন বসিয়া গিয়াছে, সারা জীবন এই গ্রামে কাটাইতে পারিলে সে আর কিছু চায় না।"

[চতুর্থ পর্ব, অষ্টম পরিচ্ছেদ]

এ শুধু যে তার ক্ষণিকের খেয়াল নয়, অন্তরের কথা, তার পরিচয় উপন্যাসের উপসংহার অংশে মুদ্রিত আছে—এক বর্ষণস্নিগ্ধ দিনের তৃতীয় প্রহরে নদীর ধারে বসে মন্দোদরী দেখতে পেয়েছে—

"তিনটি অত্যন্ত পরিচিত বহিত্র কলিঙ্গ দেশে ফিরিয়া চলিয়াছে।"

মন্দোদরীর বুকের মধ্যে দুম্ দুম্ শব্দ হইতে লাগিল। সে ক্ষণকাল ব্যায়ত চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া মুখে আঁচল ঢাকা দিয়া আবার শুইয়া পড়িল। কী আপদ! নৌকাগুলি এতদিন বিজয়নগরেই ছিল! এতদিন ধরিয়া কী করিতেছিল? ভাগ্যে গ্রামের অন্য কেহ দেখিয়া ফেলে নাই, জয় দারুব্রহ্ম!"

[চতুর্থ পর্ব, অষ্টম পরিচ্ছেদ]

জীবন সম্ভোগের এই বিচিত্র বাসনার ক্ষণিক উল্লাসেই মন্দোদরী গৌণ চরিত্র হয়েও পাঠকের অন্তরে চিরস্থায়ী আসন লাভ করে।

আলোচ্য উপন্যাসটির নামকরণের ক্ষেত্রেও স্রষ্টা শরদিন্দুর শিল্প সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাসের প্রথমেই 'ঊর্মিমর্মর'-এ ঔপন্যাসিক তুঙ্গভদ্রার বিচিত্র জন্মকথা বিবৃত করেছেন—

"সহ্যাদ্রির সুদূর দক্ষিণ প্রান্তে দুইটি ক্ষুদ্র নদী উত্থিত হইয়াছে, তুঙ্গ ও ভদ্রা। দুই নদী পর্বত হইতে কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর পরস্পর মিলিত হইয়াছে, এবং তুঙ্গভদ্রা নাম গ্রহণ করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।"

ছয়শতাব্দী পূর্বে তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ তটভূমিকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছিল সুসমৃদ্ধ হিন্দু

সাম্রাজ্য বিজয়নগর। কাহিনী বিন্যাসেও নদীটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্ণা-নদীর সঙ্গম স্থলেই প্রবল স্রোতে ভাসমান অর্জুনবর্মাকে নৌকা থেকে দেখতে পেয়ে মণিকঙ্কণা বিদ্যুন্মালার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। নদীগর্ভ থেকে উঠে আসা সেই যুবক সবার অলক্ষ্যে এমনকি নিজেরও অজান্তে কলিঙ্গরাজদুহিতা বিদ্যুন্মালার হৃদয়রাজ্যে ঘটিয়েছিল এক নিঃশব্দ বিপ্লব। আবার তুঙ্গভদ্রারই বক্ষে ঝটিকার প্রলয়োন্মত্ত আবির্ভাব চারটি নরনারীর জীবনের গতিপথকে পরিবর্তিত করে দিয়েছিল—একদিকে অর্জুনবর্মার প্রতি বিদ্যুন্মালার হৃদয়ের পূর্বরাগ পরিণত হয়েছিল অনুরাগে, অন্যদিকে মন্দোদরী ও চিপিটকমূর্তির জীবন বাঁধা পড়েছিল একসূত্রে। কাহিনীর প্রাক্-সমাপ্তি মুহূর্তে ঘটনাকে বাঞ্ছিত পরিণতি দানের ক্ষেত্রেও তুঙ্গভদ্রার অবদান লক্ষণীয়—নির্বাসিত অর্জুনবর্মা যখন বহমনীরাজ্যের গুপ্ত আক্রমণ প্রস্তুতির কথা বিজয়নগর রাজ্যে দ্রুত পৌঁছে দেবার জন্য রণপা চড়ে যাত্রা করেও সেই বংশদণ্ড ভেঙ্গে যাওয়ার দরুণ সেগুলিকে পরিত্যাগ করে প্রাণপণে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে তখন—

"অন্ধকারে ছুটিতে ছুটিতে সহসা তাহার তলা হইতে মাটি সরিয়া গেল, ক্ষণকাল শূন্যে পড়িতে পড়িতে সে ঝপাং করিয়া জলে পড়িল, পতনের বেগে জলে ডুবিয়া গেল। তারপর যখন সে মাথা জাগাইল তখন ভরানদীর খরস্রোত তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে।

আবার তুঙ্গভদ্রার জলে অবগাহন। কিন্তু এবার ভয় নাই। তুঙ্গভদ্রা তাহাকে বিজয়-নগর পৌঁছাইয়া দিবে।" (চতুর্থ পর্ব, পঞ্চম পরিচ্ছেদ)।

সুতরাং সবদিক দিয়ে বিবেচনা করে দেখা যায় আলোচ্য উপন্যাসের নাম শুধু সুখশ্রাব্যই নয়, বিষয়বস্তুর পক্ষে সম্পূর্ণ সুসংগত।

উপসংহারে বলা যায় এই উপন্যাসটি রচনার পশ্চাতে লেখকের উদ্দেশ্য ছিল তুঙ্গভদ্রার তীরবর্তী বিজয়নগরের ঐশ্বর্য সমৃদ্ধ, গৌরবময় সভ্যতার স্মৃতিকে বিস্মৃতির অতলগর্ভ অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে উত্তরসুরীর মানসলোকে চির অমরত্ব দান করা। তাঁর ঐ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি। ইতিহাসের তথ্যের সঙ্গে জীবনরসের সংযোগ পাঠক মনে অনিবার্য প্রভাব বিস্তার করেছে। তাঁর এই কৃতিত্বের যথাযোগ্য স্বীকৃতি পাওয়া যায় ১৯৬৫ সালের ২৬শে নভেম্বর তারিখে শরদিন্দুবাবুকে লেখা প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদারের চিঠিতে—

"আপনি বিজয়নগরের অতীত ঐশ্বর্যের স্মৃতি একটি মনোরম কাহিনীর মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন—এজন্য আমরা অর্থাৎ ঐতিহাসিকেরা খুবই কৃতজ্ঞ কারণ লোকে ইতিহাস পড়ে না কিন্তু আপনার বই পড়িবে। Alexander Dumas যে উদ্দেশ্য নিয়ে Three Muskateers প্রভৃতি লিখিয়াছিলেন, আপনার দুইখানি উপন্যাসের মধ্য দিয়া তেমনি শশাঙ্কের পরবর্তী সময়কার বাংলা ও দেবরায়ের বিজয়নগর সম্বন্ধে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।"

'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসটি সম্পর্কে এর চেয়ে যোগ্য মূল্যায়ন আর কি হতে পারে?

কুমারসম্ভবের কবি [১৩৭০] 'কুমারসম্ভবের কবি' শরদিন্দু-রচিত ইতিহাস-

ভিত্তিক উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম। মহাকবি কালিদাসের সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে 'কুমারসম্ভবম্' কাব্যখানিই যে আলোচ্য লেখককে বিশেষভাবে আকর্ষণ করত সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই একটিমাত্র কাব্যই কথাশিল্পী শরদিন্দুকে একাধিক রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে—লেখা হয়েছে—'অষ্টম সর্গ' গল্প 'কালিদাস' চিত্রনাট্য, এবং উক্ত চিত্রনাট্যই 'কুমারসম্ভবের কবি' নামে উপন্যাসের আঙ্গিকে পুনর্লিখিত হয়েছে।

কালিদাস নিঃসন্দেহেই শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু তাঁর জীবনবৃত্তান্ত ও আবির্ভাবকাল সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য আজও অজ্ঞাত। তাই তিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলেও তাঁর জীবন-কথাকে কেন্দ্র করে নানা কল্পকাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে সর্বাধিক প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে—

> "তিনি প্রথমে নিতান্ত মূর্খ ছিলেন এবং পরে বিদুষী ভার্যার গঞ্জনায়, কালীদেবীর আরাধনা করিয়া কবিত্ব শক্তির অধিকারী হন।" [সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস (১ম সংস্করণ) সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

এই কিংবদন্তীর সঙ্গে মৌলিক কল্পনার মিশ্রণ ঘটিয়ে শরদিন্দুর 'কুমারসম্ভবের কবি' সৃষ্টি হয়েছে। কাহিনীর ঘটনা বিন্যাসে লেখকের স্বাভাবিক কুশলতা লক্ষ্য করা যায়।

চরিত্র-চিত্রণ প্রসঙ্গে কবি কালিদাসই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্যতার দাবী রাখেন। আলোচ্য উপন্যাসে 'কুমারসম্ভবের কবি'কে শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে আঁকা হয়েছে। তাঁর প্রথম জীবনের মূর্খতা ও সারল্য, ঘটনাচক্রে কুন্তল রাজপুরীতে ও রাজকুমারীর স্বয়ংবর সভায় প্রবেশ করার পর তাঁর বিস্ময়-বিমুগ্ধ প্রতিক্রিয়া, প্রকৃত ঘটনা না বুঝেই কুন্তল রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহ হওয়ার অভাবিত সৌভাগ্যজনিত আনন্দোচ্ছ্বাস—সকল কিছুই উপন্যাসে সুপরিস্ফুট। রাজকুমারী কৃত অপমান ও লাঞ্ছনা নিরক্ষর, সরল, গ্রামীণ কালিদাসের যেন নবজন্ম ঘটিয়েছে। তখন তাঁর একমাত্র কাম্য বস্তু বিদ্যা। কিংবদন্তীর মতো উপন্যাসেও কালিদাস দেবীর বরেই বিদ্যা ও কবি প্রতিভার অধিকারী হয়েছেন। কিন্তু ইনি দেবী কালী নন, যে সর্বশুক্লা বালিকা শেষ পর্যন্ত পূর্ণ যুবতী দেবীমূর্তি ধারণ করে কালীদাসকে বরপ্রদান করেছেন সম্ভবতঃ তিনি বিদ্যা ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। দেবীর বরে কবিত্ব শক্তি প্রাপ্তির পরেও তাঁর আত্মপ্রকাশের দীনতা ও রাজসঙ্গ পরিহারের আপ্রাণ প্রয়াসই প্রমাণ করে যে বিবাহ রাত্রেই বিদুষী ভার্যা কর্তৃক লাঞ্ছিত হওয়ার বেদনা তাঁর হৃদয়ে কী গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। তাঁর অনাড়ম্বর, সরল জীবনযাত্রা, কবিখ্যাতি লাভের পরেও উদাসীন, নির্লিপ্ত আচরণ তাঁর নিরভিমান হৃদয়টিরই পরিচায়ক। ক্ষমাশীলতা শরদিন্দুচিত্রিত মহাকবির চরিত্রের এক মহৎ গুণ।

এ উপন্যাসের আর এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব মহারাজ বিক্রমাদিত্য। ইতিহাস-সচেতন লেখক তাঁর বাহুবল, কাব্যপ্রীতি, শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ সকল বৈশিষ্ট্যই সংক্ষিপ্ত পরিসরে যথাযথভাবে পরিস্ফুট করেছেন।

আলোচ্য কাহিনীতে দুটি নারীর প্রসঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—তাঁদের একজন কুন্তলকুমারী হৈমশ্রী, অপরজন মালিনী।

হৈমশ্রী প্রথম দর্শনেই কালিদাসের রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু পরে তাঁর মূর্খতার পরিচয় পেয়ে নিদারুণ ধিক্কারে তাঁকে জর্জরিত করেছেন এবং পিতার মাধ্যমে কালিদাসকে বিবাহরাত্রেই রাজপুরী থেকে বিতাড়িত করেছেন বটে, কিন্তু চিত্তে তাঁর বিন্দুমাত্র সুখ ছিল না, এক সুগভীর বেদনা তাঁকে নিরন্তর দগ্ধ করেছে। তাই হৈমশ্রীর সঙ্গে কালিদাসের মিলনেই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কুন্তল রাজদুহিতা কবির পর্ণকুটিরে সানন্দে গৃহিণী রূপে পদার্পণ করেছেন—এ কল্পনাও অযৌক্তিক নয়, কারণ ধনী নয়, জ্ঞানী-গুণী স্বামীই যে তাঁর কাম্য তার প্রমাণ তো তাঁর স্বয়ংবরকালীন শর্তেই পাওয়া যায়।

আত্মভোলা, সংসার উদাসীন কবির প্রতি মালিনীর স্বার্থশূন্য স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসা নানাভাবে বিচ্ছুরিত হয়েছে। মালিনীই গৃহকোণে আত্মমগ্ন ও প্রচারবিমুখ কবিকে অপরিচয়ের অন্ধকার থেকে মুক্ত করে যশ, খ্যাতি ও সম্মানের আলোক সভায় উপস্থাপিত করেছে। কালিদাস ও হৈমশ্রীর মিলনকে কেন্দ্র করে তার অন্তরে রিক্ততার হাহাকার পাঠকের অশ্রুত থাকে না।

'কুমারসম্ভবের কবি'তে তৎকালীন সামাজিক পরিবেশের বিস্তৃত পরিচয় না থাকলেও কাহিনীর স্থানে স্থানে প্রসঙ্গক্রমে সেকালে নারীর স্বয়ংবর প্রথা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, উজ্জয়িনীর শোভা ও সমৃদ্ধির পরিচয় প্রভৃতি পরিস্ফুট হয়েছে।

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে 'কালিদাস' চিত্রনাট্যকেই লেখক উপন্যাসের আঙ্গিকে বিন্যস্ত করেছেন তাই 'কুমারসম্ভবের কবি'র চরিত্র নির্মাণে ও ঘটনাবিন্যাসে উপন্যাস-সুলভ বিবৃতিধর্মিতা অপেক্ষা নাটকের প্রত্যক্ষতা গুণই অধিক প্রকট।

'ঝিন্দেরবন্দী' ও 'রাজদ্রোহী'তে ইতিহাসের ভূমিকা এতই গৌণ যে কাহিনীর দিক দিয়ে এদের বিশুদ্ধ রোমান্স হিসাবে চিহ্নিত করা অযৌক্তিক নয়। কিন্তু উক্ত উপন্যাস দুটিতে অতীতের যুগ ও জীবনের বিস্তৃত পরিচয় এমন একটি সূক্ষ্ম অথচ উপভোগ্য বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে যার ফলে সাধারণ সামাজিক বা রোমান্টিক উপন্যাসের থেকেও এরা পৃথক। তাই ইতিহাসের সঙ্গে সেই ক্ষীণ আত্মীয়তার সূত্রেই 'ঝিন্দেরবন্দী' ও 'রাজদ্রোহী'কে শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসের দরবারে শেষের সারিতে স্থান দেওয়া গেল।

ঝিন্দের বন্দী [১৩৪৫] "Anthony Hope" এর লেখা "The Prisoner of Zenda" অবলম্বনে রচিত ঝিন্দের বন্দী শরদিন্দুবাবুর একটি সুপ্রসিদ্ধ সৃষ্টি। আজ থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হওয়ার সময় এই কাহিনীটি "রোমান্সপিপাসু বাঙালী পাঠক-সমাজে আলোড়ন তুলেছিল।" (শরদিন্দু অমনিবাস নবম খণ্ড, গ্রন্থ-পরিচয়) কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসটি লেখককে যে শুধু খ্যাতির শীর্ষেই পৌঁছে দেয়নি, তাঁর সম্পর্কে কিছু বিরূপ সমালোচনারও সৃষ্টি করেছিল তার পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় 'ঝিন্দের বন্দী' গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় গ্রন্থকারের মন্তব্য থেকে—

"এই গল্পটি যখন ধারাবাহিকভাবে 'ভারতবর্ষে' বাহির হইতেছিল, তখন কেহ

পরদ্রব্য সম্বন্ধে আমার সততায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। গল্পের শিরোনামায় বড় বড় অক্ষরে যে নামটি ছাপা হইতেছিল তাহার প্রতি বোধহয় এই সন্দিগ্ধ ভদ্রমহোদয়গণের দৃষ্টি পড়ে নাই, পড়িলে বুঝিতে পারিতেন নামকরণ দ্বারা বংশ পরিচয় স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।"

প্রকৃতপক্ষে নামকরণের মাধ্যমেই ঔপন্যাসিক তার রচনার উৎস কাহিনীটি সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন। কিন্তু ঝিন্দের বন্দীকে 'Prisoner of Zenda'র নিছক অনুকরণ না বলে বোধহয় অনুপ্রাণিত রচনা হিসাবে চিহ্নিত করাই সমীচীন। কারণ এই উপন্যাসে শরদিন্দুবাবু শুধু উক্ত পাশ্চাত্যে রোমান্সের বিজাতীয় পটভূমি এবং বিদেশী চরিত্রগুলিকে সুকৌশলে ভারতীয় ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী রূপান্তরিত করেননি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বকীয় চিন্তাশক্তি ও শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে Anthony Hope রচিত উপন্যাসের সঙ্গে 'ঝিন্দের বন্দী'র উপসংহার পর্বের পার্থক্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'Prisoner of Zenda'র পরিণতি বিয়োগান্ত ও বিষাদপূর্ণ। কিন্তু শরদিন্দু রচিত কাহিনীটির সমাপ্তি-পর্ব মিলনমধুর। ঘটনার ক্রমাগ্রসরণে রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার মধ্যে পাঠক হৃদয়ে যে আকাঙ্ক্ষা গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠেছে, উপন্যাসের শেষ লগ্নে নায়ক-নায়িকার মিলনে সেই নিগূঢ় প্রত্যাশাই আনন্দময় চরিতার্থতা লাভ করেছে।

'ঝিন্দের বন্দী' অংশতঃ ব্রিটিশ শাসনাধীন কলকাতা এবং মুখ্যতঃ মধ্যভারতে ইংরেজদের দুই স্বাধীন মিত্র রাজ্য ঝিন্দ-ঝড়োয়ার পটভূমিতে লেখা। উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নায়ক গৌরীশংকর রায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুপণ্ডিত শিবশংকর রায়ের জবানীতে ঝিন্দঝড়োয়ার ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক উভয় পরিচয়ই বিবৃত হয়েছে। কিন্তু স্বয়ং ঔপন্যাসিকের মতে—

"বলাবাহুল্য গল্পের স্থান পাত্রপাত্রী সমস্তই কাল্পনিক। পাঞ্জাবে 'ঝিন্দ' নামে যে করদ রাজ্য আছে তাহার সহিত আমার গল্পের কোনো সম্পর্ক নাই।" [শরদিন্দু অমনিবাস, নবমখণ্ড, গ্রন্থ পরিচয়]

'ঝিন্দের বন্দী'তে আদ্যন্ত যে চরিত্রটি প্রবল মনোযোগের সঙ্গে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত তার নাম গৌরীশংকর রায়। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই পাঠক জানতে পারে বিত্তবান গৌরীশংকর "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী হইলেও খেলাধূলা, ব্যায়াম, জিমন্যাস্টিকের দিকেই তাঁহার আকর্ষণ বেশী।" কিন্তু গৌরীশংকরের অন্তরে কাব্য-প্রীতি ও সৌন্দর্যানুভূতির অভাব ছিল না। আলোচ্য উপন্যাসে তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে কখনও কালিদাসের শ্লোক, কখনও বা রবীন্দ্র-কবিতার চরণ। মনটিও ছিল সৌন্দর্যরসিক। ঝিন্দের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে তার উচ্ছ্বসিত মন্তব্য লক্ষণীয়—

"এ কোন অমরাবতীতে আমাকে নিয়ে এলে সর্দার! মনে হচ্ছে যেন সেই সেকালের প্রাচীন সুন্দর ভারতবর্ষে আবার ফিরে এসেছি।" [ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—দুই ভাই]

এছাড়া শিবশংকর ও তাঁর পত্নী অচলাদেবীর কথোপকথনের মাধ্যমে গৌরীশংকরের

দেশভ্রমণের শখ ও এ্যাডভেঞ্চারের নেশার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাই ঝিন্দের ফৌজী সর্দার ধনঞ্জয়ের প্রস্তাবে রাজী হয়ে শংকর সিং-এর ছদ্ম পরিচয়ে ঝিন্দ-যাত্রার সিদ্ধান্ত গ্রহণ তার পক্ষে অস্বাভাবিক বা অসংগত বলে মনে হয় না। উপন্যাসের প্রথম থেকে তৃতীয় পরিচ্ছেদ পর্যন্ত নানা ঘটনা পরম্পরায় যেমন কলকাতার একটি বিদগ্ধ, বনেদী পরিবারের পরিবেশ জীবন্ত হয়ে উঠেছে, তেমনি উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে দেহে মনে বলিষ্ঠ বাঙালী যুবক গৌরীশংকরের শারীরিক ও মানসিক শৌর্যের পরিচয় সার্থকভাবে উন্মোচিত হয়েছে। তার আচরণে প্রবল পৌরুষ ও অটল ব্যক্তিত্বের পরিচয়ও গোপন থাকেনি। তাই ধনঞ্জয় সর্দার উপলব্ধি করেছে—

> "এই বাঙালী যুবকটিকে তাঁহারা রাজা সাজাইয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার যে একটা অত্যন্ত জোরালো স্বাধীন ইচ্ছা আছে, সকল সময় ইহাকে লইয়া পুতুল খেলা চলিবে না……!" [নবম পরিচ্ছেদ 'যন্ত্রণা']

ঝিন্দের কনিষ্ঠ রাজকুমার উদিত সিংহও তার বন্ধু ময়ূরবাহনের অত্যাচার ও অপশাসন থেকে প্রজাদের রক্ষা করার জন্য এবং সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী নিখোঁজ শংকর সিং-এর অধিকার বজায় রাখার স্বার্থে গৌরীর নকল রাজা সাজতে আপত্তি হয়নি এবং রাজ-অভিষেকের দিন শংকর সিং-এর বাগ্‌দত্তা বধূ তরুণী 'কস্তুরীবাঈ'-এর সঙ্গে তিলক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে তার মনে ঝাড়োয়ার ঐ রানীটির সম্পর্কে কৌতূহল জেগেছে ; কিন্তু উপন্যাসের অষ্টম পরিচ্ছেদে ঘটনাচক্রে কস্তুরীর সঙ্গে তার আকস্মিক সাক্ষাৎ ঘটলে ঝড়োয়া কুমারীর রূপের আলোক ছটা সৌন্দর্য প্রেমিক গৌরীর হৃদয়ে প্রবল আলোড়ন তুলেছে। সেই সঙ্গে সূত্রপাত হয়েছে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের। এরপর থেকে একদিকে দুই প্রতিপক্ষ দলের সক্রিয়তায় কাহিনীর বহির্দ্বন্দ্ব যেমন ঘনীভূত হয়েছে, তেমনই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে কস্তুরীকে কেন্দ্র করে গৌরীশংকরের চিত্তে বিবেক ও বাসনার দ্বৈরথ। শেষ পর্যন্ত নিয়তির বিচিত্র খেয়ালে গৌরীশংকরের জীবনে যে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল তার শুভ সমাধান ঘটেছে। শক্তিগড়ের দুর্গে অবরুদ্ধ প্রকৃত শংকর সিং-এর মৃত্যু ঘটলে প্রজাবর্গের কাছে ঝিন্দের রাজা রূপে গৌরীশংকরের মিথ্যা অভিনয়ই চিরদিনের জন্য সত্যে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তার জীবনে ঝিন্দের সিংহাসনের থেকেও বড় প্রাপ্তি বোধ হয় "রমণী গণমুকুটমণি" কস্তুরীবাঈয়ের হৃদয় সাম্রাজ্যের অতুলনীয় প্রেম-ঐশ্বর্য।

এ কাহিনীর 'কস্তুরীবাঈ'-এর রূপচিত্রণে ঔপন্যাসিক অজন্তা গুহাগাত্রে অংকিত হস্তে লীলাকমল ধৃতা সুবিখ্যাত নারী মূর্তিটিকেই অনুসরণ করেছেন—

> "গৌরী নিস্পন্দবক্ষে সেই অপরূপ মূর্তির দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার মনে হইল সে যেন আজ তার একটি জীবন্ত চিত্র দেখিতেছে। তেমনি অপূর্ব ভঙ্গিতে কাপড়-খানি পরা, চোলিটি তেমনি মধুর শাসনে ঊর্ধ্বাঙ্গের চপল লাবণ্য সংযত করিয়া রাখিয়াছে, উত্তরীয়খানি তেমনি স্বচ্ছভাবে দেহটিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, চোলি ও নীবির মধ্যবর্তী স্থানটুকু তেমনি নির্লজ্জভাবে অনাবৃত ; মাথায় তেমনি বিচিত্র সুন্দর কবরীবন্ধ, হস্তে তেমনি অপরিস্ফুট লীলাকমল।"
>
> [অষ্টম পরিচ্ছেদ--'রমণীগণ মুকুটমণি']

অপরদিকে পূর্বরাগ পর্যায়ে গৌরীশংকরের প্রতি কস্তুরীর আচরণ মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের স্মৃতি জাগায়। নায়কের প্রতি তেমনি অপ্রতিরোধ্য অনুরাগ, অথচ আত্মপ্রকাশের মুহূর্তে তেমনই লজ্জা-বিজড়িত কুণ্ঠা। শকুন্তলা নাটকের ক্ষেত্রে দুষ্মন্তের সঙ্গে প্রণয় সম্ভাষণের কালে সখীদ্বয়ের ভূমিকাই সুস্পষ্ট, শকুন্তলা সর্বাপেক্ষা নীরব। ঝড়োয়া রানী এবং ঝিন্দের ভাবী রাজবধূ কস্তুরীবাঈ-এর সখী দুটি নয়, অসংখ্য; কিন্তু তার প্রিয় সখী মাত্র একজনই—সে কৃষ্ণা। কস্তুরী ও গৌরীশংকরের প্রণয় বিস্তারের প্রথম পর্বে তাকেই সর্বাপেক্ষা সহযোগিতা করতে দেখা গেছে এবং ঝিন্দ-রাজের সঙ্গে নিভৃত আলাপচারিতার কালে কস্তুরীর উদ্দেশ্যে বলতেও শোনা গেছে—

"নাও জবাব দাও। আমি বারবার তোমার হয়ে কথা কইতে পারি না।"

(অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ রমণীগণ মুকুটমণি)।

কিন্তু প্রেমের অপার মহিমাই জীবনের সংকটময় মুহূর্তগুলিতে কস্তুরীকে লজ্জায় নীরব থাকতে দেয়নি। উপন্যাসের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে অন্তর্দ্বন্দ্বে ও কৌতূহলে জর্জরিত গৌরীশংকরের ব্যাকুল জিজ্ঞাসার উত্তরে—

"ক্ষণকাল কস্তুরী নীরব রহিল, তারপর গৌরীর চোখে চোখ রাখিয়া বলিল—'আপনি যদি একজন সামান্য সিপাহী হতেন, আপনার পরিচয় ঝিন্দ—ঝড়োয়ার কেউ না জানত, আপনি যদি অখ্যাত বিদেশী হতেন—তবু আপনি আমার—'

'তোমার ?'

'আমার মালিক'।'

এ যে শুধু তার কথার কথা মাত্র নয়, অন্তরের অন্তরতম উপলব্ধি তার প্রমাণ পাওয়া যায় উপন্যাসের 'কালরাত্রি' শীর্ষক একবিংশ পরিচ্ছেদে গৌরীশংকর যখন তার কাছে অকপটে আত্মপরিচয় ব্যক্ত করেছে, এবং তাকে বিদায় দিয়ে ঝিন্দের প্রকৃত রাজা শংকর সিংকেই স্বামী রূপে বরণ করে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে, তখন প্রকৃত প্রেমের উদ্দীপনায় কস্তুরীবাঈ নিঃসংকোচে, নিষ্কম্প দৃঢ়তায় জানিয়েছে—"রাজা, তোমাকে যদি না পাই, আমার কিস্তা আছে।"

অনুরাগের এই তীব্র দীপ্তিতে এবং রূপের উজ্জ্বল জ্যোতিতে কস্তুরী নিঃসন্দেহেই মনোলোভা।

'ঝিন্দের বন্দী' উপন্যাসে যদিও রাজভ্রাতা উদিত সিংহের দুষ্টবুদ্ধি, সিংহাসন লোলুপতা, স্বার্থান্ধতা কম নয়, তবু নির্মমতা, ক্রূরতা ও অসাধারণ কূটবুদ্ধির কথা বিচার করলে আলোচ্য কাহিনীর প্রকৃত খল নায়ক উদিতের সহচর ময়ূরবাহন। উগ্র সুন্দর তার রূপ। বিশেষতঃ তার কিংশুকতুল্য রক্তিম অধরোষ্ঠে এবং তীব্র তীক্ষ্ণ শ্লেষপূর্ণ হাসিতে যেন অন্তরের নিষ্ঠুর জিঘাংসাই প্রতিবিম্বিত হয়। অবশ্য ভাগ্য-বিধাতার বিচিত্র নিয়মেই শেষ পর্যন্ত সে অজ্ঞাতসারে তার প্রবল প্রতিহিংসা ও ঘৃণার পাত্র বাঙালী গৌরীশংকরের সৌভাগ্যের রুদ্ধ দুয়ারে উন্মুক্ত করে দিয়ে গেছে। খল চরিত্র হিসাবে ময়ূরবাহন অত্যন্ত সজীব ও সার্থক সৃষ্টি।

এই কাহিনীতে শংকর সিং-এর নাম এবং তার স্বভাবের কথা একাধিকবার উচ্চারিত হলেও তিনি মূলতঃ কাহিনীর নেপথ্যেই থেকে গেছেন।

অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে ফৌজী সর্দার ধনঞ্জয়ের চারিত্রিক দৃঢ়তা, অপরিসীম মনোবল ও ঝিন্দ-রাজবংশের প্রতি প্রকৃত আনুগত্যের পরিচয় স্পষ্টরূপেই প্রকাশিত। কস্তুরী-বাঈ-এর সঙ্গে নকল রাজা গৌরীশংকরের সাক্ষাৎ বা যোগাযোগকে সে প্রথমে অন্তর থেকে সমর্থন করতে পারেনি কারণ তার সমস্ত সহানুভূতি শংকর সিং-এর প্রতিই কেন্দ্রীভূত ছিল। কিন্তু উপন্যাসের ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে কৃষ্ণার বিবাহ উপলক্ষে ঝড়োয়া রাজ্যে গমন তথা কস্তুরীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগকে গৌরীশংকর দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলে ধনঞ্জয় সর্দারের মানসিক পরিবর্তন ও অকপট স্বীকারোক্তি উল্লেখযোগ্য—

"...আজ আপনাকে আর কস্তুরী বাঈকে একত্রে কল্পনা করে মনে কোনোরকম অশান্তি বোধ করছি না, বরঞ্চ আপনি না হয়ে যদি শংকর সিং—সহসা দুই হস্ত আবেগভরে উৎক্ষিপ্ত করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—'ভগবানের কি অবিচার! কেন আপনি শংকর সিং হয়ে জন্মালেন না?"

—এই মুহূর্তেই ধনঞ্জয় সর্দারের চরিত্র নিছক কর্তব্যের শুষ্ক আবরণ ভেদ করে মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

অপর উল্লেখযোগ্য চরিত্র রুদ্ররূপের আচরণে শুধু প্রভুভক্তি এবং প্রীতি নয়, গৌরী-শংকরের প্রতি তার অকৃত্রিম শুভাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। দুঃসাহসিক কার্যে স্বেচ্ছায় গৌরীশংকরের সঙ্গে সঙ্গী হয়ে রুদ্ররূপ দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দেয়। চম্পার প্রতি তার অনুচ্চারিত প্রেমটুকু উপভোগ্য। দেওয়ান বজ্রপাণির বিচক্ষণতা সুচিত্রিত। গৌরীশংকর বঙ্গ সন্তান জেনে ঝিন্দের প্রবাসী বাঙালী প্রহ্লাদচন্দ্র দত্তের মানসিক পরিবর্তন ও মনুষ্যত্বে উত্তরণের চিত্রটি স্বজাতির প্রতি লেখকের অপরিসীম স্নেহ-দৌর্বল্যের স্বাক্ষর বহন করে। স্বরূপ দাসের ভীরু ও বিশ্বাসঘাতক চরিত্রটি যথাযথ।

ঝিন্দের বন্দীর চম্পা সত্যই সূর্যের সৌরভ। তার চরিত্র একদিকে উজ্জ্বল তেজস্বিতায় অন্যদিকে স্নিগ্ধ মাধুর্যে পরিপূর্ণ।

কৃষ্ণার সপ্রতিভতা ও সখীপ্রেম প্রশংসনীয়। ধনীর দুলালী ও ঝড়োয়ার রানীর প্রধানা সহচরী হয়েও সাধারণ সৈনিক বিজয়লালের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসায় তার নিরভিমান হৃদয়টি সার্থকভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে 'ঝিন্দের বন্দী' পাঠকালে সর্বক্ষেত্রে কার্যকারণসূত্র অন্বেষণ করতে গেলে আমাদের ব্যর্থ হতে হয়। যেমন শংকর সিং ও গৌরীশংকর রায় উভয়েই কালীশংকর রায়ের বংশধর এ যুক্তি মেনে নিলেও শংকর ও গৌরীশংকরের আকৃতিতে যমজ ভ্রাতাসুলভ অবিকল সাদৃশ্য এমনকি কণ্ঠস্বরের পর্যন্ত অভিন্নতা নিঃসন্দেহেই কষ্ট-কল্পনার বিষয়। উপসংহার পর্বে দেখা যায় উভয়ের পরিধেয় এক, এমনকি বক্ষে বাহুবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়ানোর ভঙ্গিও অনুরূপ যার ফলে ময়ূরবাহনের মতো ধূর্ত ব্যক্তির পক্ষেও প্রকৃত শংকর সিংকে চিনে নেওয়া সম্ভব হয় না—এ ঘটনাও আশ্চর্য বলেই মনে হয়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বোধ করি গৌরীশংকরের ছোরার অব্যর্থ আঘাতে নিদারুণ

আহত হয়ে কিস্তার জলে পড়ে যাওয়ার পরেও গৌরীশংকরের নিক্ষিপ্ত সেই ছোরা হস্তে ময়ূরবাহনের পুনরাবির্ভাব এবং অবিচল শক্তিতে শংকর সিংকে ছুরিকাবিদ্ধ করা।

তীব্র যুক্তির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করলে 'ঝিন্দের বন্দী'র কাহিনী বিন্যাসে উপরোক্ত অসংগতিগুলি চোখে পড়লেও আলোচ্য উপন্যাসে প্রভুভক্তি, প্রতিহিংসা, প্রেম প্রভৃতি বিচিত্র প্রবৃত্তির আবেগদীপ্ত প্রকাশ, এবং ভাষার অপূর্ব কুহকমন্ত্র পাঠককে সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত প্রায় সম্মোহিত করে রাখে। কাহিনীর দুরন্ত গতিতে আবিষ্ট পাঠকের হৃদয় থেকে সম্ভব অসম্ভবের সীমারেখা মুছে যায়। মানুষের চিরন্তন রোমান্সরস পিপাসাকে আকণ্ঠ পরিতৃপ্ত করার সমস্ত উপকরণ এই উপন্যাসে স্তরে স্তরে সঞ্চিত আছে বলেই পাঠক-সমাজে আজও এর জনপ্রিয়তা অম্লান, অপ্রতিহত।

রাজদ্রোহী [১৩৬৮] জনচিত্তজয়ের অজস্র সম্ভারে পরিপূর্ণ আর একটি সুপরিচিত উপন্যাস রাজদ্রোহী। এই কাহিনীর রঙ্গভূমি ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্তে আরবসাগরের উপকূলে অবস্থিত ও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত কাথিয়াবাড় প্রদেশ এবং কালসীমা প্রাক্-স্বাধীনতার যুগ।

আলোচ্য উপন্যাসের নায়ক চরিত্র সৃষ্টির প্রেরণাটুকু উপলব্ধি করা যায় লেখকের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যের মাধ্যমে—

> "পঞ্চাশ ষাট বছর আগেও এই দেশে একজাতীয় বীরদস্যুর আবির্ভাব হইতে যাহাদের রবিনহুডের সঙ্গে তুলনা করা করা যায়। দেশের লোক তাহাদের বলিত বার্‌বটিয়া।" [রাজদ্রোহী—প্রথম পরিচ্ছেদ]

প্রকৃতপক্ষে রাজদ্রোহী রাজপুত প্রতাপ সিংকে রবিনহুডের আদর্শেই পরোপকারী, অত্যাচারিতের সহৃদয় বন্ধু ও অত্যাচারীর প্রবল শত্রু রূপে অঙ্কিত করা হয়েছে। অবশ্য সভ্য, সম্ভ্রান্ত প্রতাপ কি কারণে দস্যু বা বার্‌বটিয়াতে রূপান্তরিত হল উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই তার বিশ্বাসযোগ্য পটভূমি রচনা করতে লেখক বিস্মৃত হননি।

শরদিন্দুর অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক গল্প উপন্যাসে শক্তিমান অত্যাচারীরা হয় রাজকুলেজাত নয়তো অভিজাত শ্রেণীভুক্ত। এমনকি 'চুয়াচন্দন'-এর অত্যাচারী দুর্বৃত্ত মাধব পর্যন্ত জমিদারের ভ্রাতুষ্পুত্র। আলোচ্য কাহিনীতে কিন্তু এই বিষয়ে কিছুটা ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। এখানে নায়কের প্রতিপক্ষ রাজা বা ভূস্বামী নয়, কুসীদজীবী মহাজনের দল। মুষ্টিমেয় সঙ্গী সহ প্রতাপ সিংয়ের প্রবল পৌরুষের প্রভাবে ধূলিসাৎ হয়েছে শেঠ গোকুলদাস থেকে শুরু করে একাধিক অর্থপিশাচের, স্বার্থান্ধ নির্লজ্জ কর্ম প্রচেষ্টা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে আলোচ্য উপন্যাসে সুদখোর মহাজন সম্প্রদায়ের অসাধু কার্যকলাপ, দারিদ্র্য ও অসহায়তার সুযোগ নিয়ে অসংখ্য মানুষের সম্পত্তি গ্রাসের বাস্তব চিত্রাঙ্কনে ঔপন্যাসিকের সাফল্য সন্দেহাতীত।

প্রতাপ সিং তার দয়ার্দ্র, পরোপচিকীর্ষু বলিষ্ঠ চরিত্রের জন্য কাথিয়াবাড়ের অগণিত নিপীড়িত জনসাধারণের অকুণ্ঠ প্রীতি অর্জন করেছে, যার অপ্রতিরোধ্য প্রভাবে আইনের দৃঢ়, নির্মম রজ্জুও তার ক্ষেত্রে শিথিল হয়ে পড়ে, সরকারী ফৌজের আদর্শবান অধিনায়ক তেজ সিং প্রতাপ বার্‌বটিয়াকে বন্দী করতে এসে তার আপাত রাজদ্রোহিতার অন্তরালে

প্রচ্ছন্ন মনুষ্যত্বের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে যান। কিন্তু পাঠক সমাজে আরও একটি গুণের জন্য তার সমাদার বৃদ্ধি পেয়েছে—সে শুধু বারবাটিয়া নয়, শুধু বিত্ত লুণ্ঠনেই সে পটু নয়, চিত্তহরণেও সে পারদর্শী। অর্থাৎ প্রতাপ শুধু রবিনহুডের মত দস্যু নয়, সে প্রেমিকও বটে। জলসত্রের পানিহারিন্ বা প্রপাপালিকা চিন্তার সঙ্গে তার প্রণয় সম্পর্ক নূতন নয় প্রকৃতপক্ষে চিন্তাকে নিয়ে যেদিন সে ঘর বাঁধবার মধুর লগ্ন স্থির করেছে, সেদিনই তার ভাগ্যচক্রের গতিপথ পরিবর্তনের সূচনা। শেঠ গোকুলদাসের ঘৃণ্য চক্রান্তের ফলে সে শুধু সর্বস্বান্ত ও মাতৃহারাই হয়নি, সম্ভ্রান্ত, ভদ্র প্রতাপ পরিণত হয়েছে বারবটিয়ায়। জীবনপথের এই আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে চিন্তাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন চরিতার্থ হয়না, তাই প্রতাপকে মাঝে মাঝে হতাশায় জর্জ্জরিত হতে দেখা যায়, চিন্তার সঙ্গে নিভৃতে মিলনের ক্ষণে বেদনাবিদ্ধ কণ্ঠে তাকে বলতে শোনা যায়—

"‥ হয়তো জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এ পথেই চলতে হবে। নিজের জন্য ভাবি না, কিন্তু তোমার কথা ভেবে বড় দুঃখ হয় চিন্তা! তোমার জীবনটা আমি নষ্ট করে দিলাম। আমি যদি তোমার জীবনে না আসতাম, তুমি হয়তো কোন গৃহস্থকে বিয়ে করে স্বামী-সংসার নিয়ে সুখী হতে—" [রাজদ্রোহী, সপ্তম পরিচ্ছেদ]

কিন্তু এই প্রেমকেন্দ্রিক নৈরাশ্য ছাড়া আর কোনও জটিলতা প্রতাপকে দুঃস্বপ্নের মত তাড়া করে না। কাহিনীর উপসংহারে তার সুকৃতির পুরস্কার সে পায়—নিশ্চিত মৃত্যুর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে বাঞ্ছিত রমণীটির সঙ্গে তার মিলন ঘটে।

নায়িকা চিন্তার চরিত্রে একনিষ্ঠ প্রেমের পরিচয়ই সুপরিস্ফুট হয়। যে প্রেম শুধু প্রেমাস্পদের সঙ্গিনী হতেই অনুপ্রাণিত করেনা প্রয়োজন হলে তারই সঙ্গে মরণকে বরণ করে নেওয়ার অসীম মনোবল দান করে, চিন্তার মধ্যে প্রেমের সেই দুর্লভ অথচ আদর্শ রূপটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ভীমসিংহ, তিলোত্তমা, প্রভু, পুরন্দর, নানাভাই প্রমুখ পার্শ্বচরিত্রগুলি কখনও বীর, কখনও শৃঙ্গার কখনও হাস্যরস পরিবেশনে সহায়তা করেছে।

উপন্যাসের রূপ লাভ করার আগে আলোচ্য কাহিনীটি চিত্রনাট্যের আকারে রচিত হয়েছিল তখন এর নাম ছিল 'যুগে যুগে'। তাই 'রাজদ্রোহী' উপন্যাস রূপে চিহ্নিত হলেও এ কাহিনীর সর্বাঙ্গে নাট্যলক্ষণই সুপরিস্ফুট। উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা ঘটনার প্রত্যক্ষ উপস্থাপনার কৌশলটুকু এক্ষেত্রে পাঠকের অগোচর থাকে না।

॥ ৩ ॥

॥ ইতিহাস আশ্রিত গল্পসমূহের আলোচনা ॥

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত অতীতাশ্রয়ী উপন্যাসগুলির মতো এই শ্রেণীর গল্প-গুলিতেও লেখকের প্রবল ইতিহাস প্রীতি ও প্রগাঢ় কল্পনাশক্তির অপূর্ব সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। একথা সত্য যে অধিকাংশ ঐতিহাসিক গল্পে মানবজীবনের যে চিত্র প্রতিফলিত ও মানব হৃদয়ের যে রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা দেশ-কাল নিরপেক্ষ শাশ্বত সত্য কিন্তু অতীতের বর্ণে, গন্ধে সেই চিরপরিচিত কথাই যে নতুন স্বাদ ও ঐশ্বর্য লাভ

করেছে তার মোহময় আকর্ষণ দীর্ঘকাল ধরে সাহিত্য-প্রেমিকদের শরদিন্দুর সৃষ্টির প্রতি আকৃষ্ট করে রেখেছে।

শরদিন্দু বাবুর লেখা ঐতিহাসিক গল্পের সংখ্যা সতের—যথা—অমিতাভ, মৃৎপ্রদীপ, রুমাহরণ, বিষকন্যা, রক্তসন্ধ্যা, সেতু, চুয়াচন্দন, বাঘের বাচ্চা, অষ্টম সর্গ, চন্দনমূর্তি, মরু ও সঙ্ঘ, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, তক্ত মোবারক, ইন্দ্রতূলক, শঙ্খকঙ্কণ, রেবারোধসি ও আদিম।

এগুলির মধ্যে আবার কয়েকটি গল্পে এক বিশেষ কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। লেখক জাতিস্মরের জন্মজন্মান্তরের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে উপস্থাপিত করেছেন। এ বিষয়ে তিনি দুজন পাশ্চাত্য লেখকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তাঁদের একজন মার্কিন গল্প লেখক 'জ্যাকলণ্ডন' ও অপরজন ইংরেজ কথা সাহিত্যিক 'আর্থার কোনান ডয়েল'। লেখক নিজে এঁদের প্রতি তাঁর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু কেবলমাত্র বিদেশী প্রেরণার ফলেই শরদিন্দুর রচনায় এমন স্বতঃস্ফূর্ত রস সৃষ্টি সম্ভব নয়, আসলে—

"জাতিস্মর বিষয়টির প্রতি তাঁর কেমন একটা সহজাত আকর্ষণ ছিল। উল্লেখ করা যায় ভারতকোষ গ্রন্থে জাতিস্মর বিষয়ে ক্ষুদ্র নিবন্ধটি শরদিন্দু বাবুরই লেখা।"

[শোভন বসু : শরদিন্দু অমনিবাস, ষষ্ঠ খণ্ডে 'গল্প পরিচয়' অংশ দ্রষ্টব্য]

'সেতু' গল্পে লেখক জাতিস্মরতার বিষয়ে একটি যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন—

"বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে ফুল, ফল আবার বীজ—ইহাই জীব জগতের পূর্ণ চক্র। কিন্তু এই চক্র পরিপূর্ণভাবে আমাদের দৃশ্যমান নয়, মাঝখানে চক্রাংশ খানিকটা অব্যক্ত। মৃত্যুর পর আবার জন্ম—মাঝ দিয়া বিস্মরণের বৈতরণী বহিয়া গিয়াছে।"

লেখক যেন বলতে চেয়েছেন এই বিস্মরণের বৈতরণী যাঁদের মনোভূমি প্লাবিত ও আচ্ছন্ন করে না, তাঁরাই জাতিস্মর।

শরদিন্দুবাবুর লেখা জাতিস্মরের কাহিনীগুলির ক্ষেত্রে আবার স্পষ্ট দুটি শ্রেণী বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। একশ্রেণীর কাহিনীগুলি একটি বক্তা বা জাতিস্মর নায়কের জন্ম-জন্মান্তরের অভিজ্ঞতার বিবরণ—যেমন অমিতাভ, মৃৎপ্রদীপ, রুমাহরণ, বিষকন্যা। অন্য শ্রেণীর গল্পগুলিতে পৃথক পৃথক ব্যক্তির পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত স্থান পেয়েছে। যথা—রক্ত-সন্ধ্যা ও সেতু।

অমিতাভ [১৩৩৬-৩৭] : 'অমিতাভ' গল্পের নায়ক বর্তমান জীবনে রেল-অফিসের ছিয়াত্তর টাকা মাইনের কেরাণী। তার উচ্চ পদমর্যাদা বা অতুল ঐশ্বর্য নেই কিন্তু আছে এক অসাধারণ, অলৌকিক মানসিক শক্তি—সে জাতিস্মর।

রেল অফিসের 'পাস' পেয়ে রাজগীরের ভগ্নাবশেষ দেখতে গিয়ে প্রথমে সে নিজের মধ্যে এই জন্মজন্মান্তরের স্মৃতি জাগরণের আনন্দ বেদনাকে উপলব্ধি করে। তার চোখের সামনে থেকে কালের যবনিকা উত্তোলিত হয়, মনে হয়—

"……আমি বারবার—বোধ হয় বহু শতবার এই ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কখন দাস হইয়া জন্মিয়াছি, কখনও সম্রাট হইয়া সসাগরা পৃথ্বী শাসন করিয়াছি, শত

মহিষী সহস্র বন্দিনী আমার সেবা করিয়াছে।”

কোন এক অমোঘ শক্তির প্রভাবে তার মানসপটে সুদূর অতীতের কত বিচিত্র আলেখ্য একে একে ছায়াছবির মতো ফুটে উঠতে থাকে। কোনো জন্মে সে শূরসেন রাজের দুই কন্যাকে তার দুই বলিষ্ঠ বাহুতে ধারণপূর্বক দুর্গ প্রাচীর থেকে পরিখার জলে লাফিয়ে পড়ে সন্তরণে যমুনা পার হয়েছিল, আবার কোনও এককালে সে ছিল সম্রাট কনিষ্কের প্রধান শিল্পী, রাজভাস্কর 'পুণ্ডরীক'।

কিন্তু এই কাহিনী পুণ্ডরীকের জীবনালেখ্য নয়, জাতিস্মর বক্তার আর এক জন্মের গল্প—যখন সে ছিল 'মগধেশ্বর অজাতশত্রুর' রাজত্বকালে স্থপতি-সূত্রধার সম্প্রদায়ের শ্রেণিনায়ক কুমার দত্ত। কুমার দত্তের জীবনের এক মহাসন্ধিক্ষণকে কেন্দ্র করে আলোচ্য গল্পের বিস্তার।

এই কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে আজ থেকে প্রায় সার্ধদ্বিসহস্র বৎসর পূর্বের ঘটনাবলী। তখন মগধের রাজা অজাতশত্রু। বিষ্ণুর উপাসক এই নরপতি তাঁর পিতা বিম্বিসারের মতো বুদ্ধভক্ত নন, তিনি বুদ্ধ বিদ্বেষী। পিতার তুল্য শান্তিপ্রিয় নন, তিনি যুদ্ধপ্রিয়। তাছাড়া অজাতশত্রুর শত্রু-অভাব ছিল না, বিশেষতঃ উত্তরে লিচ্ছবি ও পশ্চিমে কোশল রাজবংশ কর্তৃক বারংবার মগধ আক্রমণ মগধেশ্বরকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। এদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যই মহারাজ অজাতশত্রু রাজ্যের মহামাত্যের সঙ্গে পরামর্শক্রমে ভাগীরথী ও হিরণ্যবাহুর সংগমস্থলে পঞ্চাশ হাজার যোদ্ধার নিত্য বাসোপযোগী এক ঔদক দুর্গ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, আর সেই মহা-পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপদানের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল কুমার দত্তের ওপর।

সেই দুর্গ নির্মাণকার্য আরম্ভ হওয়ার পূর্বে এক তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ, সমস্যা-কণ্টকিত মুহূর্তে অকস্মাৎ সৈন্য শিবিরে আশ্রয়প্রার্থীরূপে আবির্ভূত হন কয়েকজন মুণ্ডিত মস্তক বৌদ্ধ ভিক্ষু—বৌদ্ধ-বিদ্বেষী, সৈনিকদের অহংকারাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে যারা ভিখারী ছাড়া আর কছুই নয়, তাদের আগমন সংবাদে কর্মিক-জ্যেষ্ঠ দিঙ্‌নাগ মহা উল্লাসে চিৎকার করে উঠেছে—

“জয় রুদ্রেশ্বর, জয় ভৈরব।······নায়ক, দেবতা স্বয়ং বলি পাঠাইয়াছেন।”

নায়ক কুমার দত্তও ভেবেছিলেন,

“ভিখারী অপেক্ষা উত্তম বলি আর কোথায় পাওয়া যাইবে? দিঙ্‌নাগ ঠিকই বলিয়াছে, দেবতা স্বয়ং বলি পাঠাইয়াছেন।”

কিন্তু সেই চার পাঁচটি ভিক্ষুকে যখন অধিনায়কের সম্মুখে আনা হল, তখন তাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করে, বিশেষতঃ দলের বৃদ্ধ ভিক্ষুটির সৌম্য, স্নিগ্ধ, করুণাঘন মুখচ্ছবি দর্শন করে এক পলকেই নায়ক কুমার দত্তের কঠিন হৃদয়ে নিঃশব্দে এক মহা বিপ্লব ঘটে গেল। সঙ্গী ভিক্ষুর কাছে বৃদ্ধের পরিচয় জেনে তিনি অনুভব করলেন—

“মানুষ তো অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু আজ এই প্রথম মানুষ দেখিলাম।”

গৌতম বুদ্ধের করুণাস্নিগ্ধ রূপজ্যোতিতে সম্মোহিত কুমার দত্ত তাঁর পদপ্রান্তে পতিত হয়ে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আলোক প্রার্থনা করলেন, বিনিময়ে লাভ

করলেন সেই দিব্য পুরুষের অমৃততুল্য আশীর্বচন ও ত্রিশরণ। এই অবিশ্বাস্য পরিবর্তন শুধু কুমার দত্তের অন্তরেই ঘটেনি, হিংসার পূজারী, নরবলিদানে উৎসুক, দুর্ধর্ষ, নিষ্করুণ, অসুর প্রকৃতি দিঙ্‌নাগেরও কী বিপুল পরিবর্তন! তার হৃদয়ে সহসা জাগ্রত এক বিচিত্র আবেগ বন্যা দুই চক্ষের বারিধারারূপে ঝরে পড়েছে, অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাসে তার কণ্ঠস্বর বিকৃত।

সেই পরম মুহূর্তে কুমার দত্ত অনুভব করেছেন—

"এ যেন কয়েক পলের মধ্যে এক মহা ভূমিকম্পে আমাদের অতীত জীবন ধূলিসাৎ হইয়া গেল। কীট ছিলাম, এক মুহূর্তে মানুষ হইয়া গেলাম।"

আলোচ্য গল্পে অজাতশত্রু ও গৌতম বুদ্ধ—উভয়েই ঐতিহাসিক চরিত্র। শাক্যসিংহের জ্যোতির্ময় রূপ ও ক্ষমাসুন্দর চরিত্র ইতিহাসানুগ। অজাতশত্রুর বৌদ্ধবিদ্বেষও ইতিহাস প্রসিদ্ধ। তাঁর রাজত্বকালে উত্তরে ও পশ্চিমে দুই প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে মগধের বৈরী ভাব ও প্রজাপুঞ্জের অসন্তোষ, অস্থিরতার চিত্রও যথাযথ।

কিন্তু কাহিনীর পরিকল্পনা ও ঘটনাবিন্যাস সম্পূর্ণরূপেই লেখকের মৌলিক চিন্তা-প্রসূত। সে যুগে কত শত নরনারী তথাগতের ত্রিশরণ আশ্রয় করে হিংসা, দ্বেষ, জড়-প্রবৃত্তি ও অন্ধ সংস্কারের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃত মনুষ্যত্বে উত্তরণের দুর্লভ সুযোগ লাভ করেছিল—এই গল্পে কুমার দত্ত তাদেরই প্রতিভূ।

অমিতাভের অমিত করুণার প্রভায় সমুদ্ভাসিত গল্পটির নামকরণ অবশ্যই সুসার্থক।

মৃৎপ্রদীপ [১৩৩৮] 'মৃৎপ্রদীপ শরদিন্দুর লেখা একটি উৎকৃষ্ট অতীতাশ্রয়ী গল্প। 'মৃৎপ্রদীপ' রচনার কৌতূহলোদ্দীপক ইতিবৃত্তটুকু জানা যায় স্বয়ং লেখকেরই এই বিবৃতির থেকে—

"কুমরাহারে প্রাচীন পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর সময় জঞ্জাল স্তূপের মাঝে একটি মাটির প্রদীপ কুড়িয়ে পেয়েছিলাম; মুখের কাছে একটু যেন পোড়া দাগ লেগে রয়েছে। খননকারীরা হয়তো এটি ফেলে গেছেন, কিম্বা তাঁদের নজরে আসেনি। সেটি কুড়িয়ে এনে বাড়িতে টেবিলের ওপর রেখে দিলাম এবং রাত্রে সেটি জ্বাললাম। কয়েকদিন ওই জ্বলন্ত প্রদীপটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে 'মৃৎপ্রদীপ' গল্পটি মাথায় আসে।" (জীবনকথা : শরদিন্দু অম্নিবাস, দ্বিতীয় খণ্ড)।

লক্ষণীয় যে লেখকের এই অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিই ব্যক্ত হয়েছে 'মৃৎপ্রদীপ' গল্পের সূচনাংশে কাহিনীর বক্তা অর্থাৎ জাতিস্মর নায়কের উক্তিতে, বহুকাল পূর্বে যে ছিল গুপ্ত-রাজ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের তৃতীয় বয়স্য চক্রায়ুধ ঈশানবর্মা।

আলোচ্য কাহিনীটির কালগত পটভূমি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী। গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে পুষ্করণ নামক মরুরাজ্যের অধিপতি রণপণ্ডিত চন্দ্রবর্মা কর্তৃক মগধ আক্রমণ ও তার পরিণামকে কেন্দ্র করে এ গল্পের ঘটনা বিস্তার। চন্দ্রগুপ্ত, কুমারদেবী, সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রবর্মা প্রভৃতি নামগুলি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ, কিন্তু 'মৃৎপ্রদীপ'-প্রকৃত-পক্ষে যার বিষাদ-বিধুর জীবনালেখ্য তার নাম কোনও ইতিহাসে পাওয়া যায় না, কোনও

বিশেষ স্থান বা কালের গণ্ডিতে তাকে আবদ্ধ করা যায়না, সে আত্মত্যাগের সুমহান দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল এক চিরন্তনী নারী, তার নাম সোমদত্তা।

এক বিচিত্র পরিবেশে সোমদত্তার সঙ্গে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের প্রথম যোগাযোগ। শরৎ-কালের এক নির্মল দিবসে অন্তরঙ্গ বয়স্য পরিবৃত মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত নগরের উপকণ্ঠে বনমধ্যে মৃগয়া করতে গিয়ে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর কূলে 'ছিন্নমৃণাল কুমুদিনীর' তুল্য এক নারীরত্নকে আবিষ্কার করলেন। সংজ্ঞাহীনা সেই তরুণীর নগ্ন দেহের "নবোদ্ভিন্ন যৌবনের পরিপূর্ণ বিকশিত রূপ" সেখানে উপস্থিত প্রতিটি পুরুষেরই চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাল। কিন্তু "এ নারী কাহার"? চন্দ্রগুপ্তের এই জিজ্ঞাসার উত্তরে একমাত্র মহারাজের তৃতীয় বয়স্য ছাড়া আর সকলেই অন্তরের দুর্দম লালসা গোপন করে জানাল ঐ নারী মহারাজেরই প্রাপ্য। তৃতীয় বয়স্য চক্রায়ুধ ঈশানবর্মার আচরণে নারীটির প্রতি লুব্ধ কামনার প্রকাশ পেলে তাকে তীব্র ব্যঙ্গে লাঞ্ছিত করে, মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত সেই মুহূর্তেই ঘোষণা করলেন, "এই নারীকে আমি মহিষী রূপে গ্রহণ করিলাম।"

তারপর তার সংজ্ঞাহীন দেহকে বক্ষে তুলে নিয়ে অশ্বারোহণে নিজ শিবিরে প্রত্যাবর্তন করলেন। সেখানে পৌঁছে তরুণীটি সংজ্ঞা প্রাপ্তা হলে তার প্রদত্ত আত্মপরিচয় থেকে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত জানতে পারলেন যে সোমদত্তা নাম্নী সেই রূপময়ী বিপন্না নারীটি শ্রাবস্তীর এক শ্রেষ্ঠী কন্যা। তার সেই বিড়ম্বিত জীবনের পরিচয় জানার আগেই মহারাজ তাকে মহিষীরূপে গ্রহণ করেছেন, সুতরাং শাস্ত্রমত বিবাহ হোক বা নাই হোক চন্দ্রগুপ্তের রাজপুরীতে সোমদত্তার জন্য একটি স্বতন্ত্র মহল নির্দিষ্ট হল। সেইখানেই সে দাসী সহচরী পরিবৃতা পুরস্ত্রীরূপে বাস করতে লাগল। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত তার রূপলাবণ্যে সম্পূর্ণ বশীভূত হয়ে—"মধুভাণ্ডের নিকট ষট্‌পদের মতো সোমদত্তার পদপ্রান্তে পড়িয়া রহিলেন।"

কিন্তু সোমদত্তা মহারাজকে নিজের যে পরিচয় জ্ঞাপন করেছিল তা ছদ্ম পরিচয়, প্রকৃতপক্ষে সে পুষ্করণার অধিপতি চন্দ্রবর্মার বারাঙ্গনা গর্ভজাতা কন্যা। সে চন্দ্রবর্মার গুপ্তচর। তাঁর দিগ্বিজয় যাত্রা-পথে পাটলিপুত্র জয় করা যাতে সহজ ও সুনিশ্চিত হয়, তাই চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যের সমস্ত গোপন তথ্য তাকে সরবরাহ করার জন্যই সোমদত্তা রূপের কুহকে রাজাকে বশীভূত করে রাজপুরীতে তার অবস্থানের পথ সুপ্রশস্ত করেছিল। দস্যু নিপীড়িতা, সংজ্ঞাহীনা নারী রূপে তার তটিনীতটে অবস্থানের কৌশলটি ব্যর্থ হয়নি, কিন্তু মহারাজের সঙ্গে প্রেমাভিনয় করতে করতে তার নিজের অন্তরেই এক বিপুল রূপান্তর ঘটে গিয়েছিল। লিচ্ছবিকুলদুহিতা, পট্টমহিষী কুমারদেবী ও তাঁর ভ্রাতাদের কর্তৃত্বের প্রভাবে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত নামেই মাত্র নৃপতি কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নিজ রাজ্য সম্পর্কে অথবা প্রজাদের বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার তাঁর ছিল না। ক্রমে ক্রমে প্রজারাও তাঁকে অমান্য করতে শুরু করেছিল। চন্দ্রগুপ্ত বীরপুরুষ ছিলেন, তাই তাঁর পৌরুষ ও শৌর্যের এহেন লাঞ্ছনায় তিনি ধীরে ধীরে রাজকার্যে উদাসীন এবং বিলাস-ব্যসনে মত্ত হয়ে পড়েছিলেন। পিতার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে এসে সোমদত্তা রাজার সঙ্গে প্রেমাভিনয়ের সূত্রেই কখন যেন এই পট্টমহিষী কর্তৃক লাঞ্ছিত, উপেক্ষিত মানুষটিকে ভালবেসে

ফেলল। তার মনে এক গূঢ় আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিল। সে মনে মনে স্থির করল মগধ জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় গোপন সংবাদগুলি পিতাকে জানিয়ে তাঁর জয়ের পথ সুনিশ্চিত করে দেবে, তারপর কুমারদেবীর অধিকারমুক্ত সেই রাজ্য সে পিতার কাছ থেকে চেয়ে নেবে তার স্বামী চন্দ্রগুপ্তের জন্য। মহারাজের যে পৌরুষ-বহ্নি ঔদাসীন্য ও ব্যসন-পরায়ণতার ভস্মে আচ্ছাদিতপ্রায় তাকে সে আবার উজ্জ্বল করে তুলবে। কুমারদেবীর দর্প ও দম্ভ হবে পদদলিত। কিন্তু সোমদত্তার এই সুখস্বপ্ন, স্বামীকে গৌরবাসনে প্রতিষ্ঠা করার এই মহৎ প্রচেষ্টা যার হীন বাসনার আঘাতে ধূলিসাৎ হওয়ার উপক্রম হল তার নাম চক্রায়ুধ ঈশানবর্মা। একদিকে সোমদত্তার প্রতি তার দুর্দমনীয় কামনা অন্যদিকে চন্দ্রগুপ্তের প্রতি সুতীব্র ঈর্ষা ও প্রতিশোধ স্পৃহা তাকে প্রায় উন্মাদ করে তুলেছিল, এমন সময় একই সঙ্গে সে ঐ উভয় প্রবৃত্তিকেই চরিতার্থ করার এক দুর্লভ সুযোগ লাভ করল। ঘটনা-চক্রে চক্রায়ুধ জানতে পারে সোমদত্তা চন্দ্রবর্মার গুপ্তচর। চন্দ্রগুপ্তের কাছে সোমদত্তার এই গুপ্তচর বৃত্তি প্রকাশ করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে অভাগিনী সোমদত্তার প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও নরাধম ঈশানবর্মা তার উন্মত্ত সম্ভোগবাসনা চরিতার্থ করে। বুদ্ধিমতী সোমদত্তা বুঝেছিল ঈশানবর্মার লেলিহান বাসনার অগ্নি থেকে তার রক্ষা নেই, চন্দ্রগুপ্তের হস্তে পাটলিপুত্রের শাসনভার তুলে দিয়ে স্বামীর গৌরবে গরবিনী হওয়ার সুযোগ সে আর কোনদিনই পাবে না। প্রকাশ্যে ঈশানবর্মার বিরোধিতা করলে সে চন্দ্রগুপ্তের কাছে সোমদত্তার সঙ্গে তার নিভৃত মিলনের ঘটনা প্রকাশ করে দেবে, চন্দ্রগুপ্তের কল্যাণের জন্যই যে সোমদত্তার গুপ্তচরবৃত্তি একথা মহারাজ কখনই বিশ্বাস করবেন না, আর ঈশান-বর্মার সঙ্গে তার কলুষ সম্পর্ক তাঁর ক্ষমার অযোগ্য অথচ পিতার সহায়তায় যে সিংহাসন সে চন্দ্রগুপ্তকে উপহার দেবে স্থির করেছিল, সেই সিংহাসনে পাষণ্ড চক্রায়ুধকে স্থাপন করার কথা সে কল্পনাই করতে পারে না। অতএব এমন কোনও উপায় অবলম্বন করতে হবে যাতে চন্দ্রবর্মার সৈন্যগণের দুর্গে প্রবেশের পূর্বেই চন্দ্রগুপ্তকে তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্তসহ দুর্গের বাইরে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেওয়া যায়। অবশেষে বৌদ্ধভিক্ষু অকিঞ্চনের পরোক্ষ সহায়তায় এবং নিজের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও গভীর নিষ্ঠার দ্বারা সোমদত্তা রাজপরিবারের সদস্যদের অজানা এক গুপ্তপথ আবিষ্কার করে, তারপর অমাবস্যার রাত্রে চন্দ্রবর্মা সসৈন্যে পাটলিপুত্র আক্রমণ করলে সোমদত্তা অসাধারণ তৎপরতায় রাজপুরীতে অগ্নিসংযোগ ক'রে বালক সমুদ্রগুপ্ত, পট্টমহিষী কুমারদেবী ও ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল চন্দ্রগুপ্তকে সেই গোপন নির্গমন পথে পৌঁছে দিয়ে তার স্বামীপ্রেম ও শুভ বোধের চরম পরিচয় রাখে। বিশ্বাসঘাতক, কৃতঘ্ন চক্রায়ুধ ঈশানবর্মা ততক্ষণে চন্দ্রবর্মার সৈন্যদের জন্য পশ্চিম দুর্গদ্বার উন্মুক্ত করে তাদের পথ প্রদর্শক হিসাবে সোল্লাসে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেছে। চন্দ্রবর্মা তাঁর প্রিয় কন্যাটিকে তাঁর রাজ্যজয়ে সহযোগিতার জন্য বহুমূল্য মণিহার দিয়ে পুরস্কৃত করতে চেয়েছেন—কিন্তু চন্দ্রবর্মা জানেন না, যে সোমদত্তাকে তিনি উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য পাটলিপুত্রে প্রেরণ করেছিলেন তার কী বিপুল মানসিক পরিবর্তন ঘটেছে! এক-দিকে চন্দ্রগুপ্তের প্রতি ভালবাসা অন্যদিকে নারী লোলুপ ঈশানবর্মার প্রতি তীব্র প্রতিশোধস্পৃহায় তার অন্তরে তখন হুতাশন প্রজ্বলিত। নরপিশাচ চক্রায়ুধের জন্য পিতার

কাছে যে শাস্তি সে প্রার্থনা করে তাতেই তার তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে—

"এই পিশাচকে এখনি মারিবেন না, ইহাকে তিলে তিলে দগ্ধ করিয়া মারিবেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া বিষকণ্টকপূর্ণ অন্ধকূপে যেন এই নরাধম পচিয়া পচিয়া মরে, গলিত ক্রিমিপূর্ণ শূকরমাংস ভিন্ন যেন অন্য খাদ্য না পায়, মরিবার পূর্বে যেন ইহার প্রত্যেক অঙ্গ গলিয়া খসিয়া পড়ে! আমার আত্মা পরলোক হইতে দেখিয়া সুখী হইবে।"

তারপর নিজের জন্য সে কামনা করেছে জন্মদাতার হাতে বাঞ্ছিত মৃত্যু। তার আবেদনে বীরশ্রেষ্ঠ, কঠিন হৃদয় চন্দ্রবর্মাও বিচলিত হয়ে পড়েছেন, কিন্তু সোমদত্তা অবিচল কণ্ঠে বলেছে,—

"আমার মন নিষ্কলুষ, এই দূষিত দেহ হইতে তাকে মুক্ত করিয়া পিতার কর্তব্য করুন।"

পিতার সুতীক্ষ্ণ ভল্লের সম্মুখে বক্ষ পেতে দিয়ে যে ভাবে সে মৃত্যুকে গ্রহণ করেছে তাতে এই প্রেমময়ী নারীটির দুর্জয় মনোবল এবং অসমসাহসিকতার পরিচয় পেয়ে আমরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যাই।

আলোচ্য কাহিনীতে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের যে পরিচয় অঙ্কিত হয়েছে তা ঐতিহাসিক সত্য অপেক্ষা বহুলাংশেই পৃথক। ইতিহাসবিদ্‌গণের মতে তিনি ঘটোৎকচগুপ্ত নামক এক ক্ষুদ্র ভূস্বামীর পুত্র হয়েও নিজ বাহুবলে পাটলিপুত্র অধিকার করেছিলেন এবং লিচ্ছবিদুহিতা কুমারদেবীকে বিবাহ করে সমুদ্রগুপ্তের জনক হয়েছিলেন। কিন্তু 'মৃৎপ্রদীপ'-এ চন্দ্রগুপ্তের বীরত্ব তাঁর পট্টমহিষী ও শ্যালককুলের প্রভাবে নিষ্প্রভ। এখানে তিনি একজন ব্যসনপ্রিয়, বিলাসী, বিত্তবান ব্যক্তিমাত্র। এমনকি রাজ্য আক্রান্ত হয়েছে শুনে, একবারমাত্র তাঁর বর্ম নিয়ে আসার আদেশ দিয়ে পরক্ষণেই আবার এক প্রবল ঔদাসীন্যে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। কুমারদেবীর কাছে যে শ্রদ্ধা, ভালবাসা, আনুগত্য তিনি কখনও লাভ করেননি, সোমদত্তার কাছে হৃদয়ের সেই অর্ঘ পেয়েছিলেন বলেই তার প্রতি নিছক রূপোন্মত্ততা কালক্রমে প্রকৃত প্রেমে রূপান্তরিত হয়েছিল। তাই বিদায়মহূর্তে চন্দ্রগুপ্ত যখন জানলেন সোমদত্তা শত্রু চন্দ্রবর্মার কন্যা তখনও তিনি সোমদত্তাকে ঘৃণা করতে পারলেন না, হৃদয় বিদারক স্বরে তার নাম ধরে সম্ভাষণ করে যেন তাঁরই পথের সঙ্গিনী হওয়ার করুণ আবেদন জানালেন। ইতিহাসের চন্দ্রগুপ্তের পরিচয় ইতিহাসের পাতাতেই সীমাবদ্ধ কিন্তু 'মৃৎপ্রদীপ'-এর ভাগ্যহীন চন্দ্রগুপ্তের বেদনা বিড়ম্বনার পরিচয়টুকু আমাদের মনোলোকে মহার্ঘ স্মৃতি রূপে সঞ্চিত হয়ে থাকে।

পট্টমহাদেবী কুমারদেবীর মাত্রাধিক দম্ভ, কর্তৃত্বাভিমান ও স্বামীর প্রতি অবজ্ঞাসূচক মনোভাব স্বল্প পরিসরে সুচিত্রিত। সমুদ্রগুপ্ত তখনও বালকমাত্র কিন্তু সুকৌশলে কুমারদেবীর উক্তির মাধ্যমে তাকে ভাবীকালের সমগ্র ভারত-সাম্রাজ্যের মহাপরাক্রমশালী অধীশ্বর রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

চক্রায়ুধ ঈশানবর্মার বাসনা-পঙ্কিল ঘৃণ্য চরিত্রটি লেখকের সৃষ্টি কুশলতায় অত্যন্ত সজীব হয়ে উঠেছে। সোমদত্তাকে কেন্দ্র করে তার ভোগোন্মত্ততা, চন্দ্রগুপ্তের প্রতি দ্বেষ, ঈর্ষা এবং দেশবাসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা অর্থাৎ রূপোন্মাদ এই ব্যক্তিটির অধঃপতনের স্তরগুলির

যথোপযুক্ত চিত্রায়ন নিঃসন্দেহেই প্রশংসনীয়। তার প্রতি সোমদত্তার নিষ্ঠুর শাস্তিবিধান এবং 'রুমাহরণ' গল্পে বর্ণিত তার শোচনীয় জীবন পরিণাম তাই পাঠকচিত্তে কোনও সহানুভূতির উদ্রেক করে না।

চন্দ্রগুপ্তের আমলে পাটলিপুত্রের নাগরিকদের জীবনযাত্রা, যুদ্ধকালীন অবস্থার বিবরণ, রাজপুরীর রমণীয় বর্ণনা—সকল কিছুই শরদিন্দুর মোহিনী কল্পনাশক্তির জাদুমন্ত্রে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে।

'মৃৎপ্রদীপ'-এ কখনও কখনও দু-একটি মন্তব্য নাট্যশ্লেষ বা Irony তে রূপান্তরিত হয়ে কাহিনীর অনিবার্য অশুভ পরিণামের চকিত ইংগিত দান করেছে। যেমন চন্দ্রগুপ্ত যখন সংজ্ঞাহীনা সোমদত্তার দেহ বক্ষে তুলে নিয়ে অশ্বারোহণে শিবিরের দিকে যাত্রা করলেন তখন 'মূর্ছিতার অবেনীবদ্ধ মুক্ত কুন্তল কৃষ্ণধূমকেতুর মতো পশ্চাতে উড়িতে উড়িতে চলিল।'

অন্যত্র, বাসনা-বিহ্বল চক্রায়ুধ যখন বলেছে—

'সোমদত্তা তোমার রূপের আগুনে আজ আপনাকে আহুতি দিলাম।'

তখন সোমদত্তার উক্তি প্রণিধানযোগ্য—

'শুধু তুমি নহ, তুমি আমি, চন্দ্রগুপ্ত, মগধ—সব এই আগুনে পুড়িয়া ছাই হইবে।'

কাহিনীর অপর এক মুহূর্তে সোমদত্তার প্রণয়-ছলনায় প্রীত চক্রায়ুধ মন্তব্য করেছে—
'মৃৎপ্রদীপ নয়, সোমদত্তা,তুমি রত্নদীপ। তোমার দীপ্তিতে মগধ আলোকিত হইবে।'
তখন—

"সোমাদত্তা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'আমি শ্মশানের আলো।"

আলোচ্য কাহিনীতে এইরূপ একাধিক অর্থগূঢ় উক্তি বজ্রগর্ভ মেঘের মতই একটা প্রবল বিনষ্টির ইঙ্গিতকে ঘনীভূত করে তুলেছে।

পরিশেষে, গল্পটির নামকরণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যায় মৃৎপ্রদীপ জাতিস্মর বক্তার পূর্ব স্মৃতির জাগরণ ঘটিয়েছে, তার ফলেই এই কাহিনীর সূত্রপাত। মাটির প্রদীপের শিখার আলোক নৃত্য দর্শন করেই চক্রায়ুধ ঈশানবর্মা সোমদত্তার গুপ্তচরবৃত্তি সম্বন্ধে অবহিত হয়, ফলে সবার অলক্ষ্যে সেই নারীটির ও কাহিনীর অন্যান্য পাত্রপাত্রীদের জীবনধারার দিক্ পরিবর্তন ঘটে। মৃৎপ্রদীপের দ্বারাই সোমদত্তা রাজপুরীতে অগ্নিসংযোগ করে। কিন্তু 'এহ বাহ্য' এই নামকরণের একটি নিগূঢ় তাৎপর্য আছে—আসলে নারীর মোহিনী রূপ আর ক্ষণভঙ্গুর মাটির প্রদীপশিখার সংহার-শক্তি লেখকের দৃষ্টিতে একাকার হয়ে গেছে—তার প্রমাণ চক্রায়ুধের প্রতি সোমদত্তার নিম্নোধৃত উক্তিটি—

"ভাবিতেছি কি অপরিমেয় শক্তি এই ক্ষুদ্র মৃৎপ্রদীপের! এত তুচ্ছ, ভঙ্গুর—মাটিতে পড়িলে ভাঙ্গিয়া শতখণ্ড হইবে, অথচ একটা রাজ্য ধ্বংস করিবার শক্তি ইহার আছে। এমনি কতশত ছার মৃৎপ্রদীপ কেবল রূপ-শিখার অনলে সংসার ভস্মীভূত করিতেছে।"

এই গল্পে মৃৎপ্রদীপের আরও একটি শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে

অতি তুচ্ছ এই উপকরণটি প্রতিভাবান সাহিত্যিকের হৃদয়কে নব সৃষ্টিপ্রেরণায় কতখানি আলোকিত করতে পারে 'মৃৎপ্রদীপ' তারই অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন।

রুমাহরণ [১৩৩৯] : জাতিস্মর নায়কের মনে পূর্বজন্মের স্মৃতি জাগরণকে কেন্দ্র করে শরদিন্দু রচিত আর একটি উল্লেখযোগ্য গল্প, 'রুমাহরণ'। তবে এ কাহিনীতে শুধু নায়কই জাতিস্মর নয়, নায়িকার অন্তরেও জন্মান্তরের স্মৃতি জেগেছে এবং সেও নায়ককে তার বহু জন্ম পূর্বের জীবনসঙ্গী রূপে চিনে নিতে পেরেছে। শরদিন্দু সুকৌশলে গল্পের সূচনা পর্বেই প্রাক্তন ও বর্তমানের মধ্যে সেতুবন্ধন করেছেন। 'অমিতাভ' ও 'মৃৎপ্রদীপ'-এর জাতিস্মর নায়কই 'রুমাহরণ' গল্পে হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশে উপস্থিত হয়েছে—সেখানে এক চন্দ্রালোকিত নিশীথে অপরূপ আলোছায়াময় অরণ্য পরিবেশে নায়কের মনে পূর্ব জন্মের স্মৃতি-বেদনার অস্ফুট আভসে জেগেছে এবং সেই রাত্রে, সেই মায়াময় পরিবেশেই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে এক নারীর, যার গাওয়া গানের সুর শুনে নায়ক অনুভব করেছে এই তরুণীই তার বহু পূর্ব জন্মের প্রথমা প্রিয়া 'রুমা'। বর্তমানে আঠারো উনিশ বছরের সেই রূপসী, শিক্ষিতা বঙ্গললনার নাম যদিও 'রুমা' নয় 'রমা' কিন্তু নায়কের ললাটস্থিত রক্তিম জড়ুলটি দেখে তার অন্তরেও ধীরে ধীরে অনেককাল আগের হারানো দিনগুলির স্মৃতি জেগে উঠেছে—

"কপালের দিকেই রুমা একদৃষ্টে তাকাইয়াছিল··· · ····· বহু পূর্ব জন্মে যেখানে রুমার ছুরিকাঘাতে ক্ষত হইয়াছিল, প্রকৃতির দুজ্ঞেয় বিধান ইহজন্মে তাহা রক্তবর্ণ জড়ুলরূপ ধরিয়া দেখা দিয়াছে। রুমা সেই চিহ্নটার দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া হঠাৎ চিৎকার করিয়া আমার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, "গাক্কা! গাক্কা!"

'রুমাহরণ'-এ ইতিহাসের উপস্থিতি কতটুকু সে বিষয়ে বিতর্ক নিষ্প্রয়োজন। কারণ এই গল্পে লেখক এমন এক যুগের কাহিনী বিবৃত করেছেন যখন ইতিহাস ভূগোলের সৃষ্টি হয়নি, আবিষ্কৃত হয়নি সন-তারিখের মানদণ্ডে সময়কে পরিমাপ করার কৌশলও। এমনই সুদূর প্রাচীনকালে ঘটেছিল 'রুমাহরণ।' জাতিস্মর নায়ক গাক্কা এক আদিম মানবগোষ্ঠীর সদস্যরূপে যে পর্বতচক্রের সীমানায় বসবাস করতো তার কোনও ভৌগোলিক পরিচয়ও নির্দিষ্ট করা যায় না। সেই জনগোষ্ঠীর মানুষদের আহার বিহার, জীবন যাপন পদ্ধতি ছিল পশুদের থেকে কিছুটা উচ্চস্তরের মাত্র। সেকালে জীবন-সঙ্গিনী নির্বাচনের ক্ষেত্রে আন্তরিক প্রেমানুভূতির নয়, পাশব প্রবৃত্তিরই জয় ঘোষিত হয়। গাক্কার জবানীতে নারীর প্রতি অধিকার বিস্তারের সেই আদিম পদ্ধতি মূর্ত হয়ে উঠেছে—

'আমাদের নারীরা ছিল আমাদের যোগ্য সহচরী—তাম্রবর্ণা, কৃশাঙ্গী ক্ষীণকটি, কঠিনস্তনী।

······এইসব নারীর জন্য আমরা যুদ্ধ করিতাম শ্বাপদের মতো পরস্পর লড়িতাম। ইহারা দূরে দাঁড়াইয়া দেখিত। যুদ্ধের অবসানে বিজয়ী আসিয়া তাহাদের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইত।"

অনেক সময় এর ব্যতিক্রম ঘটত, অন্তত গাক্কার ক্ষেত্রে ঘটেছিল। সে তিত্তিকে ভাল

না বাসলেও দলের প্রধান যুবক হিসাবে সেই শ্রেষ্ঠা যুবতীটি তারই প্রাপ্য ছিল। কিন্তু স্বাধীনচেতা তিত্তি গাক্কার চেয়ে বেশী পছন্দ করত হুড়াকে। তাই তাকে পাবার জন্য গাক্কা ও হুড়ার প্রাণঘাতী দ্বৈরথে তিত্তি সাধারণ রমণীদের মতো দূরে দাঁড়িয়ে নির্লিপ্ততার সঙ্গে দ্বন্দ্বের ফলাফল উপভোগ করেনি হুড়ার পরাজয় অনিবার্য দেখে সে তার পক্ষ নিয়ে গাক্কাকে তীব্র, তীক্ষ্ণ আক্রমণে বিপর্যস্ত করেছে। তিত্তির সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলেই হুড়ার জয় ও গাক্কার পরাজয় ঘটেছে। পরাভবের গ্লানিতে জর্জরিত গাক্কা সেই দিনই সূর্যাস্তের পর তার একটিমাত্র অস্ত্র পাথরের ফলকযুক্ত বর্শাখানি সঙ্গে নিয়ে নিঃশব্দে গোষ্ঠী পরিত্যাগ করে উপস্থিত হয়েছে উপত্যকার পরপারে। সেখানে লতাপাতার আচ্ছাদনে আবৃত এক চমৎকার গুহায় তার নিঃসঙ্গ নতুন জীবন সুরু হয়েছে। তারপর এক অপরাহ্নে নিজগুহার সম্মুখে বসে যখন সে ধনুকে গুণ সংযোগে মগ্ন তখন হঠাৎ একটা অশ্রুতপূর্ব চিঁহি-চিঁহি শব্দে চোখ তুলে উপত্যকার দিকে চাইতেই সে বিস্ময়ে একেবারে নিস্পন্দ হয়ে গেছে—

"একি! দেখলাম, পাহাড় দেবতার মুখবিবর হইতে পিপীলিকা শ্রেণীর মতো একজাতীয় অদ্ভুত মানুষ ও ততোধিক অদ্ভুত জন্তু বাহির হইতেছে। এরূপ মানুষ ও এরূপ জন্তু জীবনে কখনও দেখি নাই।"

গাক্কা সবিস্ময়ে অনুভব করেছে উপত্যকা প্রদেশে এই আগন্তুক জাতি পর্বতচক্রের অধিবাসী আদিম বর্বর জনগোষ্ঠীর তুলনায় অনেক সুসভ্য, এবং সুদর্শন। নিজ গুহান্তরালে অবস্থান করে এই নবাগতদের বিচিত্র জীবন যাত্রার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে গাক্কা যতই বিস্ময় ও উত্তেজনা অনুভব করুক না কেন তার পুরুষচিত্ত উন্মথিত করেছে সেই আগন্তুক দলের অন্তর্ভুক্ত এক আসন্ন যৌবনা কিশোরী। গাক্কা জেনেছে তার নাম 'রুমা'। যুবক গাক্কার দৃষ্টিতে রুমার রূপ "আকাশের ঐ আভুগ্ন চন্দ্রকলাটির মতো সুন্দর।" আর তার নির্জনতাপ্রিয় অন্তর্মুখী স্বভাবের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে বয়ঃসন্ধিতে উপনীতা নারীর চিরন্তন রহস্যগুলি। কৈশোরের সারল্য ও যৌবনের লজ্জায় মেশা তার প্রতিটি আচরণ আড়ালে থেকে লক্ষ্য করে গাক্কার হৃদয় এক দুর্নিবার আবেগে আলোড়িত হয়ে উঠেছে। তিত্তির প্রতি গাক্কার আসক্তি ছিল না, ছিল তার অহংকার-দীপ্ত অধিকারবোধ, কিন্তু রুমা নিজের অজান্তেই তার মনে জাগিয়ে তুলেছিল নারীদেহের প্রতি দুর্নিবার বাসনা। তাদের আগমনের পঞ্চম দিনেই রুমাকে কাছে পাওয়ার এক অতর্কিত সুযোগ লাভ করেও যখন গাক্কার অভীপ্সা ফলপ্রসূ হল না তখন সে এক কুটিল উপায় অবলম্বন করল। আদিম মানুষের মনেও যে কতখানি কূট বুদ্ধি থাকতে পারে রুমাকে পাবার জন্য গাক্কার আচরণেই তা প্রমাণিত হয়। রাতের অন্ধকারে নিজ গুহা ত্যাগ করে সে তাদের গোষ্ঠীতে উপস্থিত হয়েছে, ডাইনীবুড়ি রিকৃথার মাধ্যমে সে স্বজাতীয় যুবকদের জানিয়েছে উপত্যকার পরপারে আগন্তুক নরনারীদের কথা, তাদের অপূর্ব রূপের বর্ণনার দ্বারা যুবকদের মুগ্ধ ও উদ্দীপ্ত করে সংঘবদ্ধ আক্রমণের দ্বারা গাক্কা নিজ বাসনা চরিতার্থ করেছে, সফল হয়েছে রুমাহরণ। রুমার ছুরির আঘাতে গাক্কার ললাট নিঃসৃত শোণিত চিহ্ন সীমন্তে ধারণ করে শুভ্রা রুমা মধুপিঙ্গলবর্ণ গাক্কার পত্নীতে অভিষিক্ত হয়েছে।

রূমাহরণ পাঠের ফলে পাঠকের মনে জাগে অকৃত্রিম মুগ্ধতা ও অনন্ত বিস্ময়। লেখকের কল্পনাশক্তি কতদূর বলিষ্ঠ ও সুদূরপ্রসারী হলে তবে মানব সভ্যতার এক বিস্মৃতপ্রায় আদিম অধ্যায়কে এইভাবে এই যুগের পাঠকদের মানসপটে প্রগাঢ় রঙে ও রেখায় মূর্ত করে তোলা যায় তা নিঃসন্দেহেই ভেবে দেখার বিষয়। অবশ্য প্রাগৈতিহাসিক যুগের সফল চিত্রায়নেই নয়, নারীকে ঘিরে মানব হৃদয়ের বিচিত্র আসক্তি ও শাশ্বত আকাঙ্ক্ষার বলিষ্ঠ রূপায়ণেও লেখকের কৃতিত্ব অপরিসীম। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গীর অনবদ্যতায় রূমাহরণ বাংলা সাহিত্যের সার্থক ছোট গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম।

বিষকন্যা [১৩৪২]ঃ 'বিষকন্যা'তেও শরদিন্দু জাতিস্মরের বিবৃতিতে কাহিনী উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু 'রূমাহরণ'-এ নায়িকার পূর্বজন্মের স্মৃতি জাগরণ যেমন কাহিনীর একটি অন্তরঙ্গ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে, 'বিষকন্যা'য় কিন্তু তেমনটি ঘটেনি। এখানে জাতিস্মরের প্রসঙ্গ পাঠককে দূর অতীতের বিস্মৃত লোকে পেঁছে দেওয়ার একটি বহিরঙ্গ কৌশলমাত্র।

আলোচ্য গল্পে প্রায় চতুর্বিংশ শতাব্দী পূর্বের মগধের কতিপয় নরনারীর বিচিত্র জীবনকথা রূপায়িত হয়েছে। বলাবাহুল্য এ গল্পে শিশুনাগবংশীয় কয়েকজন নরপতির রাজত্বকালের বাতাবরণটুকু মাত্র ঐতিহাসিক, কাহিনী সম্পূর্ণরূপেই লেখকের স্বকপোল-কল্পিত।

'বিষকন্যা' যে নারীর বিষাদখিন্ন জীবনের মর্মন্তুদ ইতিবৃত্ত তার নাম উল্কা। উগ্রস্বভাব বিশিষ্ট, স্বেচ্ছাচারী মগধেশ্বর চণ্ডের এই কন্যার জন্ম মোরিকা নাম্নী এক দাসীর গর্ভে। অভাগিনী কন্যাটির জন্মের পরই চণ্ডের সভাপণ্ডিত কর্তৃক তার কোষ্ঠীগণনা অনুসারে জানা গেছে যে নবজাতিকা 'অতিশয় কুলক্ষণা, প্রিয়জনের অনিষ্টকারিণী—সাক্ষাৎ বিষকন্যা।'

দৈব আপদের আশঙ্কায় শঙ্কাকুল, হৃদয়হীন চণ্ড শুধু যে বিপন্মুক্ত হওয়ার জন্য সেই অমঙ্গলরূপিণীকে বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তাই নয়, উপরন্তু শিশুটিকে শ্মশানে জীবন্ত প্রোথিত করে আসার নিষ্ঠুর দায়িত্ব সে অর্পণ করেছে কন্যার ভাগ্যহীনা জননী মোরিকারই উপর। কিন্তু নিয়তির অমোঘ নির্দেশে মগধেশ্বরের নির্মম অভিপ্রায় পূর্ণ হয়নি। বিষকন্যার বিনাশ হয়নি। চণ্ডের অজ্ঞাতসারেই সেই কন্যা স্থান পেয়েছে চণ্ড কর্তৃক লাঞ্ছিত মহাসচিব শিবমিশ্রের অঙ্কে। না, শিবমিশ্র অপত্যস্নেহের বশবর্তী হয়ে শিশুটিকে বক্ষে তুলে নেননি, চণ্ডের প্রতি তীব্র প্রতিশোধস্পৃহায় তিনি অদূর ভবিষ্যতে কণ্টকের দ্বারাই কণ্টক উৎপাটিত করার মানসে মুমূর্ষু মাতার কাছ থেকে বিষকন্যাটিকে গ্রহণ করে লিচ্ছবিদেশে প্রস্থান করলেন। তিনিই শিশুটির নাম রাখলেন উল্কা। ষোড়শ বৎসর যাবৎ তীক্ষ্ণ মেধাবিনী কন্যাটিকে চতুঃষষ্টি কলায় ও বিবিধ অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত করে এবং তার উগ্র স্বভাবকে উগ্রতর হয়ে ওঠার সুযোগ দিয়ে শিবমিশ্র তাকে নিজ হস্তের শাণিত তরবারিতে পরিণত করলেন। তারপর যথাসময়ে বিষকন্যাকে তার প্রকৃত পরিচয়, তার মা মোরিকা ও পালকপিতা শিবমিশ্রের প্রতি চণ্ডের নির্মম আচরণের

কথা জানালেন। শিবমিশ্রের অন্তরের তীব্র প্রতিহিংসা উল্কার মধ্যেও সঞ্চারিত হল। চণ্ড বিদ্রোহী প্রজাবর্গের দ্বারা সিংহাসন চ্যুত হয়েছে বটে কিন্তু তার বংশেরই এক উত্তরপুরুষ মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত সুতরাং শিবমিশ্রের আদেশে উল্কা শিশুনাগবংশীয় রাজা সেনজিতের সর্বনাশ সাধনের গূঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে মিত্র রাজ্য বৈশালীর প্রতিনিধিরূপে মগধ রওনা হল। প্রথমে পাটলিপুত্রের উপকণ্ঠে রাজার মৃগয়াকাননে প্রগল্‌ভ রক্ষীকে এবং তারপরে তোরণ পার্শ্বস্থ প্রাচীর গাত্রে শৃঙ্খলিত, হস্তপদহীন চণ্ডকে নির্দ্বিধায় হত্যা করে মগধের বিষকন্যা উল্কা 'উল্কা'র মতই মগধের মহাস্থানীয়ে পদার্পণ করল।

কিন্তু শিবমিত্রের পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ উল্কার পক্ষে সম্ভব হয়নি—এখানেই চরিত্রটির আকর্ষণীয় অসামান্যতা। পুরুষের মন-মৃগয়া করতে এসে সে নিজেই কন্দর্পের শরাহতা হয়ে পড়েছে। এই সম্ভাবনা হয়তো তার বা শিবমিত্রের দূরতম কল্পনাতেও স্থান পায়নি। মগধেশ্বর সেনজিতের সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল যে তিনি বিলাসপ্রিয় অকৃতদার যুবা, সুতরাং উল্কার পাবকশিখাতুল্য উগ্র, অলোকসামান্য রূপাগ্নির প্রতি তিনি স্বাভাবিকভাবেই পতঙ্গের মত অন্ধ আবেগে আকৃষ্ট হবেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই প্রত্যাশা পূর্ণ হল না। সেনজিতের সঙ্গে সাক্ষাতের অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সে বুঝতে পারল মহারাজের চরিত্রে দুর্লভ এক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, তিনি সঠিক অর্থে নারীবিদ্বেষী নন বটে, কিন্তু রমণীদের সম্পর্কে তিনি উদাসীন। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দৃঢ়চিত্তা উল্কা তার প্রতিপক্ষের এই অসামান্যতা লক্ষ্য করে হতাশ হল না, 'বরঞ্চ মহারাজকে কুহকমন্ত্রে পদানত করিবার সঙ্কল্প তাহার কুলিশ-কঠিন হৃদয়ে আরও দৃঢ় হইল।'

উল্কার অন্তরে মগধেশ্বরের প্রতি প্রণয়ের বীজ উপ্ত হল সেইদিন, যেদিন উপস্থিত সকলের সাবধান বাণীতে কর্ণপাত মাত্র না করে মহারাজ তাঁর উন্মত্ত হস্তী পুষ্করের সম্মুখে নির্ভয়ে উপস্থিত হয়ে মৃদু ভর্ৎসনার দ্বারা তাকে শান্ত করে তুললেন। তাঁর রাজকার্যে ঔদাসীন্য ও নানাবিধ ব্যসনপ্রিয়তার জন্য উল্কার কাছে তিনি প্রথম থেকেই শৌর্যহীন যুবক রূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন, কিন্তু পুষ্কর সম্পর্কিত ঘটনায় তাঁর অমিতবীর্য ও প্রচ্ছন্ন পৌরুষের পরিচয় পেয়ে উল্কা বিস্মিত হল. তার সচেতন মন মগধরাজ সেনজিতকে রূপের কুহকে বন্দী করার উপায় অন্বেষণ করলেও অবচেতন মনের গভীরে প্রণয় দেবতার পদার্পণ বোধ করি সেই মুহূর্তেই, কিন্তু হতভাগিনী উল্কা নিজেও সেকথা জানতে পারেনি।

নিজের অন্তরের এই বিপুল পরিবর্তন সম্পর্কে সে সচেতন হওয়ার অবকাশ পেল আর একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনার তীব্র অভিঘাতে। মহারাজের পক্ষিশালা থেকে পলাতক প্রিয় শুক পক্ষীটিকে কেন্দ্র করেই এ ঘটনার বিস্তার। রাজ অন্তঃপুর সংলগ্ন উদ্যানের আমলকী বৃক্ষে উড়ে বসা সেই প্রত্যাবর্তনে অনিচ্ছুক পাখীটিকে সুকৌশলে নিজের পক্ষিনীর দ্বারা আকৃষ্ট করে উল্কা শুধু তাকে ফিরিয়েই আনেনি, সেই অবাধ্য, ভীত শুকের নখরাঘাতে সেনজিতের নগ্নবক্ষে শোণিত চিহ্ন ফুটে উঠলে স্থান-কাল-পাত্র বিস্মৃতা উল্কা তাঁর দেহ থেকে বিষ নিষ্কাশনের জন্য ক্ষতের উপর তার কোমল অধর-পল্লব স্থাপন করেছে। সেই মুহূর্তে তার এই আচরণে ছলনা ছিল না, ছিল সেনজিতকে বিপন্মুক্ত

করার অকৃত্রিম ব্যাকুলতা কিন্তু তার এই স্বার্থশূন্য প্রয়াসের প্রতিদানে মহারাজের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে কঠোর ধিক্কার—

"নারীর পুরুষভাব আমি ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু নির্লজ্জতা অসহ্য !"

এই অপ্রত্যাশিত, রূঢ় প্রত্যাখানে উল্কার যে তীব্র প্রতিক্রিয়া লেখক বর্ণনা করেছেন তা তার উগ্র প্রকৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সুসংগত—

"যতক্ষণ মহারাজকে দেখা গেল, উল্কা স্থিরনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চোখে ধিকি-ধিকি আগুন জ্বলিতে লাগিল………প্রত্যাখ্যাতা খণ্ডিতা নারীর চিত্ত-গহনে কে প্রবেশ করিবে ? শিকার বঞ্চিতা ব্যাঘ্রীর ক্ষুধিত জিঘাংসাই বা কে পরিমাপ করিতে পারে ? উল্কার নয়নে যে বহ্নি জ্বলিতে লাগিল, তাহার অন্তর্গূঢ় রহস্য নির্ণয় করা মানুষের সাধ্য নয়। বোধ করি দেবতারও অসাধ্য।"

কিন্তু সেই অপমানের অসহ্য গ্লানির মধ্যেই যে নিঃশব্দে উল্কার নবজন্ম ঘটেছে তার পরিচয় পাওয়া যায় প্রাকৃত ভাষায় গাওয়া বিরহ-সঙ্গীতটির মাধ্যমে। মদনমহোৎসবের দিন সকাল থেকেই সেনজিতের আগমন প্রত্যাশায় বাসকসজ্জা উল্কার প্রসাধনের নবনব বৈচিত্র্য, হৃদয়ের প্রগাঢ় আকাঙ্ক্ষা ও উৎকণ্ঠার অপূর্ব বহিঃপ্রকাশ দেখে আমরা বিস্মিত হয়ে ভাবি, এ কি সেই উল্কা যে বক্ষে তীব্র প্রতিশোধ স্পৃহা জাগ্রত রেখে শোণিত পঙ্কে দুই হস্ত রঞ্জিত করে মগধে পদার্পণ করেছিল ? সারা দিবসের প্রতীক্ষা ব্যর্থ হলে অন্তরের দুঃসহ আবেগে অধীরা উল্কা ফুলশরে জড়ানো লিপির মাধ্যমে মহারাজের দর্শন লাভের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা জানিয়ে প্রমাণ করে আজ তার অন্তরে সেনজিতের প্রতি প্রতিহিংসা, ক্ষোভ, এমনকি অভিমান পর্যন্তও অবশিষ্ট নেই, জেগে আছে শুধু হৃদয়ের সেই অকৃত্রিম অনুভূতি যার নাম প্রেম।

যতক্ষণ সে মহারাজের কাছ থেকে এই প্রেমের স্বীকৃতি পায়নি ততক্ষণ পর্যন্ত তার হৃদয়ে পুরুষ চিত্তজয়ের বাসনা ছাড়া আর কোনও ভাবনাই স্থান পায়নি কিন্তু যে মুহূর্তে তার বাঞ্ছিত পুরুষটি অনুরাগের রক্তিম অর্ঘ্য নিয়ে তার দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে, আবেগ মথিত কণ্ঠে জানতে চেয়েছে "উল্কা, সত্য বল, আমাকে ভালবাস ? এ তোমার ছলনা নয় ?" সেই মুহূর্তেই প্রিয়তমের বাহুবন্ধনে উল্কার সুখ তন্দ্রা ভেঙ্গে গেছে, কেটে গেছে আত্মবিস্মৃতির ঘোর। সে যে বিষকন্যা, কোনও পুরুষের কণ্ঠলগ্না হলেই সে ব্যক্তির নিশ্চিত বিনাশ। তাই ভালবাসার অভিনয় করে প্রতিপক্ষের সর্বনাশ করা তার পক্ষে সহজ, কিন্তু প্রকৃত ভালবেসে কারও জীবনসঙ্গিনী হওয়ার অধিকার তো তার নেই। তাই প্রিয়জনের জীবন থেকে নিজের অশুভ ছায়াকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার জন্য সে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। কিন্তু সেই মরণক্ষণটি কী অসাধারণ শিল্প সুষমামণ্ডিত। পুষ্পপূর্ণ বাসকগৃহে একাকিনী প্রতীক্ষারতা উল্কা, তার হাতে একগুচ্ছ কমল কোরক। কুসুমে কীট থাকে কিন্তু মহারাজের জানা ছিল না উল্কার হস্তধৃত কমলকোরকে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকার আকারে লুকিয়ে আছে স্বয়ং মৃত্যু। প্রগাঢ় প্রণয়াবেগে মহারাজ সেনজিত উল্কার বরতনু নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করতে চেয়েছেন, আর সেই প্রবল নিষ্পেষণে সূক্ষ্মাগ্র ছুরিকা আমূল বিদ্ধ হয়েছে উল্কার কবোষ্ণ বক্ষে। বিষকন্যার জীবনে প্রেম ও মৃত্যু একাকার

হয়ে গেছে। প্রিয়তমের বাহুবন্ধনের মধ্যে কী মধুর এ মৃত্যু। সেই অন্তিম মুহূর্তেও জনমদুখিনী উল্কার কী গভীর জীবন তৃষ্ণা—

উল্কা তাঁহার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া অনির্বচনীয় হাসি হাসিল, বলিল—"এখন অন্য কথা নয়, শুধু ভালবাসা।"

বিষকন্যা উল্কার কাহিনী পাঠকালে অবশ্যই মনে পড়ে যায় স্রষ্টা শরদিন্দুর আর এক মানস কন্যার কথা—সে 'মৃৎপ্রদীপ'-এর সোমদত্তা। এরা উভয়েই প্রেমের ছলনায় বিশেষ পুরুষকে বিভ্রান্ত করে কোনও নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছে, কিন্তু অভিনয় কখন সত্যে পরিণত হয়েছে, ছলনা কখন প্রণয়ে রূপান্তরিত হয়েছে তারা নিজেরাই বুঝতে পারেনি। লক্ষ্যভেদ করতে এসে তারা লক্ষ্যবিদ্ধ হয়েছে, বাঁধতে এসে বাঁধা পড়েছে এবং পরিণামে সোমদত্তা ও উল্কা উভয়েই আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে নিজ নিজ প্রিয়জনের জীবন অমঙ্গলের ছায়ামুক্ত করেছে।

'বিষকন্যা' নিঃসন্দেহেই নায়িকাকেন্দ্রিক কাহিনী। কিন্তু নায়িকা চরিত্র-চিত্রণেই যে লেখকের সমগ্র মনোযোগ সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, মহারাজ সেনজিতের চরিত্রটিও সযত্নে অঙ্কিত। শিশু নাগবংশের দূর সম্পর্কীয় উত্তরাধিকারী এই সৌম্যকান্তি, প্রিয়দর্শন যুবকটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী নন। অনর্থক যুদ্ধোন্মাদনা ও রক্তপাত তাঁর মধুর চরিত্রের স্বভাবধর্ম নয় বলেই তিনি প্রজাপুঞ্জের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ও প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক বজায় রাখতে চান। কিন্তু তিনি ভীরু বা কাপুরুষ নন। প্রয়োজনকালে আপাতনির্লিপ্ততার ভস্মাচ্ছাদন ভেদ করে তাঁর চারিত্রিক তেজ ও পৌরুষ বহ্নির যথাযোগ্য প্রকাশ ঘটে, যেমন ঘটেছিল মত্ত রাজহস্তী পুষ্করকে বশীভূত করার সময়ে।

মহারাজ সেনজিতের স্বভাবের আর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নারী-সাহচর্যে তাঁর অনাশক্তি। এই সহৃদয় পুরুষটি সন্তানসৃষ্টির মাধ্যমে অভিশপ্ত শিশুনাগবংশের আর বৃদ্ধি ঘটাতে চান না বলেই প্রেম বা বিবাহ কোনও বন্ধনই তাঁর কাছে অভিপ্রেত নয়। কিন্তু ভাগ্যদেবীর বিচিত্র পরিহাসে তাঁর জীবন-দুয়ারেই জাগ্রত বসন্তের বার্তা নিয়ে বৈশালিকা উল্কার আবির্ভাব ঘটল। নিঃসংকোচে সে নারী ঠাঁই নিল তাঁর রাজপুরীর শূন্য অন্তঃপুরে এবং তাঁরই অজান্তে তাঁর শূন্য অন্তরেও। সেনজিতের সচেতন মন উল্কার প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করলেও তাঁর অবচেতন মনে যে ঐ বিচিত্র, অগ্নিশিখাতুল্য নারীটিকে কেন্দ্র করে মোহ জেগেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় পলাতক শুক পক্ষীটির অন্বেষণে অন্তঃপুর সংলগ্ন উদ্যানে যাওয়ার ব্যাপারে তার প্রবল অনিচ্ছা প্রকাশে। বিদূষক বটুক ভট্টের প্ররোচনায় সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্রই কন্দর্পের জয়শ্রী উল্কার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ। মহারাজ সেনজিত তাঁর রাজসভায় এই বৈশালিকাকে বহুবার দেখেছেন কিন্তু সে তো যোদ্ধৃবেশে, উদ্যানে তার পরিপূর্ণ নারীবেশ এবং নারীত্বের সৌকুমার্য ও লাবণ্যভরা অপরূপ রূপমাধুরী সেনজিতকে মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত করে ফেলেছে। কিন্তু এত সহজে তিনি প্রেমের দেবতার কাছে হার মানতে চাননি তাই তাঁর বক্ষে পক্ষীর নখরাঘাতে সৃষ্ট ক্ষত স্থান থেকে উল্কার বিষ-নিষ্কাশন প্রয়াসকে প্রগল্‌ভতার ও নির্লজ্জতার অভিযোগে ধিক্কৃত করে তিনি স্থান ত্যাগ করলেন বটে কিন্তু সেই মুহূর্তেই প্রকৃতির কাছে তাঁর পরাভবের সূচনা

ঘটল। এরপর তাঁর হৃদয়ে রক্তক্ষয়ী অন্তর্দ্বন্দ্বের পালা। উল্কার প্রতি নিজের উচ্ছ্বসিত প্রেমানুভূতিকে সংযত করার প্রচেষ্টা যতই ব্যর্থ হতে লাগল তাঁর মানসিক শান্তি ও আচরণের সহজ প্রসন্নতা ততই অন্তর্হিত হল। তাঁর এই চিত্তবিক্ষোভের স্পষ্ট প্রকাশ তাঁর অন্তরঙ্গ শুভার্থীদের হৃদয়ে যুগপৎ বিস্ময় ও বেদনার সৃষ্টি করল। উল্কার রূপের উত্তাপে তাঁর এই প্রবল চিত্তদাহের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক যথার্থই বলেছেন—"শুষ্ক ইন্ধনে অগ্নি অধিক জ্বলে।"

তাই বসন্ত পূর্ণিমার রাত্রে উদ্যানে একাকী উপবিষ্ট মহারাজ যখন প্রণয়বিধুরা, উপযাচিকা উল্কার ব্যাকুল আহ্বানে ভরা আমন্ত্রণলিপি লাভ করলেন তখন তাঁর আত্ম-প্রতিরোধের শেষশক্তিটুকুও নিঃশেষিত হল। উল্কার কাছে আত্মসমর্পণ করে তিনি ধন্য হতে চাইলেন, অদম্য আবেগে চাইলেন তাকে একান্ত আপনার করে কাছে পেতে। স্বেচ্ছাকৃত সংযমের কঠিন কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর রূপতৃষ্ণ, প্রেমাভিলাষী পুরুষ-চিত্তের আত্মপ্রকাশ ঘটল। আর এই অসম্ভব প্রেমময়ী উল্কার প্রভাবেই সম্ভব হল, তাই সেনজিতের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় প্রণয়ীর অকুণ্ঠ স্বীকৃতি—

"প্রেম এত মধুর! এতদিন জানিতাম না, উল্কা, তুমি আমাকে ভালবাসিতে শিখাইলে!"

কিন্তু ভালবাসার এই সুখ, সুখ-স্বপ্নের মতই সহসা ভেঙ্গে গেল। মহারাজ সেন-জিতের মঙ্গল কামনায় উল্কার আত্মবিসর্জনে প্রমাণিত হল সে বিষকন্যা নয়। প্রেমের অমৃতে তার হৃদয় পাত্র পরিপূর্ণ হয়েছিল বলেই সে প্রিয়জনের জন্য নিজের মহার্ঘ জীবন হাসিমুখে উৎসর্গ করতে পেরেছিল। একটি তুচ্ছ সংস্কার দুটি নরনারীর সম্ভাবনাময় জীবনকে কতখানি ব্যর্থ করে দিতে পারে 'বিষকন্যা' তারই জ্বলন্ত নিদর্শন। আলোচ্য গল্পের শিবমিশ্রের প্রতিশোধলিপ্সু চরিত্রটির সঙ্গে পরিচিত হলে 'গৌড়মল্লার' এর কোদণ্ডমিশ্র, এবং শঙ্খকঙ্কণের' ভূপসিংহকে অনিবার্যভাবে মনে পড়ে যায়। এই চরিত্রগুলির মূল প্রেরণা সম্ভবতঃ নন্দবংশ উচ্ছেদকারী 'চাণক্য'।

এ কাহিনীতে চণ্ডের আচার আচরণ ও তার শেষ পরিণামের বর্ণনা পাঠ করলে উপলব্ধি করা যায় যে লেখক শরদিন্দু শুধু শৃঙ্গার ও বিস্ময়রস সৃষ্টিতেই সার্থক নন, প্রয়োজন মত বীভৎস রসও তাঁর লেখনীমুখে উৎসারিত হয়।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে 'বিষকন্যা'য় সেনজিত ও উল্কার হৃদয়ের' সুতীব্র কামনা ও প্রবল রূপতৃষ্ণা লেখকের বর্ণনা কৌশলের চমৎকারিত্বে শিল্পের উত্তুঙ্গ শিখর স্পর্শ করেছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অবশ্য পাশ্চাত্ত্য রোমান্সের সূক্ষ্ম প্রেরণা অনুভূত হয়। এই প্রসঙ্গে কাহিনীর ষষ্ঠ অধ্যায়ে উল্কা ও সেনজিতের অভিনব অসিযুদ্ধের বিবরণ বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

'বিষকন্যা'য় লেখকের গল্প কথনের ভঙ্গী এমনই সরস ও তীব্র গতিসম্পন্ন, তাঁর কল্পনার কুহকমন্ত্র এমনই অমোঘ যে কাহিনী পাঠ কালে পাঠকের মন থেকে সম্ভব অসম্ভবের সীমারেখা ঘুচে যায়। ঘটনা গ্রন্থনের অপূর্ব চাতুর্যে, অন্তরের বিচিত্র ঘাত প্রতিঘাতের নিপুণ প্রকাশে ও চরিত্রের বিবর্তনকে মনস্তত্ত্বের উপযুক্ত পটভূমিকায়

প্রতিষ্ঠাদানে শরদিন্দুর সন্দেহাতীত পারদর্শিতা 'বিষকন্যা'কে শুধু শরদিন্দু সৃষ্টি সংভারেই নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পের সম্মান দান করেছে।

রক্তসন্ধ্যা [১৩৩৬-৩৭] : 'রক্তসন্ধ্যা' গল্পে লেখক এক বিচিত্র কৌশল অবলম্বন করেছেন সম্পূর্ণ অপরিচিত ফিরিঙ্গি ক্রেতার প্রতি গোলাম কাদের নামক এক মাংস বিক্রেতার আকস্মিক নৃশংস আচরণকে কেন্দ্র করে এ কাহিনীতে ভারত-ইতিহাসের এক মহাদুর্যোগময় ক্রান্তিকালের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন।

'রক্তসন্ধ্যা'র মূল ঘটনাকাল ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৫০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। ঘটনাস্থল প্রধানতঃ কালিকট, লেখকের ভাষায়—

"মালাবার উপকূলে অতি সুন্দর মহার্ঘ মণিখণ্ডের মত একটি ক্ষুদ্র নগর।" এই নগরটি ছিল সেকালে "পৃথিবীর সমগ্র বণিক সমাজের মোসাফিরখানা।"

আলোচ্য গল্পে এই বাণিজ্য নগরীর মহাসমৃদ্ধির পরিচয় এবং তথাকার রাজা 'সামরী'র অতুল ঐশ্বর্যের বর্ণনা যেমন ইতিহাস সম্মত, সেই কালিকটের বন্দরে পর্তুগীজ সেনাপতি ভাস্কো-ডা-গামার আগমনকে কেন্দ্র করে পাশ্চাত্য বাণিজ্যলক্ষ্মীর প্রথম ভারতে পদার্পণ তেমনিই ইতিহাসবিশ্রুত ঘটনা। কালিকটের রাজা নবাগত ক্রীশ্চানদের সে দেশে বাণিজ্য করার অনুমতি দিলেও তাদের প্রতি কালিকটের অন্যান্য বণিকদের, বিশেষতঃ আরব ব্যবসায়ীদের তীব্র বিরোধিতাও ঐতিহাসিক সত্য। 'রক্তসন্ধ্যা'য় ইতিহাসের নীরস তথ্য মানব জীবনের এক চিরন্তন সত্যে পরিণত হয়েছে যে কল্পিত চরিত্রের বিষাদময় জীবন পরিণামকে কেন্দ্র করে তাঁর নাম মির্জা দাউদ বিন্ গোলাম সিদ্দিকী, সংক্ষেপে মির্জা দাউদ। লেখকের বিবৃতি অনুসারে জানা যায়—

"বস্তুত মির্জা দাউদের মত সর্বজনপ্রিয় বহু সম্মানিত ব্যক্তি নগরে আর দ্বিতীয় নাই। উচ্চনীচ, ধনী-নির্ধন সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে। স্বয়ং রাজা সামরী তাঁহাকে বন্ধুর মধ্যে গণ্য করেন।"

তাঁর কর্মজীবনই শুধু সমৃদ্ধ নয়, পারিবারিক জীবনটিও সুখে শান্তিতে পরিপূর্ণ। মুসলমান ধর্মাবলম্বী হয়েও তিনি একপত্নীক। চৌত্রিশ বৎসর বয়সে প্রথম একটি কন্যার পিতা হওয়ার সৌভাগ্য তাঁর অন্তরে আনন্দের জোয়ার এনেছে। প্রকৃতপক্ষে "মানুষ পৃথিবীতে যাহা কিছু পাইলে সুখী হয়, কিছুরই তাঁহার অভাব নাই।"

কিন্তু এই নিরবচ্ছিন্ন সুখ তাঁর জীবনে চিরস্থায়ী হলনা গ্রীষ্মের এক রক্ত সন্ধ্যায় কালিকটের বন্দরে পর্তুগাল থেকে আগত তিনখানি জাহাজ শুধু প্রাচ্য বাণিজ্যের আকাশেই কৃষ্ণছায়া বিস্তার করেনি সেই সঙ্গে সবার অলক্ষ্যে মির্জা দাউদের পূর্ণচন্দ্রের মতো পরিপূর্ণ জীবনেও শুরু হয়েছিল রাহুগ্রাস, যা সম্পূর্ণ হল চার বৎসর পরে তরঙ্গ সঙ্কুল ভারত সাগরের অসীম বিস্তারের মাঝখানে।

ঘটনাচক্রে সেই গ্রীষ্মের প্রদোষে, সদ্য আগত ক্রীশ্চানদের সঙ্গে বাক্-বিনিময়ের ভার গ্রহণ করতে হয়েছে পর্তুগীজ ভাষা বোদ্ধা মির্জা দাউদকেই। পর্তুগীজদের দলপতি ভাস্কো-ডা-গামার সঙ্গে এই সম্ভ্রান্ত মূর বণিকের কথোপকথনের সূচনা মুহূর্ত থেকেই তাঁদের পরস্পরের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে, তবুও শেষ পর্যন্ত দুজনেই আন্তরিক

ক্ষোভকে সংযত করে সৌজন্যের পরিচয় দিয়েছেন। এদেশে সকলের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে বাণিজ্য করা ছাড়া পর্তুগীজদের আর দ্বিতীয় কোনও উদ্দেশ্য নেই জেনে মির্জা দাউদ তাদের কালিকট রাজ সামরীর প্রাসাদে পেঁাছে দিয়েছেন বটে, কিন্তু তাদের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস তাঁর মন থেকে সম্পূর্ণ দূর হয়নি। পর্তুগীজদের প্রতি তাঁর এই অনাস্থার কারণ—

"তিনি ফিরিঙ্গীকে পূর্ব হইতেই চিনিতেন—মূরমাত্রেই চিনিত। স্বদেশে বহু সংঘর্ষের ভিতর দিয়া এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। তাহারা জানিত যে, ফিরিঙ্গী অতিশয় অর্থলিপ্সু ও ভোগলুব্ধ।...পরের উন্নতি ইহাদের চক্ষুশূল। কোথাও একবার ধনরত্ন-ঐশ্বর্যের সন্ধান পাইলে ইহাদের লালসা ও ক্ষুধা এত উগ্র, নির্মম হইয়া উঠে যে, কোনও মতে সেখানে প্রবেশ লাভ করিয়া নিজেকে একবার ভালরূপ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে শত্রুমিত্র নির্বিচারে সকলের উপর দুর্বিনীত বাহুবল, স্পর্ধা ও জুলুম প্রকাশ করিতে থাকে। ইহারা নিরতিশয় কলহপ্রিয় ও যুদ্ধনিপুণ।"

মির্জা দাউদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লেখক কর্তৃক তৎকালীন পোর্তুগীজ জাতির এই চরিত্র বিশ্লেষণ যথাযথ।

মির্জা দাউদের দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা প্রশংসনীয়। পর্তুগীজরা যখন কালিকটে অবস্থান করে অতি নিকৃষ্ট পণ্যও উচিত মূল্যের দ্বিগুণ, চতুর্গুণ দামে ক্রয় করতে শুরু করল তখন—

"ইহাতে নির্বোধ ব্যবসায়ীরা যতই উৎফুল্ল হউক না কেন মির্জা দাউদের ন্যায় বহুদর্শী শ্রেষ্ঠীদের মনে সন্দেহ ততই ঘনীভূত হইয়া উঠিল। অধিক মূল্য দিয়া পণ্য ক্রয় করা ব্যবসায়ীর স্বভাব নহে, অথচ, নবাগতরা অব্যবসায়ী বা নির্বোধ নহে। এক্ষেত্রে বাণিজ্য ছলমাত্র, অন্য কোনও দুরভিসন্ধি তাহাদের অন্তরে প্রচ্ছন্ন আছে, ইহা অনুমান করিয়া বিচক্ষণ ব্যবসায়ীদের চিন্তার ও উৎকণ্ঠার অবধি রহিল না।"

পোর্তুগীজদের ক্রিয়াকলাপকে কেন্দ্র করে মূর বণিকদের এই পুঞ্জীভূত দুর্ভাবনা ও বিদ্বেষ দীর্ঘদিন প্রচ্ছন্ন থাকল না, একদিন তার চরম বিস্ফোরণ ঘটল—আর তা ঘটল মির্জা দাউদের প্রজ্জ্বলিত ক্রোধের মাধ্যমেই। কালিকটের বন্দরে বঙ্গদেশের ব্যবসায়ী প্রভাকর বর্ধনের আনা উৎকৃষ্ট মলমল ক্রয়ের ব্যাপারে ভাস্কো-ডা-গামার অশিষ্ট আচরণের আঘাতে মির্জা দাউদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল—যার অনিবার্য পরিণাম সমুদ্র ঘাটে অগণিত জনতার সম্মুখে সম্ভ্রান্ত মূর ব্যবসায়ীটির সঙ্গে পর্তুগীজ সেনাপতির অসিযুদ্ধ। মির্জা দাউদ তরবারি যুদ্ধেও যে কতদূর নিপুণ তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রবল পরাক্রমশালী, দীর্ঘদেহী ভাস্কো-ডা-গামাকে পরাস্ত করা এবং তার কাছ থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে কালিকট ত্যাগের প্রতিশ্রুতি আদায় করার ঘটনায়। সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ভাস্কো-ডা-গামা সপ্তাহান্তে অনুচর সহ পোর্তুগাল প্রত্যাবর্তনের জন্য জাহাজে উঠল বটে, কিন্তু কালিকট ত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে ওষ্ঠে ক্রূর হাসি ও চক্ষে স্থির দৃষ্টি নিয়ে বলে গেল—

"মির্জা দাউদ, আবার আমাদের সাক্ষাৎ হইবে।"

তার এই ভবিষ্যৎবাণী যে বর্ণে বর্ণে সত্য তা বোঝা গেল পূর্বোক্ত ঘটনার চার বৎসর

পরের একটি অপ্রত্যাশিত অশুভ মুহূর্তে, অথচ মির্জা দাউদের মনে সেই ভাবী দুর্যোগের ছায়া পলকের জন্যও পড়েনি। তিনি ভারমুক্ত আনন্দিত মনে পবিত্র মক্কা থেকে তীর্থ সেরে সপরিবারে কালিকট ফিরে চলেছেন। বৃহদাকার জলযান দ্রুতগতিতে সাগর থেকে সাগরান্তরে ছুটে চলেছিল। আর কয়েকদিনের মধ্যেই নিরাপদে কালিকটে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনায় যাত্রীদের মন উৎফুল্ল। এমন পরিবেশে সহসা এক শুক্রবারের দ্বিপ্রাহরিক প্রশান্তি যেন মেঘ গর্জনের ন্যায় এক ভীষণ শব্দে বিদীর্ণ হয়ে গেল। ব্যাপারটি ভালভাবে অনুধাবন করার আগেই মির্জা দাউদের সমুদ্রযান লক্ষ্য করে ছুটে এল অতিকায় জলজন্তুর মত পাঁচটি ফিরিঙ্গি যুদ্ধ জাহাজ। তাদের অধিনায়ক ভাস্কো-ডা-গামা।

> "তাহার মুখের উপর কৃষ্ণ কাল-সর্পের মত হিংসা যেন কুণ্ডলিত হইয়া আছে।" সেই কাল সর্পের মুহুর্মুহু দংশনে অসহায় মির্জা দাউদ সমুদ্র বক্ষে সব হারালেন। চক্ষের সম্মুখেই বৃদ্ধ পিতা, প্রিয়তমা পত্নী, প্রাণাধিকা কন্যা—সকলেরই মহামূল্য জীবন লুঠ করে নিল প্রতিহিংসায় উন্মাদ পোর্তুগীজ সেনানায়ক ভাস্কো-ডা-গামা। মির্জা দাউদও তার এই জিঘাংসার যথোচিত মূল্যই দান করেছে, অবশ্য সে জন্মে নয়, পরবর্তী কোনও এক জন্মে—যখন সে কলকাতার দুর্গাচরণ মিত্র লেনের মাংস বিক্রেতা গোলাম কাদের আর ভাস্কো-ডা-গামা সেই দোকানে ক্রেতা হিসেবে আগত এক পোর্তুগীজ ফিরিঙ্গী! তাকে দেখা মাত্রই গোলাম কাদেরের মর্মান্তিক পূর্বস্মৃতি জাগ্রত হয়েছে। বর্তমানকে সম্পূর্ণ রূপে বিস্মৃত হয়ে সে বিদেশী ক্রেতাটিকে মাংস কাটার সুতীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে বারংবার আঘাত করেছে আর প্রতিটি আঘাত হানার সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন 'ভাস্কো-ডা-গামা, এই আমার স্ত্রীর জন্যে—এই আমার কন্যার জন্যে এই আমার বৃদ্ধ পিতার জন্যে।"

কিন্তু পূর্বজন্মের শত্রুতার পরিপ্রেক্ষিতে তার এই প্রতিশোধস্পৃহা বর্তমান জন্মের সামাজিক আইনে ক্ষমার্হ হয়নি, তাই পঞ্চদশ শতাব্দীর মির্জা দাউদ বা বিংশ শতাব্দীর গোলাম কাদের হাইকোর্টের মৃত্যু দণ্ডাদেশ মাথায় নিয়ে পরলোকে যাত্রা করেছে।

'রক্তসন্ধ্যা' গল্পে ইতিহাসের সঙ্গে মানবজীবনের পূর্ব জন্মের সঙ্গে পরজন্মের অভূতপূর্ব সমন্বয় গল্পটিকে অসাধারণ শিল্পসাফল্য দান করেছে। লেখকের অতুলনীয় বর্ণনা কৌশলে সেকালের প্রাচ্য বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র কালিকট বা গোয়ার পরিবেশ, সেখানকার নাগরিকগণের জীবনচর্যার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, ভারতীয় বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ও সাফল্যের বিবিধ চিত্র সুঅঙ্কিত। নায়ক মির্জা দাউদ ও প্রতিনায়ক ভাস্কো-ডা-গামার চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে লেখকের নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। এই প্রসঙ্গে সুসাহিত্যিক ও সমালোচক প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—

> …'রক্তসন্ধ্যা' ও 'চুয়াচন্দন' গল্প দুইটি আমাদের সবচেয়ে ভালো লাগিয়াছে। ভাস্কো ডা-গামার আমলের গোয়া নগর এবং তথাকার লোকজন এমন জীবন্তভাবে লেখক আঁকিয়াছেন যে তাঁহাকে প্রশংসার ভাষা খুঁজিয়া পাই না। হয়তো এসব

তথ্য তিনি ইতিহাস হইতে পাইয়াছেন কিন্তু এ প্রাণ তো ইতিহাসের গ্রন্থে ছিল না।"

[শরদিন্দু অমনিবাস ষষ্ঠ খণ্ড গল্প পরিচয় দ্রষ্টব্য]

এই উক্তির যাথার্থ্য রসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন।

১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে, জলপথে ভাস্কো-ডা-গামার ভারত আগমনের বিষয়টি আর এক প্রখ্যাত কথাশিল্পীকেও বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল—তাঁর নাম নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর রচিত ও ১৩৫৬ সনের 'শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত 'পদসঞ্চার' গল্পটির সঙ্গে 'রক্তসন্ধ্যা'র একটি তুলনামূলক আলোচনা বোধকরি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে উভয় কাহিনীরই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অভিন্ন। ভাস্কো-ডা-গামার কালিকটে পদার্পণ যে একই সঙ্গে পাশ্চাত্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রভূত সম্ভাবনা ও প্রাচ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অজস্র দুর্ভাবনার সৃষ্টি করল—এই ইংগিত দু'টি গল্পেই পাওয়া যায়। উভয় লেখকই প্রবল ইতিহাস নিষ্ঠা ও গভীর কল্পনাশক্তির অধিকারী, তাই অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের বর্ণনাভঙ্গির মধ্যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ দুটি গল্পেই ফিরিঙ্গী বণিকদের কালিকটে পদার্পণের পূর্বে প্রাচ্যের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির বর্ণনা লক্ষণীয়—

"কালিকটের নাম আপনি শুনিয়া থাকিবেন। মালাবার উপকূলে অতি সুন্দর মহার্ঘ মণিখণ্ডের মত একটি ক্ষুদ্র নগর।... পীতবর্ণ চৈনিক, তাম্রবর্ণ বাঙালী, লোহিতবর্ণ পারসিক, কৃষ্ণবর্ণ মূর—সকলেই কালিকটের পথে সমান দর্পে পা ফেলিয়া চলে, কেহ কাহারও অপেক্ষা হীন নহে। চীন হইতে লাক্ষা, দারুশিল্প, ব্রহ্ম হইতে গজদন্ত, মলয়দ্বীপ হইতে চন্দন, বঙ্গ হইতে ক্ষৌম পট্টবস্ত্র, মলমল, ব্যাঘ্রচর্ম, চম্পা ও মগধ হইতে চামর, কস্তুরি, চারুকেশরার পুষ্পবীজ, দাক্ষিণাত্য হইতে অগুরু, কর্পূর, দারুচিনি, লঙ্কা হইতে মুক্তা আসিয়া কালিকটে স্তূপীকৃত হয়।"

(রক্তসন্ধ্যা)।

"নীল সমুদ্রের কোলে প্রাচ্যের সেরা বন্দর কালিকট।

ঘাটে ঘাটে সারি সারি বিদেশী জাহাজ। নানা কারুকার্যে খচিত, নানা আকৃতি। সপ্তগ্রামের মকরমুখ বাণিজ্যপোতে, ড্রাগন চিহ্নিত চৈনিক জলযান, বিপুলকায় মিশরীয় বাণিজ্যতরী, আরব আর পারস্য দেশীয় অর্ধচন্দ্রাঙ্কিত পোতবহর।

বন্দরের সঙ্গেই নগরের প্রধান বাণিজ্য অঞ্চল। ছোট বড় আচ্ছাদনের নীচে লবঙ্গ, দারুচিনি, আদা ও অন্যান্য মশলা স্তূপীকৃত, গন্ধে বাতাস সমাকুল। এইগুলিই প্রধানত কালিকটের বন্দর থেকে দেশে বিদেশে রপ্তানি হয়। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধের ফলে বন্দরের অসাধারণ সমৃদ্ধি।"

[পদসঞ্চার গল্প—শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৫৬, পৃষ্ঠা ১৫৪-১৫৫]

'রক্তসন্ধ্যা' ও 'পদসঞ্চার' উভয় গল্পেই দেখানো হয়েছে কালিকটে উপস্থিত হয়েই নবাগত 'ক্রীশ্চান'রা মূর ও মোপ্‌লাদের সর্বাত্মক অসহযোগিতা ও তীব্র বিদ্বেষের সম্মুখীন হয়েছিল।

ভাস্কো-ডা-গামার নেতৃত্বে সমুদ্র বক্ষে নিরীহ তীর্থ যাত্রীদের উপর গোলাবর্ষণ ও নির্বিচারে নরহত্যার পাশবিক চিত্র উভয় গল্পেই সাফল্যের সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু 'রক্তসন্ধ্যা'য় লেখকের বিবৃতি অনুসারে বোঝা যায় মির্জা দাউদের জাহাজ মক্কা থেকে কালিকটে প্রত্যাবর্তন করেছিল। অপর পক্ষে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প অনুসারে মূর নরনারীতে পরিপূর্ণ জাহাজটি তীর্থযাত্রীদের নিয়ে মক্কা অভিমুখেই ধাবিত হচ্ছিল।

কিন্তু আলোচ্য গল্পদুটির মধ্যে শুধু সাদৃশ্য নয়, কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈসাদৃশ্যও পরিলক্ষিত হয়।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 'রক্তসন্ধ্যা'য় ভাস্কো-ডা-গামার চরিত্র চিত্রণে অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়ের লেখা 'ফিরিঙ্গী বণিক'-এর দ্বারা বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। অন্যদিকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-এর কাহিনীর ঐতিহাসিক উপাদান সংগৃহীত হয়েছে ভাস্কো-ডা-গামার সহযোদ্ধা কবি ক্যামিয়েনস্-রচিত 'লুসিয়াদ্‌স' (Lusiads') থেকে। তাই 'রক্তসন্ধ্যা' পাঠ করলে মূর বণিকদের যতখানি সৎ ও নির্দোষ বলে মনে হয়, 'পদসঞ্চার' পাঠ করলে সে ধারণা কিছুটা পরিবর্তিত হয় বৈকি। এদেশে পর্তুগীজদের বাণিজ্য বিস্তারের পথকে রুদ্ধ করার জন্য তারাও যে নানা হীন কৌশল অবলম্বন করেছিল তার প্রণাম নিম্নোদ্ধৃত অংশেই পাওয়া যায়—

"পাউলো হিংস্রভাবে গোঁফের একটা প্রান্ত চিবুতে লাগল ঃ কিন্তু যা করে তুলেছে, কিছু কি করতে দেবে এই মূরেরা ? জামোরিণের কানে গিয়ে লাগিয়েছে আমরা বণিক নই, জলদস্যু। আদার ভিতরে দিচ্ছে মাটি, মশলার মধ্যে মিশাল দিচ্ছে মুঠো, মুঠো ধূলো। আর—শত্রুতা সে তো আছেই।"

[পদসঞ্চার, শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ ১৩৫৬, পৃঃ ১৫৭]

'রক্তসন্ধ্যা'য় ভাস্কো-ডা-গামার হৃদয় শুধু হিংস্রতা আর ক্রূরতায় পূর্ণ। তার অশিষ্ট, দুর্বিনীত আচরণ তার প্রতি পাঠকের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে না। 'পদসঞ্চার'-এ উক্ত পোর্তুগীজ সেনাপতির পৈশাচিক প্রবৃত্তি ও তুলনাহীন নির্মমতার চিত্র বলিষ্ঠভাবেই উন্মোচিত হয়েছে, কিন্তু তার মাঝেই কোনও কোনও মুহূর্তে এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিটির প্রবল পৌরুষ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, ও অসীম মনোবলের পরিচয় অব্যক্ত থাকেনি,—উদাহরণ স্বরূপ 'পদসঞ্চার'-এর একটি বর্ণনা লক্ষ্য করা যেতে পারে—

"আতাম্র শ্মশ্রুরাশি মুঠোর মধ্যে আঁকড়ে ধরে চিন্তামগ্ন পদক্ষেপে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তিনি। সপ্তসমুদ্র পার হয়ে তাঁর এই সুদীর্ঘ যাত্রা পথের সে কী ভয়ঙ্কর ইতিহাস। মনে পড়েছিল সেই দুর্দিনের কথা—যেদিন সমুদ্রের বুকের ওপর সুরু হয়েছিল প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের তাণ্ডব। একদিকে যে কোনও মুহূর্তে জাহাজ ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা—অন্যদিকে বিদ্রোহী নাবিকদের সমবেত দাবী আমরা লিসবনে ফিরে যাবো।

ঝড়ের গর্জন ছাপিয়ে সেনাপতির গর্জন ধ্বনিত হয়েছিল ঃ না, হিন্দে না পৌঁছুনো পর্যন্ত আমাদের ফেরার পথ বন্ধ। রাজা মানোএলের জয় হোক।"

['পদসঞ্চার'-শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৫৬, পৃঃ ১৫৭]

'রক্তসন্ধ্যার' সঙ্গে 'পদসঞ্চার'-এর আর একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য গল্পের ঘটনা বিস্তারের পদ্ধতিতে। 'পদসঞ্চার'-এ মূল দ্বন্দ্ব পোর্তুগীজদের সঙ্গে মূর বণিকদের। আরব ব্যবসায়ীদের মুখপাত্র হিসেবে আবু রশীদ নামে একজন বর্ষীয়ান ব্যক্তির উল্লেখ এখানে আছে বটে, কাহিনীতে তাঁর ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তিনি কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে ওঠেননি। কিন্তু 'রক্তসন্ধ্যায়' মূর বণিকদের সঙ্গে পোর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের স্বার্থের সংঘাত দিয়ে সমস্যার সূত্রপাত হলেও শেষ পর্যন্ত তা পরিণত হয়েছে মির্জা দাউদের সঙ্গে ভাস্কো-ডা-গামার প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে। 'পদসঞ্চার'-এ যেখানে জামোরিণের প্রাপ্য বাণিজ্য শুল্ক মিটিয়ে দিতে না পারার জন্যই পোর্তুগীজদের কালিকট ত্যাগ করতে হয়েছে, সেখানে 'রক্তসন্ধ্যায়' ফিরিঙ্গী বণিকদের গোয়া ত্যাগের মূল কারণ মির্জা দাউদের কাছে অসিযুদ্ধে ভাস্কো-ডা-গামার পরাজয়, ও সপ্তাহ মধ্যে কালিকট ত্যাগের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার ঘটনা।

'পদসঞ্চার'-এ ভাস্কো-ডা-গামার তীর্থ যাত্রীদের জাহাজে গোলাবর্ষণ মূরের প্রতি পোর্তুগীজদের ঘৃণা ও প্রতিশোধ-স্পৃহার পরিচয়বাহী। কিন্তু 'রক্তসন্ধ্যায়' ভাস্কো-ডা-গামার অনন্যসাধারণ হিংস্রতা ও পৈশাচিকতার একমাত্র লক্ষ্য মির্জা দাউদের বিরুদ্ধে তার প্রতিহিংসার চরিতার্থ করা। সর্বোপরি কাহিনীর প্রধান চরিত্রের মনে পূর্বজন্মের স্মৃতি জাগরণের ব্যাপারটি 'রক্তসন্ধ্যা'য় বিশেষ প্রাধান্য পেলেও 'পদসঞ্চার'এ এধরণের কোনও ঘটনার উল্লেখ নেই। সুতরাং 'রক্তসন্ধ্যা' ও 'পদসঞ্চার'-এর মধ্যে কিছু বাহ্য সাদৃশ্য থাকলেও কাহিনীর-পরিকল্পনা ও চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে রচয়িতাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বিশেষ-ভাবেই উপলব্ধি করা যায়।

সেতু [১৩৪৩]ঃ সেতু গল্পের বক্তা পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক এক তরুণ বৈজ্ঞানিক, যে অলীক কল্পনার ধার ধারে না। আলোক রশ্মি ঋজু রেখায় চলে কি না এই বিষয়ে তিন বৎসর যাবৎ শ্রমসাধ্য গবেষণা কার্যে ব্যাপৃত থাকার পর যেদিন তার অনুসন্ধানের কাজ সমাপ্ত হয়েছে, সেই রাত্রেই ঘুমের মধ্যে সে দেখেছে এক অদ্ভুত স্বপ্ন—পূর্ব জন্মের জীবন কথা, মৃত্যু এবং পুনরায় জন্মলাভ, অর্থাৎ বিগত জন্ম থেকে সুরু করে বর্তমান জীবনের সূচনা পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা সেই স্বপ্নের মাধ্যমে বিচিত্র ছায়াছবির মতো তার মানসপটে প্রতিফলিত হয়েছে। 'সেতুর' ভূমিকাংশে তরুণ বৈজ্ঞানিকের সেই স্বপ্নাহত বিস্ময় বিমূঢ় অবস্থা 'জাতিস্মরতা' ব্যাপারটিতে নিতান্ত অবিশ্বাসী ব্যক্তির মনকেও প্রস্তুত করে দেয় এমন এক অভিজ্ঞতার শরিক হওয়ার জন্য বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না।

'সেতু'র কাহিনী চিরপুরাতন অথচ চিরনতুন—নারী দেহের অপার সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে পুরুষচিত্তে অনিবার্য রূপতৃষ্ণার চিরাচরিত আলেখ্য। ডঃ সুকুমার সেনের মতানুসারে এ গল্পের কালসীমা খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতাব্দী। কাহিনীর প্রধান পাত্র-পাত্রী—উজ্জয়িনীর দক্ষিণমণ্ডলে উপবিষ্ট শক বাহিনীর একজন পত্তিনায়ক অহিদত্ত রঞ্জুল, উজ্জয়িনীর প্রসিদ্ধ অসিধাবক তণ্ডু এবং তার কুহকিনী লাস্যময়ী ভার্যা রল্লা।

শক যুবক অহিদত্ত বীর, দৃঢ়চেতা পুরুষ। কিন্তু উজ্জয়িনীর বসন্তোৎসবে তাম্রকাঞ্চনবর্ণা উদ্ভিন্নযৌবনা তন্বী রল্লার সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকেই তার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেছে। রল্লার

প্রতি তার সুতীব্র বাসনাই দুর্জয় নিয়তির মতো তাকে আকর্ষণ করে নিয়ে গেছে অসিধাবক তণ্ডুর গৃহে। শুধুমাত্র রল্লার দর্শন লাভের আশাতেই সে অসিসংস্কারের ছলে বারংবার পদার্পণ করেছে তণ্ডুর অস্ত্রাগারে। বৃদ্ধ, জরাবিধ্বস্ত তণ্ডু যে পূর্ণযৌবনা রল্লার স্বামী একথা ভেবে অসিধাবকের প্রতি অহিদত্তের তরুণ হৃদয়ে ঈর্ষার তুফান উঠেছে। ভূয়োদর্শী, সুচতুর তণ্ডুর পক্ষেও তার গৃহে যুবক অহিদত্তের পুনঃপুনঃ আগমনের প্রকৃত কারণ অনুধাবন করা কষ্টকর হয়নি, তাই একদিন অসিসংস্কার কালেই তণ্ডু তার সম্মুখে উপবিষ্ট অহিদত্তকে ব্যঙ্গের আঘাতে উত্তেজিত করে তুলেছে এবং তাদের বাক্‌বিতণ্ডার এক চরম মুহূর্তে ক্ষিপ্ত, ক্রোধোন্মত্ত তণ্ডু অহিদত্তেরই সদ্যসংস্কৃত, সুতীক্ষ্ণ অসির দ্বারা তার প্রাণনাশ করেছে।

শরদিন্দুর অন্যান্য ইতিহাসগন্ধী রচনার মতো 'সেতু'তেও ধূসর অতীতকে কল্পনার প্রগাঢ় বর্ণানুলেপনে উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত করে তোলার অপরূপ কৌশল প্রকাশিত হয়েছে। নারীকে কেন্দ্র করে পুরুষের মোহমত্ততা ও রূপাসক্তি এবং প্রণয় বিলাসিনী রমণীর আকাঙ্ক্ষার অপূর্ণতাজনিত চিত্ত বিক্ষোভের চিত্রাঙ্কনে লেখকের পারদর্শিতার পরিচয় শুধু 'সেতু'তেই নয়, এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বহু উপন্যাসে ও গল্পেই পাওয়া যায়, কিন্তু কাহিনী হিসাবে সেতুর স্বতন্ত্র মূল্য অন্যত্র নিহিত। তণ্ডু কর্তৃক নিহত হওয়ার পর অহিদত্তের দেহমুক্ত আত্মার স্বাধীন বিহারকে কেন্দ্র করে প্রেতলোক ও চন্দ্রলোকের যে কাল্পনিক চিত্র এ গল্পে আঁকা হয়েছে তা এককথায় অনবদ্য। লোকলোকান্তরে বিচরণের পর কোনও এক অদৃশ্য শক্তির আদেশে পুনরায় তার মর্ত্যে আগমন এবং মাতৃ-জঠরকে আশ্রয় করে দেহের বন্ধনে পুনর্বার আবদ্ধ হওয়ার সহজ ও সরল বর্ণনাও কৌতূহলোদ্দীপক।

বাঘের বাচ্চা : [১৩৩৮] 'বাঘের বাচ্চা' শরদিন্দুবাবুর লেখা বহু প্রশংসিত গল্প-গুলির অন্যতম। এই কাহিনীর ঐতিহাসিক উপাদান সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—

"বাঘের বাচ্চা'র মূল কথাটি Elphinstone এর History of India-র একটি পংক্তিতে পাওয়া যায়, অন্য কোথাও উহার উল্লেখ আছে কিনা জানিনা। স্যার যদুনাথের 'শিবাজী'তে কিছু নাই।

[লেখকের নোটস, শরদিন্দু অমনিবাস ষষ্ঠ খণ্ডে গল্প-পরিচয় দ্রষ্টব্য]

'বাঘের বাচ্চা' গল্পে স্বল্প পরিসরে, উল্লিখিত সূত্রটুকু অবলম্বন করে, ইতিহাসবিশ্রুত মারাঠা কেশরী শিবাজীর কৈশোর কালের আকৃতি ও প্রকৃতির অপূর্ব অথচ বাস্তবসম্মত পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ঘটনা অবলম্বনে কুশলী-কাহিনীকার ভবিষ্যতের মোগল-ত্রাস, মারাঠা সাম্রাজ্যের ভাবী অধীশ্বর, অসাধারণ মানসিক শক্তির অধিকারী শিবাজীর এক উজ্জ্বল চিত্র পাঠকের মনোলোকে মুদ্রিত করে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে তার আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা লক্ষণীয়—

"দ্বিতীয় আরোহীটি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বয়স বোধকরি ষোল বৎসর অতিক্রম করে নাই···সহসা এই বালকের মুখ দেখিলে একটা অপূর্ব বিভ্রম জন্মে, মনে হয় যেন

একখানা তীক্ষ্ণধার বাঁকা কৃপাণ সূর্যালোকে ঝক ঝক করিতেছে।"

মুখ হইতে দৃষ্টি নামাইয়া দেহের প্রতি চাহিলে কিন্তু আরো চমক লাগে। মুখের মতো দেহের সৌষ্ঠব নাই, প্রস্থের তুলনায় দৈর্ঘ্যে দেহ অত্যন্ত খর্ব। প্রথমেই মনে হয়, অতিশয় বলশালী। কটি হইতে পায়ে শুঁড়তোলা নাগরা জুতো পর্যন্ত প্রাণসার অথচ ক্ষীণ, মৃগচরণের মতো যেন অতি দ্রুত দৌড়াবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু কটি হইতে উর্দ্ধে দেহ ক্রমশঃ প্রশস্ত হইয়া বক্ষস্থলে এরূপ বিশাল আয়তন ধারণ করিয়াছে যে বিস্মিত হইতে হয়।"

আলোচ্য গল্পে শিবাজীর এই রূপচিত্রণে শরদিন্দুর অপূর্ব নৈপুণ্য সম্পর্কে প্রথমনাথ বিশীর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য—

"বাঘের বাচ্চা' গল্পে কিশোর শিবাজীর চিত্র পাওয়া যায়। কিশোর শিবাজীকে কোথাও দেখি নাই। শিবাজীর শরীরের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাহা আশ্চর্য রকমের বস্তুগত। শিবাজীর দেহের ঊর্ধ্বার্ধ যে নিম্নার্ধের অপেক্ষা সবল ও পুষ্ট ছিল, ইহা শরদিন্দুবাবু কোথাও পড়িয়াছেন কিনা জানিনা; কিন্তু শিবাজীর অশ্বারূঢ় চিত্র দেখিলেই এই কথাটি মনে হয়। বোধহয় ইহা শিবাজীর প্রতিষ্ঠিত মহারাষ্ট্র রাজ্যেরও প্রতীক। শিবাজীর মৃত্যুর এক শতাব্দীর মধ্যেই মহারাষ্ট্র রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া পড়িল; তাহার নিম্নার্ধ বা ভিত্তি অস্পষ্ট ছিল, ইহাই বোধ করি তাহার সবচেয়ে বড় কারণ।"

[শরদিন্দু অম্নিবাস ষষ্ঠ খণ্ডে গল্প পরিচয় দ্রষ্টব্য]

'বাঘের বাচ্চা' গল্পে শুধু শিবাজীর আকৃতিগত বৈশিষ্টই নয়, তাঁর প্রকৃতিগত অসাধারণত্বগুলিও সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক বৃদ্ধ দাদোজী কোণ্ডর সঙ্গে কিশোর শিবাজীর কথোপকথন প্রসঙ্গে তাঁর নির্ভীক মনোভাবটি সার্থকরূপে ধরা পড়ে। নিরীহ, ক্ষুদ্র শশককে বধ করতে তাঁর মন ওঠে না, ইচ্ছা বাঘ শিকার। নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে সেই প্রবল প্রতিপক্ষকে হত্যা করা নয়, মাটিতে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে বল্লম দিয়ে ব্যাঘ্র বধই তাঁর লক্ষ্য। তাঁর এই বিস্ময়কর মনোবাসনার পরিচয় পেয়ে দাদোজী জানতে চেয়েছেন—

"ভয় করবে না?"

"ভয়!" বালকের উচ্চহাস্য আবার চারিদিকে প্রতিধ্বনি তুলল।

"আচ্ছা দাদো, ভয় জিনিসটা কি আমাকে বুঝিয়ে বলতে পারো? সকলের মুখেই ওই কথাটা শুনতে পাই, কিন্তু ওটা যে কি পদার্থ তা বুঝতে পারি না।"

শিবাজীর এই নিঃশঙ্ক মনোভাবের সঙ্গে বিজড়িত ছিল আরও একটি বৈশিষ্ট্য—তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধিমত্তা, রাজপুতদের মতো দৈহিক বীরত্ব বা বাহুবলই তাঁর কাছে বড় কথা নয়, তাঁর বিবেচনায় বুদ্ধিই মানুষের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। দাদোজীর কাছে 'সম্মুখ যুদ্ধ' সম্পর্কে প্রশ্ন করে শিবাজী যখন জানতে পারেন—

"সম্মুখ যুদ্ধ মানে সামনা-সামনি শক্তি পরীক্ষা। যার শক্তি বেশী সেই জিতবে।" তখন তাঁর প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে লক্ষণীয়—দাদোজীর কাছে তিনি জানতে চান—

"আর যার শক্তি কম, সে যদি চালাকি করে জিতে যায় ?"

"সে তো আর ধর্মযুদ্ধ হল না।"

"নাই বা হল ! যুদ্ধে হার-জিৎই তো আসল—ধর্মযুদ্ধ হল কি না তা দেখে লাভ কি ?"

—এই কথোপকথন থেকেই বুঝতে পারা যায় শিবাজীর প্রধান অস্ত্র ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, যার সাহায্যে তিনি পরবর্তীকালে প্রবল পরাক্রমশালী ও কূটকৌশলী মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবকে পর্যন্ত পরাস্ত করেছিলেন।

শিবাজীর অপূর্ব সাংগঠনিক প্রতিভা এবং সুগভীর মাতৃভক্তির পরিচয়ও এ গল্পে অব্যক্ত থাকেনি। 'বাঘের বাচ্চা'য় কল্পনার প্রাধান্য অনস্বীকার্য, কিন্তু তা ইতিহাস বিরোধী নয়, বরং ইতিহাসের সূক্ষ্ম, শুষ্ক তথ্যগুলিকে জীবনরসে পরিপূর্ণ করে তুলতে লেখকের কল্পনাশক্তির ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এ কাহিনীতে শিবাজীর পরিচয় ছাড়া আরও একটি উপভোগ্য বিষয় দাদোজী কোণ্ডু কর্তৃক বিবৃত শিবাজীর পিতা শাহজীর সঙ্গে শিবাজী-জননী জিজাবাঈয়ের বিবাহ প্রসঙ্গটি।

গল্পটির নাম এবং দাদোজী কোণ্ডুর একাধিক উক্তির মাধ্যমে এই সত্যের দিকেই লেখক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, যে ধূর্ততা ও চাতুর্য কিশোর শিবাজীর চরিত্রে পরিলক্ষিত হয়, তা তাঁর পিতামহ মালোজী ও পিতা শাহজীর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। অবশ্য বংশগত বুদ্ধিমত্তার ঐতিহ্যটি শিবাজীর মধ্যেই চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল।

পরিশেষে উল্লেখ করি এ গল্পে বর্ণিত নৈসর্গিক পটভূমির কথা। পরিবেশের যথাযথ চিত্রণে শরদিন্দুর পারদর্শিতা বহু ক্ষেত্রেই প্রমাণিত। আলোচ্য কাহিনীতেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি।—

গল্পের সূচনাতেই পুণার পার্শ্ববর্তী পার্বত্য প্রদেশের সজীব বর্ণনা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য—

> "পুণাগ্রাম হইতে প্রায় সাত-আট ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে উপত্যকা হইতে বহু ঊর্ধ্বে গিরিসংকটের ভিতর দিয়া দুইজন সওয়ার নিম্নাভিমুখে অবতরণ করিতেছিল। চারিদিকেই উচ্চ-নীচ ছোট-বড় পাহাড়ের শ্রেণী,—যেন কতকগুলা অতিকায় কুম্ভীর পরস্পর ঘেঁষাঘেঁষি হইয়া তাল পাকাইয়া এই হেমন্ত অপরাহ্নের সোনালী রৌদ্রে শুইয়া আছে।"

ভাষার এই চিত্র সৌন্দর্য যে কতখানি চিত্তস্পর্শী রসিক পাঠকমাত্রই তা উপলব্ধি করে থাকেন।

অষ্টম সর্গ [১৩৪০] ঃ 'অষ্টম সর্গ' গল্পটি কিংবদন্তীমূলক। একটি সাহিত্যিক বিতর্ককে কেন্দ্র করে এ কাহিনী রচিত। সপ্তদশ সর্গে গ্রথিত 'কুমারসম্ভবম্' কাব্য কালিদাসের রচনা হিসেবে খ্যাতি লাভ করলেও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতে সম্পূর্ণ 'কুমার-সম্ভবম্' কালিদাসের রচনা নয়, তিনি এ কাব্যের সপ্তম সর্গ পর্যন্ত রচনা করেছিলেন। অষ্টম থেকে সপ্তদশ সর্গ পর্যন্ত অন্য কোনও কবির রচনা। 'অষ্টম সর্গ'-এর গল্পকার

কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ করতেন। অন্তত আলোচ্য গল্পে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে 'কুমারসম্ভবম্' কাব্যের 'অষ্টম সর্গ' কালিদাসেরই রচনা। এই কাহিনীতে ইতিহাসকে অন্বেষণ করা যে বৃথা তা স্বয়ং লেখকের বক্তব্য থেকেই প্রমাণিত হয়—

"অষ্টম সর্গ গল্পে যে যুগের অবতারণা করিয়াছি সে যুগের কোনও স্পষ্ট ইতিহাস নাই, বিভিন্ন মতাবলম্বী অনুমান মাত্র আছে। যে মানুষগুলিকে এই গল্পে অবতারিত করা হইয়াছে তাঁহারা কোন্ শতকের লোক ছিলেন এবং একই কালে জীবিত ছিলেন কিনা এই ক্ষুদ্র প্রশ্নের মীমাংসা করা গল্পের বিষয়ীভূত নয়। ইতিহাসের অস্পষ্টতার সুযোগ লইয়া আমি তাঁহাদের সমসাময়িক রূপে কল্পনা করিয়াছি। কুমারসম্ভব কাব্যের অষ্টম সর্গ যে স্বয়ং কালিদাসের রচনা তাহা এই কাহিনীর প্রতিপাদ্য না হইলেও মুখ্য বক্তব্য বটে।" [শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ডে গল্প পরিচয় দ্রষ্টব্য]

কুমারসম্ভবের 'অষ্টম সর্গ' প্রকৃতপক্ষে কালিদাসের রচনা কি না সে বিষয়ে যত সন্দেহই থাক গল্প হিসাবে 'অষ্টম সর্গের' সাফল্য সন্দেহাতীত।

শরদিন্দুর মোহিনী কল্পনার যাদু স্পর্শে সেকালের উজ্জয়িনী, তার পার্শ্বে প্রবাহিতা শিপ্রা নদী, গম্ভীর আরতিধ্বনিপূর্ণ মহাকাল মন্দির, নগরীর পথ-ঘাট, নাগরিকবৃন্দের সৌন্দর্য ও ব্যসনপ্রিয়তা—সকল কিছুই প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। এই পরিবেশ চিত্রণে সম্ভবতঃ তাঁকে সাহায্য করেছে কালিদাসেরই 'মেঘদূত' কাব্যখানি।

কালিদাসের তিক্ত দাম্পত্য জীবনের যে পরিচয় এ কাহিনীতে উদ্ঘাটিত হয়েছে তা কাল্পনিক। প্রতিভাবান, নির্বিরোধী, সচ্চরিত্র স্বামীর প্রতি সন্দেহপরায়ণা কবি-পত্নী আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারেন না বটে, কিন্তু চরিত্র হিসেবে সজীব সৃষ্টি।

প্রিয়দর্শিকা শুধু নামে বা রূপেই সুন্দরী নয়, তার স্বভাবটিও বড় মধুর। উজ্জয়িনীর এই বারাঙ্গনার আচার-আচরণে পরিচ্ছন্ন, মার্জিত রুচির চিহ্ন সুপরিস্ফুট। তার সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও গভীর রসোপভোগ শক্তির পরিচয়ও 'অষ্টম সর্গ' গল্পে সূচিত্রিত। কবি কালিদাসের সঙ্গে তার নিষ্কাম প্রীতির অনাবিল সম্পর্কটি চিত্তাকর্ষক।

'অষ্টম সর্গ' রচনার পূর্বে একদিকে শাস্ত্র, অন্যদিকে জীবনসত্য—এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে জর্জরিত মহাকবির মনোভাবটির সার্থক প্রকাশ ঘটেছে। বরাহমিহির, অমর সিংহ প্রভৃতি ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণকে কালিদাসের সমসাময়িকরূপে চিহ্নিত করা যায় কি না সে বিষয়ে তর্কের অবকাশ থাকলেও একথা অনস্বীকার্য যে উক্ত চরিত্রগুলি এই ক্ষুদ্রাবয়ব কাহিনীটিতে কিঞ্চিৎ কৌতুকরসের সঞ্চার করেছে।

চুয়াচন্দন [১৩৪১] : ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকের কালসীমায়, নবদ্বীপের পটভূমিকার রচিত 'চুয়াচন্দন' একটি চিত্তজয়ী, প্রণয়-মধুর কাহিনী।

এ গল্পের শীর্ষনাম নায়িকা এবং নায়ক উভয়েরই নাম সমন্বয়ে রচিত। নায়িকা 'চুয়া' নবদ্বীপের স্বর্গত বণিক কাঞ্চন দাসের কন্যা। নায়ক চন্দন দাস অগ্রদ্বীপের সুবিখ্যাত সদাগর রূপচাঁদ সাধুর পুত্র।

কোথায় নবদ্বীপের অভাগিনী চুয়া! আর কোথায় অগ্রদ্বীপের সৌভাগ্য লক্ষ্মীর বরপুত্র চন্দন! তবু "একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে কী ছিল বিধাতার মনে।" নবদ্বীপের পথেই তাদের প্রথম দেখা। সেই প্রথম দর্শনেই তরুণ চন্দন দাসের হৃদয়ে ষোড়শী চুয়ার প্রতি পূর্বরাগ সঞ্চারিত হয়, তারপর বহু প্রতিকূলতা অতিক্রম করে তাদের বাঞ্ছিত মিলনেই কাহিনীর পরিসমাপ্তি।

'চুয়াচন্দন'-এর বিষয়বস্তুতে উল্লেখযোগ্য কোনও অভিনবত্ব নেই, কারণ তা সাধারণ রোমান্টিক প্রণয় কাহিনীগুলিরই অনুরূপ। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তার যথাযোগ্য উপস্থাপনার গুণে ও ঘটনাগ্রন্থনের অপূর্ব কৌশলে সাধারণ বক্তব্যই অসাধারণ রস বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে।

আলোচ্য গল্পে নানা প্রসঙ্গে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকের অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ববর্তীকালের নবদ্বীপের যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবক্ষয় ও নৈরাজ্যের চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে তার ঐতিহাসিক যাথার্থ্য সন্দেহাতীত। বিশেষতঃ দেশে সেই অরাজকতার কালে বৌদ্ধতান্ত্রিকতার সঙ্গে শাক্ত ও শৈব মতবাদ মিশ্রিত হয়ে যে বীভৎস বামাচার উদ্ভূত হয়েছিল, মাতৃকাসাধনার নামে যে নারীলোলুপতা ও ব্যাভিচার অবাধ প্রশ্রয় লাভ করেছিল তার পরিচয় আত্মীয় পরিজনহীনা 'চুয়া'র প্রতি দুর্ললিত মাধবের অত্যাচারের মাধ্যমে লেখক মূর্ত করে তুলেছেন।

কিন্তু সেই নৈরাজ্য ও অবক্ষয়ের দিনেও নবদ্বীপ শহরের অবশিষ্ট সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের পরিচয়টুকু এ গল্পে অনুদ্ঘাটিত থাকেনি—এই প্রসঙ্গে চন্দন দাসের নগর দর্শন উপলক্ষে লেখকের বর্ণনা লক্ষণীয়—

> "সে-সময় নবদ্বীপের সমৃদ্ধির বিশেষ খ্যাতি ছিল। পথে পথে নাট্যশালা, পাঠশালা, চূর্ণ বিলেপিত দেউল, প্রতি গৃহচূড়ায় বিচিত্র ধাতু-কলস, প্রতি দ্বারে কারুখচিত কপাট; বাজারের এক বিপণিতে লক্ষ তঙ্কার সওদা কেনা যায়। পথগুলি সংকীর্ণ বটে, কিন্তু তাহাতে নগরশ্রী আরও ঘনীভূত হইয়াছে। রাজপথে বহু লোকের ব্যস্ত যাতায়াত নগরকে সজীব ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে।"

'চুয়াচন্দন'-এ মাত্র একজন ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরই সক্রিয় উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় —তিনি নিমাই পণ্ডিত। প্রকৃতপক্ষে চুয়া ও চন্দনের প্রণয়-পর্ব যতই রোমান্টিক হোক না কেন এ কাহিনীর সর্বাপেক্ষা বড়ো আকর্ষণ নিমাই পণ্ডিতের অনবদ্য ভূমিকা। এই নিমাই মুণ্ডিত-মস্তক কৌপীনধারী, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নন, লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যুর পর মাতৃইচ্ছা পূরণের জন্য তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে ঘরে এনেছেন বটে, কিন্তু তখনও পিতৃ পিণ্ডদানের উদ্দেশ্যে গয়া গমন করেননি, নদীয়ায় টোল খুলে ছাত্র পড়াচ্ছেন—

> "এ সেই দুর্দান্ত বিদ্বান, মূর্খ পণ্ডিতদের মূর্তিমান ভয়স্বরূপ, দৈব প্রতিভায় সমুজ্জ্বল, এক ডুবে গঙ্গাগর্ভ-নিমজ্জিত পণ্ডিতের টিকি ধরিয়া টানিয়া তোলা, প্রচুর হাস্যে প্রগলভ, সন্ন্যাস-পূর্ববর্তী চৈতন্যদেবের চিত্র।"

[প্রমথনাথ বিশী] [শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ডে গল্প পরিচয় দ্রষ্টব্য]

কোনও কোনও চৈতন্য জীবনীগ্রন্থে গয়া গমনের পূর্ব পর্যন্ত তরুণ নিমাইয়ের চরিত্রের এই

অমিত প্রাণ প্রাচুর্য ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় কিছু কিছু পাওয়া যায় বটে, কিন্তু শরদিন্দুবাবু তাঁর গল্পে সেই ক্ষীণ সূত্রগুলি অবলম্বন করে 'নিমাই পণ্ডিত'কে যেভাবে উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত করে এঁকেছেন তার তুলনা বিরল। কাহিনীর সূচনায় আকস্মিক স্রোতাভিঘাতে নিমজ্জমান প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বাণভট্টকে উদ্ধার প্রসঙ্গে তাঁর পাণ্ডিত্যসমুজ্জ্বল, রঙ্গপ্রিয় চরিত্রটি যেমন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তেমনি চন্দন দাসের সঙ্গে কথাবার্তায় তাঁর নির্ভীক অথচ সংবেদনশীল হৃদয়টি সার্থক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর বাচনভঙ্গীতে কখনও ফুটে ওঠে অম্লমধুর ব্যঙ্গ, কখনও বা অনুভূত হয় স্মিত কৌতুক। যেমন, বাণভট্ট গঙ্গা বক্ষে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে নিমাই পণ্ডিতকে প্রশ্ন করেন……

"··নিপাতন, তুমিই জল থেকে টেনে তুলেছ, না ?"

নিপাতন বলিল, "উঁহু, আপনাকে টেনে তুলেছে আপনার প্রচণ্ড পাণ্ডিত্যের বিজয় নিশান।"

"সে কি ?"

"আপনার নধর শিখাটিই আপনার প্রাণদাতা! ওটি না থাকলে কিছুতেই টেনে তুলতে পারতাম না।"

এখানে শিখাধারী পণ্ডিতের প্রতি নিমাইয়ের ব্যঙ্গপূর্ণ কটাক্ষ নিঃসন্দেহেই উপভোগ্য।

আবার চন্দন দাসের উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে পরিপূর্ণ সহায়তা করে প্রস্থানোদ্যত নিমাই পণ্ডিতকে সদ্যবিবাহিত চন্দন তার নৌকাতেই রাত্রি যাপনের জন্য অনুরোধ জানালে নিমাই যখন বলেন—

"না—আজই আমায় ফিরিতে হবে। রাত্রিতে না ফিরিলে মা চিন্তিত হবেন। তাছাড়া, তোমার নৌকায় তো একটি বই ঘর নেই।"

মৃদুহাস্য মিশ্রিত শেষোক্ত বাক্যটির গূঢ়ার্থে চন্দন দাস একটু লজ্জিত হয় বটে, কিন্তু এই রসিকতা "চুয়াচন্দনের" পাঠককে মুগ্ধ না করে পারে না।

নদীবক্ষে নৌকায় চুয়া ও চন্দনের রাক্ষসবিবাহের পুরোহিত রূপে নিমাইয়ের যে অভূতপূর্ব ভূমিকা শরদিন্দুর লেখনীতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে তা কাল্পনিক হলেও তাঁর ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে এমনই সামঞ্জস্যপূর্ণ যে তাঁর এই নবীন মধুর পরিচয়টিকেই একমাত্র সত্য বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে। এ প্রসঙ্গে রসজ্ঞ সমালোচক প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

"যে চৈতন্য একদিন বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই, তিনি আবার একদিন অন্ধকারে রাত্রে মাঝ গঙ্গায় চন্দনের সহিত চুয়ার রাক্ষস-বিবাহ দিয়াছিলেন এমনতর মিথ্যা-সত্য ইহার আগে পড়ি নাই। যাঁহারা চৈতন্যদেবের গতানুগতিক চিত্র দেখিয়া বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা এ দৃশ্য দেখিলে চৈতন্যদেবের ভক্ত হইয়া উঠিবেন, আশা করিতেছি।"

[শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড গল্প পরিচয় দ্রষ্টব্য]

আলোচ্য কাহিনীতে আর একটি পরিচিত জনের সঙ্গে আমাদের পলকের জন্য

সাক্ষাৎ হয় তিনি গৌরাঙ্গ-ঘরণী 'বিষ্ণুপ্রিয়া'। অভুক্ত চন্দনদাসের আহার্যের ব্যবস্থা করার জন্য নিমাই অন্তঃপুরে উপস্থিত হলে পাঠকের সম্মুখে এক দুর্লভ দৃশ্যের অবতারণা ঘটে—

> "বেলা তখন তৃতীয় প্রহর। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ভৃত্য-পরিজন সকলকে খাওয়াইয়া নিজে আহারে বসিতে যাইতেছিলেন, নিমাই গিয়া বলিলেন, "একজন অতিথি এসেছে। খেতে দিতে পারবে ?"
> বিষ্ণুপ্রিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "পারব"। তারপর ক্ষিপ্রহস্তে দালানে জল-ছড়া দিয়া পিঁড়ি পাতিয়া নিজের অন্নব্যঞ্জন অতিথির জন্য ধরিয়া দিয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিলেন।"

—ক্ষণকালের দেখায় বিষ্ণুপ্রিয়ার এই সেবাপরায়ণতা ও অতিথি বাৎসল্য আমাদের মানস পটে চিরমুদ্রিত হয়ে থাকে।

চন্দনদাসের চরিত্রটি কাল্পনিক হলেও, সেকালের বাঙালী বণিক পুত্রদের সে যোগ্য প্রতিনিধি। একুশ-বাইশ বৎসর বয়স্ক এই সুদর্শন যুবকটি শুধু যে বাকপটু, বিনয়ী ও সৌখীন প্রকৃতির তা নয়, তার মধ্যে আবেগপ্রাচুর্যও পরিলক্ষিত হয়। নবদ্বীপের পথে অনিন্দ্য-সুন্দরী চুয়াকে দেখামাত্রই সে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। তদুপরি নানা সূত্রে সে যখন অনুভব করেছে মেয়েটি বেণের মেয়ে অর্থাৎ তাদেরই স্বজাতি, তখন এক অপ্রতিরোধ্য কৌতূহলে আবিষ্ট হয়ে সে মেয়েটির পরিচয় জানবার জন্য তাকে অনুসরণ করে উপস্থিত হয়েছে নবদ্বীপের এক দরিদ্র পল্লীতে। তারপর যে কৌশলে সে বৃদ্ধা আইমার কাছ থেকে চুয়ার দুঃখ-বিড়ম্বনাপূর্ণ জীবনের সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেছে তাতে তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। পাষণ্ড মাধবের কবল থেকে চুয়াকে উদ্ধার করা সর্প বিজড়িত শতদল চয়নের মতই দুঃসাধ্য, বিশেষতঃ এই শহরে চন্দন বহিরাগত বিদেশী আর জমিদারের ভ্রাতুষ্পুত্র মাধব নদীয়ার এক দোর্দণ্ড প্রভাবশালী ব্যক্তি। কিন্তু চুয়ার প্রতি চন্দনের হৃদয়াবেগ চপলমতি, লঘুচিত্ত যুবকের সাময়িক মোহ নয়, তা আন্তরিক সহানুভূতি মিশ্রিত সুগভীর প্রেমাকর্ষণ। তাই দুরাচারী প্রতিপক্ষের সমস্ত কীর্তিকলাপের কথা জেনে বা তার প্রতিপত্তির চাক্ষুষ পরিচয় পেয়েও চন্দন চুয়াকে উদ্ধারের সঙ্কল্পে অবিচল থেকেছে।

শুধু প্রেম নয়, অসাধ্য সাধন করার মত অত্যন্ত তীক্ষ্ণ অথচ স্থির বুদ্ধি তার চরিত্রের অন্যতম সম্পদ। চরম উত্তেজনার মুহূর্তেও সে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়নি। দুর্দান্ত মাধবকে মুষ্ট্যাঘাত করে তারই ঘোড়ায় চড়ে পলায়ন করার মধ্যে কিঞ্চিৎ হঠকারিতা প্রকাশ পেলেও এই ঘটনার পরবর্তী প্রত্যেকটি আচরণেই তার বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। মাঝিদের মাধ্যমে নিজের নৌকাগুলিকে নিরাপদ দূরত্বে প্রেরণ করার থেকে শুরু করে চুয়া হরণের পর সেই রাত্রেই গঙ্গাবক্ষে তাদের বিবাহ সম্পাদনের জন্য নিমাই পণ্ডিতকে অনুরোধ জানানো পর্যন্ত প্রতিটি কাজেই তার চাতুর্য ও লোকচরিত্রাভিজ্ঞতার পরিচয় অনায়াসলভ্য। এক কথায় চন্দনদাস সেকালের বুদ্ধিদীপ্ত, হৃদয়বান বঙ্গ যুবকদের উপযুক্ত প্রতিভূ।

এ কাহিনীর ঘটনাস্রোত যাকে ঘিরে আলোড়িত হয়েছে সেই 'চুয়া' কিন্তু বহুলাংশেই নিষ্ক্রিয় চরিত্র। সে বিষকন্যার 'উল্কা' বা 'মৃৎপ্রদীপ'-এর সোমদত্তার মত প্রখর ব্যক্তিত্ব-শালিনী নয়, তার জীবনে চন্দনের আকস্মিক আবির্ভাব না ঘটলে সে অন্তরে শত দুঃখ সত্ত্বেও বিনা প্রতিবাদেই পাপাচারী মাধবের লালসার যূপকাষ্ঠে আত্মদান করত। প্রতিকূল ভাগ্যকে জয় করার কোনও চেষ্টাই সে করেনি, শুধু মাঝে মাঝে এই যন্ত্রণাময় জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তার নদীগর্ভে আত্মবিসর্জন দিতে ইচ্ছে করেছে বটে কিন্তু তার সন্তরণ-পটুত্বের জন্যই সে ইচ্ছাকে ফলবতী করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য অদৃষ্টের কাছে এই নীরব আত্মসমর্পণের মনোভাবই তার চরিত্রটিকে যুগোপযোগী করে তুলেছে। চুয়ার স্রষ্টা শরদিন্দু তাকে আকৃতি ও প্রকৃতি উভয় দিক দিয়েই মধ্যযুগের বাঙালী নারী করে গড়েছেন। ইতিহাস-আশ্রিত অন্যান্য গল্প বা উপন্যাসগুলিতে নায়িকার রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে যেখানে শরদিন্দু সংস্কৃত সাহিত্যের, বিশেষতঃ মহাকবি কালিদাসের রচনার শরণাপন্ন হয়েছেন, সেখানে চুয়ার রূপমাধুরীর বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন,—

"পূর্ণ যৌবনা ষোড়শী—তাহার রূপের বর্ণনা করিতে গিয়া হতাশ হইতে হয়। বৈষ্ণব রসসাহিত্য নিঙড়াইয়া এই রূপের একটা কাঠামো খাড়া করা যাইতে পারে ; হয়তো এমনই কোন গোরোচনা গোরী নবীনার নববিকশিত রূপ দেখিয়া প্রেমিক বৈষ্ণব কবি তাঁহার রাই-কমলিনীকে গড়িয়াছিলেন, কে বলিতে পারে।"

এই মধুর রূপ ও কোমল স্বভাব বিশিষ্টা তরুণীটিকে অজানা ভবিষ্যতের ভাবনায় একবারমাত্র মুখর হয়ে উঠতে দেখি—চুয়াকে অপহরণের পূর্বরাত্রের তৃতীয় প্রহরে চন্দনদাস চুয়ার সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাৎ করে যখন তাকে আগামী দিনের সমস্ত পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিতে এসেছে.........

"তখন সে আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না, চন্দন দাসের পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িল। দুই হাতে পা জড়াইয়া কাঁদিয়া কহিল, "একটা কথা বলো।"

চন্দনদাস চুয়ার মুখ তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, "চুয়া, চুয়া, কি কথা?"

বলো, আমায় বিয়ে করবে ? তুমি আমায় প্রবঞ্চনা করছ না ?"

সর্বোপরি, এ গল্পেও শরদিন্দুর কাহিনী-কথন ভঙ্গিটুকু অত্যন্ত উপভোগ্য। বিশেষতঃ চুয়াহরণের কঠিন-সাধ্য পরিকল্পনার সূচনা থেকে তা কার্যে পরিণত করা পর্যন্ত তীব্র কৌতূহল ও উৎকণ্ঠা পাঠক-হৃদয়কে উৎসুক করে রাখে। কোনও গভীর জীবন-সমস্যা না থাকলেও ঘটনাবৈচিত্র্যে এবং নাটকীয় উদ্দীপনায় 'চুয়াচন্দন' একটি রমণীয় কাহিনী।

চন্দন মূর্তি [১৩৪৩] ঃ 'চন্দন মূর্তি' গল্পে আমরা এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর সাক্ষাৎ লাভ করি, তাঁর নাম ভিক্ষু অভিরাম। বৌদ্ধ শাস্ত্রে মহাপ্রাজ্ঞ এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর চরিত্রে শুধু বিনয়, নম্রতা ও তথাগতের প্রতি গভীর ভক্তিই পরিস্ফুট হয়নি, প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আপাতকোমল হৃদয়ের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন বজ্রতুল্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যা মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের পথে শত প্রতিকূলতাকে অনায়াসেই তুচ্ছ করতে পারে। সংক্ষেপে আলোচ্য

কাহিনীর বিষয়বস্তু এইরূপ—গোতম বুদ্ধের অবিকল প্রতিকৃতি একটি দুষ্প্রাপ্য চন্দন মূর্তির সন্ধান পাওয়ার জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুটির সযত্ন প্রয়াস—একটি শিলালিপির মাধ্যমে সেই আকাঙ্ক্ষিত মূর্তিটির সঠিক অবস্থান সম্পর্কে ইঙ্গিত লাভ, তারপর শাক্যসিংহের সেই মূর্তি দর্শনের জন্য অপরিসীম ব্যাকুলতা বক্ষে নিয়ে যোগ্যসঙ্গী জ্ঞানলিপ্সু বিভূতিবাবুর সঙ্গে দুর্গম পথ যাত্রা,—পরিণামে প্রকৃতির এক নিষ্ঠুর খেয়ালে সেই মহাজীবনের পরি-পরিসমাপ্তি। কিন্তু তাঁর অন্বেষণ ব্যর্থ নয়, তাঁর সাধনা সফল, কারণ তাঁর বহু বাঞ্ছিত চন্দন মূর্তি তিনি দর্শন করেছিলেন, তাই মৃত্যুর মুহূর্তেও তাঁর মুখ এক অনির্বচনীয়, জ্যোর্তিময় আনন্দে ছিল সমুদ্ভাসিত।

'চন্দন মূর্তি' পাঠকালেই বোঝা যায় বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের প্রতি শরদিন্দুর ছিল সুগভীর অনুরাগ, কিন্তু সাহিত্য হিসাবে এ কাহিনী রসোত্তীর্ণ হতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। বুদ্ধের আটশত বৎসরের প্রাচীন চন্দন মূর্তিকে কেন্দ্র করে নানা বিবরণ ও আলোচনার বিস্তার গল্পটিকে যতখানি তথ্যেভারাক্রান্ত করেছে ততখানি মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারেনি। ভিক্ষু অভিরামের চরিত্র সরল, একমুখী ও বৈচিত্র্যহীন। যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্ব, বৈপরীত্যধর্মী প্রবৃত্তিসমূহের বিচিত্র সংঘাত কোনও চরিত্রকে আকর্ষণীয় ও আধুনিক করে তোলে, ভিক্ষু অভিরামের মধ্যে তার বিশেষ অভাবই পরিলক্ষিত হয়। তাঁর জীবন-সাধনা আমাদের অন্তরে শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ের সঞ্চার করে মাত্র, কিন্তু সহানুভূতি সৃষ্টি করতে পারে না।

মরু ও সঙ্ঘ [১৩৪৪]ঃ শরদিন্দু অম্নিবাস ষষ্ঠ খণ্ডের ভূমিকাংশে ড. সুকুমার সেনের লেখায় 'মরু ও সংঘ' গল্পের ঐতিহাসিক উপাদানটুকু যথাযথ রূপে বিশ্লেষিত হয়েছে, তাঁর বিবৃতি থেকেই জানা যায়,—

"চীনীয় তুর্কিস্থান একদা সরস উর্বর ভূখণ্ড ছিল, সেখানে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ চর্চা হ'ত। কালক্রমে গোবি মরুভূমির বালিরাশি সে ভূখণ্ডকে গ্রাস ক'রে ফেলে এবং সব কিছুই বালিতে চাপা পড়ে যায়। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনীয় তুর্কিস্থানের মরুভূমি খুঁড়ে প্রাচীন শহরের ও বিহারের ভগ্নস্তূপ এবং বহুলেখা পাওয়া যায়। তাহাতে সে দেশের ইতিহাস, সে দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ এবং তত্র বৌদ্ধধর্মের পরিণতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য মিলেছে। চীনীয় তুর্কিস্থানের এই মরুগ্রাস ঘটনাকে অবলম্বন করে এই গল্পটি লেখা হয়েছে।"

আলোচ্য গল্পে ইতিহাসের সেই বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়কে কেন্দ্র করে শরদিন্দু মানব জীবন ও মানব হৃদয়ের এক বিচিত্র পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করেছেন। এই কাহিনীর পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা চার—একজন বৃদ্ধ ও একজন পূর্ণবয়স্ক বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং সেই জনশূন্য মরুস্থানে তাঁদের দ্বারা আশৈশব প্রতিপালিত একটি যুবক ও একটি যুবতী—এদের কেন্দ্র করেই 'মরু ও সংঘ'-এর ঘটনা স্রোত আবর্তিত হয়েছে।

এ গল্পের নির্বাণ ও ইতি শৈশব থেকেই পরস্পরের সাহচর্যে কাল অতিবাহিত করলেও যৌবন সমাগমে একদিন তারা আত্ম-সচেতন হয়ে উঠেছে, এবং তাদের দ্বন্দ্বহীন সম্পর্ক পারস্পরিক প্রণয়াকর্ষণে রূপান্তরিত হয়েছে। অবশ্য বিষয়টি কিছু নূতন নয়।

যৌবনের মায়ামুগ্ধ দৃষ্টিতে অতিপরিচিত সম্পর্কের এরূপ নবজন্ম সাহিত্যে বহুবার ঘটে গেছে, স্বয়ং শরদিন্দুর লেখা 'গৌড়মল্লার'-এ বজ্র ও গুঞ্জার প্রণয়োন্মেষের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যাপারই লক্ষ্য করা যায়। বরং 'মরু ও সঙ্ঘ' আমাদের কাছে অধিকতর আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে সেই পর্বে যখন গুরু উচণ্ডের আদেশ ও বৌদ্ধধর্মের রীতি-নীতির প্রতি নিষ্ঠায় অবিচল থেকে আত্মপ্রতিরোধের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও সদ্য দীক্ষিত তরুণ সন্ন্যাসী নির্বাণ শেষ পর্যন্ত ইতির প্রণয়াকুতির কাছেই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। জীবনবিমুখ শুষ্ক আদর্শ অপেক্ষা জীবনানুগ বাসনাই জয়যুক্ত হয়েছে। একদিকে ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য উচণ্ডের বজ্র নির্দেশ, অন্যদিকে ইতির প্রতি অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে নির্বাণের তরুণ হৃদয়ের দোলাচলবৃত্তির পরিচয় লেখক অপরিসীম দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন।

কিন্তু এ কাহিনীর সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য বিষয় উচণ্ডের চারিত্রিক বিবর্তনের ক্রমিক স্তরবিন্যাস। উচণ্ড ভয়াবহ মরুগ্রাসের কবল থেকে কোনমতে উদ্ধার প্রাপ্ত বৌদ্ধ ভিক্ষুদ্বয়ের অন্যতম। বাইরের আচরণে ও নিয়মনিষ্ঠায় তিনি একাগ্রচিত্ত বৌদ্ধ বটে, কিন্তু যে ত্যাগ, ক্ষমা ও অহিংসার পরিপূর্ণ অধিকারী হতে না পারলে প্রকৃত বৌদ্ধ হওয়া যায় না, করুণাহীন উচণ্ড ছিলেন তার থেকে বহু দূরবর্তী। সাধনা ও কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা তিনি প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে জয় করতে পারেননি বলেই নারীমাত্রেই তাঁর কাছে 'মার' বা মূর্তিমতী পাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। ইতি যখন শিশু মাত্র তখন থেকেই তার প্রতি উচণ্ডের বিরূপতা ও বিদ্বেষ লক্ষণীয়, ইতির একমাত্র অপরাধ সে স্ত্রীজাতীয়। উচণ্ড যে 'উপসম্পদা'র বাঁধ দ্বারা নির্বাণের সহজ স্বতঃস্ফূর্ত প্রণয়াবেগের গতিরুদ্ধ করতে চেয়েছেন সে কি শুধু ধর্মীয় সংস্কার বশতঃ ? না, তা নয় ধর্মনিষ্ঠার সূক্ষ্ম ছদ্ম আবরণের অন্তরালে আত্মগোপন করেছিল তাঁর তমসাচ্ছন্ন হৃদয়। সন্ন্যাসীর কোনও বন্ধন থাকতে নেই, কিন্তু উচণ্ডের হৃদয় তাঁর অজ্ঞাতসারেই নির্বাণের প্রতি অন্ধস্নেহের বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল এবং সেই স্নেহ থেকেই তাঁর অন্তরে জন্ম নিয়েছিল এক তীব্র, সংকীর্ণ অধিকারবোধ। নির্বাণকে সঙ্ঘের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলার গূঢ়তম উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি এই সদ্য তরুণটিকে উপসম্পদা দানের আয়োজন করেছেন ; অপরদিকে প্রণয়বিহ্বল তরুণ-তরুণীদুটিকে কেন্দ্র করে হৃদয়-গহনে আত্মপ্রকাশ করেছে আর এক কুটিল রিপু যার নাম ঈর্ষা। যে তীব্র মধুর জীবনরস উচণ্ড নিজে উপভোগ করতে পাননি অন্যে তা আকণ্ঠ পান করে তৃপ্ত হবে এ চিন্তাও বোধ করি তাঁর পক্ষে অসহ্য, তাই কি ইতি ও নির্বাণের প্রতি তাঁর আচরণ অত রূঢ় ও ক্ষমাশূন্য হয়েছে ? শেষ পর্যন্ত প্রকৃতিই তাঁর মোহভঙ্গ ঘটিয়েছে। সর্বগ্রাসী বালুঝটিকার প্রচণ্ড পুনরাবির্ভাবের আঘাতে তাঁর চৈতন্যোদয় ঘটেছে। নৈসর্গিক বিপর্যয়ের সর্বনাশা আলোকে তাঁর মন থেকে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর হয়েছে। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে অন্য এক ভাষা, অন্য এক সুর—

"আমি যাইব। তাহাদের ফিরাইয়া আনিব—তাহাদের ফিরাইয়া আনিব !"

উচণ্ডের প্রচণ্ডতার পাশে বৃদ্ধ স্থবিরের করুণাঘন উদার, শান্ত মূর্তিটি কী শান্তি

প্রদায়িনী। তাঁর প্রসন্ন, গভীর আচরণে বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত স্বরূপ যেন সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

এ কাহিনীতে মরু প্রকৃতির ও বালুকারাশির আগ্রাসী তৃষ্ণার যে কল্প চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা একথায় অনবদ্য। বর্ণনার যাদুমন্ত্রে সেই দিগন্তপ্রসারী ঊষর মরুভূমি ও শ্যামল ওয়েসিস আমাদের মানসপটে প্রত্যক্ষবৎ স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। চেরাপুঞ্জীর থেকে মেঘ ধার করে এনে গোবি সাহারার তৃষ্ণা নিবৃত্তি করা সম্ভব কিনা জানিনা, কিন্তু নগর জীবনের নিরাপদ, বিলাস-সুখ পূর্ণ আবেষ্টনে অবস্থান করেও কেবলমাত্র একটি কাহিনী-বিহঙ্গের পক্ষ আশ্রয়পূর্বক সুদূর সেই মরুস্থানে মানসপ্রয়াণ যে অসম্ভব নয়, সেকথা 'মরু ও সঙ্ঘ'-এর সহৃদয় পাঠকমাত্রই স্বীকার করবেন।

প্রাগ্‌জ্যোতিষ [১৩৪৬] ঃ চন্দ্রগ্রহণ একটি প্রাকৃতিক ব্যাপার। তাকে কেন্দ্র করে মানবসংসারে কত না বিধি নিষেধ, কত না সংস্কার, কিন্তু চন্দ্রগ্রহণ নামক এই একান্ত নৈসর্গিক ব্যাপারটি মানবজীবনের জাগতিক সমস্যা সমাধানে কতখানি সহায়ক হতে পারে শরদিন্দুর লেখা 'প্রাগ্‌জ্যোতিষ' গল্পটি পাঠ করলেই তা বোঝা যায়।

এই কাহিনী অগস্ত্যমুনির দক্ষিণাপথে অগস্ত্যযাত্রারও পরবর্তীকালের। সেই সময়ে

> "দুইজন নবীন আর্যযোদ্ধা সৈন্য সামন্ত লইয়া দক্ষিণাপথে বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলেন এবং দেখিয়া শুনিয়া খানিকটা উর্বর ভূভাগ হইতে কৃষ্ণকায় দস্যু-তস্করদের তাড়াইয়া স্বরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই আর্য বীরপুরুষদুটির নাম—প্রদ্যুম্ন এবং মঘবা। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড বন্ধুত্ব।"

এই গভীর সৌহার্দ্যই তাদের মধ্যে এক প্রবল সমস্যার সৃষ্টি করল—সে সমস্যা রাজা হওয়ার সমস্যা। বন্ধুকে বঞ্চিত করে তাদের দুজনের কেউই রাজা হতে চায় না, অথচ সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজ্যটি এতই ক্ষুদ্র যে তা দ্বিধা বিভক্ত করা সম্ভব নয়, আবার এক রাজ্যে একই সঙ্গে দুজন রাজার অস্তিত্ব বিশৃঙ্খলারই নামান্তর মাত্র। সুতরাং এই সমস্যা কণ্টকে জর্জ্জরিত হয়ে দুই বন্ধু এক পূর্ণিমারাত্রে প্রস্তর নির্মিত দূর্গ চূড়ায় যখন অবস্থানরত, তাদের ললাটে কঠিন চিন্তার কুঞ্চন রেখা—তখন আকাশে এক বিচিত্র খেলা শুরু হয়েছে—

> "আকাশ নির্মেঘ, কিন্তু চন্দ্রের শুভ্র মুখের উপর ধূম্রবর্ণ ছায়া পড়িয়াছে, করাল ছায়া ধীরে ধীরে চন্দ্রকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিতেছে।"

দুজনেই বুঝেছে এ চন্দ্রগ্রহণ, উভয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্থির বুদ্ধির অধিকারী প্রদ্যুম্ন এই চন্দ্রগ্রহণের মধ্যেই তাদের সমস্যার সমাধান সূত্র খুঁজে পেয়েছে। তারই পরামর্শে স্থির হয়েছে চন্দ্রগ্রহণ অনুসারে তাদের রাজত্বকাল নির্ধারিত হবে। প্রথমে রাজা হবে মঘবা এবং তার পরবর্তী চন্দ্রগ্রহণকালে প্রদ্যুম্নের রাজত্বকাল সুরু হবে। এইভাবে ক্রমান্বয়ে তারা রাজ্য শাসন করবে। মঘবা প্রদ্যুম্নের কথা অনুসারে প্রথমে রাজা হতে স্বীকৃত হয়েছে এবং সেনাপতি প্রদ্যুম্নকে অপত্য নির্বিশেষে প্রজাপালনের আদেশ দান করে যুদ্ধযাত্রায় বহির্গত হয়েছে।

বন্ধুপ্রীতির সেই নির্মেঘ আকাশে যাকে কেন্দ্র করে আরও একবার সমস্যার কৃষ্ণমেঘ ঘনীভূত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল সে কোদণ্ড রাজদুহিতা বন্দিনী এলা। রাজা মঘবা

প্রদ্যুম্নের হস্তে রাজ্য শাসন ভার অর্পণ করে যুদ্ধ যাত্রায় বহির্গত হয়ে তিনমাস পরে প্রত্যাবর্তন করল, তার সঙ্গে বিজিত কোদণ্ড রাজদুহিতা, অপহৃতা এলা। মঘবা বন্দিনী রাজকন্যার উপযুক্ত বসবাসের ব্যবস্থার ভার এবং তাকে মঘবার পট্টমহিষী করে তোলার জন্য আর্যভাষা থেকে শুরু করে যাবতীয় শিক্ষাদানের দায়িত্ব সেনাপতি বন্ধুর উপর ন্যস্ত করে পুনরায় বিদ্রোহী কোদণ্ড জাতিকে দমন করার জন্য যুদ্ধ যাত্রা করল।

প্রদ্যুম্ন আন্তরিক সহৃদয়তার সঙ্গেই বন্দিনী কোদণ্ড রাজদুহিতাকে বন্ধুর সুযোগ্য পত্নী তথা রাজমহিষীতে পরিণত করার জন্য আপ্রাণ প্রয়াসী হয়েছে এবং ঘটনাচক্রে এলার হৃদয়ের এক নিগূঢ় সত্য সে অবগত হয়েছে—বর্বর, নারী হরণকারী মঘবা নয়, মার্জিত, পরিশীলিত চরিত্রের অধিকারী প্রদ্যুম্নই এলার প্রার্থিত পুরুষ। এই নতুন সমস্যায় প্রদ্যুম্ন যখন দিশেহারা তখন আকাশের রঙ্গমঞ্চে চন্দ্রগ্রহণের ঘটনা মঘবার রাজত্বকালের অবসান এবং প্রদ্যুম্নের রাজত্বের সূচনা ঘোষণা করেছে। কোদণ্ড জাতির সঙ্গে মঘবার সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে কোদণ্ড রাজকন্যা রাজারই বিবাহযোগ্য। সুতরাং এলা এবং প্রদ্যুম্নের মিলনে মঘবা কোনও বাধাদান করেনি বরং নিঃসঙ্কোচ অট্টহাস্যে এই মধুর পরিণতিকে স্বাগত জানিয়েছে।

'প্রাগ্‌জ্যোতিষ'-এ ইতিহাসকে অন্বেষণ করতে যাওয়া বৃথা। কারণ সুদূর অতীতে জ্যোতিষ শাস্ত্রের জন্মের পূর্ব এ কাহিনীর সূত্রপাত। তবুও আর্যদের ভারত আগমন, অনার্যদের পরাজিত করে রাজ্যবিস্তার, বংশরক্ষার জন্য আর্যপুরুষদের অনার্য-কন্যা বিবাহের সিদ্ধান্ত প্রভৃতির উল্লেখে অতীত যুগ ও জীবনচিত্র প্রাণবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে।

এ কাহিনীর সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ গল্প-কথনের প্রসন্ন, কৌতুকসিক্ত সরস ভঙ্গীটি। আদ্যন্ত স্নিগ্ধ মাধুর্যে পরিপূর্ণ এই কাহিনী রচনার ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ লেখকের লক্ষ্যই ছিল একটি বিশুদ্ধ সুরম্য গল্প পাঠককে উপহার দেওয়া। তাই জটিল সমস্যা সৃষ্টির সুযোগ গ্রহণ না করে শরদিন্দু সরস সহজ সমাধানের পথেই অগ্রসর হয়েছেন। এককথায় 'প্রাগ্‌জ্যোতিষ'কে লঘুরসে পরিপূর্ণ একটি পরম উপভোগ্য কাহিনীরূপে চিহ্নিত করা যায়, যা পাঠ করলে আমাদের বহু ভাবনাকণ্টকিত হৃদয় এক নির্ভার অকৃত্রিম আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

তক্ত্ মোবারক [১৩৫৪] 'তক্ত্ মোবারক' সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার প্রারম্ভের ঐতিহাসিক গল্প হিসেবে এর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে স্বয়ং লেখকের মন্তব্যটুকু লক্ষণীয়—

> "তক্ত্ মোবারক ঐতিহাসিক কাহিনী। পূর্বে আমি যত ঐতিহাসিক কাহিনী লিখিয়াছি, রোমান্সই ছিল তাদের লক্ষ্য; তক্ত্ মোবারক গল্পে ইতিহাসের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করিয়াছি।"

[শরদিন্দু অমনিবাস ষষ্ঠ খণ্ড—গল্প পরিচয়]

আলোচ্য কাহিনীর ঘটনাস্থল মুঙ্গের। প্রায় তিন শতাব্দী পূর্বে মোগল সম্রাট সাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজা যখন তার পিতৃ বিয়োগ সংক্রান্ত জনশ্রুতি বিশ্বাস করে মুঙ্গেরের সুজাই ঘাট থেকে মহাসমারোহে আগ্রা যাত্রা করেছিলেন এবং তৃতীয় ভ্রাতা

ঔরঙ্গজেবের কাছে পরাভূত হয়ে পুনরায় মুঙ্গেরেই ফিরে এসেছিলেন—এ কাহিনী সেই কালের।

বঙ্গ সাহিত্যের প্রাঙ্গণে বাংলার সুবাদার সুজার সঙ্গে আমাদের আরও একবার পরিচয় হয়—সে পরিচয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা 'সাজাহান' নাটকের সূত্রে। সেখানে সুজা যুদ্ধোন্মাদ, উচ্চাভিলাষী বটে, কিন্তু জীবন প্রেমিক, সঙ্গীতানুরাগী, সর্বোপরি পত্নীব্রত। তাই ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের ফলে তাঁর শোচনীয় পরিণাম সংবেদনশীল হৃদয়ে সুগভীর সহানুভূতির উদ্রেক করে।

'তক্ত্ মোবারক'-এর সুজা কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির। এখানে সুজা শুধু পিতৃসিংহাসন লাভের জন্য লালায়িত নন, তিনি অহংকারী, আত্মাভিমানী নির্দয়, বিলাসী এবং নারী-সঙ্গলোলুপ। মদ্য-প্রভাবে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে অপরিচিত, নিরীহ যুবক মোবারকের প্রতি তাঁর অভব্য আচরণ এবং মোবারকের দৃপ্ত প্রতিবাদের জবাবে তাকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা ছাড়াও এ গল্পে আরও ঘৃণ্য অপরাধ তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মোবারককে হত্যা করার তিনদিনের মধ্যে তার অনিন্দ্য-সুন্দরী সপ্তদশী পত্নীকে নিজ অন্তঃপুরে আনয়নের হীন কৌশলটুকু তবুও রাজকীয় ভোগলিপ্সার বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করা যায়, কিন্তু সহ্যাতীত তাঁর সেই স্পর্ধা যার বলে তিনি মোবারকের হতভাগ্য পিতা খাজা নজরকে তাঁর জন্য একটি মঙ্গলময় সিংহাসন প্রস্তুত করার অনুরোধ জানান, সে অনুরোধ অবশ্য আদেশেরই নামান্তর। ভ্রাতৃকলহে জর্জরিত সুজার জীবনের দুর্ভাগ্যজনক পরিসমাপ্তি ইতিহাস প্রসিদ্ধ কিন্তু শরদিন্দু আলোচ্য কাহিনীতে এই বিষয়টির উপর নতুনভাবে আলোকপাত করেছেন। তিনি সুজার সমস্ত দুর্গতির মূল কারণ রূপে সেই সিংহাসনটিকেই চিহ্নিত করতে চেয়েছেন যা খাজা নজর কর্তৃক তার একমাত্র পুত্রের রক্তে রাঙা শ্বেত প্রস্তর দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। লেখকের বিবৃতি অনুসারে জানা যায়—

> "এই বিশেষত্বহীন স্থূল কারুকার্য খচিত সিংহাসনটির প্রতি তাঁহার অহেতুক মোহ জন্মিয়াছিল।...তারপর ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুমলার তাড়া খাইয়া সেখান হইতে রাজমহলে পলায়ন করেন। তক্ত্ মোবারক তাঁহার সঙ্গে ছিল। কিন্তু রাজমহলেও বেশী দিন থাকা চলিল না, তিনি সিংহাসন লইয়া ঢাকায় গেলেন।
>
> মীরজুমলা যখন তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ঢাকায় উপস্থিত হইলেন তখন সুজার শোচনীয় অবস্থা, তিনি তক্ত্ মোবারক ঢাকায় ফেলিয়া আরাকানে পলায়ন করিলেন। অতঃপর যে রক্ত কলুষিত স্বখাত সলিলে তাঁহার সমাধি হইল তাহার বহু কিম্বদন্তী আছে, কিন্তু জীবিতলোকে আর তাঁহাকে দেখা যায় নাই। শাহেনশা বাদশার পুত্র এবং ময়ূর সিংহাসনের উমেদার সুজার ইতিবৃত্ত এইখানেই শেষ।"

এ কাহিনীর মোবারক যেন প্রত্যূষের সুখস্বপ্নের মতই মধুর কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। এই অপরূপ সুদর্শন যুবককে ঘিরে তার অভিজাত অথচ ভাগ্য বিড়ম্বিত পিতার বহু প্রত্যাশা, পত্নী পরীবানুর অগাধ ভালবাসা, ছয় মাসের দাম্পত্য জীবনের পরিপূর্ণ মাধুর্য—এই সুখসৌভাগ্যের পটভূমিতে তার জীবনদীপ আকস্মিক নির্বাপিত হওয়ার করুণ পরিণাম নিঃসন্দেহেই বেদনাবহ। আর একমাত্র প্রিয়তম পুত্রের অকল্পনীয় অকাল-বিনাশে তার

ভাগ্যাহত পিতার কী অনন্যসাধারণ প্রতিক্রিয়া! ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় সেই প্রৌঢ় নির্বাক, স্তব্ধ। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠে একটা সরব প্রতিবাদ, তাঁর বক্ষনিঃসৃত একটি স্পষ্ট দীর্ঘশ্বাসও শোনা যায় না। এমনকি পরদিন সন্ধ্যায় যখন সুজার অতিশয় প্রিয়পাত্র আলিবর্দি খাঁ (বা আলাবর্দি খাঁ) মিষ্টালাপে খ্বাজা নজরকে তুষ্ট করে ভাবী ভারত সম্রাট সুজার জন্য একটি মঙ্গলময় সিংহাসন তৈরী করে দেওয়ার অনুরোধ জানালেন এবং পারিশ্রমিক স্বরূপ একমুঠি মোহর তাঁর পাশে রাখলেন, তখন

> "খ্বাজা নজরের মন তিক্ত হইয়া উঠিল, তিনি ভাবিলেন ইহারা কি মানুষ। মোবারকের অভাব একমুঠি সোনা দিয়ে পূর্ণ করিতে চায়! মুখে বলিলেন 'শাহাজাদার ইচ্ছাই আদেশ, সিংহাসন তৈরী করে দেব।"

এই ঘটনার তিনদিন পর আলিবর্দি পুনরায় খ্বাজা-নজরের গৃহে উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রতি সুজার অপর একটি অনুগ্রহের কথা জানালেন অর্থাৎ মোবারকের বিধবা পত্নী পরীবানুকে সুজার হারেমে স্থান দেওয়ার বাসনা ব্যক্ত করে প্রকারান্তরে অসহায় প্রৌঢ়ের ইজ্জতটুকুও কেড়ে নিতে চাইলেন। তখনও আমরা সেই সদ্য শোকাহত পিতার আচরণে এতটুকু ধৈর্যচ্যুতির পরিচয় পাইনা। বুকে তাঁর নিদারুণ বেদনার জ্বালা তবুও তিনি নিষ্কম্প কণ্ঠে বলেন—"আমি দাসানুদাস—রাজার যা ইচ্ছা তাই হোক।"

খ্বাজা নজর তাঁর বহিরাচরণে এই সংযম ও ধৈর্য রক্ষা করে চললেও অন্তরে তীব্র পুত্রশোকাগ্নি অনির্বাণ রেখে তিনি সিংহাসন রচনা করেছেন! মোবারকের উষ্ণ শোণিত স্পর্শ এবং খ্বাজা নজরের অনুচ্চারিত প্রতিশোধস্পৃহা ও অভিশাপের সমন্বয়ে যে সিংহাসনের জন্ম হল তা নামেই তক্ত্ মোবারক বা মঙ্গলময় সিংহাসন, তার অশুভ প্রভাব শুধু সুজার জীবনকেই ব্যর্থ করে দেয়নি, আরও বহুজনের জীবনেই চরম দুর্ভাগ্যকে বহন করে এনেছে। সুজার পর মীরজুমলা, মীরজুমলার পর নবাবী আমলে মুর্শিদকুলি খাঁর জামাতা সুজা খাঁ, তাঁর পুত্র সরফরাজ, সরফরাজের বিদ্রোহী ভৃত্য আলিবর্দি, আলিবর্দির দৌহিত্র সিরাজদৌলা এবং সর্বশেষে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর এই সিংহাসন দখল করেছিলেন। কিন্তু নিয়তির নিদারুণ পরিহাস তক্ত্মোবারকের কোনও অধিকারীই সুখী ও দীর্ঘজীবী হতে পারেননি। সিংহাসন লাভের অল্প কিছুকালের মধ্যেই তাঁদের মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। ব্যথাহত পিতৃহৃদয়ের অভিশাপ এমনই সুদূরপ্রসারী, এমনই অমোঘ। খ্বাজা-নজরের চরিত্রের সেই নির্বাক, অথচ সুতীব্র পুত্র শোক ও প্রতিবিধিৎসা 'তক্ত্-মোবারক'কে দান করেছে এক মর্মস্পর্শী স্বাতন্ত্র্য।

ইন্দ্রতূলক [১৩৫৫] : প্রাচীন পৌরাণিক কাল থেকে শুরু করে আর্য সভ্যতা বিস্তারের সুপরিচিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত 'ইন্দ্রতূলক'কে প্রকৃত অর্থে গল্প বলা চলে না, এটিকে সরস রম্যরচনা রূপে চিহ্নিত করাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

আলোচ্য কাহিনীটি সম্পর্কে 'শাদা পৃথিবী' গল্প গ্রন্থের ভূমিকায় লেখকের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য—

> "ইন্দ্রতূলক রচনাটি কেহ গাম্ভীর্যের সহিত গ্রহণ করিবেন এরূপ আশা করিনা। উহা 'হইলে হইতে পারিত' গোছের পরিকল্পনা কিন্তু জ্ঞাত ইতিহাসের সহিত

তাহার কোনও বিরোধ নাই। আর্যদের আদি বাসভূমি কোথায় ছিল এই ঐতিহাসিক তর্কের মীমাংসা হয় নাই। আর্যগণ য়ুরোপের আদিম অধিবাসী ছিলেন ইহা যেমন সাহেবদের আষাঢ়ে গল্প, আমাদের গল্প হয়তো ততটাই আষাঢ়ে, তাহার বেশী নয়।" [শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড—গল্প পরিচয়]

'ইন্দ্রতুলক' লেখকের সরস কল্পনাকুশলতার পরিচয়বাহী মাত্র নয়, অতীত যুগ ও জীবনের প্রতি তাঁর প্রবল অনুসন্ধিৎসার পরিচয়ও এই রচনাটিতে সুপরিস্ফুট।

আদিম [১৩৬৮] ঃ 'আদিম' গল্পে প্রাচীনকালের পটভূমিতে নরনারীর এক বিচিত্র সম্পর্কের চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে—সে সম্পর্ক সহোদর ও সহোদরার মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেনের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য ঃ—

"ঐতিহাসিক গল্পগুলির মধ্যে 'আদিম' একটু দুর্বল। তার কারণ এ গল্পের কাহিনীতে ইতিহাসের খেই ঠাস বুনোনি গাঁথতে পারেনি। ইতিহাস প্রাচীন মিশরের। যে ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের মনের সম্পর্ক কিছু নেই। প্রাচীন মিশরের রাজ-সংসারে ভাই-বোনের বিয়ে হত প্রধানত রাজবংশের বিশুদ্ধি রাখার জন্যে। সাধারণ সমাজে ভাই-বোনের বিয়ে কতটা চলত তা জানি না, তবে কিছু হয়ত চলত। তবে আমাদের কাছে এ ব্যাপার অত্যন্ত ঘৃণ্য ঠেকে।"

[শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড—ভূমিকা]

আলোচ্য গল্পে শরদিন্দুবাবু ঘটনার স্থান বা কালের স্পষ্ট পরিচয় উল্লেখ করেননি। তবে তাঁর কাহিনীর কেন্দ্রস্থলে যে পরিবারটি বিরাজ করছে, তা কোনও রাজ পরিবার নয়, বৃত্তিজীবী সাধারণ মানুষের পরিবার। সুতরাং লেখকের স্বাধীন কল্পনাই এক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে।

এই কাহিনীতে সৈনিক সোমভদ্র ও বন্দিনী মেরুকার পারস্পরিক প্রেম ও সহানুভূতির পরিচয় পরিস্ফুটনে শরদিন্দুর কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। অন্যদিকে যুদ্ধ প্রত্যাগত ভ্রাতা সোমভদ্রের আচরণে পূর্বের উত্তাপ ও উচ্ছ্বাসের অভাব লক্ষ্য করে ভগিনী শফরীর মনোবেদনা সংবেদনশীলতার সঙ্গে চিত্রিত। ডাকিনীর কাছে বক্ষরুধির উৎসর্গ করে শফরী কর্তৃক সোমভদ্রকে বিদেশিনী প্রেমিকার মোহমুক্ত করার প্রচেষ্টার মধ্যে একদিকে আদিম মানবজাতির তন্ত্রে মন্ত্রে বিশ্বাস, অপরদিকে ভ্রাতা তথা প্রিয়তমের প্রতি তার সুতীব্র কামনা ও সুগভীর অধিকারবোধের প্রতিফলন ঘটেছে। মেরুকাকে কেন্দ্র করে সোমভদ্রের স্বপ্ন রচনায় তরুণ হৃদয়ের বাস্তব আশা-আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে উঠেছে। মেরুকাকে না পাওয়ায় তার বেদনা ও নৈরাশ্যও সুপরিস্ফুট। সোমভদ্রের হৃদয়ের সেই নিঃসীম ব্যর্থতার মাঝে নতুন ইশারা নিয়ে এসেছে শফরী। শেষ পর্যন্ত কেবলমাত্র পারিবারিক নিয়ম রক্ষার্থেই নয়, শফরীকে পরিপূর্ণ ভালোবেসেই সোমভদ্র পিতার কাছে বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করেছে।

ভ্রাতা ভগিনীর পরিণয়-চিত্র অবশ্যই ভারতীয় ঐতিহ্য বিরোধী, কিন্তু বিষয়-বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে আলোচ্য গল্পের মূল্য অনস্বীকার্য।

শঙ্খকঙ্কণ [১৩৬৯] ঃ পিতৃহৃদয়ের প্রবল প্রতিবিধিৎসার আর এক বিস্ময়কর

কাহিনী 'শঙ্খকঙ্কণ'। বিন্ধ্যগিরি ক্রোড়স্থিত সাতটি শৈলরাজ্যের অন্যতম পঞ্চমপুর এ কাহিনীর মধ্যে ঘটনাস্থল। উদার, মহৎ চরিত্রের নৃপতি ভূপসিংহের রাজত্বকালে পঞ্চমপুরের অধিবাসীবৃন্দ নিরুপদ্রব শান্তিতে বসবাস করছিল। কিন্তু পঞ্চমপুরের দুর্ভাগ্য যে এই রাজ্য দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিন খিলজীর দাক্ষিণাত্য বিজয় অভিযানের যাত্রা পথে পড়েছিল, দুর্ভাগ্য রাজা ভূপসিংহের কারণ তিনি ছিলেন এক সুন্দরী কন্যার জনক। আলাউদ্দিনের ম্লেচ্ছ সৈন্য অবাধে পঞ্চমপুরের ঘরবাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে নারীদের ইজ্জৎও লুণ্ঠন করল এবং আলাউদ্দিনের শিবিরে ভূপসিংহকে তলব পাঠিয়ে তাঁর সুন্দরী কন্যা শিলাবতীকে যবন সুলতানের লেলিহান কামাগ্নিতে আহুতি প্রদানের জন্য হুকুম দেওয়া হল। দিল্লীশ্বরের তুলনায় নগণ্য শক্তির অধিকারী নিরুপায় ভূপসিংহ আত্মজাকে রক্ষা করার জন্য এক কূট কৌশল অবলম্বন করলেন। তাঁর আদেশে সীমন্তিনী নাম্নী এক নবযৌবনা সুরূপা দাসীকে শিলাবতীর ছদ্মপরিচয়ে আলাউদ্দিনের কাছে প্রেরণ করা হল। কিন্তু ভূপসিংহের কৌশল সম্পূর্ণ ব্যর্থ—সুচতুর আলাউদ্দিন সপ্তাহকাল পর দাসীকে তার প্রভুর কাছে প্রত্যর্পণ করে নিজে পঞ্চমপুর রাজপুরী অন্বেষণপূর্বক প্রকৃত রাজকন্যাকে ধরে নিয়ে গেলেন। এই নির্মম সংবাদ শুনে শিলাবতীর মা প্রাণত্যাগ করলেন। আর অসহায় পিতার বক্ষে সেই নিদারুণ অপমানের জ্বালা তুষানলের মতই অনির্বাণ হয়ে রইল। বহুকাল অতিবাহিত হলেও ভূপসিংহের অন্তরের এই প্রতিশোধস্পৃহা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। তাই আট বৎসর পর পুত্র রামরুদ্রকে আলাউদ্দিন-হত্যার জন্য দিল্লী প্রেরণ করলেন, কিন্তু রামরুদ্র এ কার্যে শুধু ব্যর্থই হল না ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে যাওয়ায় জল্লাদের হাতে তার মৃত্যুও ঘটল। একমাত্র পুত্রকে হারিয়েও ভূপসিংহ শোক করলেন না। এই দুর্দৈবের আঘাতে "তাঁহার প্রকৃতি যেন দ্বিধাভিন্ন হইয়া গেল, একদিকে শুষ্ক কঠিন কুটিলতা, অন্যদিকে নির্বিকার ঔদাসীন্য।"

আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে ভূপসিংহের প্রতিহিংসা চরিতার্থতার আর একটি মাত্র অস্ত্র অবশিষ্ট—সে দাসী সীমন্তিনীর গর্ভজাতা, আলাউদ্দিন খিলজির কন্যা চঞ্চরী। এই অভাগিনী কন্যাটির জন্মক্ষণেই তার মা সীমন্তিনী তীব্র ঘৃণায় তাকে হত্যা করতে চেয়েছে। কিন্তু দূরদর্শী ভূপসিংহই এই কার্যে বাধা প্রদান করেছেন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতার ছত্রছায়াতলে চঞ্চরী বাল্য থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে উপনীতা হয়েছে। আর তার অত্যুগ্র রূপের দিকে চেয়ে চেয়ে এক কুটিল পরিকল্পনা ভূপসিংহের হৃদয়ে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে। তিনি বুঝেছেন চঞ্চরীই সেই আগুন যার দ্বারা তাঁর চিরশত্রুকে দগ্ধ করে তিনি নিজের চিত্তদাহ নির্বাপিত করতে পারবেন। এই চঞ্চরীর লেলিহান রূপবহ্নিতে ভোগলোলুপ আলাউদ্দিন অন্ধ পতঙ্গের মতই যদি ঝাঁপ দেয়, আর তারপর যদি সেই মহাপাপিষ্ঠকে চঞ্চরীর প্রকৃত পরিচয় জানানো হয় তবেই শান্ত হবে তাঁর কন্যাশোকে অধীর পিতৃহৃদয়। কিন্তু এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য চঞ্চরীকে দিল্লী নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন। নিরন্তর এই চিন্তায় মগ্ন ভূপসিংহের সম্মুখে নিয়তি প্রেরিতের মতই আবির্ভূত হয়েছে এক যুবক তার নাম ময়ূর। কান্তিমান, পৌরুষ-উজ্জ্বল এই ভাগ্যান্বেষী যুবকটি শুধু আকর্ষণীয় রূপের অধিকারীই নয়, ধনুর্বিদ্যায় তার পারদর্শিতা

অতুলনীয়। তাকে কিছুদিন নিজ আশ্রয়ে রেখে ভূপসিংহ তার চরিত্রের আর একটি অসাধারণত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন, সাধারণ যুবকদের মতো সে নারীসঙ্গ লোলুপ নয়, বরঞ্চ নারীসঙ্গ পরিহারেই তার অধিক আগ্রহ। তারপর এই বিশ্বস্ত, অহংকারশূন্য, নানা গুণবান ময়ূরের মাধ্যমে কিভাবে পঞ্চমপুর নামক সেই ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি স্বরাজ্যে অবস্থান করেই প্রবল পরাক্রান্ত প্রতিপক্ষ দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিন খিলজীর বিরুদ্ধে তাঁর অন্তরে বহুকাল-পোষিত প্রতিবিধিৎসাকে চরিতার্থ করলেন সেই ঘটনাসমূহই 'শঙ্খকঙ্কণ'-এ ভাষারূপ লাভ করেছে।

ভূপসিংহের কার্যকলাপ অনিবার্যভাবেই আমাদের মনে 'বিষকন্যা' গল্পের মহামন্ত্রী শিবমিশ্রের স্মৃতিবহন করে আনে। এঁরা উভয়েই শক্তিমান প্রতিপক্ষের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হননি। কিন্তু 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্' সূত্রানুসারে তাঁরা শত্রুকন্যার দ্বারাই শত্রুর চরম সর্বনাশ সাধনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তবে ভূপতি সিংহের অবলম্বিত পদ্ধতি অবশ্যই নিষ্ঠুরতর।

'শঙ্খকঙ্কণ'-এর ময়ূরকে দেখে মনে পড়ে 'তুঙ্গভদ্রার তীরে'র অর্জুন বর্মার কথা। এরা দুজনেই প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাবে দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছে—ভাগ্যান্বেষণে দেশান্তরে যাত্রা-পথে আকস্মিকভাবেই তাদের জীবনে নিজ নিজ যোগ্যতা প্রমাণের অপ্রত্যাশিত সুযোগ উপস্থিত হয়েছে! অর্জুনবর্মার ক্ষেত্রে রণপা ব্যবহারের বিরলদক্ষতা এবং ময়ূরের ক্ষেত্রে শরসন্ধানের অপূর্ব কৌশল ভাগ্যের রুদ্ধদুয়ার উন্মোচিত করে দিয়েছে। উভয় যুবকের জীবনেই ঘটেছে রাজকন্যার প্রেমলাভের অকল্পনীয় সৌভাগ্য।

ভূপসিংহের কনিষ্ঠা কন্যা, শুচিশুভ্রা সোমশুক্লার ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্র ও অপ্রগল্ভ অথচ মধুর আচরণ রাজদুহিতাসুলভ। অজ্ঞাত কুলশীল তরুণ ময়ূরের প্রতি তার গভীর প্রেম, শান্ত ও সংযত ভঙ্গীতে প্রকাশ লাভ করেছে।

এ কাহিনীর একমাত্র ইতিহাস বিশ্রুত চরিত্র আলাউদ্দিন খিলজী। এখানে তাঁর চরিত্রের যে দুইটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে তার একটি—পিতৃব্যকে হত্যা করে সিংহাসন আরোহণের ঘৃণ্য নির্মম মনোবৃত্তি, অপরটি অন্ধ কামাসক্তি। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটির সম্বন্ধে লেখকের ভাষায় বলা যায়।

"সুন্দরী নারী, রাজরাণী হোক বা পথের ভিখারিনী হোক আলাউদ্দিনের চোখে পড়িলে আর তার নিস্তার নাই। তিনি এক বার চিতোরের পদ্মিনীর দিকেও হাত বাড়াইয়াছিলেন, কিন্তু সেই জ্বলন্ত অনলশিখাকে স্পর্শ করিতে পারেন নাই। নারী-বিজয়-ক্ষেত্রে দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিনের ইহাই একমাত্র ব্যর্থতা।"

আলাউদ্দিন খিলজীর শেষ জীবন সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য—

"ইহার পর আলাউদ্দিন বিকৃত মস্তিষ্ক ও ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া তিন বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। ইহাই ইতিহাসের সাক্ষ্য।"

দুইটি আবর্তে এবং নয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত কাহিনীর নামকরণ প্রশংসনীয়। দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ সৌভাগ্যের সূচক। বয়স্য ভট্ট নাগেশ্বর মারফৎ ভূপসিংহ একই দিনে একটি দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ এবং ময়ূর নামক একটি অজ্ঞাতকুলশীল যুবককে লাভ করেছেন।

দক্ষিণাবর্ত শঙ্খটি পাওয়া মাত্রই ভূপসিংহ তাঁর কন্যা সোমশুক্লাকে ওই শুভ শঙ্খ দ্বারা অলঙ্কার নির্মাণ করিয়ে অঙ্গে ধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ময়ূর যখন ভূপসিংহের আদেশানুসারে গুরুতর কার্যভার গ্রহণ করে দিল্লী যাত্রা করে তখন কুমারী সোমশুক্লা তার শুভকামনার চিহ্ন স্বরূপ ময়ূরকে সেই বিঘ্ন নিবারক ও সৌভাগ্য সূচক শঙ্খ-কঙ্কণটি দান করে। এই শঙ্খ-কঙ্কণ শুধু শুভকামনার নয়, সোমশুক্লার গভীর প্রেমেরও শুভ্র, সুন্দর প্রতীক। হয়তো এর প্রভাবেই কাহিনীর উপসংহারে শুধু সোমশুক্লা ও ময়ূরের প্রত্যাশিত মিলনই ঘটেনি, আর এক অপ্রত্যাশিত মিলনও ঘটেছে সে মিলন হতভাগ্য পিতা ভূপসিংহের সঙ্গে অভাগিনী কন্যা শিলাবতীর।

আলোচ্য কাহিনীর পরিবেশ চিত্রণে শরদিন্দুর দক্ষতা প্রশংসাতীত। কাহিনীর সূচনায় পঞ্চমপুরের বন্ধুর অথচ মনোরম নিসর্গ চিত্র যেমন সজীব তেমনি জীবন্ত সেকালের দিল্লীর নানা বিলাসিতা ও উত্তেজনাপূর্ণ নাগরিক প্রতিবেশ। গল্পকথনের সরস ভঙ্গীটি উপভোগ্য। মিলন-মধুর কাহিনীর মধ্যে শুধু একটি বিষন্নতার সুর গুঞ্জরিত হয়—সে বিষন্নতা চঞ্চরীকে কেন্দ্র করে। অল্পবুদ্ধি, বাসনায় উচ্ছল, এই অত্যুগ্র রূপময়ী তরুণীটির অভিশপ্ত ঘৃণ্য জীবন-পরিণাম পাঠক মনে করুণ সহানুভূতির উদ্রেক করে। পাপাত্মা আলাউদ্দিনের পরিণাম গল্পকার আমাদের জানিয়েছেন কিন্তু আজন্ম স্নেহবঞ্চিতা চঞ্চরীর জীবনের উপসংহার পর্ব অজানা রয়ে গেছে। এ গল্পে সত্যিই সে 'কাব্যের উপেক্ষিতা'।

রেবা রোধসি [১৩৬৯]ঃ আলাউদ্দিন খিল্‌জীর রাজত্বকালের পরিপ্রেক্ষিতে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় আরও একটি গল্প রচনা করেছেন, তার নাম 'রেবা রোধসি'। এ কাহিনীর সূচনায় স্বয়ং আলাউদ্দিন খিল্‌জীর দাক্ষিণাত্যবিজয় যাত্রা এবং সমাপ্তিতে তাঁর মুখ্য সেনাপতি মালিক কাফুর কর্তৃক দাক্ষিণাত্য অভিযানের উল্লেখ পাওয়া যায়। কাহিনীর মূল ঘটনাস্থল নর্মদা নদীর উত্তর তীরবর্তী এক ক্ষুদ্র কিন্তু সুসমৃদ্ধ রাজ্য এবং তার সীমান্ত থেকে দূরবর্তী এক আটবিকজাতি অধ্যুষিত গ্রাম। এই ক্ষুদ্রাবয়ব কাহিনীটিতে মুখ্যত একটি চরিত্রের কৌতূহলোদ্দীপক বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তাঁর নাম তূণীর বর্মা। উল্লিখিত যুবকটির পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে গল্পকার লিখেছেন—

> "তূণীর বর্মা রাজা শিববর্মার তৃতীয় মহিষীর গর্ভজাত চতুর্থ পুত্র। তিনি কোনোকালে রাজা হইবেন সে সম্ভাবনা নাই। বাল্যকাল হইতেই তাহার স্বভাব দুরন্ত ও দুঃশীল, কেহ তাঁহাকে শাসন করিতে পারিতেন না। তারপর তিনি যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন তখন তাঁহার স্বভাব আরও প্রচণ্ড ও দুর্দমনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহার আকৃতি যেমন সুন্দর দেহ তেমনিই বলশালী, তাঁহার প্রতিকূলতা করিতে কেহ সাহস করে না; উৎসর্গীকৃত বৃষের ন্যায় তিনি স্বচ্ছন্দচারী হইয়া উঠিলেন। ভোগব্যসনে তাঁহার রুচি রাজকবি ভর্তৃহরির পন্থা অবলম্বন করিল। জীবনে ভোগ্যবস্তু যদি কিছু থাকে তবে তাহা মৃগয়া এবং নারীর যৌবন। যৌবনং বা বনং বা।"

এই দুর্দান্ত দুঃশীল রাজপুত্র মহেশগড়ের এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের তরুণী ভার্যাকে অপহরণ করার অমার্জনীয় অপরাধে পিতৃআদেশে রাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়। বিদায় মুহূর্তে

যুবরাজ তথা ভ্রাতা ইন্দ্রবর্মার প্রতি উদ্ধৃত উক্তির মাধ্যমে স্বদেশ এবং স্বজনদের প্রতি তাঁর অন্তরে সঞ্চিত তীব্র বিদ্বেষ ও ক্ষোভের স্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়—

"......মহেশগড় আমার মাতৃভূমি নয়, বিমাতৃভূমি। এখানে সবাই আমার শত্রু, যদি কোনোদিন ফিরে আসি, একা ফিরব না, এই তরবারি হাতে নিয়ে ফিরে আসব।"

এই অবাধ্য রাজকুমারের উগ্র উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র যার প্রেমের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে স্নিগ্ধ ও সংযত রূপ ধারণ করল তার নাম রেবা। মহেশগড় থেকে নির্বাসিত তূণীর বর্মা যখন অশ্বারোহণে অনির্দেশ্যের উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছেন, সেই সময় একদিন একটি গ্রামের সন্নিকটে নৃত্যগীতরতা এক গুচ্ছ বন্য রমণীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, তাদের মধ্যে যে যুবতী নিজের গলার মালা তূণীর বর্মার কণ্ঠে পরিয়ে দিয়ে তাকে স্বেচ্ছায় পতিত্বে বরণ করে, সেই স্বয়ংবৃতাই রেবা। রেবার শ্যামল যৌবন এবং কোমল স্বভাবের প্রভাবে তূণীর বর্মা জীবনে প্রথম প্রকৃত সুখের সন্ধান পান। নাগরিক জীবনের কোলাহল, বিলাসবিভ্রম, অতৃপ্তি ও কৃত্রিমতা মুক্ত হয়ে এই সরল, উদ্বেগহীন পল্লী জীবনযাত্রার সঙ্গে তিনি গভীর একাত্মতা অনুভব করেন। এই নতুন পরিবেশে পরিপূর্ণ শান্তি ও অকৃত্রিম প্রেম নির্বাসিত যুবকটিকে দেয় অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দ। শুধু ক্বচিৎ কখনও সূর্যাস্তকালে নর্মদা-সৈকতে বসে তাঁর মনে পড়ে মহেশগড়ের কথা, কিন্তু—

"মহেশগড়ের কথা স্মরণ হইলেই তাঁহার মন বিমুখ হয়। তিনি ভাবেন, মহেশগড় আমার জন্মভূমি নয়, মহেশগড়ের মানুষ আমার আপনজন নয়।"

কিন্তু জন্মভূমিকে সচেতনভাবে ভুলে থাকার বা জন্মভূমিকে অস্বীকার করার যত চেষ্টাই তূণীর বর্মা করুন না কেন, তাঁর অবচেতন মনে মহেশগড়ের প্রতি যে গভীর প্রীতি রয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যায় সেইদিন যেদিন মৃগয়া অন্তে সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে রেবাকে নিয়ে গ্রামে ফেরার সময় তূণীর বর্মা অসংখ্য যবন সৈন্যের আগমন লক্ষ্য করেন এবং বৃক্ষান্তরালে আত্মগোপন করে তাদের কথোপকথনের মাধ্যমে জানতে পারেন যে এই সৈন্যদল মালিক কাফুর নামক যবন সেনাপতির নেতৃত্বে দাক্ষিণাত্য অভিযানে চলেছে। মহেশগড়ও তাদের আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্যস্থল। এই ঘটনার অভিঘাতে তূণীর বর্মার সুপ্ত দেশপ্রেম প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। যিনি এক সময় মনে করেছিলেন মহেশগড় তাঁর মাতৃভূমি নয়, বিমাতৃভূমি, সেই অভিমানক্ষুব্ধ যুবকই তাঁর অন্তরতমা রেবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নর্মদার জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তাঁর লক্ষ্য মহেশগড়, উদ্দেশ্য যবন সৈন্য সেখানে পৌঁছাবার আগেই মহেশগড়ের অধিবাসীদের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করা। তূণীর বর্মার এই সক্রিয় প্রচেষ্টার ফলেই সেবার মালিক কাফুর মহেশগড় জয় করতে পারেনি। মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নির্বাসিত রাজপুত্রের এই আন্তরিক প্রয়াস প্রমাণ করে যে তাঁর চরিত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা ও উগ্রতার অন্তরালে বহু সদ্‌গুণ প্রচ্ছন্ন ছিল, রেবার স্নিগ্ধ প্রেম ও আটবিক জাতির সরল, দ্বন্দ্বহীন জীবন চর্যার প্রভাবে সেগুলি বিকশিত হওয়ার যথোপযুক্ত অবকাশ লাভ করেছে।

'রেবা রোধসি' গল্পে কাহিনী বিবৃতির ক্ষেত্রে লেখকের সংযম ও মিতভাষিতা লক্ষণীয়। তূণীর বর্মার চারিত্রিক বিবর্তনটুকু যথাযোগ্যভাবে চিত্রিত করার জন্য যতটুকু

প্রয়োজন তদতিরিক্ত বাগ্‌বিন্যাস বা ঘটনা বিস্তার এক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় না। কাহিনীর একমুখী ধারা তরঙ্গ সংকুলা নর্মদার মতই তীব্রগতিতে পরিণতি অভিমুখে ধাবিত হয়েছে। উপসংহার অংশে লেখক একটিমাত্র বাক্য জানিয়েছেন—

"সেবার মালিক কাফুরের সৈন্যদল মহেশগড় রাজ্য জয় করিতে পারে নাই।"

কিন্তু তৃণীর বর্মা ও রেবার কি হল? মহেশগড়ের রাজা শিববর্মা কি তাঁর নির্বাসিত পুত্রের সুকৃতির পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে পুনরায় সাদরে স্বরাজ্যে স্থান দিলেন? অরণ্য দুহিতা রেবা কি মহেশগড়ের রাজবধূর যোগ্য সমাদর ও স্বীকৃতি লাভ করল? আলোচ্য কাহিনীকে কেন্দ্র করে এইরকম একাধিক প্রশ্ন পাঠকের অন্তরে তীব্র কৌতূহলের সৃষ্টি করে। পাঠকমনের এই কৌতূহল ও অতৃপ্তিই প্রমাণ করে 'রেবা রোধসি' একটি সার্থক ছোট গল্প।

॥ ৪ ॥

॥ **শরদিন্দু-সৃষ্ট ইতিহাসাশ্রয়ী গল্প-উপন্যাসগুলির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য** ॥

শরদিন্দুর লেখা ইতিহাসাশ্রয়ী গল্প-উপন্যাসগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে লেখকের রচনারীতির কয়েকটি বিশেষত্ব আমাদের কাছে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। সেই বৈশিষ্ট্যসমূহের সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ বিশ্লেষণই বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক রোমান্স রচনার ক্ষেত্রে শরদিন্দু-মানসে বঙ্কিমী-প্রেরণার কথা। সাহিত্য সম্রাটের প্রতি শরদিন্দুর যে কতখানি শ্রদ্ধা ছিল তা তাঁরই একটি মন্তব্যের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়—

> "ছেলেবেলায় ইতিহাসের ভাল ছাত্র ছিলাম না, তবে ইতিহাস সম্পর্কে একটা মোহ ছিল। ঐতিহাসিক গল্প লেখার প্রেরণা পাই বঙ্কিমচন্দ্র পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে শিখেছি ভাষার মধ্যেই বাতাবরণ সৃষ্টি করা যায়—বিশেষ করে ঐতিহাসিক বাতাবরণ।" [শরদিন্দু অম্নিবাস, দ্বিতীয় খণ্ড—জীবনকথা]

—পূর্বসূরীর প্রতি এই আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং তাঁকেই ইতিহাসাশ্রয়ী কাহিনীর আদর্শ লেখক রূপে গ্রহণ করার ফলে শরদিন্দুর রচনাশৈলীর কোথাও কোথাও অনিবার্যভাবে বঙ্কিম-প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের একটি সুপরিচিত কৌশল ঘটনাবর্ণনার সূত্রে পাঠকের সঙ্গে লেখকের নিবিড় অন্তরঙ্গতা স্থাপনের প্রয়াস—শরদিন্দুর রচনাতেও কখনও কখনও এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করা যায়—যেমন 'কালের মন্দিরার' 'প্রাসাদ শিখরে' শীর্ষক চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিধৃত একটি বর্ণনা—

> "কবি কালিদাস বলিয়াছেন, বল্কল পরিধান করিলে সুন্দরী তন্বীকে অধিক সুন্দর দেখায়। হয়তো দেখায়, আমরা কখনও পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই। কিন্তু যোদ্ধৃবেশ ধারণ করিলে রূপসীর রূপ বর্ধিত হয় একথা স্বীকার করিতে পারিব না। ভাল দেখাইতে পারে কিন্তু অধিক সুন্দর দেখায় না। আমরা বলিব, কুমারী রট্টার মত যিনি তন্বী ও সুন্দরী, যাঁহার বয়স আঠার বৎসর—তিনি অলকগুচ্ছ কুন্দকলি দ্বারা অনুবিদ্ধ করুন।"

আবার 'কালের মন্দিরা'র ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের অন্তিম মুহূর্তে শরদিন্দু যখন লেখেন—

"রট্টার চোখে জল আসিল, তিনি অবরুদ্ধস্বরে বলিলেন—'স্ত্রী জাতি বড় জঞ্জাল।'

চিত্রক মাথা নাড়িয়া বলিল—'না, পুরুষ বড় জঞ্জাল'।"

—তখন আমাদের মনে পড়ে যায় সাহিত্য সম্রাটের বিশেষ লেখন-ভঙ্গীটির কথা।

'কালের মন্দিরা', গৌড়মল্লার', 'ঝিন্দের বন্দী' প্রভৃতি উপন্যাসে শরদিন্দু কাহিনীকে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন এবং প্রতিটি পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থগূঢ় শীর্ষনাম সংযোজন করে পাঠকের কৌতূহল ও উৎকণ্ঠাকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলেছেন। বঙ্কিমের উপন্যাস ও রোমান্সেও এ কৌশল বহু ব্যবহৃত।

বঙ্কিম-সাহিত্য সম্ভারে যে মানবিক সম্পর্ক সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করেছে তা নর-নারীর প্রণয় সম্পর্ক। বঙ্কিম সৃষ্ট নায়িকাদের একমাত্র পরিচয় তারা প্রেমময়ী রমণী। পুরুষ চিত্তে তারা যে রূপতৃষ্ণা ও প্রণয়াকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে তার পরিণাম স্বরূপ তীব্র জটিল জীবন-সমস্যা কাহিনীগুলিকে আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য করে। শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রিত গল্প ও উপন্যাসগুলিতেও ভিন্ন ভিন্ন কালের পটভূমিকায় প্রেম নামক সেই পরশমণির বিচিত্র বর্ণচ্ছটা পরিলক্ষিত হয়। তাঁর লেখা 'অমিতাভ', 'বাঘের বাচ্চা', 'অষ্টম সর্গ', 'চন্দন মূর্তি' এবং 'ইন্দ্রতূলক' ব্যতীত অন্যান্য ঐতিহাসিক কাহিনীগুলিতে শৃঙ্গাররসের অপ্রতিহত প্রাধান্য। তাঁর নায়িকারাও শুধুই প্রেমিকা। তাদের জায়া বা জননী রূপ দুর্লভ।

ঔপন্যাসিক বঙ্কিম ছিলেন সৌন্দর্যের পূজারী। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রূপ বর্ণনায় তাঁর ছিল বিশেষ আগ্রহ। কত ভাবে, কত ভঙ্গীতেই না তিনি মানব-মানবীর অনিন্দ্য-সুন্দর দেহকান্তিকে ভাষায় মূর্ত করতে চেষ্টা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জগৎসিংহ, গোবিন্দলাল, মোবারক কন্দর্পপ্রতিম রূপের অধিকারী। তাঁর দুর্গেশনন্দিনীর তিলোত্তমা, আয়েষা থেকে শুরু করে সীতারামের শ্রী, জয়ন্তী পর্যন্ত সকল নায়িকাই সৌন্দর্যের মানদণ্ডে অলোক সামান্যা। নারীর রূপ বর্ণনায় শরদিন্দুরও আগ্রহ এবং পারদর্শিতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ বিষয়ে তাঁকে বঙ্কিমের সগোত্র হিসেবে চিহ্নিত করা বোধ হয় অযৌক্তিক নয়। বোধ হয় অতিশোয়োক্তি নয়। তাঁর 'কালের মন্দিরা'র রট্টা যশোধরা, 'গৌড়মল্লারে'র রঙ্গনা, 'তুমি সন্ধ্যার মেঘে'র যৌবনশ্রী, 'তুঙ্গভদ্রার তীরের' বিদ্যুন্মালা ও 'মণি-কঙ্কণা', 'ঝিন্দের বন্দীর' কস্তুরী বাঈ, 'বিষকন্যার' উল্কা, 'মৃৎপ্রদীপে'র সোমদত্তা, 'শঙ্খকঙ্কণে'র সোমশুক্লা, 'সেতু'র রল্লা, 'চুয়াচন্দনে'র চুয়া সকলেই অপরূপ রূপ লাবণ্যবতী। ধূসর অতীতের এই সকল রমণী মূর্তি পাঠকের মানসপটে প্রত্যক্ষবৎ উজ্জ্বল ও জীবন্ত করে তোলার জন্য স্রষ্টা শরদিন্দু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুসরণ করেছেন, সংস্কৃত কাব্যের বর্ণনা বিশেষভাবে কালিদাসের সাহিত্য এ ব্যাপারে তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। একমাত্র 'চুয়াচন্দনের' চুয়াকে তিনি এঁকেছেন বৈষ্ণব কবিকুলের মানস প্রতিমার আদর্শে।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় সন্ন্যাসী চরিত্র ও জ্যোতিষ গণনার বিশেষ গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', 'সীতারাম' প্রভৃতি উপন্যাসের

নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। অপরদিকে শরদিন্দুর ঐতিহাসিক গল্প ও উপন্যাস-গুলিতে জ্যোতিষ চর্চার পরিচয় সুলভ না হলেও সন্ন্যাসী চরিত্র অপ্রতুল নয়। তবে তাঁরা সকলেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। 'গৌড়মল্লারের' শীলভদ্র, 'তুমি সন্ধ্যার মেঘের' অতীশ দীপঙ্কর, 'মৃৎপ্রদীপের' শ্রমণাচার্য ভিক্ষু অকিঞ্চনের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কালের মন্দিরা, মরু ও সঙ্ঘ, চন্দনমূর্তি প্রভৃতি উপন্যাস ও গল্পে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বৌদ্ধ সংঘারামের বিশেষ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। সর্বোপরি অমিতাভ গল্পে স্বয়ং শাক্য সিংহের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি শরদিন্দুবাবুর অনুরাগের প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেনের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—

"বৌদ্ধ ধর্মের ও 'বৌদ্ধ' যুগের ইতিহাসের উপর শরদিন্দুবাবুর টান একটু বেশি ছিল। তার কারণও আছে। এঁর জীবনের পূর্বাংশ কেটেছিল দক্ষিণ মগধ অঞ্চলে। পাটলিপুত্র, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী এঁর সবিশেষ পরিচিত ছিল।"

[শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড—'ভূমিকা']

অতীতাশ্রয়ী কাহিনী রচনার ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য লেখকের যে পরিবেশ-চিত্রণ দক্ষতা একান্ত কাম্য তা শরদিন্দু-প্রতিভার একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য। যুগচিত্রকে সজীব ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য পটভূমির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার দিকে তাঁর আগ্রহ অপরিসীম। স্থান ও কাল অনুযায়ী পাত্রপাত্রীর আচার-আচরণ রুচি, সংস্কার, বেশভূষা সমস্ত কিছুই যথাসম্ভব নিখুঁতভাবে উপস্থাপনার প্রতি তাঁর সজাগ দৃষ্টি। এমনকি দেশ-কাল অনুসারে ভোজ্যদ্রব্যের বর্ণনা প্রদানেও তিনি সিদ্ধহস্ত—দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি বিবরণ লক্ষণীয়—

কালের মন্দিরার একাদশ পরিচ্ছেদে রাজকুমারী যশোধরা চিত্রকের সঙ্গে চষ্টন দুর্গের দিকে চলেছেন। অশ্বারোহণে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তারা উপস্থিত হয়েছেন এক সংঘারামে। তারপর ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য তাঁরা বুদ্ধের প্রসাদ ভিক্ষা করলেন—

"ভিক্ষু তাহাদের জন্য খাদ্য আনিয়া দিলেন, কিছু দ্বিদল সিদ্ধ, কিছু সিক্ত চিপিটক, কয়েকটি শুষ্ক দ্রাক্ষাফল ও খর্জুর।"

অহিংসার পূজারী বৌদ্ধগণের সংঘারামে অনাড়ম্বর অথচ সাত্ত্বিক আহার্য ব্যবস্থার অনুরূপ পরিচয় গৌড়মল্লারেও বিধৃত—

"পূজার্চনার ঘণ্টিকা নীরব হইবার কিয়ৎকাল পরে মণিপদ্ম বজ্রের আহার্য লইয়া উপস্থিত হইল। আহার্যের মধ্যে ঘৃতপক্ক তণ্ডুল ও গোধূমের একটা একপিণ্ড এবং ফলমূল;" [গৌড়মল্লার দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ শীলভদ্র]

কিন্তু গৌড়মল্লারের স্থানিক পটভূমি বঙ্গদেশ—এই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা আচারে আচরণে, জীবনচর্যার প্রতি পদক্ষেপেই সেই বাঙালীয়ানার পরিচয় দিয়েছে। তাই মৌরী নদীর তীরে বেতসকুঞ্জে প্রতীক্ষারত ক্ষুধার্ত মানবের নৈশ আহারের উপাদান হিসাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে রান্না করা মৌরলা মাছ, এবং ঘৃতযুক্ত তপ্ত ভাত।

উক্ত উপন্যাসেই কর্ণসুবর্ণ নগরে বটেশ্বরের মদিরা ভবনের প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক যখন লেখেন—"মদ্যপায়ীরা সুরাভাণ্ডসহ ভর্জিত পর্পট ও ইল্লীশ মৎস্য লইয়া বসিত"—তখন এ

যে একান্তভাবেই বঙ্গদেশের পানশালার বিবরণ তা বুঝে নিতে আমাদের কোনও অসুবিধাই হয় না।

আবার কাহিনীর পটভূমিকা যখন ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে আরব সাগরের উপকূলে কাথিয়াবাড় প্রদেশ তখন আহার্যের বর্ণনা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে গেছে, তাই রাজদ্রোহীতে চিন্তা প্রতাপসিংহের জন্য প্রকাণ্ড পিতলের থালিতে সাজিয়ে দেয়—"গমের ফুলকা রুটি, শিং দিয়া তুরের ডাল, মুঠিয়া পকৌড়ি, ধোক্‌ড়া, দহি-বড়া, শ্রীখণ্ড—আরও কত কি।"

এইরূপে একাধিক উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় পরিবেশ চিত্রণে, স্থান-কাল-পাত্রের বাস্তবতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার ক্ষেত্রে শরদিন্দুর শিল্পবোধ নিঃসন্দেহে অতুলনীয়।

তাঁর গল্প-কথনভঙ্গীটি অত্যন্ত সরস ও আকর্ষণীয়। পাঠক চিত্তকে পরিতৃপ্ত করার প্রচুর আয়োজনে তাঁর সাহিত্য সম্ভার সুসমৃদ্ধ। কাহিনীতে যে সম্ভাবনাগুলির অস্ফুট ইংগিত থাকে তাদের সতর্কতার সঙ্গে সযত্নে পরিস্ফুট করে তোলা হয়। অবশ্য একটি মাত্র ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়, 'তুমি সন্ধ্যার মেঘে' এক ম্লেচ্ছ অশ্ব ব্যবসায়ীর উল্লেখ আছে। তার প্রতি লক্ষ্মীকর্ণের অশোভন আচরণের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অনুচরবৃন্দসহ সেই বণিকের—

"চক্ষু দিয়া অসহায় ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল।"

এই ম্লেচ্ছ বণিকের আচরণে একটি নিগূঢ় অভিসন্ধির ইংগিত পেয়ে পাঠকমন স্বাভাবিক ভাবেই কৌতূহলী হয়ে ওঠে—কিন্তু কী সেই অভিসন্ধি—উপন্যাসের কোথাও এই জিজ্ঞাসার সদুত্তর মেলে না।

পরিশেষে শরদিন্দুর সুসমৃদ্ধ, তৎসম শব্দের সুললিত বিন্যাসে সুখশ্রাব্য অথচ প্রাঞ্জল ভাষার কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। সুনির্বাচিত শব্দের সাহায্যে তাঁর বাক্‌প্রতিমা গড়ে উঠেছে। বক্তব্য বিষয়টি তিনি স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করেন, অথচ কোথাও অতি-কথনের অবাঞ্ছিত বিস্তারে তাঁর ভাষার সুদৃঢ় বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে না। বলাবাহুল্য, এই স্বচ্ছন্দ, সাবলীল এবং মুখ্যতঃ চিত্রধর্মী এই ভাষাশৈলীই শরদিন্দুর ঐতিহাসিক রোমান্সগুলির বিপুল জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ।

॥ ৫ ॥

॥ শরদিন্দু রচিত ইতিহাসাশ্রয়ী কথাসাহিত্যের স্থান-কাল ও প্রসঙ্গ নির্দেশক সারণী ॥

[রচনাগুলি ইতিহাসের সময় অনুসারে বিন্যস্ত—লেখকের রচনাকাল অনুযায়ী নয়।]

গল্প	উপন্যাস	স্থান	ইতিহাসের প্রসঙ্গ	সময় (আনুমানিক)
ইন্দ্রতূলক		বেলুচিস্থান থেকে ইরাণের দক্ষিণভাগ	আর্যগণ প্রাচ্যেরই অধিবাসী ছিল (কাল্পনিক)	প্রায় আট হাজার বছর আগেকার কাহিনী।
রুমাহরণ				প্রাগৈতিহাসিক যুগ
প্রাগ্‌জ্যোতিষ		দক্ষিণাপথ	আর্য অনার্য সমন্বয়	আর্যদের ভারত আগমনের পরবর্তী কাল
আদিম		প্রাচীন মিশর		?
অমিতাভ		মগধের অন্তর্গত পাটলি গ্রাম	অজাতশত্রুর বৌদ্ধ বিদ্বেষ	খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ পঞ্চম শতাব্দী
বিষকন্যা		মগধ ও লিচ্ছবি		”
সেতু		উজ্জয়িনী		”
মৃৎপ্রদীপ		মগধ	প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে মগধের ভাগ্য বিপর্যয়	চতুর্থ শতাব্দী

গল্প	উপন্যাস	স্থান	ইতিহাসের প্রসঙ্গ	সময় (আনুমানিক)
অষ্টম সর্গ		উজ্জয়িনী	কুমারসম্ভবম্-এর অষ্টম সর্গ কালিদাস-বিরচিত কিনা।	পঞ্চম শতাব্দী
মরু ও সঙ্ঘ		চীনীয় তুর্কিস্থান	চীনীয় তুর্কিস্থানে বৌদ্ধ ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রসার	পঞ্চম শতাব্দী
	কালের মন্দিরা	ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম পার্বত্য অঞ্চল	হূণগণের ভারত আক্রমণ, গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্ত কর্তৃক প্রতিহত করার চেষ্টা	পঞ্চম শতাব্দী
	গৌড়মল্লার	গৌড়বঙ্গ	শশাঙ্কের মৃত্যুর পর মাৎস্যন্যায় কবলিত বঙ্গদেশের বিশৃঙ্খল অবস্থা	ষষ্ঠ শতাব্দী
	তুমি সন্ধ্যার মেঘ	মগধ ও চেদিরাজ্য	মগধেশ্বর নয়পাল ও চেদিরাজ কর্ণ-দেবের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা	একাদশ শতাব্দী
শঙ্খ-কঙ্কন		দাক্ষিণাত্যের সাতপুরা শৈলমালার পঞ্চমপুর ও ভারতের রাজধানী দিল্লী	আলাউদ্দিন খিলজীর দাক্ষিণাত্য অভিযান	ত্রয়োদশ শতাব্দী
রেবা রোধসি		নর্মদার তীরবর্তী মহেশ-গড় নামক রাজ্য	প্রথমে আলাউদ্দিন খিলজী ও পরে মালিক কাফুরের দাক্ষিণাত্যঅভিযান	ত্রয়োদশ শতাব্দী
	তুঙ্গভদ্রার তীরে	বিজয়নগর	বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্যের পারস্পরিক শত্রুতা	পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ

গল্প	উপন্যাস	স্থান	ইতিহাসের প্রসঙ্গ	সময় (আনুমানিক)
রক্তসন্ধ্যা		কালিকট	পর্তুগীজদের ভারত আগমন ও মূরদের সঙ্গে শত্রুতার সূচনা	পঞ্চদশ শতাব্দী
চুয়াচন্দন		নবদ্বীপ	চৈতন্যদেবের সমসাময়িক নবদ্বীপের নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খল অবস্থা	ষোড়শ শতাব্দী
বাঘের বাচ্চা		পুণা	কিশোর শিবাজীর পরিচয়	সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ
তক্ত মোবারক		মুঙ্গের	শাহাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহ সুজার প্রসঙ্গ	সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ
চন্দন মূর্তি		কলকাতা ; হিমালয়ের সানুদেশ	গৌতমবুদ্ধের একটি চন্দন মূর্তি উদ্ধার প্রসঙ্গ।	১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ

তৃতীয় অধ্যায়

অলৌকিক ও অতিলৌকিক কাহিনী

॥ ১ ॥

বাংলা অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত কাহিনী ধারায় শরদিন্দু

সাধারণতঃ অলৌকিকতা ও অতিলৌকিকতা বলতে বোঝায় আমাদের লৌকিক অভিজ্ঞতার সীমানা বহির্ভূত এমন কিছু রহস্য যেগুলিকে বাস্তব যুক্তি বা বুদ্ধির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না—যেমন ভৌতিক ক্রিয়াকলাপ, দৈব প্রভাব, জন্মান্তরবাদ, মন্ত্রশক্তি ইত্যাদি।

সৃষ্টির ঘনতমসাবৃত প্রথম প্রহর থেকে শুরু করে আজকের এই আলোকোজ্জ্বল বিংশ শতাব্দীর অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত অলৌকিক ও অতিলৌকিক-এর প্রতি মানব হৃদয়ের কৌতূহল ও বিস্ময়ের অন্ত নেই। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সাহিত্যেই অপ্রাকৃতকে কেন্দ্র করে জনচিত্তের এই দুর্নিবার জিজ্ঞাসারই প্রতিফলন ঘটেছে। বাংলা সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। তার অন্যান্য ক্ষেত্রে তো বটেই, এমনকি কথাসাহিত্যের ধারাতেও অতি শৈশবকাল থেকেই অনৈসর্গিক ঘটনার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এই শাখায় প্রথম সার্থক শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ গল্প উপন্যাসেই জ্যোতিষচর্চা ও দৈবপ্রভাবের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বহুস্বজন-বিয়োগ-বেদনাহত রবীন্দ্রনাথ নাকি ব্যক্তিগত জীবনে পরলোকচর্চায় বিশেষ আগ্রহী ছিলেন, তাঁর সাহিত্যেও অলৌকিক রস পরিবেশনের আয়োজন হয়েছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর লেখা একাধিক ছোটগল্পের কথা উল্লেখ করা যায়—যেমন নিশীথে, মণিহারা, ক্ষুধিত পাষাণ প্রভৃতি। অবশ্য গভীর অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় আপাতদৃষ্টিতে উপরোক্ত গল্পগুলিকে অলৌকিক মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এরা মানবমনের বিচিত্র অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। যেমন 'নিশীথে' গল্পটিতে নায়ক যখনই তার দ্বিতীয়া স্ত্রীকে সম্ভাষণ করতে গেছে তখনই সে শুনতে পেয়েছে মৃতা প্রথমা স্ত্রীর কণ্ঠনিঃসৃত তীক্ষ্ণ প্রশ্ন "ও কে, ও কে, ও কে গো," ! এই জিজ্ঞাসা আসলে নায়কের অবচেতন মনের অপরাধবোধের প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই নয়। 'কঙ্কাল' ও 'মণিহারা'তেও বিশেষ পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে চরিত্র সমূহের মনোবিকলন ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার প্রকাশ ঘটেছে। 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর রোমাঞ্চকর ঘটনাবলীও আসলে ইতিহাস সচেতন এক রোমান্টিক কবি মনের নানা ভাবনার প্রক্ষেপ-মাত্র। বঙ্গ-কথাসাহিত্যের অপর এক দিকপাল শরৎচন্দ্রের রচনায় সমাজ-বাস্তবতা ও সামাজিক সমস্যা প্রাধান্য লাভ করলেও অপ্রাকৃতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ এবং

অলৌকিকতা-চিত্রণে তাঁর দক্ষতা যে কত গভীর 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের অষ্টম পরিচ্ছেদে নিরুদিদির মৃত্যু দৃশ্যে এবং অষ্টম ও নবম পরিচ্ছেদে শ্রীকান্তের মহাশ্মশানে রাত্রিযাপন-কালে বিভিন্ন অনুভূতি বর্ণনার ক্ষেত্রে তার অভ্রান্ত স্বাক্ষর মুদ্রিত আছে।

বাংলা সাহিত্যকে অনেকগুলি ভৌতিক' গল্প উপহার দিয়েছেন যে সাহিত্যিক তাঁর নাম ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি বঙ্গ সাহিত্যের এই বিশেষ শাখাটিকে সমৃদ্ধ করে তোলার কাজেই বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর লেখা 'পৌষ-পার্বণে চীনে ভূত' বা 'মেঘের কোলে ঝিকিমিকি', 'সতী হাসে ফিকিফিকি' প্রভৃতি গল্পে ভূতের আনাগোনা থাকলেও তারা ভীতিপ্রদ নয়, বরং কৌতুকবহ। তবে তাঁর লেখা 'মাস্টার মশায়' ভৌতিক গল্প হিসাবে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শরদিন্দুর সমসাময়িক এক খ্যাতকীর্তি সাহিত্যিকও অতিলৌকিক ও অলৌকিক জগতে বেশ স্বচ্ছন্দচারী—তাঁর নাম বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় অর্থাৎ 'বনফুল'ও আমাদের কাছে নূতন আঙ্গিকে, অভিনব দৃষ্টিকোণ থেকে অপ্রাকৃতকে উপস্থাপিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। সুতরাং আলোচ্য ধারায় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বগামী, সহযাত্রী ও উত্তরসূরী অনেকেই আছেন কিন্তু বক্তব্যে ও প্রকাশভঙ্গীতে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাতন্ত্র্য অবিস্মরণীয়। শুধু অগণিত পাঠকচিত্ত জয়ের সহজ উপায় হিসাবেই তিনি অলৌকিক কাহিনী রচনায় মনোনিবেশ করেছেন এমন নয়, অপ্রাকৃতের প্রতি একটা নিগূঢ় আন্তরিক আকর্ষণ না থাকলে উক্ত বিষয় অবলম্বনে বহুসংখ্যক রসোত্তীর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভবপর নয়। এ তথ্য শুধু অনুমান মাত্র নয়, এক কৌতূহলী পাঠকের প্রশ্নের উত্তরে মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে স্বয়ং লেখকই বলেছিলেন "ভূতের গল্প সম্বন্ধে আমার একটু দুর্বলতা আছে" [শরদিন্দু অম্‌নিবাস—পঞ্চম খণ্ড, গল্প পরিচয়] অবশ্য একই সঙ্গে আছে পাশ্চাত্য সাহিত্যিকগণের বিশেষতঃ আর্থার কোনান ডয়েল ও মোপাঁসার লেখা কয়েকটি গল্পের পরোক্ষ প্রেরণা। যেমন লেখকের স্বীকৃতি অনুসারে জানা যায় 'রক্তখদ্যোত' গল্পের শেষ কয়েক পংক্তির ভাবাংশ আর্থার কোনান ডয়েলের একটি গল্পের থেকে গৃহীত হয়েছে। এবং অশরীরী গল্পটি মোপাঁসার "La Horla" গল্পের ভাবানুপ্রেরণায় রচিত।

[শরদিন্দু অম্‌নিবাস—পঞ্চম খণ্ডে গল্প পরিচয় দ্রষ্টব্য]

অবশ্য এইরকম দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া শরদিন্দুর অধিকাংশ অলৌকিক গল্প তাঁর মৌলিক চিন্তার ফসল। তিনি শুধু অনেকগুলি ভৌতিক গল্পই রচনা করেননি, সৃষ্টি করেছেন এক প্রেতপ্রেমিক চরিত্রও—তার নাম বরদা। শরদিন্দুর প্রথম রোমাঞ্চ কাহিনী (যতদূর জানা যায় এটি তাঁর লেখা প্রথম ছোট গল্পও বটে) 'প্রেতপুরী' লেখা হয় ১৯১৫ (বাংলা ১৩২২) সালে, তখন লেখকের মাত্র ষোল বছর বয়স। এই গল্পেই বরদার সঙ্গে পাঠকের প্রথম সাক্ষাৎ। এরপর শরদিন্দু-সৃষ্ট অলৌকিক রসলোকের আলোছায়াময় পথে আরও বহুবার তার দেখা পাওয়া যায়। মূলতঃ বরদার অভিজ্ঞতা-সূত্রেই মুঙ্গের শহর ও বিহারের গ্রামাঞ্চলের প্রেক্ষাপটে অপ্রাকৃত জগৎ তার অফুরন্ত রহস্য ও বিচিত্র বিস্ময় নিয়ে আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অতএব

বর্তমান অধ্যায়ে প্রথমে বরদা-বিবৃত কাহিনীগুলির ও তারপর যথাক্রমে জাতিস্মরতা-বিষয়ক ও অন্যান্য অলৌকিক ও অতিলৌকিক গল্পসমূহের পর্যালোচনা করা হবে।

॥ ২ ॥

প্রেতপুরী [১৩২২] : 'প্রেতপুরী' গল্পে বাংলার পল্লীগ্রামে 'ভূতুড়ে বাড়ী' বলে পরিচিত এক নির্জন, পরিত্যক্ত গৃহ, সেখানকার ভৌতিক পরিবেশ, সর্বোপরি গল্পের শীর্ষনাম পাঠক হৃদয়ে একটি রোমহর্ষক অলৌকিক গল্প পাঠের প্রত্যাশা জাগায় বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ কাহিনীতে উদ্ঘাটিত হয়েছে লৌকিক জীবনেরই এক সকরুণ ট্র্যাজিডি। মদ্যাসক্তি ও হিতাহিতজ্ঞানশূন্য ক্রোধ মানুষের সমস্ত সাধ ও স্বপ্নকে কেমন করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় 'প্রেতপুরী' তারই নির্মম প্রতিচ্ছবি।

'প্রেতপুরী'র বিপত্নীক গৃহস্বামী মদ্যাকর্ষণ ও ক্রোধ এই উভয় প্রভাবে একই দিনে হারিয়েছে তার চাকরী এবং হত্যা করেছে তার আদরিণী শিশু কন্যাটিকে—তারপরে পুলিশের ভয়ে ফেরার হয়েছে। কিন্তু এই নিষ্ঠুর অপরাধের গুরুত্ব অনুভব করে অনুতপ্ত হওয়ার শক্তিটুকুও তার অবশিষ্ট নেই—তিনমাস যাবৎ মদ্যপান করতে না পারার কষ্টেই সে ব্যাকুল। তাই তাকে বলতে শোনা যায়—"মেয়েটা মরেছে—যাকগে। কিন্তু তার মল ক' গাছা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না।" মেয়ের পুঁতে রাখা সেই মল ক' গাছার সন্ধানেই সে রাতের অন্ধকারে প্রাকৃতিক দুর্যোগ অগ্রাহ্য করে সর্বশক্তি দিয়ে গাছতলার মাটি কোপায়, আর তারই তালে তালে জনহীন ঘরের আলমারিতে রাখা সুরার শূন্য বোতলগুলিতে শব্দ হয়—ঝন্‌ঝন্‌, ঝন্‌ঝন্‌। সাধারণ মানুষ এই বাস্তব কার্যকারণ সূত্রকেই অপ্রাকৃত ঘটনা মনে করে বিভ্রান্ত হয়েছে। বাড়ীটিকে প্রেতের আবাস ভেবে অযথা ভয় পেয়েছে কিন্তু ভূতের সম্পর্কে যার অপরিসীম কৌতূহল, সেই বরদা বাড়ীটির সম্পর্কে জনশ্রুতি শুনেও সেখানেই রাত্রিবাস করতে চেয়েছে, এবং গভীর রাত্রে হঠাৎ দেওয়াল-আলমারির মধ্যে থেকে ভেসে আসা ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ শুনতে পেয়ে সে কিছুটা বিমূঢ় হয়ে পড়েছে বটে কিন্তু মনোবল সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেনি। তাই তার পক্ষে প্রেতপুরীর প্রকৃত রহস্য জানা সম্ভব হয়েছে। অবশ্য এর জন্য তাকে কিছু মূল্যও দিতে হয়েছে—খোয়াতে হয়েছে তার সোনার ঘড়ি ও মানিব্যাগ। না, এই চৌর্যক্রিয়াটুকুও কোনও প্রেতের অলৌকিক কাজ নয়, ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের একান্ত লৌকিক প্রয়োজনেই সেগুলি আত্মসাৎ করেছে 'প্রেতপুরী'র ভূতপূর্ব গৃহস্বামীই। এ গল্পের সূচনায় তাই ভয়ানকের আভাস থাকলেও সমাপ্তি করুণ রসে।

রক্তখদ্যোত [১৩৩৫-৩৬] : 'রক্তখদ্যোত' গল্পে প্ল্যানচেটের মাধ্যমে প্রেতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। আলোচ্য গল্পে মৃত সুরেশবাবুর আত্মা বরদা-ভ্রাতা পাঁচুর মাধ্যমে নিজের জীবনের এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতাকে বর্ণনা করেছে। তবে তাঁর বক্তব্য মুখের কথায় নয়, হাতের লেখায় প্রকাশিত হয়েছে।

সুরেশবাবুর প্রেতাত্মার সেই জবানবন্দী পাঠ করার পর পাঠকমনে প্রশ্ন জাগে সত্যিই কি সুরেশবাবু সেই শীতের রাত্রে মুঙ্গেরের গঙ্গা উপকূলে অবস্থিত মুসলমানদের গোরস্থানে

অলৌকিক কিছু দেখেছিলেন ? অথবা তাঁর যুক্তিবাদী চেতন মনের অন্তরালে অবচেতনে সুপ্ত ভয়ের সহজাত সংস্কার, জীবন্ত গোরস্থানটি সম্পর্কে ভীতিপ্রদ জনশ্রুতি, দিনের আলোয় দেখা গোরের উপর শায়িত ভয়ংকর দর্শন কুকুরটির হিংস্র আচরণ, সর্বোপরি তমসাবৃত নির্জন রাত্রির প্রভাব কি সুরেশবাবুকে দুর্বল করে ফেলেছিল ? তাই নিভন্ত চুরুটের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গকে তিনি সেইদিনই সকালে দেখা গোরস্থানের প্রহরী, অদ্ভুত কুকুরটির রক্তখদ্যোত সদৃশ মণিহীন, রক্তাভ দুটি চক্ষু বলে মনে করেছেন ? অবশ্য সুরেশবাবুর মৃত্যু ঘটেছে কুকুরের কামড়ে বা অলৌকিক কোনও কারণে নয়, সেই হিমশীতল আবহাওয়ায় সারারাত উন্মুক্ত প্রান্তরে অচৈতন্য অবস্থায় অতিবাহিত করার ফলস্বরূপ তিনি 'নিউমোনিয়া'য় আক্রান্ত হয়ে পরলোক যাত্রা করেন। কিন্তু সংশয় জাগে তাঁর এই জীবন পরিণাম কি নিছক ঘটনাচক্র, নাকি জীবন্ত কবরটির অশুভ প্রভাবে অবিশ্বাস করার প্রতিফল ? এই সংশয়, এই রহস্যই 'রক্তখদ্যোত'কে অলৌকিক গল্প হিসাবে সার্থক করে তুলেছে।

গল্পের শেষাংশে সুরেশবাবুর আত্মার প্রেতলোকে অবস্থানের পরিকল্পনাটি প্রশংসনীয়। দেহের বন্ধন থেকে মুক্তি পেলেও অনেক সময়ে সদ্যমুক্ত আত্মা এই বিপুল পরিবর্তন সহজে অনুভব করতে পারে না—সুরেশবাবুর ক্ষেত্রে এই রকমই ঘটেছে—মৃত্যুর পরেও প্রেতলোককে তিনি মর্তলোক ভেবেছেন। মৃত্যুর মহানিদ্রা অন্তে আত্মার জাগরণকে তাঁর মনে হয়েছে মানবদেহের রোগমুক্তির আনন্দ—তাই বহুকাল আগেই মৃত বাল্যবন্ধু বিনোদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি সবিস্ময়ে ভেবেছেন পরলোকগত বিনোদের ইহলোকে আগমন ঘটল কি উপায়ে ? তখন বিনোদের আত্মাই তাঁকে জানিয়েছে সেই চরম সত্য—"তুমিও আর বেঁচে নেই বন্ধু।"

জীবন ও মৃত্যুর প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের দ্বৈতলীলায় ভাস্বর রক্তখদ্যোত শরদিন্দু-সাহিত্যাকাশে একটি অত্যুজ্জ্বল আলোকবিন্দু।

টিকটিকির ডিম [১৩৩৬]ঃ "ভয়ের যে বস্তুটা চোখ দিয়ে দেখা যায় না, যার ভয়ানকত্ব যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করা যায় না এবং যার হাত থেকে উদ্ধার পাবার কোনো জানিত উপায় নেই, সে বস্তুই বোধ করি জগতে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। ভূতের ভয় ঐ জাতীয়।"

—এই উক্তি 'টিকটিকির ডিম' গল্পের উপসংহার পর্বে স্বয়ং ভূতবিজ্ঞানী বরদার! এ গল্পের কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু মানবাত্মা নয়, একটি মৃত টিকটিকির প্রতিশোধলিপ্সু আত্মা। একরাত্রে বরদার হস্তনিক্ষিপ্ত অভিধানের আঘাতেই তার মৃত্যু হয়, এবং এই ঘটনার পর থেকেই বরদা প্রায়ই একই সঙ্গে দুটি করে টিকটিকির ডিম দেখতে পায়। এই অপ্রাকৃত অভিজ্ঞতার অভিঘাতে ঘৃণায়, আতঙ্কে বরদার জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

'টিকটিকির ডিম' গল্পের বর্ণনা কৌশলের দ্বারা অলৌকিকতার স্বাদ সৃষ্টি করা হলেও প্রকৃতপক্ষে গল্পটি কিছুটা মনস্তত্ত্বমূলক। টিকটিকির প্রতি বরদার প্রথমাবধিই তীব্র বিতৃষ্ণা, তার মতে—

"জগতে যত রকম জানোয়ার আছে, আমার বিশ্বাস তার মধ্যে সবচেয়ে টিকটিকি

বীভৎস। মাকড়সা, আরশোলা, শুঁয়োপোকা, কচ্ছপ এমনকি ব্যাঙ পর্যন্ত আমি সহ্য করতে পারি। কিন্তু টিকটিকি!”

তাই তারই টেবিলে এক প্রকাণ্ড টিকটিকিকে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে দেখে ঘৃণায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য বরদা প্রবল আক্রোশে টিকটিকিকে বধ করেছে। কিন্তু তার অবচেতন মনে এই ঘটনার গভীর প্রতিক্রিয়া ঘটেছে—নিগূঢ় এক পাপবোধ তার অন্তরাত্মাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সেই রাত্রে বরদা ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখেছে। তার পরদিন প্রভাতী চা পানকালে তার চোখে পড়েছে টেবিলের ওপর পাশাপাশি রাখা দুটি টিকটিকির ডিম —এ দুটির অস্তিত্ব হয়তো অস্বীকার করা যায় না কিন্তু এরপর থেকে সে যত্রতত্র টিকটিকির ডিম দেখতে পেয়েছে—এ যে তার রজ্জুতে সর্পভ্রম, তার অস্থির মানসিক পরিস্থিতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র এইরকম অনুমানের সূত্র গল্পের মধ্যেই পাওয়া যায়—যেমন ভাতের মধ্যে দুটি সিদ্ধ করমচাকে টিকটিকির ডিম মনে করে প্রবল বিতৃষ্ণায় বরদার খাবার ফেলে উঠে যাওয়া। শেষ পর্যন্ত বন্ধু শুভেন্দু মারফৎ বরদা গয়ায় নিহত টিকটিকির উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করে, প্রেতাত্মার হাত থেকে নয় প্রকারান্তরে নিজের বিবেক দংশন থেকেই মুক্তি পেয়েছে ; তাই কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে তাকে লঘু পরিহাসের সুরে বলতে শোনা যায়—

“সেই মায়ামুক্ত জীবাত্মা বোধ করি এখন দিব্যলোকে বৈকুণ্ঠের দেয়ালে উঠে পোকা ধরে ধরে খাচেছন।”

মরণ ভোমরা [১৩৩৮] **:** ‘মরণ ভোমরা’ গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এক আশ্চর্য কাকতালীয়।

এই গল্পের স্থান মুঙ্গের শহরে অবস্থিত বরদাদের ক্লাবঘর। ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে এক শীতার্ত সন্ধ্যায় সেখানে ভূতনাথ শিকদার নামে এক বিচিত্র আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটেছে। ছত্রিশ বছর বয়স্ক এই শীর্ণ দর্শন মানুষটি ক্লাবের তিন সদস্যের কাছে ব্যক্ত করেছে তার জীবনের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। তার বিবৃতি অনুসারে জানা যায় ষোল থেকে ছত্রিশ—এই কুড়ি বছরে লোকটি তিনশ একুশবার এক কালো ভ্রমর দেখেছে। আর এই ভোমরা দেখার ফলে তার কোনও ক্ষতি হয়নি বটে, কিন্তু তিন-দিনের মধ্যে অপর কোনও ব্যক্তির মৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠেছে—প্রতিবারই এই অলৌকিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। কুড়ি বছর ধরে বারংবার ভ্রমর দর্শন ও মৃত্যুর অপ্রতিহত যোগাযোগ ভূতনাথ শিকদারকে মানসিক ভাবে দুর্বল করে ফেলেছে, সে নিজের কাছেই মূর্তিমান অলক্ষণ রূপে প্রতিপন্ন হয়েছে এবং মানব সঙ্গ পরিহার করে স্বেচ্ছা নির্বাসন বরণ করে নিয়েছে।

ভূতনাথের এই অদ্ভুত জীবনকথা ক্লাবের অন্য সদস্যেরা তো দূরের কথা বরদা পর্যন্ত সহজে বিশ্বাস করতে চায়নি। সে ভূত-অভিজ্ঞ বটে, কিন্তু এই ধরণের অলৌকিকতার সঙ্গে তার আগে কখনও পরিচয় ঘটেনি। তাই ভূতনাথের সম্বন্ধে তাকে বন্ধুদের কানে কানে বলতে শুনি—

“একেবারে বদ্ধ পাগল—মনোম্যানিয়াক”

কিন্তু ভূতনাথের বিবৃতি যে পাগলের প্রলাপ মাত্র নয়, তার প্রমাণ পাওয়া যায়

অল্প কয়েক মুহূর্ত পরেই, যখন ক্লাবঘরের পশ্চিমদিকের জানালাটি খুলে দেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাতায়ন পথ দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে একটি কৃষ্ণ ভ্রমর। সেই মৃত্যুদূতের সাক্ষাৎ পাওয়া মাত্রই ভূতনাথ শিকদার উন্মাদের মত ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে গেছে—আর ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় তিন শ্রোতা "বিহ্বল জিজ্ঞাসুভাবে পরস্পরের মুখের পানে" চেয়ে ভেবেছে—"তিন দিনের মধ্যে কাহাকে যাইতে হইবে ?"

এই মর্মন্তুদ জিজ্ঞাসার মাধ্যমে গল্পটি সমাপ্ত করার পরিকল্পনায় শরদিন্দুর ছোট গল্প রচনার দক্ষতা সুপরিস্ফুট।

অশরীরী [১৩৩৯] : 'অশরীরী গল্পের উপস্থাপনার কৌশলটুকু অভিনব। বরদা কর্তৃক সংগৃহীত একটি ছিন্ন ডায়েরীর শেষ কয়েকটি পাতা এ কাহিনীর উপজীব্য, কোন এক বৎসরের ৭ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২৮ শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বাইশ দিনের ঘটনাক্রম এখানে বর্ণিত হয়েছে।

ছিন্ন দিনলিপির লেখকের নাম জানা যায় না, তবে তা পড়ে এটুকু বোঝা যায় যে তিনি হাইকোর্টের নামজাদা এ্যাডভোকেট। বিগত কিছুমাস ওকালতির পেশায় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় দেহে মনে ক্লান্ত এই ব্যক্তি কিছুদিন মানুষের ভীড় ও শহরের কোলাহল থেকে মুক্ত হয়ে নিরালায় বিশ্রাম নেবার ইচ্ছায় উপস্থিত হয়েছেন মুঙ্গের স্টেশন থেকে মাইল তিনেক দূরে পীর পাহাড় অঞ্চলের এক বাড়ীতে। পাহাড়ের ঠিক মাথার উপরে অবস্থিত এই নির্জন বাড়িটি প্রথম দর্শনেই তাঁকে মুগ্ধ করেছে—এবং পরের সন্ধ্যাতেই তাঁর কাঁধের ওপর হঠাৎ ঝরে পড়েছে একটা রক্তরাঙা শিমূল ফুল—লেখকের বিভ্রম ঘটেছে, শিমূল ফুলকে মনে হয়েছে এক ঝলক রক্ত।

এরপরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে ১৩ই ফেব্রুয়ারী তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছেন না, অথচ ঘুমের মধ্যে কার স্পর্শ তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তারপর প্রতিদিন একটু একটু করে সেই জনহীন গৃহে তিনি কোনও এক দেহ বিমুক্ত আত্মার অশরীরী অস্তিত্ব সুস্পষ্টভাবে অনুভব করেছেন। সেই অনুভূতি এত গভীর যে তাঁর প্রেতসম্পর্কে অবিশ্বাসী মনেও ধীরে ধীরে প্রেতাত্মায় বিশ্বাস জন্মেছে, এবং সেই অশরীরী সঙ্গীকে চাক্ষুষ দর্শনের বাসনা তাঁকে ব্যাকুল করে তুলেছে। বিশেষতঃ যেদিন তাঁর চিরুনিতে একটি সুদীর্ঘ কেশ জড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি বুঝতে পেরেছেন সেই অদৃশ্য আত্মা পুরুষের নয়, নারীর, সেইদিন থেকে নেপথ্যচারিণীটিকে প্রত্যক্ষ করার ব্যাকুলতা তীব্রতর হয়ে উঠেছে, তাঁর আহার-নিদ্রা ঘুচে গেছে। বিরহ-উন্মত্ত যক্ষের মতো তাঁর হৃদয়েও শুধু সেই অদেখা প্রিয়ার চিন্তা ও তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার দুর্দম আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠেছে। অবশেষে তিনি অনুভব করেছেন—

> "না, রক্ত মাংসের শরীরে তাহাকে পাইব না। সে সূক্ষ্মলোকের অধিবাসিনী ; স্থূল মর্তলোক হইতে আমি তাহার নাগাল পাইব না। আমার এই জড় দেহটাই ব্যবধান হইয়া আছে।"

তাই আত্মহননের মাধ্যমে সেই ছায়াময়ী প্রিয়তমার সঙ্গে পরলোক মিলনের পথ তিনি স্বহস্তে রচনা করেছেন।

লৌকিক প্রেমের মত অলৌকিক প্রণয়াবেগেরও কি প্রবল আকর্ষণ ও দুর্জয় শক্তি থাকে—অশরীরী গল্পে তার পরিচয় পাওয়া যায়। নির্জন প্রাচীর বাড়ী, সেখানে প্রেতের অস্তিত্ব অথচ দিনলিপির লেখক অর্থাৎ কলকাতার সেই আইনজীবী ভদ্রলোকটি আশ্চর্য হয়ে ভেবেছেন—'ভয় করে না কেন ?'

এ গল্প পড়ে ভয় জাগে না পাঠকের মনেও বরং বাস্তব নর-নারীর অনুরাগ রক্তিম প্রণয় কাহিনীর মতোই লৌকিক নায়কের সঙ্গে অশরীরী নায়িকার সেই প্রগাঢ় বিরহ-মিলন লীলার ভাষাচিত্র আমাদের মনে এক অপরূপ রসানুভূতির সৃষ্টি করে। এই রোমান্টিক প্রণয় মাধুর্যই 'অশরীরী'কে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে।

সবুজ চশমা [১৩৪০] ঃ 'নাস্তিক' বরদা কী কারণে প্রেতের অস্তিত্বে গভীরভাবে বিশ্বাসী হয়ে পড়ল, "সবুজ চশমায়" সেই কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনাই বিবৃত হয়েছে। একরাত্রে কিউল স্টেশনের প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগারে পদার্থ বিদ্যার স্বনামধন্য অধ্যাপক বিরাজমোহন সেনের সঙ্গে বরদার দেখা হয়। আর সেই সূত্রেই বরদার হাতে এসেছে বায়নাকুলার চশমার মত দেখতে এক অদ্ভুত চশমা যার কাচের রং ফিকে সবুজ। এই বিচিত্র বস্তুটির নির্মাতা অধ্যাপক সেনের সানন্দ সম্মতিতে ও সহযোগিতায় কৌতূহলী বরদা সেই সবুজ চশমাটি পরেছে—এবং অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বরদার চোখের সামনে ছায়াছবির মতো ক্রমান্বয়ে অলৌকিক দৃশ্যাবলী পরিস্ফুট হতে সুরু করেছে। 'কিউল' স্টেশনের সেই প্রতীক্ষালয়ে প্রফেসর সেন ও বরদা ছাড়া তৃতীয় প্রাণী উপস্থিত ছিল না কিন্তু সবুজ চশমার ভেতর দিয়ে বরদা দেখতে পেল—

"……টেবিল ঘিরে প্রত্যেক চেয়ারে একটি করে লোক বসে আছেন—তাঁদের পেছনে মাথার পর মাথা, ঘরের মধ্যে তিল ফেলবার জায়গা নেই !"

… … … ..

"এঁদের যে কত রকম চেহারা, তা বর্ণনা করা যায় না। সাহেব আছেন, চীনাম্যান আছেন, ভারতীয় লোক আছেন, আবার নিকষকান্তি নিগ্রোও রয়েছেন—কোনও ভেদজ্ঞান নাই।"

কেবলমাত্র অন্ধ বিশ্বাস নয়, প্রেতলোক ও প্রেতযোনির অস্তিত্বকে বিজ্ঞানসম্মতরূপে প্রতিষ্ঠাদানের এক দুর্লভ সুযোগ এনেছিল অধ্যাপক সেনের আবিষ্কৃত সবুজ চশমা—কিন্তু বিশ্ববাসীর কাছে তাঁর এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারটিকে প্রতিষ্ঠা দান করা যায়নি। কারণ চশমা চোখে দিয়ে প্রেতলোক দর্শনে তন্ময় বরদা এমনই বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিল যে সহসা তার প্রতি বহুসংখ্যক প্রেতাত্মার সমবেত ক্রোধ লক্ষ্য করে প্রাণভয়ে চশমাসহ পলায়ন করতে গিয়ে ঘটনাচক্রে সে নিজে কোনমতে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায় বটে, কিন্তু সবুজ চশমা ট্রেনের চাকায় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। এ দুর্ঘটনা না ঘটলে বহু মানুষই আজ সেই সবুজ চশমা চোখে দিয়ে অদৃশ্য প্রেতলোক দর্শন করার সুযোগ লাভ করতেন। কিন্তু অধ্যাপক সেনের আবিষ্কার একেবারে ব্যর্থ হয়নি। বিশ্বের অন্ততঃ একটি মানুষ তাঁর সবুজ চশমার মাধ্যমে প্রেতবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে—তার নাম বরদা।

তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে সবুজ চশমা শুধু বরদার কাছেই নয়, পাঠকদের কাছেও

প্রেত চরিত্র সম্বন্ধে একাধিক প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে চলেছে। যেমন প্রেত সমাজে যে কোনও বর্ণভেদ নেই, প্রেতাত্মাদের দর্শন করা গেলেও তাদের কথা শোনা যায় না এবং তাদের সম্পর্কে মানুষের অযথা কৌতূহল তারা মোটেই পছন্দ করে না—এই সকল বিষয়গুলি 'সবুজ চশমা' পাঠ করলেই জানা যায়।

শরদিন্দুর অলৌকিক ও অতিলৌকিক গল্পের সংকলন 'কল্পকুহেলী'র ভূমিকায় শ্রীসুভদ্রকুমার সেন সবুজ চশমাকে fantasy—জাতীয় রচনা রূপে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর এই অভিমত সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত। একটা অসম্ভব কল্পনা যথাযোগ্য উপস্থাপনার গুণে কতখানি রসোত্তীর্ণ হতে পারে 'সবুজ চশমা' তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই গল্পে অলৌকিকতা থাকলেও তা ভীতিপ্রদ নয়, বরং কৌতুক ও বিস্ময়ের অপূর্ব সমন্বয়ে গল্পটি পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

বহুরূপী [১৩৪৪]: বিহারের এক গ্রামাঞ্চলের পটভূমিতে লেখা 'বহুরূপী'তে প্রেত সম্পর্কে এক অভিনব তথ্যকে কেন্দ্র করে কাহিনীবৃত্ত গড়ে উঠেছে। শরদিন্দুর অধিকাংশ গল্পেই প্রেতাত্মারা বিদেহী। কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখানো হয়েছে এক অশরীরী আত্মা যে শুধু দেহধারণ করতে পারে তাই নয় সে ইচ্ছারূপধারী। আবার কি কৌশলে প্রেতাত্মা দেহধারণ করতে পারে সেই 'থিওরি'ও সেই বরদার রূপধারী প্রেতাত্মার মুখেই শোনা যায়—

"অশরীরী আত্মাকে স্থূল দেহ ধারণ করতে হলে কিছু জান্তব মাল-মশলার দরকার হয়, তার নাম বিজ্ঞানের ভাষায় এক্টোপ্লাজম। এই এক্টোপ্লাজম প্রয়োজন মত না পেলে চেহারা একটু অন্যরকম হয়ে যায়।"

"..... প্রেতযোনি ইচ্ছা করলেই চেহারা বদল করতে পারে; কারণ তাদের দেহের উপাদান মানুষের দেহের উপাদানের মত কঠিন বস্তু নয়।"

বরদার গ্রামের বাড়ীতে আমন্ত্রিত বন্ধুরা ঘুণাক্ষরেও অনুমান করতে পারেনি, বরদার অনুপস্থিতিতে যিনি তাদের আপ্যায়ন করেছেন, এমনকি প্রেত জীবন সম্পর্কে তাদের বহুবিধ তথ্য জানিয়েছেন তিনি আসলে বরদার রূপধারী এক প্রেতাত্মা। বরদার কুকুর খোক্কসের দেহ থেকে প্রয়োজনীয় 'এক্টোপ্লাজম' নিয়ে তিনি রূপধারণ করেন। গল্পের শেষে প্রকৃত বরদার আগমনে বরদা রূপধারী প্রেতের অন্তর্ধান এবং খোক্কসের কান্নার মত একটানা দীর্ঘ সুরে ডেকে ওঠা প্রভৃতি ঘটনা বরদার প্রেত-অবিশ্বাসী বন্ধুদের মনে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার করেছে। গল্পের শেষ চমকটুকু নিঃসন্দেহে উপভোগ্য। 'বহুরূপী' গল্পটির মূল্যায়ন করতে গিয়ে 'কল্পকুহেলী' নামক গল্প সংকলনের ভূমিকায় সুভদ্রকুমার সেনের মন্তব্য অবশ্যই এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য—

"এই গল্পের প্রকাশনা doppelgaenger কল্পনাকে আশ্রয় করেনি। পক্ষান্তরে জীবিত ও অজীবিতের এই লুকোচুরির কল্পনাটি খুব চমৎকার। এবং বরদাকে impersonate করার কল্পনাটি তুলনাহীন।"

প্রতিধ্বনি [১৩৪৫]: "প্রতিধ্বনি" গল্পের পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে একটি প্রতিধ্বনিযুক্ত প্রাচীন বাড়ীকে কেন্দ্র করে। বিপত্নীক, বিলিয়ার্ড প্রেমিক সোমনাথের

প্রথম দর্শনেই বাড়ীটির প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার একমাত্র কারণ হলঘরের কেন্দ্রস্থলেই বিলিয়ার্ড টেবিলটি এবং এই আকর্ষণ এমনই অমোঘ যে সোমনাথ পৈতৃক বাড়ী বিক্রি করে দিয়ে সেই প্রাচীন, নির্জন বাড়ীটি কিনে নিয়ে সেখানে বসবাস সুরু করেছে। মুঙ্গেরের বাঙালী ক্লাবে তার ক্রমহ্রাসমান উপস্থিতি লক্ষ্য করে তার বন্ধুদের মধ্যে দুজন অত্যধিক কৌতূহলী হয়ে তার এই নির্জনবাসের কারণ অনুসন্ধানের জন্যই এক সন্ধ্যায় অযাচিতভাবে তার এই বিজন গৃহে উপস্থিত হয়েছে এবং বন্ধুত্বের অধিকারেই সেখানে রাত্রিবাসের সংকল্প জানিয়েছে কিন্তু তারা লক্ষ্য করেছে সোমনাথ এমন কি তার একমাত্র সঙ্গী বাবুর্চিটি পর্যন্ত তাদের এই সিদ্ধান্তে খুশী হয়নি। অন্ধকার ঘনীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সোমনাথের বন্ধুদের চারপাশে কিছু অতীন্দ্রিয় ব্যাপার ঘটতে সুরু করেছে—প্রথমে চোখে কিছু দেখা যায়নি বটে, কিন্তু একাধিক অশরীরী আত্মার আবির্ভাব অনুভব করা গেছে—এমনকি জিয়ানো ল্যাভেণ্ডার ফুলের অতিমৃদু সুগন্ধও স্পষ্টভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সোমনাথের বন্ধু চুনী অশরীরী অস্তিত্বকে সহজে মানতে চায়নি, গভীর রাতে বিলিয়ার্ড রুমে কোনও এক অদৃশ্য প্রতিযোগীর সঙ্গে সোমনাথের বিলিয়ার্ড খেলা, এক অদৃশ্য রমণীর কণ্ঠে সুমিষ্ট হাসির উচ্ছ্বাস, নিম্নসুরে বিদেহী ব্যক্তিদের সঙ্গে সোমনাথের নিমগ্ন আলাপ প্রভৃতি উপলব্ধি করেও চুনী তার প্রতিধ্বনি সম্পর্কিত থিওরিতেই অটল থাকতে চেয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক আশ্চর্য দৃশ্যের সম্মুখীন হয়ে প্রেতের অস্তিত্বে তার সমস্ত অবিশ্বাসই ঘুচে গেছে। সোমনাথের বন্ধুরা সবিস্ময়ে দেখেছে কোন্ অদৃশ্য শিল্পীর দ্বারা অন্ধকারের পটে জোনাকির আলো নিয়ে একটি ছবি আঁকা হয়েছে একটি পাংশু নীলাভ নারী মুখ—"মোমে গড়া মুখোশের মত নিশ্চল মুখ, কিন্তু চোখে কটাক্ষ রহিয়াছে।"

এই গল্পে লেখক দেখিয়েছেন প্রেতাত্মাকে জীবন্ত মানুষের মত ভালবাসতে পারলে সেই বিদেহী ছায়ার সঙ্গে বর্তমানের অধিবাসীদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ গড়ে উঠতে পারে। সোমনাথের বিলিয়ার্ড খেলার নেশার সূত্রেই তার সঙ্গে 'প্রতিধ্বনি'র অদৃশ্য বাসিন্দাদের এক সখ্য সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। কিন্তু অশরীরী অস্তিত্বের প্রতি যথাযোগ্য বিশ্বাস ও ভালবাসা যদি না থাকে তবে তাদের সম্পর্কে মানুষের প্রবল অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহল অলৌকিক জগতের অধিবাসীদের বিব্রত করে তোলে। তাই সন্ধ্যাবেলা বন্ধু পরিবৃত সোমনাথের কাছে এসেও তারা সন্ত্রস্ত হয়ে দূরে সরে গেছে।

এ গল্পে বরদার ভূমিকা গৌণ, কিন্তু বাড়ী কেনার পর থেকে ক্লাবে সোমনাথের অনুপস্থিতি প্রসঙ্গে তার অনুমান অভ্রান্ত। ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে একমাত্র সে-ই বুঝেছে—

"সোমনাথ আমাদের চেয়ে ঢের বেশী মনের মত সঙ্গী পেয়েছে। পুরনো বাঁধনের পাশে খুব শক্ত নূতন বাঁধন পড়েছে, তাই পুরনো বাঁধন ঢিলে হয়ে গেছে।"

আকাশবাণী [১৩৫৩]ঃ বরদা 'আকাশবাণী'র বক্তা নয়, শ্রোতা। সে ক্লাবের অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে একযোগে শুনেছে নূতন সদস্য সুধাংশুর জীবনের এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা। শোনা যায় এই অভিজ্ঞতার প্রভাবেই নাকি নাস্তিক সুধাংশু ভূত-বিজ্ঞানী বরদার পরম ভক্তে পরিণত হয়েছে।

এই গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন প্রিয়তোষবাবু নামে এক বাঙালী ভদ্রলোক। সুধাংশুর পল্লীতে নবাগত এই ব্যক্তিটি বিপত্নীক, তাঁর গৃহ নারীবিহীন। অথচ প্রতি রাত্রেই তাঁর বাড়ী থেকে রমণীকণ্ঠের বাক্যালাপ শোনা যায়। ফলে প্রতিবেশীরা অল্প-কালের মধ্যেই তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠে। প্রিয়তোষবাবুর সম্পর্কে এই জনরবের যাথার্থ্য বিচার করার জন্য কৌতূহলী সুধাংশু এক রাত্রে গোপনে তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হয় এবং অনুভব করে ভদ্রলোকটির সম্বন্ধে জনশ্রুতি আদৌ মিথ্যা নয়—কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই তার কাছে প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। প্রিয়তোষবাবুর কাছ থেকেই সে জেনেছে তাঁর ঘর থেকে ভেসে আসা ঐ কণ্ঠস্বর কোনও জীবিতা রমণীর নয়, তাঁর মৃতা স্ত্রীর। প্রতি রাত্রে তিনিই স্বামীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। তবে উপায়টি অভিনব -'আকাশবাণী' বা বেতারযন্ত্রের মধ্যে দিয়ে তাঁর বাণী ভেসে আসে। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বিমূঢ়, বিস্ময়াহত সুধাংশুকে প্রিয়তোষবাবু জানিয়েছেন—

"রেডিওতে আমার স্ত্রী রোজ এই সময় আমার সঙ্গে কথা কন। তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই এমনি হয়ে আসছে। আমার জীবনের এই একমাত্র সম্বল। উনিই সংসার চালান, উনিই সবকিছু করেন—আমি শুধু ওঁর কথামত কাজ করে যাই।"

সেদিন শুধু প্রিয়তোষবাবুর রেডিওতেই নয়, সুধাংশু বাড়ী ফিরে তার নিজের বেতার যন্ত্রটিতেও সেই নারী কণ্ঠের তরল কৌতুকের হাসি এস্রাজের ধাতব মূর্ছনার মতো বেজে উঠতে শুনেছে—

"তারপর সেই গলার আওয়াজ,—কেমন জব্দ! আর যাবেন পরের হাঁড়িতে কাঠি দিতে?... ..স্বামী-স্ত্রীর কথা চুরি করে শুনতে গিয়েছিলেন তাই একটু ভয় দেখালুম। আর কখনও এমন কাজ করবেন না।"

গল্পটিতে অদ্ভুত ও কৌতুকরসের সুন্দর সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। বেতার যন্ত্র জন-মনোরঞ্জনের একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। কিন্তু এ গল্পে তাকেই এক বিশেষ ক্ষেত্রে ইহলোক ও পরলোকের সংযোগ-সেতু রূপে কল্পনা করে লেখক নিঃসন্দেহেই অভিনব চিন্তা ও গভীর রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

দেহান্তর [১৩৫৬]ঃ 'দেহান্তর' গল্পে বরদা তার এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বন্ধুদের কাছে বিবৃত করেছে। এই গল্পের ঘটনাস্থল কোন এক পাহাড়ী অঞ্চল, যেখানে বাস করেন বরদার জ্যেষ্ঠ শ্যালক। তাঁরই কাছে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে গিয়ে এই কাহিনীর পাত্রপাত্রীদের সঙ্গে বরদার পরিচয় ঘটেছে। এখানে পাত্রপাত্রী মূলতঃ তিনজন —দুজন ইহজগতের বাসিন্দা, অন্যজন লোকান্তরবাসী। গল্পের নায়িকা বিধবা সাবিত্রী দাস সুন্দরী তরুণী, প্রমথ নামে এক স্থানীয় বাঙালী যুবক তার প্রতি গভীরভাবে প্রণয়াসক্ত —সে সাবিত্রীকে বিবাহ করতে চায়—শান্ত, সংযত সাবিত্রীর আচরণে প্রমথর প্রতি প্রণয়োচ্ছ্বাস ধরা পড়ে না, তাই সাধারণ লোক তার প্রকৃত মনোভাব অনুধাবন করতে না পারলেও তার প্রয়াত স্বামীর অশরীরী আত্মার কাছে প্রমথকে কেন্দ্র করে সাবিত্রীর হৃদয়-দৌর্বল্য অজ্ঞাত থাকে না। তাই হর-জটায় সাবিত্রী দাসের বাড়ীতে এক রাত্রে প্ল্যানচেটের আসর বসানো হলে, কোমল প্রকৃতির প্রমথর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, কঠিন

প্রকৃতির মিস্টার দাসের বক্তব্য

"তুমি আবার বিয়ে করতে চাও ? দেব না—দেব না—তুমি আমার—"

প্ল্যানচেটের সময় প্রেতাত্মা সাময়িকভাবে মিডিয়ামের ওপর ভর করতে পারে, আবার যথাসময়ে ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু মিস্টার দাসের আত্মা তাঁর স্ত্রীর প্রণয়ী প্রমথর প্রতি প্রবল বিদ্বেষবশতঃ তার দেহকে সম্পূর্ণ রূপেই অধিকার করে নিয়েছে। তাই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটেছে—প্রমথর প্রকৃতি শুধু নয়, আকৃতিও গতাসু মিস্টার দাসের অনুরূপ হয়ে উঠেছে, এমনকি চিবুকের মধ্যবর্তী খাঁজটি পর্যন্ত বাদ যায়নি।

অর্থাৎ আলোচ্য গল্পে দেখানো হয়েছে দেহ বিমুক্ত আত্মা ইচ্ছামত শরীর ধারণ করতে পারে না বটে, কিন্তু কোনও জীবিত দেহে ভর করে তাকে সম্পূর্ণ রূপে অধিকার করতে পারে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে প্রমথকে সাবিত্রীর দ্বিতীয় স্বামী বলে মনে হলেও প্রকৃত-পক্ষে প্রমথর দেহকে আশ্রয় করে মিস্টার দাসেরই অতৃপ্ত আত্মা তাঁরই পত্নীকে পুনর্বিবাহ করেছেন।

গল্পের শেষে একটা প্রশ্ন থেকেই যায় যা বরদার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে—

"যদি তাই হয় তাহলে প্রমথর আত্মাটার কী হল ? কোথায় গেল সে ?"

কিন্তু এর সঠিক উত্তর খুঁজে পাওয়ার আগেই বরদার শ্রোতারা হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠেছে কারণ—

"অকস্মাৎ আকাশে একটি দীর্ঘ আর্ত কর্কশ চীৎকারধ্বনি হইল।……বাদুড়ের মতো একটা পাখি চাঁদের উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে—কালো ত্রিকোণ পাখা মেলিয়া পাখিটা ক্রমে দূরে চলিয়া গেল।"

অলৌকিক কাহিনীর পক্ষে এই ধরণের রহস্যময় উপসংহার অবশ্যই শিল্পসম্মত।

নীলকর [১৩৬৫] : 'নীলকর' গল্পটিতে বরদার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এক অতৃপ্ত প্রেতাত্মার বিস্ময়কর ক্রিয়াকলাপ বর্ণিত হয়েছে। এই প্রেতাত্মা এক নীলকর সাহেবের। মজঃফরপুর জেলায় নীলমহল অঞ্চলের জনসাধারণের কাছে যে ছিল 'বিল্লি সাহেব' নামে পরিচিত। এই 'বিল্লি সাহেব' তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের 'রোগ' সাহেবের সগোত্র। কারণ 'রোগ' সাহেবের মতোই বিল্লি সাহেবের অন্তরেও প্রজাপীড়নের সাধারণ প্রবণতা ছাড়াও নারীদেহের প্রতি ছিল প্রবল আসক্তি। বহু নারীর উপরে তার অকথ্য নির্যাতনের যোগ্য পুরস্কার সে পেয়েছে এক রমণীর কাছ থেকেই—কোৎঘরে বন্দিনী সেই কৃষক-বধূ দুই হাতের 'কাঙনা' দিয়ে বিল্লি সাহেবের রগে প্রবল করাঘাত করে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। সেই আঘাতেই বিল্লি সাহেবের মৃত্যু ঘটে। অন্য সাহেবেরা এই কেলেঙ্কারীর কথা গোপন করার জন্য কোৎঘরের মাটি খুঁড়ে বিল্লি সাহেবের প্রাণহীন দেহকে কবর দেয়। তারপর থেকে সেই কোৎঘরে-ই সাহেব ভূতের অবস্থান। এই নীলমহল এবং এর কোৎঘর বর্তমানে বরদাদেরই পৈতৃক সম্পত্তির অন্তর্গত। তাই এখানে জমিজমার তদারক করতে এসে বরদা নায়েব শিবসদয়-বাবুর কাছ থেকে এই সাহেব ভূতের কাহিনী শুনে বিশেষভাবে কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

অশরীরীর অস্তিত্বে বরদার অবিশ্বাস নেই, আছে প্রবল অনুসন্ধিৎসা। তাই ভূতের

প্রতি সন্দেহবশতঃ নয়, তার অবস্থানের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়ার জন্যই মনকে প্রস্তুত করে বরদা বিল্লি সাহেবের ঘরে একাকী শয়ন করতে চেয়েছে। তার প্রত্যাশা অপূর্ণ থাকেনি —রাতের গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই কোৎঘরে একের পর এক অলৌকিক ঘটনা ঘটতে সুরু করেছে—যথেষ্ট ইন্ধন থাকা সত্ত্বেও লণ্ঠন নিভে যাওয়া, ঘরের রুদ্ধ দরজা জানলাগুলি আপনা থেকে খুলে যাওয়া, অদৃশ্য কোনও ব্যক্তির খিস্‌খিসে হাসির ,আওয়াজ, বরদার প্রজ্বলিত সিগারেটের ঘ্রাণ গ্রহণের জন্য তার আপ্রাণ চেষ্টা, কুঁজো থেকে জল খাওয়ার শব্দ —সবই বরদা সুস্পষ্টভাবে অনুভব করতে পেরেছে, তবু সাহস হারায়নি। কিন্তু হলধরের স্বৈরিনী কন্যা কবুতরী সেই ঘরে প্রবেশের মুহূর্ত থেকেই যা ঘটতে শুরু করেছে তাতে বরদার মত দুর্জয় মনোবলসম্পন্ন ব্যক্তিও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। কবুতরী এসেছিল তার যৌবনের কুহকমন্ত্রে বরদাকে বশীভূত করতে, কিন্তু বরদা বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে দেখেছে এক অদৃশ্য শক্তির বন্ধনে কবুতরী যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছে, তারপর তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য রমণীটির কী আপ্রাণ প্রয়াস! নারীলোলুপ বিল্লি সাহেবের প্রেতাত্মা আগ্রাসী ক্ষুধায় যেন কবুতরীকে নিঃশেষে গ্রাস করতে চেয়েছে। প্রেতের বিকৃত কামনার এমন নগ্ন প্রকাশ বরদা আব কখনও দেখেনি। বিল্লি সাহেবের সেই খিস্‌খিসে হাসির শব্দকে বরদা বলেছে—'অসভ্য বেয়াড়া হাসি'—কারণ তার মধ্যে দিয়ে শুধু মৃত সাহেবের পঙ্কিল মনই প্রকাশ পায় না—সে হাসির শ্রোতার অন্তরেও সুপ্ত আদিম কামনা জেগে উঠে নৈতিকতা ও শালীনতার সীমা লঙ্ঘনের জন্য প্ররোচিত করতে থাকে।

নীলকরদের অনেক কুকীর্তির পরিচয়ই বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় ছড়িয়ে আছে, কিন্তু নীলকর সাহেবের প্রেতাত্মার পরিচয় বোধ হয় এই গল্পেই প্রথম পাওয়া গেল। আলোচ্য গল্পে ভৌতিক পরিবেশ যেমন জীবন্ত হয়ে উঠেছে, তেমনি অতীতের কলুষ পরিবেশের প্রভাব কিভাবে বর্তমানের মানুষকে অধঃপতনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তার পরিচয়ও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। বহুকাল পূর্বে মৃত বিল্লি সাহেবের চারিত্রিক শৈথিল্যই যেন সঞ্চারিত হয়েছে নায়েব শিবসদয় ও ভ্রষ্টা কবুতরীর চরিত্রে। ভূতের ভয়ে নয়, নৈতিক পদস্খলনের ভয়েই বরদা উক্ত ঘটনার মাত্র দুদিন পরেই নীলমহল ত্যাগ করেছে।

মালকোষ [১৩৬৯] **ঃ** 'মালকোষ' গল্পে দেশী ভূতের কার্যকলাপ নয়, একেবারে আরব্য-উপন্যাসে বর্ণিত জিন বা দৈত্যদের সঙ্গীত-প্রীতির কথা উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছে। বরদার এই অভিনব অভিজ্ঞতা শ্রোতা বা পাঠকের কাছে কম চমকপ্রদ নয়।

একরাতে শ্যালক শুভেন্দুর সঙ্গে বরদা ওস্তাদ কাফি খাঁর ডাকবাংলোতে তাঁর সেতার বাদন শুনতে গিয়েছিল। ওস্তাদজির অপূর্ব নৈপুণ্যে মালকোষ রাগের আলাপ যখন বেশ জমে উঠেছে তখন বরদা কড়া তামাক পাতার গন্ধে সচকিত হয়ে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই তার চোখে পড়ছে এক অভিনব দৃশ্য—

> "ঠিক চাতালের নীচেই একটা প্রকাণ্ড মানুষ উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। ··নিকষের মত কালো গায়ের রঙ, আট হাত লম্বা তাগড়া শরীর, সর্বাঙ্গে লোহার শলার মত রোঁয়া খাড়া হয়ে রয়েছে।"

একটি নয়, এরকম একাধিক দৈত্যই সেদিন মালকোষ রাগের আকর্ষণে কাফি খাঁর ডাকবাংলোতে এসে সমবেত হয়েছিল, বাজনা শোনার ভঙ্গী তাদের সকলেরই একরকম— মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে গান শুনতেই তারা ভালবাসে। তাদের বিশাল আকৃতি দেখে বরদার মতো সাহসী লোকেরও ভয়ে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেছে। অনাহুত, এই সঙ্গীতরসিক আগন্তুকেরা কিন্তু বাদক বা শ্রোতা কারো কোনও ক্ষতি করেনি, বাজনা থামতেই তারা অদৃশ্য হয়ে গেছে। সেতার শ্রবণরত সেই জিনদের সে রাত্রে কিন্তু বরদা ছাড়া আর কেউ দেখতে পায়নি। এই বিষয়টি বরদার মনে কিছুটা সন্দেহ জাগিয়েছে। তাই বন্ধুদের উদ্দেশ্যে তাকে বলতে শুনেছি—

"মালকোষ সুরটা কিন্তু খাঁটি ভারতীয় সুর, তার আদি নাম মল্লকৌষিক।"

তবে সেই রাত্রে বরদা যে জিন দেখেছিল, সে কি মিথ্যা? কেবলমাত্র চোখের ভুল? সেতার সুরু করার আগেই কাফি খাঁ বলেছিলেন—

"মালকোষ যদি শুদ্ধভাবে বাজানো যায় তাহলে জিন্ আসে। ওরা মালকোষ শুনতে বড় ভালবাসে।"

কাফি খাঁর এই উক্তিই কি বরদার অবচেতন মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল? তাই তার ওই দৈত্য-দর্শনের দৃষ্টি বিভ্রম? তাহলে তামাক পাতার গন্ধ এল কোথা থেকে, সে বৈশিষ্ট্য তো আরব্য উপন্যাসের পাতায় বা কাফি খাঁর কথায় উল্লেখ করা হয়নি। মালকোষ গল্পে জিনের আর্বিভাবের সত্যতাকে কেন্দ্র করে সংশয় যত তীব্র হয়, অলৌকিক গল্প হিসেবে এর অবদান ততই প্রবল হয়ে ওঠে।

মরণদোল [১৩৪০]: প্রবল ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত মুঙ্গের শহরের পেক্ষাপটে রচিত 'মরণদোল' গল্পটিতেও অপ্রাকৃতের আংশিক স্পর্শ পাওয়া যায়।

১৩৪০ সনের পৌষ মাসের এক দ্বিপ্রহরে প্রকৃতি দেবীর আকস্মিক তাণ্ডব নৃত্যে বিপর্যস্ত বরদা এবং তার বন্ধুরা প্রত্যেকেই অর্জন করেছে কোনও না কোনও করুণ অভিজ্ঞতা। তারপর দিনের শেষে তারা তাদের ভগ্ন ক্লাবঘরের বাইরে সমবেত হয়ে বিষণ্ন কণ্ঠে একে একে ব্যক্ত করেছে সেই ভয়ংকর মুহূর্তে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার কথা। সবশেষে এসেছে বরদার পালা। কিন্তু তার বক্তব্যে শুধু বেদনা নয়, জড়িয়ে আছে গভীর বিস্ময়ও। ভূকম্পনের সময়ে যখন আত্মরক্ষার তাগিদে স্ত্রীর হাত ধরে নীচে নামার সিঁড়ির দিকে সে ছুটে যাচ্ছিল তখন জলদগম্ভীর স্বরে কে যেন বলে উঠেছে "ওদিকে যাসনি"। সেই চরম বিপদের মুহূর্তেও বরদা তার উপস্থিত বুদ্ধি হারায়নি। তখন ঐ নিষেধবাণীর উৎস সন্ধানের মত সময় এবং সুযোগ তার ছিলনা বটে, কিন্তু অলৌকিকের প্রতি তার প্রগাঢ় আস্থা আছে বলেই, সেই নির্দেশ সে অমান্য করেনি—অন্যপথে নিরাপদ স্থানে ছুটে গেছে। দুর্যোগ থেমে গেলে ব্যাপক ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে অনুভব করেছে অদৃশ্য মনুষ্য কণ্ঠে সেই সতর্কবাণী উচ্চারিত না হলে তাদের রক্ষা পাওয়ার কোনও উপায়ই ছিল না। বরদা বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হয়ে ভেবেছে তার এত বড় শুভার্থীটি কে যে তাকে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করল? বরদার বিস্ময়ই প্রমাণ করে সেই মুহূর্তে সেখানে কোনও জীবিত মানুষের উপস্থিত থাকা সম্ভব নয়—

অথচ ব্যাপারটিকে বিপদের মুহূর্তে বরদার মনের ভুল বলে উপেক্ষাও করা যায় না। সেই মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বরটি কার এই প্রশ্নের সদুত্তর মেলে না, তাই 'মরণ দোল'-এ আন্দোলিত বরদার এই অভিজ্ঞতা অলৌকিকেরই পর্যায়ভুক্ত।

বরদা : সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের মতো ভূতান্বেষী বরদাও স্রষ্টা শরদিন্দুর আর এক প্রশংসনীয় সৃষ্টি। অবশ্য ব্যোমকেশকে কেন্দ্র করে রচিত গল্পের তুলনায় বরদা কেন্দ্রিক গল্পগুলি সংখ্যায় নিতান্তই নগণ্য। অতএব স্বাভাবিক ভাবেই ব্যোমকেশের জনপ্রিয়তা বরদার তুলনায় অনেক ব্যাপক। তবু একথা অনস্বীকার্য যে বাংলা গোয়েন্দা গল্প পড়ুয়াদের কাছে ব্যোমকেশ যেমন অবিস্মরণীয় এক চরিত্র, ভূত-অনুরাগী পাঠকদের পক্ষে বরদাকে বিস্মৃত হওয়া বোধকরি তেমনই অসম্ভব।

ব্যোমকেশের মূল বাসস্থল ও কর্মক্ষেত্র কলকাতা, বরদা মুঙ্গেরের অধিবাসী। ব্যোমকেশ যুক্তি ও অনুমানের প্রখর আলোকসম্পাতে রহস্যের সমস্ত কুহেলী জাল ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে সত্যকে আবিষ্কার করতে চায়, অপরদিকে অপ্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃতের প্রতি বরদার গভীর বিশ্বাস, তাই অলৌকিক জগতের রহস্যময়তাকে সঞ্চারিত করে দিতে চায় অন্যের হৃদয়েও, তবু এক জায়গায় ব্যোমকেশের সঙ্গে বরদার মিল আছে—সাধারণ বাঙালীর তুলনায় তারা দুজনেই অসাধারণ—অথচ তাদের জীবনচর্যায়, আচারে-আচরণে বাঙালীয়ানারই স্পষ্ট প্রকাশ।

বরদার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ভৌতিক গল্পগুলি পাঠ করলে তার সম্বন্ধে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য লাভ করা যায়, যেগুলি চরিত্রটির ব্যক্তিস্বরূপ উপলব্ধি করার পক্ষে একান্ত সহায়ক। 'রক্ত-খদ্যোত', 'টিকটিকির ডিম', 'বহুরূপী', 'নীলকর' প্রভৃতি গল্পের মাধ্যমে বরদার পারিবারিক জীবনের একটি নির্ভরযোগ্য রেখাচিত্র লাভ করা যায়। 'রক্ত-খদ্যোত' পড়লে জানা যায় বরদা কৃতদার, এবং তার পেঁচো (পাঁচু ?) নামে একটি ভাই আছে ; সম্ভবতঃ সে অল্প বয়স্ক, কারণ পেঁচোর সম্পর্কে অমূল্যকে বরদার উদ্দেশ্যে বলতে শুনি—

"এই বয়স থেকেই ছোট ভাইটির মাথা খাওয়া হচ্ছে কেন ?" 'টিকটিকির ডিম'-এ বরদার মায়ের এবং 'নীলকর' গল্পে বরদার দাদার উল্লেখ আছে। 'বহুরূপী' ও 'নীলকর' গল্পে জানা যায় মুঙ্গের শহর থেকে মাইল পনের দূরে দেহাত অঞ্চলে এবং মজঃফরপুর জেলায় বরদাদের কিছু ভূ-সম্পত্তি আছে, আছে কয়েকঘর প্রজা।

আর্টস-স্টুডেন্ট বরদার বি. এ. পরীক্ষা দেওয়ার সংবাদ জানা যায় 'সবুজ চশমা' গল্পে। শ্যালক শুভেন্দুর সঙ্গে সে কাফি থাঁর সেতারে মালকোষ শুনতে গেছে বটে কিন্তু আসলে সে রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভক্ত। এই প্রসঙ্গে 'মালকোষ' গল্পে তার স্বীকারোক্তি লক্ষণীয় "উচ্চাঙ্গ গান-বাজনার প্রতি আমার বিশেষ আসক্তি নেই ; ধ্রুপদ চৌতাল ধামার দশকুশী বুঝিনা ; রবীন্দ্র-সঙ্গীতেই আমার আত্মা পরিতুষ্ট।" তাই 'আকাশবাণী' গল্পে ফাল্গুন মাসের এক অপরূপ গোধূলিতে এই প্রসিদ্ধ ভূতপ্রেমিকেরই কণ্ঠে গুঞ্জরিত হয়, "যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখি।"

বরদা ভদ্র, মার্জিত, শিক্ষিত বাঙালী যুবক। তাই অশালীনতাকে সে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয়

দিতে নারাজ। 'নীলকর' গল্পের নায়েব শিবসদয়বাবুর চারিত্রিক অধঃপতনকে সে যেমন আন্তরিকভাবে সমর্থন করতে পারেনি, তেমনি তার মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য কবুতরীর নির্লজ্জ প্রয়াসকে সে প্রবলভাবে উপেক্ষা করতে চেয়েছে। এ সত্য তার অনুভূতির অগোচরে থাকেনি যে দিনের পর দিন নীলমহলের সেই দূষিত পরিবেশে অতিবাহিত করলে সুস্থ রুচি সম্পন্ন মানুষও অসুস্থ কামনার শিকার হয়ে পড়তে পারে। তাই শুভবুদ্ধি সম্পন্ন বরদা সুলভ আমোদের মোহে প্রলুব্ধ না হয়ে দুদিনের মধ্যেই মজঃফরপুরের সেই বিশেষ অঞ্চল পরিত্যাগ করে মুঙ্গেরে ফিরে এসেছে।

বরদার প্রেত-বিশ্বাস কখনও কখনও তার বন্ধুদের কাছে পরিহাসের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু একদিন এই বরদাও ছিল ঘোর নাস্তিক। কি করে সে প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে উঠল। সেই ঘটনাই বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে 'সবুজ চশমা' গল্পে। প্রেত জগতের প্রতি তার কৌতূহল জেগেছে 'সবুজ চশমা চোখে পরার পর থেকেই। মানুষের সহজাত সংস্কার বা ভয় যে তার একেবারেই নেই তা নয়। কোনও কোনও ভয়ংকর পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে ভয়ের হিমশীতল অনুভূতিতে তারও স্নায়ুতন্ত্রী অবশ হয়ে আসে। তবে সেই ভয়কে জয় করে রহস্যের রস আকণ্ঠ পান করার দুঃসাহস ও কৌতূহল তার আছে বলেই প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়েও সে সাধারণের অগম্য স্থানে দিন বা রাত্রি অতিবাহিত করতে পেরেছে। এই প্রসঙ্গের দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'প্রেতপুরী' ও 'নীলকর' গল্পদুটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

বরদা ভূতকে ভয় পায় না বটে, কিন্তু তুচ্ছ প্রাণী টিকটিকির প্রতি তার প্রবল বিতৃষ্ণা প্রকাশ পেয়েছে। সে নিজেই বলেছে—

"টিকটিকির দর্শন মাত্রেই আমার প্রাণে একটা অহেতুক আতঙ্কের সঞ্চার হয়, পেটের ভেতরটা কেমন যেন খালি হয়ে যায়, শিরদাঁড়া সিরসির করতে থাকে।"

[টিকটিকির ডিম]

বরদার গল্প বলার কৌশলটি চিত্তাকর্ষক। জীবনে সে শুধু নানা অলৌকিক অভিজ্ঞতাই অর্জন করেনি, সেগুলিকে গল্পের আকারে পরিবেশনের ক্ষেত্রেও তার পারদর্শিতা অসাধারণ। এ প্রসঙ্গে 'কল্পকুহেলী' নামক গল্প সংকলনের ভূমিকায় শ্রীসুভদ্রকুমার সেনের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—

"...বরদার উক্তি ব্যক্তি সম্বন্ধে তার বন্ধুরা স্থির নিশ্চয় নয়। ইংরেজী হলে বলতুম রীতিমত Sceptic। বরদার বর্ণিত কাহিনীগুলি তার বন্ধুরা শুনতে অনিচ্ছুক নয়, কিন্তু বিশ্বাস করতে পরাঙ্মুখ অথচ যখন গল্প বলা শেষ হয় তখন তারা গল্পটিকে গাঁজাখুরি বলে সরাসরি উড়িয়ে দিতেও পারেনা। ঘরে ফিরে যেতে তাদের গা ছমছম করে।"

[শরদিন্দু অমনিবাস ৯ম খণ্ড, গল্প পরিচয় দ্রষ্টব্য]

এ উক্তির যাথার্থ্য অস্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ যখন দেখা যায় অমূল্যর মত প্রবল প্রতিপক্ষ বরদার গল্প সুরু হওয়ার আগে তাকে যত বাধা দেওয়ার বা ব্যঙ্গ বাণে বিদ্ধ করার চেষ্টা করুক না কেন, গল্পের শেষে প্রতিবাদের সমস্ত ভাষা ভুলে কখনও ভয়ে,

কখনও বিস্ময়ে মৌন হয়ে যায়—তখন বক্তা হিসেবে বরদার সাফল্য সম্বন্ধে আমাদের কোনও সন্দেহই থাকে না।

বিভিন্ন সূত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শরদিন্দু বরদা সম্পর্কে আমাদের অনেক তথ্যই জানিয়েছেন, শুধু একটি বিষয় ছাড়া—বরদার পেশাটি তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। সত্যান্বেষণের মাধ্যমে ব্যোমকেশের যশ প্রাচুর্য ঘটেছিল বটে, কিন্তু আর্থিক উন্নতি তেমন ঘটেনি, তাই তাকে অজিতের সঙ্গে পুস্তক প্রকাশনার ব্যবসা সুরু করতে হয়েছে। তবু সত্যান্বেষীর জমার খাতা একেবারে শূন্য নয়, বিশেষতঃ 'পথের কাঁটা', 'সীমন্ত হীরা', 'দুর্গরহস্য', প্রভৃতি গল্পে তার প্রাপ্তিযোগ দেখলে রীতিমত ঈর্ষা হয়। অন্যদিকে ভূতের সান্নিধ্যে এসে বরদা প্রচুর অলৌকিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে বটে, কিন্তু তার লৌকিক সংসার যাত্রা নির্বাহ হয় কিসে ? কেবল জমিজমার আয় থেকে নাকি ?—এ কৌতূহলটুকু শেষ পর্যন্ত অচরিতার্থই থেকে যায়।

॥ ৩ ॥

জাতিস্মরের অনুভূতি অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষের পূর্বজন্মের স্মৃতি জাগরণের অভিজ্ঞতাকেও অলৌকিকতার পর্যায়ভুক্ত করা চলে, কারণ ইহলোকে অবস্থানকালে জন্মান্তরের স্মৃতি অনুভব সকলের ক্ষেত্রে ঘটেনা এবং বিষয়টিকে বাস্তব বুদ্ধি বা যুক্তির দ্বারা সবসময় ব্যাখ্যাও করা যায় না। এই অপ্রাকৃত ব্যাপারটির প্রতি শরদিন্দুর প্রবল কৌতূহল ও আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর লেখা ঐতিহাসিক গল্পগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গেছে 'অমিতাভ', 'মৃৎপ্রদীপ', 'বিষকন্যা', 'রুমাহরণ', 'রক্তসন্ধ্যা' ও 'সেতু' জন্মান্তরবাদের উপর ভিত্তি করেই রচিত। উক্ত উপাদান উপজীব্য করে তিনি লিখেছেন একাধিক ভৌতিক গল্পও যেমন—'দেখা হবে', 'গুহা', 'চিরঞ্জীব', 'মায়াকুরঙ্গী' ও 'প্রত্নকেতকী', অলৌকিক রসাশ্রিত এই বিশেষ শ্রেণীর পাঁচটি গল্পই বর্তমান পরিচ্ছেদে আলোচ্য বিষয়।

দেখা হবে [১৩৬১] **:** 'দেখা হবে' গল্পে ভূপতির স্ত্রী স্মৃতি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তার স্বামীকে বলে গেছে এক অদ্ভুত কথা—"এক শিলা নগরীতে আবার দেখা হবে।" আপাতদৃষ্টিতে এই উক্তি রোগিনীর মৃত্যুকালীন বিকার বলে মনে হলেও এ যে কত অভ্রান্ত তার প্রমাণ পাওয়া যায় কিছু মাস পরেই। ভূপতির সনির্বন্ধ অনুরোধে তার বন্ধু ও গল্পের বক্তা তার সঙ্গে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বার হয়েছিল। কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থানে বিশ্রাম গ্রহণের পর যেন নিয়তি তাড়িত হয়ে ভূপতি পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই দক্ষিণের এক অখ্যাত স্টেশনে ট্রেন থেকে বন্ধুসহ নেমে পড়েছে। স্থানটির নাম 'ওরঙ্গল'। সেখানে ইতিপূর্বে সে কখনই আসেনি—অথচ কোন এক অজ্ঞাত কারণে ওরঙ্গলের সহস্র স্তম্ভ মন্দির, উটের কুঁজ সদৃশ পাহাড় সব কিছুই ভূপতির অতি চেনা বলে মনে হয়েছে। ক্রমশঃ তার চোখের দৃষ্টি স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে, আচরণে দেখা দিয়েছে পারিপার্শ্বিকের প্রতি অদ্ভুত ঔদাসীন্য, তারপর সঙ্গী বন্ধুটির তাড়নায় সে ওরঙ্গল পরিত্যাগে রাজী হলেও সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছে—"আমি কিন্তু আবার আসব।" তবে এই পুনরাগমনের

আর প্রয়োজন হয়নি। গল্পের বক্তা ভদ্রলোক স্টেশন থেকে ফিরে এসে প্রত্যক্ষ করেছেন এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য—

"···তখনও সে সেই চেয়ারে বসিয়া আছে, মাথাটা পিছন দিকে হেলান দেওয়া। চোখ দুটো বিস্ফারিত হইয়া খুলিয়া আছে। চোখে এবং মুখে কী অনির্বচনীয় বিস্ময়ানন্দ তাহা বর্ণনা করা যায় না। যেন প্রিয়জনকে বহুদিন পরে দেখার শুভ মুহূর্তে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।"

ভূপতির এই প্রিয়জনটি কে তা প্রত্যক্ষ প্রমাণে না হলেও অনুমানে নিশ্চয় ধরা পড়ে। বিশেষতঃ যখন জানা যায় ওরঙ্গলেরই প্রাচীন নাম 'একশিলা', তখন ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক অলৌকিকে বিশ্বাস না করে উপায় থাকে না. ভূপতির বন্ধুর ক্ষেত্রেও তাইই ঘটেছে। তিনি স্মৃতির মৃত্যুকালীন উক্তিটির যেন যথার্থ তাৎপর্য আবিষ্কার করতে পেরেছেন।

তাই তিনি অনুভব করেছেন স্মৃতির অন্তিম প্রতিশ্রুতি কথার কথা মাত্র নয়, মৃত্যুকালে সে হয়তো অর্জন করেছিল দুর্লভ দূরদর্শিতা—যার প্রভাবে সে শুধু সুদূর অতীতকে নয় অনাগত ভবিষ্যৎকেও প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিল—তাই সে ভূপতিকে একশিলা নগরীতে পুনরায় সাক্ষাতের আশ্বাস জানিয়েছিল।

আলোচ্য গল্পে দেখা যায় লৌকিক বুদ্ধির মাপকাঠিতে যে অতীন্দ্রিয় সত্যকে ধরা ছোঁয়া যায়না, অনুভূতি ও বিশ্বাসের গভীরতায় তাকে কিছুটা উপলব্ধি করা যায় মাত্র।

গুহা [১৩৬২]ঃ জন্মান্তরবাদকে কেন্দ্র করেই 'গুহা'র কাহিনীবৃত্ত গড়ে উঠেছে। শ্যালিকার বিবাহোৎসবে যোগদানের জন্যে যাত্রা করে বৃষ্টির কারণে ব্যর্থ মনোরথ এক যুবক তার যুবতী স্ত্রীকে নিয়ে এক রাত্রের জন্য আশ্রয় নিয়েছিল এক গুহায়। সঙ্গে ছিল তাদের মালবাহক। গুহায় প্রবেশের পর থেকেই যুবতীটির আচার আচরণে মনে হয় এই স্থান তার অপরিচিত নয়—বরং সুপরিচিত। অথচ এখানে সে তো আগে কখনও আসেনি। যুবক মুখে তার স্ত্রীর এই মনোবৈকল্যকে লঘুভাবে উপহাস করলেও মনে মনে বিস্ময় ও উদ্বেগ অনুভব না করে পারেনি। তারপর স্বপ্নের মধ্যেই সে পেয়েছে রহস্যের চাবিকাঠি। পূর্বজন্মবৃত্তান্ত তার মনের পর্দায় ছায়াছবির মত ফুটে উঠেছে। বহুকাল আগে এই গুহাই ছিল তাদের মিলন স্থল। ইহজন্মে যে যুবতী তার স্ত্রী, বিগত জন্মে সেই ছিল তার প্রণয়িনী তিন্নি। কিন্তু তাদের প্রণয়-মধুর জীবন যার তীব্র ঈর্ষার বিষে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল তার নাম ভিল্লা, সে আর কেউ নয়, এ জন্মের তাদের সঙ্গে একই গুহায় নিদ্রিত কুলিটি। স্বপ্নে পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত দর্শনের বিস্ময়ে সুপ্তোত্থিত যুবক অনুভব করেছে স্বপ্ন সে শুধু একাই দেখেনি—দেখেছে যুবতীও, এমনকি ভিল্লা অর্থাৎ কুলিটিও। সে যেন স্বপ্নের ঘোরেই বল্লম দিয়ে মাটি খুঁড়ে চলেছে, অনতিবিলম্বেই পাওয়া গেছে একটি নরকরোটি। স্বপ্ন বৃত্তান্ত সূত্রেই যুবক অনুভব করেছে গতজন্মে ভিল্লা তাকে হত্যা করে এই স্থানে প্রোথিত করেছিল তাই ঐ করোটি তারই। প্রবল প্রতিহিংসার প্রভাবে তার মন থেকে অতীত ও বর্তমানের ভেদরেখা মুছে গেছে। বিগতজন্মের নিষ্ঠুর ভিল্লার অপরাধের শাস্তি দিতে সে এ জন্মের নিরীহ

কর্নেলটিকে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করে শেষে প্রবল অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছে।

এই গুহায় আশ্রয় গ্রহণকারী তিনটি নর-নারীর অন্তরেই স্বপ্নের মাধ্যমে পূর্বস্মৃতি জাগরণের বিষয়টি লেখকের কল্পনা-বৈচিত্র্যের সার্থক উদাহরণ। 'গুহা'র সূচনা সাধারণভাবে ঘটলেও ঘটনার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই এর বিষয়গত অভিনবত্ব প্রকাশ পেতে সুরু করে। ঘটনাকে বর্তমান থেকে অতীতে নিয়ে যাওয়া এবং অতীত থেকে পুনরায় বর্তমানে ফিরিয়ে আনার সুনিপুণ কৌশলে অপ্রাকৃত বক্তব্য পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। চরিত্রানুগ সংলাপ-রচনা এই নাট্যধর্মী কাহিনীটির শিল্প সাফল্যের অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

চিরঞ্জীব [১৩৬৪]: চিরঞ্জীব গল্পে অলৌকিকের উপস্থিতি ভয় নয়, বিস্ময় জাগায়। পুণার এক মন্দিরে গল্পের বক্তা ভদ্রলোকের সঙ্গে চিরঞ্জীবের আকস্মিক সাক্ষাৎ। তাঁর চেহারা দেখে তাঁর বয়স ষাট বাষট্টির বেশী মনে হয় না, অথচ তাঁর বাচন-ভঙ্গী ও বিবৃতি শুনে মনে হয়, তিনি আড়াইশো বছরের প্রাচীন লোক—সেই পলাশীর যুদ্ধের সময় থেকেই তিনি নাকি জীবিত আছেন। তাঁর বক্তব্য অনুসারে জানা যায় যে 'বিরিঞ্চি' নামে এক ব্যক্তি তাঁর পরম শত্রু। 'বিরিঞ্চি'র "যথের মত কালো লম্বা চেহারা, ড্যাবডেবে চোখ, একটা কান বড় অন্য কানটা ছোট, বাঁ গালে কাটা ঘায়ের মত লালচে একটা জড়ুল।" প্রতি একশ বছর অন্তর বিরিঞ্চির সঙ্গে চিরঞ্জীবের সাক্ষাৎ হয়। সেই হিসাবে বর্তমান সনে তার সঙ্গে পুনরায় দেখা হওয়ার সম্ভাবনা, তাই চিরঞ্জীব বিরিঞ্চিকেই খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

এই সমস্ত অদ্ভুত কথা শুনে কাহিনীটির বক্তা ভদ্রলোকের পক্ষে চিরঞ্জীবকে ঠিক প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি বলে মেনে নিতে অসুবিধা হয়েছে। কিন্তু এর থেকেও বড় বিস্ময় যে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল, তার পরিচয় পেলেন উপরোক্ত ঘটনার মাসখানেক পরে মেজর গাঙ্গুলীর বাড়ীর চায়ের জলসাতে। গৃহস্বামিনীর মাধ্যমে সদ্য পরিচিত এক ভদ্রলোককে দেখে বক্তা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন কারণ তার আকৃতি চিরঞ্জীব কথিত বিরিঞ্চির অনুরূপ। কৌতূহলবশতঃ প্রশ্ন করে বক্তা জেনেছেন কর্ণেল ভার্মার নাম সত্যিই বিরিঞ্চিবর্মা এবং বক্তার মুখে চিরঞ্জীবের নাম শুনেই তার মুখের রেখাগুলির দ্রুত হিংস্রভাব ধারণ শুধু গল্পের বক্তাকেই নয়, গল্পটির পাঠককেও বিস্ময়ে বিমূঢ় করে করে ফেলে। চিরঞ্জীবের কথাগুলি বিশ্বাস করা কঠিন, অথচ কর্নেল ভার্মার সঙ্গে সাক্ষাতের পর অবিশ্বাস করার পথও তো বন্ধ। এই বিচিত্র অসহায়তাই 'চিরঞ্জীব' গল্পটিকে উপভোগ্য করে তুলেছে।

মায়াকুরঙ্গী [১৩৬৪]: 'মায়াকুরঙ্গী'র নায়ক এক আশ্চর্য আকৃতি নিয়ে পুণা শহরের উপকণ্ঠে জংলীবাবার আস্তানায় উপস্থিত হয়েছেন, তিনি সাধারণ ভক্তদের মত অর্থ মোক্ষ, কিছুই প্রার্থনা করেননি, সাধুবাবার কাছে তাঁর একটিই জিজ্ঞাসা—

"বাবা, পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে, সকলের ভিত্তি হচ্ছে জন্মান্তরবাদ, অর্থাৎ আত্মা অমর, দেহের বিনাশ হলেও আত্মা বেঁচে থাকে। ...এখন কথা হচ্ছে, আত্মা যে বেঁচে থাকে তার কোনো প্রমাণ আছে কি ?"

বক্তার এই বিচিত্র কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্য জংলীবাবা তাঁকে তাঁর পূর্বজন্মের ইতিবৃত্ত দর্শন করাতে চেয়েছেন। জংলীবাবার নির্দেশিত পন্থা অনুসরণ করেই গল্পের নায়ক তাঁর পূর্বজন্মের অবয়ব থেকে সুরু করে সেই জীবনের মর্মন্তুদ পরিণাম পর্যন্ত সমস্ত কিছুই সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন।

কিন্তু 'মায়াকুরঙ্গীর' আসল চমকটুকু এর উপসংহার পর্বে নিহিত। সেখানে দেখা যায় নিজ পূর্ব-জন্মবৃত্তান্ত অবগত হওয়ার পর, গল্পের নায়কের মনে এর যাথার্থ্য সম্পর্কে সন্দেহ জেগেছে। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা যে জংলীবাবার সম্মোহন বিদ্যার প্রভাব মাত্র নয়, তার প্রমাণ তিনি সহজেই লাভ করেছেন—সেই প্রমাণ হল তাঁর চিত্রাঙ্কন দক্ষতা। বিগত জন্মে তিনি 'পুণ্ডলীক' নামধারী এক প্রতিভাবান চিত্রকর ছিলেন—অজন্তার গুহাচিত্রের কয়েকটি তাঁরই শিল্পকীর্তি! —কিন্তু বর্তমান জীবনে তিনি কখনও চিত্ররচনায় আগ্রহ বোধ করেননি—অথচ পূর্ব পরিচয় অবগত হওয়ার পর কৌতূহল বশতঃ ছবি আঁকতে গিয়ে তিনি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছেন ইহজীবনে চিত্র শিল্পের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক না থাকলেও চিত্ররচনা তাঁর পক্ষে কত সহজ! এ যে তাঁর সহজাত প্রতিভা।

অতএব আলোচ্য গল্পে জাতিস্মরতা সম্পর্কে এক নতুন তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। লেখক যেন জানাতে চেয়েছেন মানুষের অবিনশ্বর আত্মাই শুধু একজন্ম থেকে অন্য জন্মে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলে না তার অন্তর্নিহিত প্রতিভাও জন্ম-জন্মান্তর ধরে অক্ষয় হয়ে থাকে।

প্রত্নকেতকী [১৩৬৮] ঃ নায়িকার অন্তরে জন্মান্তরের স্মৃতি-জাগরণ কিভাবে তার সদ্য গড়ে ওঠা দাম্পত্য জীবনে তীব্র সমস্যার সৃষ্টি করেছে আলোচ্য গল্পে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। এক সন্ধ্যায় 'প্রত্নকেতকী'র অরুণার মাথায় হঠাৎ আঘাত লাগার ফলেই সে জ্ঞান হারায়। অরুণার স্বামী সুবীর তাকে অচৈতন্য অবস্থায় নার্সিংহোমে নিয়ে এলে চিকিৎসক পরীক্ষা করে জানান—"ভয়ের কিছু নেই, সামান্য কন্কাশন (concussion) হয়েছে।" কিন্তু আঘাত গুরুতর না হলেও এই সূত্রেই মস্তিষ্কে কোনও এক অজ্ঞাত ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ফলেই তার পূর্বজন্মের স্মৃতি জেগে উঠতে থাকে। তাই আঘাত প্রাপ্তির পর অরুণার জ্ঞান যথাসময়ে ফিরে আসলেও তার আচরণে কিছুটা অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয়! লেখকের ভাষায়—

> "অরুণার চোখে কিন্তু মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি, সে ক্ষণকাল শূন্যে চাহিয়া থাকিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল—'কেয়ার গন্ধ'! এমনকি ঘটনার তিনদিন পরে সুস্থ অবস্থায় নার্সিংহোম থেকে ছাড়া পাওয়ার পরেও—'তাহার মুখের হাসি চোখের চাহনি দেখিয়া মনে হয় সে যেন অন্তরের কোন সুদূর লোকে প্রবেশ করিয়াছে, বহির্লোকের সহিত তাহার সম্পর্ক কমিয়া গিয়াছে'।"

চিকিৎসকের পরামর্শে সুবীর স্ত্রীকে আগের মত সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তোলার জন্য রাজস্থানে তার প্রত্নতাত্ত্বিক ভগ্নীপতির কর্মক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। যে পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদে তাদের বসবাসের আয়োজন করা হয়, সেখানে নাকি এক অশরীরী আত্মার

অধিষ্ঠান। এই রাজপ্রাসাদে পদার্পণ করার মুহূর্ত থেকেই অরুণার মনে অতীত ও বর্তমানের দ্বন্দ্ব প্রবলতর হয়ে ওঠে। তার কথাবার্তা ও আচার-আচরণে মনে হয় এই প্রাসাদ যেন তার অতি পরিচিত অথচ ইহজন্মে সে তো একবারের জন্যও এখানে আসেনি। তার মনে পূর্বজন্মের স্মৃতি জাগরণ সম্পূর্ণ হয় রুক্মিণীর কাছে রাজা বিজয়কেতু ও রাণী অরুণাবতীর অপরূপ প্রণয় কাহিনী শোনার পর। সেই কাহিনীতে কেয়াফুলের ভূমিকা অসামান্য। কলকাতায় একবার ও রাজস্থানে একাধিকবার অরুণার মুখে অসময়ে কেয়া ফুলের গন্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়, আবার শুধু রাণীর সঙ্গে অরুণার নাম-সাদৃশ্যই নয়, তার আচরণ দেখে মনে হয়, বিগতজন্মে সে ছিল রাজা বিজয়কেতুর প্রিয়তমা মহিষী। এই অতীতানুভূতি জাগ্রত হওয়ার ফলে অরুণার কাছে তার এ জন্মের স্বামী সুবীরের অস্তিত্ব অসহনীয় হয়ে ওঠে। এদিকে অরুণার ব্যবহারে বিস্ময়াহত সুবীর এক গভীর রাত্রে স্বকর্ণে শুনেছে রাজপ্রাসাদেরই কোন কক্ষ থেকে ভেসে আসা বীণাধ্বনি এবং নিজ কক্ষে অনুভব করেছে কেয়াফুলের তীব্র সুগন্ধ, অথচ মরুপ্রদেশে কেয়াফুলের বাস্তব অস্তিত্ব একেবারেই অসম্ভব! পরের রাত্রে তৃতীয় প্রহরে অরুণাকে ঘরের মধ্যে দেখতে না পেয়ে তার সন্ধানে কক্ষান্তরে গিয়ে সুবীর অর্জন করেছে এক অলৌকিক অভিজ্ঞতা—

> "সুবীর নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, সন্তর্পণে টেবিলগুলি বাঁচাইয়া ওই আলোকবিন্দুর দিকে অগ্রসর হইল।
> অর্ধপথে সে থমকিয়া দাঁড়াইল। মৃদু বিগলিত হাসির শব্দ! যেন দুইটি প্রণয়ী বাসর শয্যায় শুইয়া চুপি চুপি কথা বলিতেছে, গভীর রসালুতার গদ্‌গদ হাসি হাসিতেছে।"

অথচ পরমুহূর্তেই সুবীর প্রমাণ পেয়েছে ঘরে অরুণা ছাড়া আর দ্বিতীয় প্রাণী ছিল না। অতএব সেই প্রাসাদবাসী অশরীরী আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার আর কোনও উপায় থাকে না।

পরিশেষে দেখা যায় আর এক ক্ষুদ্র দুর্ঘটনার অভিঘাতে অরুণার এই মোহাচ্ছন্ন অবস্থার অবসান ঘটেছে। সে স্বেচ্ছায় এই স্মৃতি-বেদনার হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে, চেয়েছে বর্তমান জীবনকেই ভালবাসতে।

এ গল্পে একদিকে অরুণার জাতিস্মরতা এবং অন্য দিকে রাজপ্রাসাদে বিজয়কেতুর অশরীরী আত্মার অবস্থান—এই উভয় সূত্রেই অলৌকিক রহস্য ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। আবার রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান হিসাবে 'প্রত্নকেতকী' অতুলনীয় সৌরভ বিতরণ করে চলেছে—একদিকে অরুণার স্বামী শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, হৃদয়বান সুবীরের অকৃত্রিম পত্নীপ্রেম, অন্য দিকে রুক্মিণীর বিবৃতিতে বিজয়কেতু ও অরুণাবতীর পারস্পরিক প্রবল ভালোবাসার অনবদ্য প্রকাশ অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। রাজস্থানের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের সজীব চিত্রণ এ গল্পের অতিরিক্ত আকর্ষণ।

॥ ৪ ॥

শরদিন্দু সৃষ্ট অলৌকিক কাহিনীর মায়ালোকে যেমন অজস্র মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তেমনই পাওয়া যায় অসংখ্য প্রেতের সন্ধান। তাদের বিচিত্র আচার-আচরণ ও

বিস্ময়কর কার্য পদ্ধতির পরিচয় সমন্বিত কিছু উপভোগ্য অপ্রাকৃত গল্প সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

অন্ধকারে [১৩৩৭]ঃ এ গল্পে এমন এক প্রেতাত্মার দেখা পাওয়া যায় যে প্রকৃতই মহানুভব। এক বর্ষণমুখর, ঘন তমসাবৃত রাতে শহর কলকাতা যখন সম্পূর্ণ জলমগ্ন, পথঘাট জনশূন্য তখন এই অশরীরী পরোপকারী এক বিপন্ন পথচারীকে তার সঠিক ঠিকানায় পৌঁছে দিয়েছে।

গল্পটিতে একদিকে যেমন বর্ষাপ্লাবিত শহরের নৈশ পটভূমি বর্ণনাগুণে প্রত্যক্ষবৎ জীবন্ত হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি পথ হারা ব্যক্তিটিকে সহায়তা করার জন্য অদৃশ্য সাহায্যকারীর আবির্ভাব মুহূর্ত থেকেই রহস্যময়তাও ঘনীভূত হয়েছে। তাই খাঁটি ভৌতিক গল্পের রোমাঞ্চকর স্বাদ "অন্ধকারে"র পাঠকের মনে অবশ্যই অপ্রাকৃত অনুভূতির শিহরণ জাগায়।

পঞ্চভূত [১৩৫১]ঃ মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থাটা কেমন সে কথা জানবার জন্যে জীবিত মানুষদের কৌতূহলের অন্ত নেই—আবার সেই অজানা জগৎ সম্পর্কে ভয়ও কিছু কম নয়। কিন্তু 'পঞ্চভূত' নাটকে শরদিন্দু মরণোত্তর জীবনের যে কাল্পনিক ছবিটি উপহার দিয়েছেন তা পাঠ করলে প্রেতাবস্থা সম্পর্কে ভয় নয় বরং গভীর ভরসাই জাগে অন্ততঃ ইহলোকের মনুষ্য জন্ম অপেক্ষা সে যে সহস্রগুণ সুখের সেই সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে নাটকের এক বিশিষ্ট চরিত্র মৃত্যুঞ্জয়ের উক্তিতে—

"শরীরে ক্ষুধা নেই অথচ তৃপ্তি আছে, বাসনা নেই প্রেম আছে, স্বাধীনতা আছে, অগাধ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে।"

স্থূলদেহধারী জীবিত মানুষের গণ্ডি সীমাবদ্ধ, কিন্তু মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম শরীরে যত্রতত্র বিচরণে বাধা নেই—এমনকি ইচ্ছে হলেই চন্দ্রলোকে পর্যন্ত অনায়াসে ভ্রমণ করে আসা যায়। এ অবস্থায় ক্ষুধা-তৃষ্ণা রোগ-যন্ত্রণা, অর্থসংকট, অন্নাভাব—কোনও দুঃখই থাকে না, অথচ প্রেম, বন্ধুত্ব, বিশ্বাস প্রভৃতি অবিনশ্বর অনুভূতিগুলি হৃদয়ে স্থায়ীভাবে জেগে থাকে। এক অনির্বচনীয় আনন্দসুধারসে অন্তর থাকে পরিপূর্ণ হয়ে। এই নির্ভার জীবনে একটি-মাত্র আশংকাই প্রেতাত্মাদের কণ্টকিত করে রাখে—তা হল বহুসমস্যা পরিকীর্ণ মর্ত্যলোকে পুনর্জন্মের আশংকা। তাই পঞ্চভূতের মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে মর্ত্যে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান এসে পৌঁছালে মৃত্যুঞ্জয় এবং তার স্ত্রী শাশ্বতী দুজনেই গভীর বিষাদে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে।

আবার মানবজীবনে যাকে মনে হয়েছিল চরম শত্রু, মৃত্যুর পর সেই অমরনাথকেই প্রেত অবিনাশ পরম বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করেছে—কারণ প্রেতলোকের স্বাধীন, ভার ও বন্ধন মুক্ত জীবনের স্বাদ পেয়ে সে বুঝেছে হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির পক্ষে কতখানি উপকারী।

মৃত্যুঞ্জয়ের পুনর্জন্মকে কেন্দ্র করে প্রেত দম্পতির বিরহ-জনিত সামান্য বিষাদের স্পর্শ লাগলেও নাট্যলক্ষণাক্রান্ত এই কাহিনীতে মূলতঃ রঙ্গ-কৌতুকই প্রাধান্য পেয়েছে। তবু এই হাস্য-পরিহাসের মধ্যেও মৃত্যু ও পুনর্জন্মের মধ্যবর্তী জীবন সম্পর্কে লেখকের প্রবল অনুসন্ধিৎসা অব্যক্ত থাকে না।

ধীরেন ঘোষের বিবাহ [১৩৫৬] : তিপান্ন বছর বয়স্ক বিপত্নীক ধীরেনবাবু তাঁর উপযুক্ত পুত্র কন্যাদের না জানিয়ে গোপনে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করার জন্যে কাশীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। ট্রেনের কামরায় এক যুবকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছে। যুবকটিও বিয়ে করতে চলেছে তবে কাশীতে নয় গয়ায়। যুবকটিকে দেখে ধীরেনবাবুর মনে হয়েছে সে যেন তাঁর কত চেনা—কত ঘনিষ্ঠ একজন। কাহিনী সমাপ্তির পূর্বে জানা যায় যুবকটির নামও ধীরেন ঘোষ। যুবকটি আসলে প্রৌঢ় ধীরেন ঘোষেরই বিগত যৌবন। এবং কাশীতে যিনি বিয়ে করতে চলেছেন তাঁর প্রথম শ্বশুর বাড়ী ছিল গয়ায়। প্রৌঢ়ের মনে পড়েছে যৌবনে তিনি যখন গয়ায় বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন তখন ট্রেনের কামরায় এক বৃদ্ধের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল, সম্ভবত তাঁরও নাম ছিল ধীরেন ঘোষ। প্রবল বিস্ময়ে অভিভূত তিপান্ন বছর বয়স্ক ধীরেনবাবু ভেবেছেন—"এমনিভাবে কি অনন্তকাল ধরিয়া চলিতেছে ?"

গল্পটিতে বর্ণিত ঘটনা সম্পর্কে স্বয়ং লেখকের মন্তব্য "অতিপ্রাকৃত ব্যাপার। বিশ্বাসের যোগ্য নয়।" এখানে একটি মানুষের দুইটি বিভিন্ন বয়স একই কালে বর্তমান দেখানো হয়েছে। অতএব ব্যাপারটিকে জন্মান্তরের ঘটনা হিসেবেও চিহ্নিত করা যায় না। এ এক অভূতপূর্ব, আশ্চর্য অভিজ্ঞতা—বাংলা সাহিত্যে এই ধরণের কাহিনী দুর্লভ।

ভূত-ভবিষ্যৎ [১৩৫৭] : 'ভূত-ভবিষ্যৎ' গল্পের নন্দদুলাল নন্দী তাঁর জীবদ্দশায় নিজের কর্মদক্ষতা ও বিষয়বুদ্ধির সাহায্যে বহু বিত্ত অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর উত্তর-পুরুষেরা তাঁর মত মিতব্যয়ী ছিল না। তাই তাদের আর্থিক অবস্থার ক্রম-অবনতি সুরু হয়েছিল। এরই ফলে নন্দদুলালবাবুর প্রপৌত্র গোপীদুলালের দুর্দশা চরম সীমায় পৌঁছেছে। নন্দদুলালবাবুর মৃত্যুর পর প্রেতাবস্থা প্রাপ্ত হলেও বংশধর গোপীদুলালের জন্য, বিশেষতঃ তার অনূঢ়া কন্যা কমলার জন্য তাঁর চিন্তার শেষ নেই। তাই বহুদিন আগে নিমগাছতলায় প্রোথিত একশ আকবরী মোহর গোপীদুলালের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি এক লেখককে বারংবার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁর এই আচরণে যে শুভবুদ্ধি ও হিতাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে তা জীবিত মানুষদের মধ্যে দুর্লভ।

অনেক সময় দেখা যায় দেহ বিমুক্ত হয়েও আত্মা তার পূর্ব স্বভাব পরিত্যাগ করতে পারে না তাই আলোচ্য গল্পে লেখক ব্যক্তিটি মোহরের ভাগ চাইলে একদা মুৎসুদ্দি নন্দদুলালবাবুর প্রেতাত্মার উক্তি—

"বেশ, আপনি পাঁচ পারসেন্ট দালালি পাবেন। পাঁচখানা মোহর আপনার।"

ইনি আবার সম্পূর্ণ অশরীরী নন, ইচ্ছা হলে সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করতে পারেন। কাহিনীর সমাপ্তিপর্বে দেখা যায় গল্পের বক্তা গোপীদুলালবাবুর গৃহে মোহর পৌঁছে দিতে গিয়ে তাঁর অসহায়া কন্যা কমলার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে বিবাহ করেছে জেনে নন্দ-দুলাল নন্দীর মুচকি হাসি সহ মন্তব্য—"দালালি একটু বেশী নিয়েছ।"—এই উক্তি প্রেতের রসবোধেরই পরিচায়ক। স্বল্প পরিসরে গল্পের বক্তা চরিত্রটিও সুচিত্রিত। তিনি তাঁর পাঠকদের অকপটে জানিয়েছেন—

"ভূতের কৃপায় আমার ভবিষ্যৎ এখন বেশ উজ্জ্বল"।

—গল্পের এই শেষ বাক্যটিতেই লুকিয়ে আছে "ভূত ভবিষ্যৎ" নামের একটি সরল তাৎপর্য।

নিরুত্তর [১৩৫৯] **ঃ** নিরুত্তর' গল্পটিও মূলতঃ অলৌকিক উপায়ে পরোপচিকীর্ষার কাহিনী। এই গল্পের মধ্যমণি হলেন উত্তরাঞ্চলের কোনও একটি শহরের দারোগা নৃসিংহ পাল। তাঁর কুৎসিত আকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রকৃতিও ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর। পঞ্চ 'ম' কারের কোনটিতেই তাঁর অরুচি ছিল না। এ হেন ব্যক্তিটি যখন এক সন্ধ্যায় নিজের ঘরে বসে একাই মদ্যপানে মশগুল তখন তাঁর সম্মুখে যেন মন্ত্র বলে এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটেছে। সেই সন্ন্যাসী তাঁকে বলেছে—

"তোর সময় হয়েছে। রোজ দুবেলা গঙ্গাস্নান করবি। আর মা'র নাম করবি। মদ খাবি না, আর বুধবার দাড়ি কামাবি না।"

বলা বাহুল্য নৃসিংহবাবু স্বেচ্ছায় এই নির্দেশ পালন করতে চাননি। বরং গাঁজাখুরি বুজরুকি ব্যাপার ভেবে উপেক্ষা করতেই চেয়েছেন কিন্তু পারেননি। কোন এক অদৃশ্য অলৌকিক শক্তির পরিচালনায় তিনি সন্ন্যাসীর নির্দেশগুলি পালনে বাধ্য হয়েছেন। দুর্দান্ত নিষ্ঠুর, মদ্যপ সেই দারোগা ক্রমশঃ শান্ত সাত্ত্বিক এক নূতন মানুষে রূপান্তরিত। কিন্তু শুধু এই চারিত্রিক পরিবর্তন সাধনই এ গল্পের শেষ কথা নয়, সেই অদৃশ্য আত্মা নৃসিংহবাবুকে অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকেও রক্ষা করেছে। নিজের জীবনের এই অত্যাশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করার পর নৃসিংহ দারোগা লেখকের কাছে তীব্র ব্যাকুল সুরে জানতে চেয়েছেন—

"···শুনেছি যাঁরা সাধু সজ্জন যোগী তপস্বী, ভগবান তাঁদের দয়া করেন। কিন্তু এ কি! জীবনে আমি একটা ভাল কাজ করিনি, মন্দ কাজ এত করেছি যে তার সীমা সংখ্যা হয় না, তবে বেছে বেছে আমাকে দয়া করবার মানে কি?"

কিন্তু এ জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া যায় না। কারণ লৌকিক কার্যকারণ সূত্রে যা কিছু বিশ্লেষণ করা যায় না তাই তো অলৌকিক। সুতরাং নৃসিংহ দারোগার মত অসৎ ব্যক্তির প্রতি সন্ন্যাসীর অকৃপণ কৃপা বর্ষণের প্রকৃত তাৎপর্য আমাদের বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করতে না পারাটাই তো স্বাভাবিক।

শূন্য শুধু শূন্য নয় [১৩৬৩] **ঃ** 'শূন্য শুধু শূন্য নয়' ও 'অশরীরী'র মধ্যে কিছু কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। উভয় ক্ষেত্রেই জনহীন, পরিত্যক্ত বাড়ীকে কেন্দ্র করে গল্পের বিস্তার। উভয় কাহিনীতেই কর্মকোলাহল মুখর জীবন পরিবেশ থেকে পলাতক নায়কের সঙ্গে ছায়ালোকবাসিনী নায়িকার মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তবু শিল্পগত আবেদনের দিক থেকে গল্প দুটিকে একই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। 'অশরীরী' খাঁটি ভূতের গল্প আর 'শূন্য শুধু শূন্য নয়'কে Fantasy জাতীয় রচনা হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়। কারণ এ গল্পে ভয়-উৎপাদক উপাদান অপেক্ষা আজগুবি অথচ উপভোগ্য কল্পনাই প্রাধান্য পেয়েছে।

শূন্য যে শুধু শূন্য নয় এই অভিজ্ঞতা যার জীবনে ঘটেছে তার নাম গৌরমোহন সাহা। ধনী পিতার একমাত্র সন্তান এই সুশ্রী, সৌখীন যুবকটি অনভিপ্রেত বিবাহের বন্ধনে বন্দী

হতে চায় না বলেই বাংলার মাটি ত্যাগ করে ছোটনাগপুর অঞ্চলে এসে উপস্থিত হয়েছে। তার উদ্দেশ্য বন্ধু মোহনলালের নির্জন বাংলোয় নিরুপদ্রব শান্তিতে কিছুদিন অজ্ঞাতবাস। বলা বাহুল্য সেই পরিত্যক্ত বাড়ীটির প্রাক্তন অধিবাসীদের দুর্ভাগ্য-করুণ জীবন পরিণামের কথা গৌরমোহনের জানা ছিল না। কিন্তু স্টেশনে নেমেই স্টেশন মাস্টার ও মুদির কাছে সেই বাজ-পড়া বাংলোটির সম্পর্কে নানা ভীতিজনক অপবাদ শুনেও সে পশ্চাদপসরণ করেনি এবং এই সমস্ত জনশ্রুতি যে মিথ্যা নয় তার প্রমাণও সে প্রতি মুহূর্তেই পেয়েছে। তারপর এক বজ্রমন্দ্রিত ঝঞ্ঝামুখর সন্ধ্যায় সেই অদৃশ্য অস্তিত্বের পরিপূর্ণ পরিচয় গৌরমোহন জানতে পেরেছে! বাজ-পড়া বাংলোর সেই স্থায়ী বাসিন্দাটি পুরুষ নয়, নারী। তার নাম ছায়া। সে দেহহীনা বটে, কিন্তু প্রেতাত্মা নয়, মানবী। ন-দশ বছর আগে এই বাংলোয় বজ্রপাত রূপ যে নৈসর্গিক দুর্ঘটনা ঘটেছিল, তার ফলে এখানে বসবাসকারী পরিবারটির প্রায় সকল সদস্যেরই মৃত্যু হলেও ছায়া প্রাণ হারায় না, জ্ঞান হারায় মাত্র। সম্ভবতঃ তিন-চারদিন পরেই তার লুপ্ত চৈতন্য ফিরে আসে, কিন্তু ফিরে আসে না তার পূর্ব দেহ। বজ্রাঘাতে মানুষের মৃত্যুর দৃষ্টান্ত বিরল নয়, কিন্তু বজ্রপতনের শব্দে 'ছায়া'র কায়াহীনা হওয়ার অনুরূপ দৃষ্টান্ত বাস্তব জগতে সুদুর্লভ। অথচ মানুষের মতই তার সুখ-দুঃখ, ক্ষুধা-তৃষ্ণার অনুভূতি বর্তমান, আবার সাধারণ মানব-দেহের মতই তার অদৃশ্য দেহেও ঘটেছে কৈশোর থেকে যৌবনে স্বাভাবিক বিবর্তন। চিত্রশিল্পী গৌরমোহন স্পর্শ দ্বারা সেই তারুণ্যের লাবণ্যে ভরা অপরূপ দেহ-সুষমা শুধু অনুভবই করেনি রং ও তুলির সাহায্যে তাকে দৃশ্যমান করে তুলতেও সচেষ্ট হয়েছে। গল্পের সমাপ্তিপর্বে দেখা যায় দেহধারী যুবকটির সঙ্গে দেহহীনা যুবতীটির বিবাহের আয়োজন চলেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে অপ্রাকৃত ঘটনা অবলম্বনে রচিত হলেও 'শূন্য শুধু শূন্য নয়' মূলতঃ কৌতুক রসে পূর্ণ। গল্পের বিষয়বস্তু অবিশ্বাস্য হলেও লেখকের বর্ণনার নৈপুণ্যে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ছায়া ও গৌরমোহনের রোমান্টিক প্রণয়-মাধুর্যের সরস উপস্থাপনার কৌশলটুকুও প্রশংসার দাবী রাখে।

মধুমালতী [১৩৬৪] ঃ 'পুণা শহরের পটভূমিকায় রচিত 'মধুমালতী' অপ্রাকৃতের স্পর্শ যুক্ত প্রণয় মধুর কাহিনী। নায়ক মধুকর ও নায়িকা মালতী একই কলেজের ছাত্র-ছাত্রী। প্রীতির মাধ্যমে তাদের সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটলেও ক্রমশঃ তা রূপান্তরিত হয় গভীর প্রেমে। কিন্তু মালতীর ধনী অভিভাবকেরা দরিদ্র মধুকরের সঙ্গে তার মিলনের পথে প্রবলভাবে বাধা দেয়। শাসনের নামে তাদের নিষ্ঠুর পীড়ন এড়াবার জন্য প্রণয়ীযুগল গভীর খাদে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে।

এই ধরণের ঘটনা সমজে বা সাহিত্যে নতুন কিছু নয়, কিন্তু এ কাহিনীর অভিনবত্ব অন্যত্র। জীবনে যারা ছিল অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা মরণের পরেও তাদের প্রেমের ধারা অব্যাহত থেকেছে। এই অপ্রাকৃত তথ্য সারা শহরে মাত্র একজন ব্যক্তিরই জানা ছিল, তার নাম বামন রাও। জীবিতঅবস্থায় তার দোকান থেকেই সাইকেল ভাড়া নিয়ে মধুকর ও মালতী ভ্রমণে বার হত, মৃত্যুর পরেও প্রতিরাত্রে বামন রাওয়ের দোকান থেকে সাইকেল নেওয়ার জন্য তাদের আগমন ঘটে—আবার কিছুক্ষণ পরেই তারা সেই যান

দুটি ফিরিয়ে দিয়ে যায়। চোখে তাদের দেখা যায় না—কিন্তু দুটি প্রণয়-বিহ্বল তরুণ-তরুণীর উচ্ছল হাসির শব্দ, মৃদু কলগুঞ্জন, সাইকেলের ঘণ্টির আওয়াজ এবং আরোহী ছাড়াই সাইকেল দুটির সচল অবস্থা তাদের অদৃশ্য অস্তিত্বের প্রমাণ ঘোষণা করে। ইহলোকের নিষ্ঠুর বিধান তাদের প্রেমের কুসুমকে যথাযথভাবে প্রস্ফুটিত হতে দেয়নি বটে, কিন্তু সেজন্য কারও প্রতি তাদের ক্ষোভ বা প্রতিহিংসা দেখা যায় না, উপরন্তু বামনরাওয়ের মতে তারা নাকি ভারী পয়মন্ত। কোনও রাত্রে সেই যুগল আত্মার আবির্ভাব না ঘটলে বামনরাওয়ের দোকানের আয় কমে যায়।

'মধুমালতী' গল্পে যে অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ আছে তাকে চোখের ভুল বা মনের বিকার বলে উপেক্ষা করা যায় না, কিন্তু সমস্ত অলৌকিকতাকে ছাপিয়ে দুটি তরুণ হৃদয়ের প্রগাঢ় ভালবাসার পরিচয় আমাদের মুগ্ধ করে।

সতী [১৩৬৪]ঃ 'সতী'কে অতিলৌকিক গল্প হিসেবে চিহ্নিত করা চলে। এই গল্পটি রচিত হয়েছে গুজরাতের এক বিশেষ অঞ্চলের পটভূমিকায় যেখানে একটি নদীর ধারে অবস্থিত একই ধাঁচের অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দির। সেই মন্দিরগুলি কিন্তু দেবদেবীর আলয় নয়, এগুলি সতী মন্দির। এই মন্দিরগুলি নির্মাণের মূলে রয়েছে অলৌকিক প্রেরণা। এ সম্পর্কে এই গল্পের এক বিশিষ্ট চরিত্র কাকুভাই দেশাইয়ের বিবৃতি অনুসারে জানা যায়—

> "যেদিন শহরে কোনও সতী নারীর মৃত্যু হয় সেদিন সন্ধ্যার পর ওই মন্দিরগুলিতে হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠে, তারপর প্রদীপ হাতে নিয়ে সতী নারীরা মন্দির থেকে বেরিয়ে আসেন, তাঁরা দল বেঁধে মন্দিরগুলোকে প্রদক্ষিণ করেন, তারপর আবার মন্দিরে অদৃশ্য হয়ে যান, শহরের লোকেরা তাই দেখে বুঝতে পারে; তখন তারা নতুন মন্দির তৈরি করে।"

কাকুভাইয়ের সঙ্গী শ্রোতাটি মুখে সামান্যতম প্রতিবাদ না জানালেও মনে মনে এই অতিলৌকিক ঘটনাকে কিছুতেই বিশ্বাস করতেন না, যদি না পর মুহূর্তেই কাকুভাইয়ের বর্ণনার মতই নদীর পরপারে সেই মন্দিরগুলিতে দপ্‌ করে আলো জ্বলে ওঠা থেকে সুরু করে প্রদীপ হাতে একদল রমণীর মন্দির পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়েরই অবিকল অভিনয় ঘটত। সতীমাহাত্ম্যে বিশ্বাসী কাকুভাই এক অপ্রাকৃত দৃশ্য দেখে তৎক্ষণাৎ অনুমান করলেন বহুবছর বাদে শহরে কোনও সতীর জীবনাবসান ঘটেছে। অনতিবিলম্বে জানা গেল তাঁর অনুমান মিথ্যা নয়, কাকুভাইয়ের পরিচিত, দুরারোগ্য যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত চম্পকভাই প্যাটেলের মৃত্যু ঘটেছে আর তারই সঙ্গে স্বেচ্ছায় অনুমৃতা হয়েছে তার অসামান্য সুন্দরী স্ত্রী রমা। শাস্ত্র বা সমাজের রক্তচক্ষুকে ভয় করে নয়, একটি পুরুষকে কায়মনোবাক্যে ভালবেসে রমাবেন শুধু জীবনে নয় মরণেও তার সঙ্গিনী হয়েছে। নদীর পরপারে সতী-মন্দিরগুলিতে হঠাৎ জ্বলে ওঠা আলোর ইশারা তার এই মহৎ আত্মদানকে সতীত্বের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। রক্ত মাংসের মানব মানবীই যে চারিত্রিক মাহাত্ম্যে, আত্মদানের পুণ্যে দেবত্বে উন্নীত হতে পারে, 'সতী' গল্পে যেন তারই পরিচয় পাওয়া যায়।

কালো মোরগ [১৩৬৫]ঃ যে রহস্যময়তা অলৌকিক কাহিনীর প্রাণসম্পদ

'কালো মোরগ' গল্পে তার পরিপূর্ণ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তর্কশাস্ত্রের অধ্যাপক, শিকারী গোকুলবাবুর জীবনকে কেন্দ্র করে এখানে এক বিদেহী আত্মার প্রবল প্রতিশোধ-স্পৃহার পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

যুক্তিবাদী, অকৃতদার গোকুলবাবুর একমাত্র নেশা পাখী শিকার। সেই সূত্রেই একদিন উপস্থিত হওয়ার পর সেখানে তল্লাসীরত পুলিশদের অনুরোধে কুখ্যাত গুণ্ডা নরঘাতক আবদুল্লাকে খুঁজে বার করার কাজে তিনি বিশেষভাবে সাহায্য করেন। গোকুলবাবুর এই কাজটি নিতান্তই ঘটনাচক্রে ঘটে যায়, কিন্তু একথা সত্যি যে তাঁর মত অরণ্য-অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তা ছাড়া পুলিশের পক্ষে আবদুল্লাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল না। একথা বোধ হয় আবদুল্লাও বুঝেছিল, তাই যখন,

"পুলিশ তাহার হাতে হাতকড়া পরাইল সে বাধা দিল না। কেবল তাহার বিষাক্ত হিংস্র দৃষ্টি গোকুলবাবুর উপর স্থির হইয়া রহিল।"

এর কিছুদিন পরে বিচারকের রায় অনুসারে আবদুল্লার ফাঁসি হয়েছিল। আসামীটি ধরা পড়ার ঠিক এক বছর পর গোকুলবাবু সেই বনেই শিকার করতে গিয়েছিলেন কিন্তু সেদিন শিকারপ্রিয় অধ্যাপক নিজেই শিকারে পরিণত হলেন। মৃত আবদুল্লার অতৃপ্ত প্রেতাত্মার হিংস্র আবির্ভাব গোকুলবাবুর হৃদয়যন্ত্রকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিল।

কিন্তু গোকুলবাবুর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কি আবদুল্লার মৃত্যু সম্পর্কে যুক্তিপরায়ণ ভদ্রলোকটির অবচেতন মনের ভয় ও অপরাধবোধ ? না অপ্রাকৃত কোনও শক্তির প্রভাব ? অবশ্য গল্পটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে এখানে সুরু থেকেই এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে যাদের ব্যাখ্যা লৌকিক যুক্তি বা বুদ্ধির সাহায্যে করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই লক্ষণীয় যে, গোকুলবাবুর শেষ শিকার-যাত্রার দিন বন সম্পূর্ণ রূপে পক্ষীশূন্য ছিল, সেদিন বটগাছগুলি ফলে ফলে রাঙা হয়ে ছিল—

"কিন্তু আশ্চর্য ! কোথাও একটি পাখি নাই। এই সময় গাছে গাছে ফলাশী পাখীর ভিড় লাগিয়া থাকে, আজ পাখিগুলা গেল কোথায় ?"

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা—একটি গাছের গোড়ায় জড়িয়ে থাকা কাঁটালতায় গোকুলবাবুর গরম পাঞ্জাবীর খুঁট আটকে যাওয়া এবং সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর সেদিন সেই পক্ষীশূন্য বনে একটি নিষ্পত্র শেওড়া গাছের শাখায় অপ্রত্যাশিতভাবে একটি বন মোরগের আবির্ভাব। মোরগটির রূপ অসাধারণ—

"প্রকাণ্ড মোরগ, যেন একটা ময়ূর। কুচকুচে কালো গায়ের পালক, তাহার উপর রৌদ্র পড়িয়া ঝক্‌মক্ করিতেছে, পুচ্ছের ময়ূরকণ্ঠী পালকগুলি বক্রভাবে উদ্যত হইয়া আছে।"

শিকারীদের পক্ষে অতি লোভনীয় এই পাখীটিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে করতে গোকুলবাবু দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যেখানে উপস্থিত হয়েছেন সেটি একটি গ্রাম্য গোরস্থান। সেই গোরস্থানের বাঁ পাশের ফণীমনসা ঝোপের ভেতর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে একটি কৃষ্ণকায় মানুষের মুখ—

"নিষ্ক্রান্ত দন্ত, চক্ষু দুটা অপার্থিব হিংসায় জ্বলিতেছে।"

—এই মুখ মৃত নরঘাতক আবদুল্লার। মৃত ব্যক্তির এই আকস্মিক আবির্ভাবের অপ্রত্যাশিত চমকেই যুক্তিপরায়ণ গোকুলবাবুর মৃত্যু ঘটেছে। পর পর ঘটে যাওয়া উল্লিখিত ঘটনাসমূহকে নিশ্চয় কেবলমাত্র অধ্যাপক ভদ্রলোকটির বিভ্রান্ত মানসিকতার দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায় না।

'কালো মোরগ'-এর সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত অপ্রাকৃতের সম্মোহন শক্তি পাঠককে গভীরভাবে আবিষ্ট করে রাখে। উচ্চমানের এই গল্পটি শরদিন্দু-প্রতিভার এক অনবদ্য অবদান।

নখদর্পণ [১৩৬৫]ঃ বিজ্ঞান-শক্তির দুর্বার গতি জয়রথের আরোহী সভ্য মানুষদের অনেকেই আজ আর মন্ত্রশক্তির ব্যাখ্যাতীত প্রভাবে আস্থা রাখতে পারেন না। কিন্তু শরদিন্দুর লেখা 'নখদর্পণ'-এর মোসীন সাহেব মন্ত্রের দ্বারাই অসাধ্য সাধন করেছেন। তাঁর সাহায্যেই শম্ভুনাথবাবুর পুত্রবধূর অপহৃত অলংকারগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। যে পদ্ধতিতে এই অবিশ্বাস্য ঘটনাটি ঘটেছে তা হিন্দুশাস্ত্রের নখদর্পণের প্রায় অনুরূপ। তবে এখানে 'নখ' নয় একটি বিশেষ ধরণের আংটি দর্পণের কাজ করেছে। মোসীন সাহেবের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এই ভারী গড়নের আংটিটি বোধ হয় চাঁদির তৈরী। তাতে আধুলির মত গোলাকৃতি, মসৃণ, উজ্জ্বল একটি কালো পাথর বসানো। সেই পাথরে অল্প একটু তেল মাখাতেই তা আয়নার মত চকচক করে উঠেছে—এবং মোসীন সাহেব নিম্নকণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারণ সুরু করার মিনিট দশেকের মধ্যেই দুটি নিষ্পাপ শিশু আংটির পাথরে প্রতিফলিত হতে দেখেছে একটি মুখ—এবং এই পদ্ধতিতে শুধু যে অপহরণকারীকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে তাই নয়, সেই অপহৃত বহুমূল্য বস্তুগুলি কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাও জানা গেছে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বক্তা প্রথমে মোসীন সাহেবের কথায় আস্থা জ্ঞাপন করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর আংটির অত্যাশ্চর্য শক্তির পরিচয় পেয়ে প্রবল বিস্ময় ও উত্তেজনার মধ্যে তিনিও অনুভব করেছেন —"মোসীন সাহেবের আংটি বুজরুকি নয়। এ কী লোমহর্ষণ কাণ্ড!"

এই গল্পে শুধু অলৌকিক মন্ত্রশক্তি নয়, লৌকিক মানব চরিত্রের এক বিশেষ পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। উপকারী বন্ধুর ছদ্মবেশে মানুষ যে মানুষের কতখানি শত্রুতা করতে পারে 'নখদর্পণ'-এ নটবর মল্লিকের আচরণ তারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

গল্পের উপসংহার পর্বটুকু লক্ষণীয়—

"...আদালতে বিচারকালে হাকিম পুলিশ-তৎপরতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। তখন ইংরেজের আমল। সাহেব হাকিম নখদর্পণ জাতীয় বর্বরোচিত কুসংস্কার বিশ্বাস করেন নাই।"

—সম্পূর্ণ কাহিনীটির প্রেক্ষাপটে শেষের এই অম্ল-মধুর ব্যঙ্গ নিঃসন্দেহেই পরম উপভোগ্য।

ছোট কর্তা [১৩৬২]ঃ 'ভূত-ভবিষ্যৎ' গল্পের মতো ছোটকর্তা গল্পেও এক দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন অভিভাবকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। কলকাতার শোভাবাজার অঞ্চলে অবস্থিত একটি পুরান বাড়ী একাহিনীর ঘটনাস্থল, যেখানে অন্যান্য অধিবাসীদের

সঙ্গে বাস করেন ছোটকর্তা, তিনি কিন্তু জীবিত নন। ঘটনার বছর দুয়েক আগে তাঁর নশ্বর দেহ বিনষ্ট হলেও তাঁর আত্মা সেই বাড়ীরই দোতলায় নিজস্ব ঘরে অবস্থান করে। কারো কোনও ক্ষতি করে না। মৃত্যুর আগে ছোটকর্তা তাঁর মেয়ে রাণীকে সৎপাত্রে সম্প্রদানের জন্য ব্যগ্র হয়েছিলেন, কিন্তু সে কর্তব্য তিনি সম্পন্ন করার সুযোগ পাননি। হয়তো সেই কারণেই মৃত্যুর পরেও তাঁর আত্মা মর্ত্যলোক পরিত্যাগ করতে পারছে না। অথচ কন্যার জন্য কোনও পাত্রই তাঁর মনোমত হয় না। শেষ পর্যন্ত ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ আভার ছোট ভাই দেবুকে তাঁর জামাই হিসেবে পছন্দ হয়েছে এবং তাঁর মতামত তিনি ইংগিতের মাধ্যমে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছেন।

এ গল্পের প্রয়াত ছোটকর্তা কথা বলেন না বটে কিন্তু তিনি ইচ্ছা করলেই দেখা দিতে পারেন। এমনকি নবাগত দেবুও তাঁর দর্শন লাভে বঞ্চিত হয়নি। একরাত্রেই সে একাধিকবার তাঁর দেখা পেয়েছে। তখনও দেবু সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জানে না। পরদিন সকালে দিদি আভার কাছে ছোট কর্তার বিষয়ে অবগত হয়ে এবং তার প্রতি তাঁর মনোভাব জানতে পেরে বিস্ময়বিমূঢ় দেবু ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ছোটকর্তার আলোকচিত্রের দিকে তাকিয়ে দেখে—

"বৃদ্ধের জীবন্ত চোখে যেন একটু হাসি খেলা করিতেছে।"

এই স্মিত কৌতুক ও স্নিগ্ধ প্রসন্নতা অলৌকিক গল্পটিকে মানবরসে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

ফকিরবাবা [১৩৬৯] ঃ মুঙ্গের অঞ্চলে একদা ফকিরবাবা নামে পরিচিত এক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে এই গল্পের বিস্তার। ফকিরবাবার চেহারায় যেমন কিছুটা অসাধারণত্ব ছিল, তেমনি তার ছিল কিছু অলৌকিক ক্ষমতা, বিশেষতঃ মামলা-মোকদ্দমার ফলাফলের ব্যাপারে তার দূরদর্শিতা ছিল অসাধারণ। এই সকল বিষয়ে তার উক্তি কখনও মিথ্যে হত না। কিন্তু এ গল্পে এর থেকেও চমকপ্রদ ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। একদিন মুঙ্গের জেলাকোর্টের এক জুনিয়ার উকিল নিরাপদ মুখোপাধ্যায়ের কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য ফকিরবাবা তাঁর কাছ থেকে এক তা সাদা কাগজ চেয়ে নিয়েছে, তারপর সেই কাগজ স্পর্শমাত্র না করে কেবল সেগুলির দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে সাদা পৃষ্ঠায় কিম্ভূত এক ভূতের ছবি ফুটিয়ে তুলেছে। পরিশেষে কাগজগুলি বই চাপা দিয়ে দুটি টাকা নিয়ে ফকিরবাবা হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করার পর "দেখা গেল কাগজে ভূতের চেহারা নেই, সাদা কাগজ আবার সাদা হয়ে গেছে।"

আমাদের দেশে গ্রামে গঞ্জে মন্ত্র-শক্তির বা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বেশ কিছু লোক সাধারণ মানুষের মধ্যেই মিশে রয়েছে যাদের অসাধারণত্ব সহজে উপলব্ধি করা যায় না বটে কিন্তু কোনও সূত্রে তাদের এই অসামান্যতার পরিচয় পেলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। ফকিরবাবা এদেরই সুযোগ্য প্রতিনিধি।

পিছু পিছু চলে [১৩৭২] 'পিছু পিছু চলে' গল্পটি শরদিন্দু-সৃষ্টি সম্ভারে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই গল্পটিকে নির্দ্বিধায় অলৌকিক হিসাবে চিহ্নিত করা যায়, অথচ মানবমনের পাপবোধ ও অপরাধজনিত জটিলতাও এর সঙ্গে মিশে আছে যার

ফলে 'পিছু পিছু চলে' একই সঙ্গে ভৌতিক হয়েও মনস্তাত্ত্বিক গল্পের মর্যাদা পেতে পারে।

এ কাহিনীর সত্যবান সিন্ধের সঙ্গে অনন্ত মারাঠের শত্রুতার সূত্রপাত ত্রিশবৎসর আগের সেই দিনটিতে যেদিন সত্যবান অনন্তর বৌ সুমন্তাকে নিয়ে ফেরার হয়েছিল। অস্থির চরিত্রের সুমন্তা সত্যবানের সঙ্গেও বেশীদিন বাস করেনি বটে, কিন্তু কঠিনহৃদয় অন্তুতার অন্তরে সত্যবানের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল তা চিরস্থায়ী। তাই ত্রিশ বৎসর পরে পুণা শহরে হঠাৎ সত্যবানের সন্ধান পেয়ে অনন্তা যেখানে সেখানে তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতে শুরু করেছে। হয়তো সত্যবানের ধারণাই ঠিক, অনন্তা তার বাড়ীর ঠিকানা জেনে নিয়ে তার স্ত্রী-পুত্রের কাছে সেই কলংকময় অতীতকথা ফাঁস করে দেবার জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। সত্যবানের সতর্ক তৎপরতায় অনন্তার সেই ইচ্ছে সার্থক হয়নি বটে কিন্তু অতীতের অপরাধ সত্যবান সিন্ধের বর্তমান জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে, তার স্বাভাবিক জীবনধারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। তারপর একদিন তারই চোখের সামনে প্রতিশোধলিপ্সু অনন্তা এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে পরলোকে পাড়ি দিয়েছে। কিন্তু সত্যবানের রেহাই নেই। পথে বার হলেই অনন্তার প্রেত তাকে অনুসরণ করতে সুরু করেছে। শেষে সেই প্রেতাত্মার প্রতিশোধ লিপ্সার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য পেন্ঢারপুরে পিণ্ডি দিতে যাওয়ার পথে হার্টফেল করে সত্যবানের মৃত্যু ঘটেছে।

গল্পটি পড়ার পর স্বভাবতই দু-একটি প্রশ্ন মনে জাগে। প্রথমতঃ জানতে ইচ্ছে করে সত্যবান যে একাধিবার অনন্তার প্রেতদর্শন করেছিল সে কি বাস্তব ঘটনা না অন্তরের ক্রমবর্ধমান অপরাধবোধের প্রভাবে এই মানসিক বিভ্রান্তি? কিন্তু প্রেতরূপী অনন্তার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষাও করা যায় না, কারণ সত্যবান সিন্ধে ছাড়া আরও একজন তার দর্শন লাভ করেছিলেন, তিনি সত্যবানের সেই প্রতিবেশী যাঁর মাধ্যমে সত্যবানের জীবনের অনৈসর্গিক অভিজ্ঞতাগুলি গল্পাকারে ব্যক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ গল্পের উপসংহার অংশে দেখা যায় সত্যবান সিন্ধে হার্টফেল করে মারা গেছেন। কিন্তু এই হার্টফেলের কারণ কি? নিছক হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতা না ট্রেনে সে এমন কিছু দেখেছিল যাতে তীব্র ভয়ে তার হৃদ্‌স্পন্দন চিরতরে থেমে গেল?

এই সংশয়, এই রহস্যই প্রমাণ করে ভৌতিক ছোট গল্প হিসাবে, পিছু পিছু চলে, কতখানি সফল রচনা।

তক্ত্ মোবারক [১৩৫৪] ঃ প্রাচীন মুঙ্গের শহরের পটভূমিতে রচিত 'তক্ত্ মোবারক' গল্পেও প্রাকৃত-অপ্রাকৃতের সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। পঞ্চম মোগল সম্রাট সাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজা পানোন্মত্ত অবস্থায় অন্যায়ভাবে যুবক মোবারককে হত্যা করেছিলেন, আর তার হতভাগ্য বৃদ্ধ পিতা শিল্পী খ্বাজানজর বোখারীকে একটি মঙ্গলময় সিংহাসন প্রস্তুত করার আদেশ দিয়েছিলেন। সদ্যপুত্রহীন বৃদ্ধ শাহাজাদা সুজার সেই আদেশ অমান্য করেননি, পুত্রেরই রক্তে রাঙ্গা পাথর দিয়ে গড়ে দিয়েছিলেন শত্রু সুজার 'তক্ত্ মোবারক' বা মঙ্গলময় সিংহাসন। কিন্তু এ সিংহাসন যে কত অমঙ্গলজনক তা পরবর্তীকালে বোঝা যায়। তরুণ মোবারকের রক্ত-লাঞ্ছিত সেই

সেই 'তক্ত' শুধু তার হত্যাকারী সুজার জন্যেই চরম দুর্ভাগ্য বহন করে আনেনি, সুজার পর যথাক্রমে মীরজুমলা, মুরশিদকুলি খাঁর জামাতা সুজা খাঁ, সুজাখাঁর পুত্র সরফরাজ, সরফরাজের ভৃত্য আলিবর্দি, আলিবর্দির পর সিরাজদ্দৌলা এবং সর্বশেষে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর সেই সিংহাসনে আরোহণ করেছেন কিন্তু কারো জন্যেই 'তক্ত্ মোবারক' সৌভাগ্য বহন করে আনেনি। তাই গ্রীষ্মকালে তক্ত্ মোবারকের পাষাণ গাত্র বেয়ে যে রক্তবর্ণ স্বেদ ঝরে পড়ে তা বাদশাহী আমলের ঐশ্বর্য ও গরিমা স্মরণ করে সিংহাসনের শোণিতাশ্রু বিসর্জন নয়, দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিনব প্রতিবাদ। এই অসাধারণ বৈশিষ্ট্যই 'তক্ত্ মোবারক'কে অলৌকিকতার স্পর্শ এনে দিয়েছে।

কামিনী [১৩৭২]: শরদিন্দুর লেখা সর্বশেষ অলৌকিক গল্প 'কামিনী'র মাধ্যমে ডাকিনী সম্পর্কে বহুল প্রচলিত ধারণাকেই নবরূপ দান করা হয়েছে। ডাকিনী বা ডাইনীরা সাধারণ মানুষকে নানা ছলা-কলার কুহকে বশীভূত করে শেষে তাদের প্রাণহরণ করে—এরকম একটা ধারণাই এই মায়াবিনীদের সম্পর্কে প্রচলিত আছে। আলোচ্য কাহিনীতে কামিনী ডাকিনীর সান্নিধ্যে এসে ডাক বিভাগের ইন্‌স্পেকটর সুরনাথবাবুর জীবনে সেই ভয়ংকর পরিণামই ঘটেছিল।

'কামিনী'র উপস্থাপনা কৌশল প্রশংসনীয়। এর সূচনা সাধারণভাবে ঘটলেও বারো-মাইল দূরের এক পোস্টঅফিসের উদ্দেশে সুরনাথবাবুর যাত্রা করার পূর্ব মুহূর্ত থেকেই রহস্যময়তার সূত্রপাত। এই সময় পোস্টমাস্টারের নির্দেশ লক্ষণীয়—

> "এখান থেকে মাইল পাঁচ-ছয় দূরে রাস্তা দু ফাঁক হয়ে গেছে। ডান-হাতি রাস্তা দিয়ে গেলে একটু ঘুর পড়ে বটে, কিন্তু আপনি ওই রাস্তা দিয়েই যাবেন।"

বাঁ দিকের রাস্তা সম্পর্কে সুরনাথবাবু প্রশ্ন করলে তাঁর সংক্ষিপ্ত অথচ ইংগিতপূর্ণ উত্তর—"ও রাস্তাটা ভাল নয়"—পাঠককে সচকিত করে তোলে।

তারপর যখন দেখা যায় সুরনাথবাবু পোস্টমাস্টার মশাইয়ের সহৃদয় পরামর্শ অগ্রাহ্য করে বাম দিকের রাস্তা ধরেই সাইকেল চালাতে লাগলেন তখন আমাদের মনে একই সঙ্গে জেগে ওঠে কৌতূহল ও উৎকণ্ঠা। কিছুক্ষণ পর রাস্তার পাশেই একটি নিঃসঙ্গ কুঁড়ে ঘরের দৃশ্য ফুটে ওঠে। কুটিরের দাওয়ায় এক মোহময়ী যুবতীর বসে থাকার শিথিল অথচ আকর্ষনীয় ভঙ্গি, সেই কুটিরেই রাত্রিবাসের জন্য সুরনাথবাবুর উদ্দেশ্যে রমনীটির মধুর আমন্ত্রণ—তার দুরন্ত যৌবন মাদকভরা রূপ, রহস্যময়, প্রগল্‌ভ অথচ আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণের প্রভাবে মধ্যবয়স্ক, বিপত্নীক সুরনাথবাবুর বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থা—এই সকল ঘটনাই পাঠকমনে এক অনিবার্য পরিণামের আশংকা জাগায়। অবশেষে আসে সেই বিশেষ মুহূর্তটি যখন নৈশ ভোজনের পর তন্দ্রাচ্ছন্ন সুরনাথবাবু সহসা চোখ খুলে দেখেছেন—

> "কামিনী নিঃশব্দে কখন তাঁহার বিছানার পাশে আসিয়া বসিয়াছে; তাহার মুখে বিচিত্র হিংস্র-মধুর হাসি।"

সাতদিন পর যখন তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেছে তখন তাঁর সাইকেল, সুটকেশ এবং

অন্যান্য জিনিসপত্র সবই যথাযথ অবস্থায় আছে, অটুট আছে তাঁর অঙ্গ-প্রতঙ্গ—

"কিন্তু দেহটি প্রাচীন মিশরীয় 'মমি'র মত শুষ্ক ও অস্থিচর্মসার হইয়া গিয়াছে, যেন রক্ত-চোষা বাদুড় দেহটা শুষিয়া লইয়াছে।"

কাহিনী বয়ন কৌশল লক্ষ্য করলে দেখা যায় এ গল্পে কোথাও উগ্র, বীভৎস রসের আমদানি করা হয়নি। সামগ্রিক বিচারে লেখকের বর্ণনাভঙ্গি প্রাঞ্জল, স্বাভাবিক। মাঝে মাঝে দু-একটি ইংগিত গর্ভ বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র, অথচ অলৌকিক রসানুভূতি সৃষ্টিতে 'কামিনী'র পারদর্শিতা অনস্বীকার্য। অপ্রাকৃত ছোটগল্প হিসেবে 'কামিনী' রীতিমত শিল্প সফল।

॥ ৫ ॥

॥ **শরদিন্দু-রচিত অলৌকিক কাহিনীসমূহের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য** ॥

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত অপ্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত রহস্যপূর্ণ কাহিনীসমূহ পাঠ করলে লেখকের রচনাভঙ্গির বিশেষ কয়েকটি দিক সহজেই অনুধাবন করা যায়। বর্তমান নিবন্ধে সেই বৈশিষ্ট্যগুলিই যথাসম্ভব সংক্ষেপে উল্লেখ করা হচ্ছে।

শরদিন্দুর লেখা ভৌতিক গল্পগুলিতে অলৌকিক রস সৃষ্টির উপাদান যথোপযুক্ত পরিমাণেই ব্যবহৃত হয়েছে। পরিত্যক্ত পুরানো বাড়ী, ভয়ংকরদর্শন কুকুরের অশুভ কান্না, বর্ষণমুখর অন্ধকার রাত্রি, হঠাৎ ঘনিয়ে আসা অন্ধকার, ডাকিনীর মায়ামন্ত্র, নখদর্পণ, জন্মান্তরবাদ, অদৃশ্য মানবী, বিভিন্ন শ্রেণীর প্রেতাত্মা, আরব্য উপন্যাস বর্ণিত অতিকায় 'জিন' প্রভৃতি বিচিত্র অনৈসর্গিক উপকরণ শরদিন্দু-সৃষ্ট রসলোকে সমাদরে স্থান পেয়েছে। কিন্তু কোন গল্পেই তিনি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অনুরূপ লোমহর্ষক বিভীষিকা বা horror সৃষ্টির দ্বারা পাঠকের অনুভব শক্তিকে অনাবশ্যকভাবে পীড়িত করেননি। তাঁর অধিকাংশ অলৌকিক রচনাতেই বীভৎস রস অপেক্ষা বিস্ময় ও কৌতুকই অধিক প্রাধান্য পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'পঞ্চভূত', 'সবুজ চশমা', 'শূন্য শুধু শূন্য নয়', 'ছোট কর্তা', 'চিরঞ্জীব' প্রভৃতি গল্পের কথা উল্লেখ করা যায়। 'রক্তখদ্যোত', 'দেহান্তর', 'কালো মোরগ', 'পিছু পিছু চলে' ইত্যাদি মুষ্টিমেয় কয়েকটি কাহিনীতে লেখক ভয়ের অকৃত্রিম উত্তেজনা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন এবং সফলও হয়েছেন।

সাধারণ ধারণা অনুসারে প্রেতাত্মা অশরীরী। কিন্তু শরদিন্দু-লেখনী প্রসূত প্রেতদের মধ্যে কেউ কেউ মুহূর্তের জন্য অস্পষ্ট সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করেছে, আবার ক্ষণপরেই অন্তর্হিত হয়েছে যেমন 'প্রতিধ্বনি' গল্পের বিদেশিনী নারী, 'ভূত-ভবিষ্যৎ'-এর নন্দদুলাল নন্দী। কখনও বা প্রয়াত ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক চেহারাতেই দেখা দিয়েছেন যেমন 'ছোটকর্তা' গল্পের ছোটকর্তা। 'বহুরূপী'র প্রেতটি শুধু ইচ্ছারূপধারীই নয় কী কৌশলে অশরীরী আত্মা প্রয়োজনমত শরীর ধারণ করতে পারে সেই তত্ত্বও সে বরদার বন্ধুদের কাছে সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করেছে। কোনও কোনও প্রেত আবার সম্পূর্ণ অন্তরালে থেকেছে। যেমন 'অশরীরী' গল্পের দেহহীনা নায়িকা, 'প্রত্নকেতকী' গল্পের রাজা 'বিজয়কেতু'। 'অন্ধকারে' পথভ্রষ্ট অসহায় পথিককে সাহায্যকারীও প্রায় অদৃশ্য, তার শীতল একখানি হাত ছাড়া আর কিছুই দেখা যায়নি, অথচ কথাবার্তা স্পষ্টই শোনা গেছে।

শরদিন্দু সাহিত্যলোকের অধিকাংশ অপ্রাকৃত অধিবাসীরাই কিন্তু সহৃদয় ও পরদুঃখ-কাতর। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ছোটকর্তা' গল্পের বৃদ্ধ ছোটকর্তা, 'ভূত-ভবিষ্যৎ'-এর নন্দদুলাল নন্দী, 'নিরুত্তর'-এর সন্ন্যাসী ঠাকুরের কথা স্মরণার্হ। এই প্রসঙ্গে 'আকাশবাণী' গল্পের প্রিয়তোষবাবুর গৃহিনীর ক্রিয়াকলাপও ভুলে গেলে চলবে না। প্রতি রাত্রে তিনি বেতারযন্ত্রে স্বামীর সঙ্গে কথা বলেন এবং সাংসারিক ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করেন। 'শূন্য শুধু শূন্য নয়'-এর নেপথ্যচারিণী ছায়াই বা কম কিসে? ক্ষুধার তাড়নায় খাবার চুরি করার অভ্যাস তার আছে বটে, (গৌরমোহনের মন্তব্য থেকে জানা যায় "তেলেভাজা থেকে সন্দেশ পর্যন্ত কিছু বাদ দেয় না") কিন্তু অলক্ষ্যে থেকে নিঃসঙ্গ গৌরমোহনের নানা কাজে ছায়ার আন্তরিক সহায়তা অনস্বীকার্য। তবে শরদিন্দুর অলৌকিক কাহিনী-মালায় এই ধরণের উপকারী ভূতদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মহানুভব বোধ হয় 'অন্ধকারে' গল্পের পথপ্রদর্শক আত্মাটি। তার সাহায্য না পেলে সেই প্রগাঢ় অন্ধকারে বৃষ্টির জলে ভরা পথ অতিক্রম করে দিশাহারা অসহায় ভদ্রলোকটির পক্ষে আপন ঠিকানায় পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। অথচ প্রেত সম্পর্কে আমাদের ভয় এমনই সহজাত ও বদ্ধমূল যে একজন জীবিত ব্যক্তির কাছ থেকে যে ধরনের উপকার পেয়ে আমরা কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে পড়ি, সেই একই সাহায্য কোনও লোকান্তরবাসীর দ্বারা সৃষ্ট হলে আমাদের সংজ্ঞা হারাবার উপক্রম হয়। অবশ্য পরোপচিকীর্ষু প্রেতবন্ধুদের পাশাপাশি কিছু নিষ্ঠুর, প্রতিশোধলিপ্সু আত্মার সাক্ষাৎও শরদিন্দুর গল্পে পাওয়া যায় যথা—'নীলকর'-এর বিল্লি সাহেব, 'দেহান্তর'-এর মিস্টার দাস, 'পিছু পিছু চলে'র অনন্ত বিষ্ণু মারাঠে, 'কামিনী'র কামিনী ডাইনী প্রভৃতি।

কাহিনীর পটভূমি ও পারিপার্শ্বিকের সজীব বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা যে শরদিন্দু-প্রতিভার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ সেই সত্য তাঁর গোয়েন্দা ও ইতিহাস নির্ভর রচনাগুলির মাধ্যমে বারংবার প্রমাণিত হয়েছে। আলোচ্য ধারাতেও লেখকের এই বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রয়েছে। শরদিন্দুর লেখা অলৌকিক গল্পগুলির পটভূমি অবশ্য বঙ্গদেশে নয়, মূলতঃ বিহার, পুণা ও বোম্বাই।

বরদা-কেন্দ্রিক গল্পগুলির মধ্যে একমাত্র 'প্রেতপুরী'র ঘটনাস্থল গ্রামবাংলা এবং 'দেহান্তর'-এর ঘটনা ঘটেছিল ভারতের কোনো এক পার্বত্য প্রদেশে। নতুবা বরদার অভিজ্ঞতাঋদ্ধ অন্যান্য অলৌকিক কাহিনীসমূহ প্রধানতঃ বিহারের মুঙ্গের শহর ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে রচিত। 'ফকির বাবা' ও 'নখদর্পণ'-এ বর্ণিত অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলীও মুঙ্গেরেই ঘটেছিল। আলোচ্য লেখকের অন্যান্য অপ্রাকৃত গল্পগুলির স্থানিক পটভূমি পুণা ও বোম্বাই। ব্যক্তিগত জীবনে শরদিন্দু উল্লিখিত শহর তিনটির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। তাই তাঁর অলৌকিক গল্পগুলির লৌকিক পরিবেশ অত্যন্ত উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত। স্থান ও কাল অনুযায়ী বিষয়বস্তুর সঠিক উপস্থাপনা, সুষ্ঠু রূপায়ণ ভৌতিক কাহিনীগুলিকে নিঃসন্দেহেই উপভোগ্য ও রসোত্তীর্ণ করে তুলেছে। সামগ্রিক বিচারে বলা যায়, বাংলা প্রাকৃত-অতিপ্রাকৃত সাহিত্য শাখায় শরদিন্দুর অবদান অবিস্মরণীয়, তাঁর কীর্তি দীর্ঘজীবী।

চতুর্থ অধ্যায়
শরদিন্দুর কৌতুক-কাহিনী

বহুকাল আগেই গুপ্তকবি লিখেছিলেন—"এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা।" এই উক্তির যাথার্থ্য আমরা তখনই উপলব্ধি করি যখন দেখি আমাদের সমাজ জীবনে অসংখ্য সমস্যা ও অজস্র বিপর্যয় সত্ত্বেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্মেষকাল থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বাঙালীর লেখা কাব্য কবিতায়, গল্পে-উপন্যাসে, প্রবন্ধে নাটকে, গানে, হাস্যরসের অভাব বিশেষ ঘটে নি। কখনও অশ্রুসিক্ত হাসি, কখনও উচ্ছল কৌতুক, কখনও রঙ্গব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ কশাঘাত, কখনও বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যের শাণিত দ্যুতি, আবার কখনও উদ্ভট, আজগুবি কল্পনার বিস্ময়ানন্দ শত দুঃখ, দুর্দশা, সমস্যা, সংশয়ের মধ্যেও বাঙালী-হৃদয়ের সরস অনুভূতির ধারাটিকে যুগ যুগ ধরে সঞ্জীবিত করে রেখেছে। বঙ্গ-কথা-সাহিত্যের কোনও কোনও লেখক কেবল হাস্যরস সৃষ্টির কার্যেই তাঁদের প্রতিভাকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত রেখেছেন। আবার এমন অনেক লেখক আছেন যাঁরা বিভিন্ন শ্রেণীর, বিচিত্র রসাশ্রিত কাহিনী সৃষ্টি করেছেন, 'কৌতুক রস' তাঁদের রচনার রসবৈচিত্র্যের অন্যতম উপাদান মাত্র। কথাশিল্পী শরদিন্দু সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে ঐ শেষোক্ত শ্রেণীর লেখককুলেরই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তিনি নানা ধরনের গল্প উপন্যাস লিখতে ভালবাসেন। কিন্তু পরিহাসপ্রিয়তা তাঁর শিল্পীসত্তার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই তাঁর গাম্ভীর্যপূর্ণ বা Serious রচনাতেও বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গীর গভীর আবরণ ভেদ করে কালোমেঘের বুকে বিদ্যুতের চকিত চমকের মত কৌতুকের শুভ্র রেখাটি মাঝে মাঝেই আত্মপ্রকাশ করে। এ ছাড়াও কিছু গল্প তিনি অবিমিশ্র হাস্যরস পরিবেশনের উদ্দেশ্যেই রচনা করেছেন। শরদিন্দু রচিত সেই কৌতুকগল্পগুলিই এখন সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

কর্তার কীর্তি [১৩৩৯] ঃ সরস ভঙ্গীতে লেখা 'কর্তার কীর্তি'র কর্তা হৃষীকেশ রায়ের চরিত্রটি চিত্তাকর্ষক। বদরাগী এই মানুষটির মেজাজের বর্ণনা আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা আতিশয্যদুষ্ট বলে মনে হলেও তাঁর আচার আচরণকে সম্পূর্ণ আজগুবি কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কৌতুক গল্প হিসেবে 'কর্তার কীর্তি'র মূল্যায়ন প্রসঙ্গে শ্রীপ্রথমনাথ বিশীর মন্তব্য অবশ্যই লক্ষণীয়—

> "কর্তার কীর্তি'র জমিদার হৃষীকেশবাবুর চিত্রটি বড়ই উপভোগ্য। প্রাচীন কালের একজন জমিদারের ইনি type। রাগিলে ইনি আসবাব ভাঙ্গিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু কাচের গেলাস ভাঙ্গলে ইহাঁর রাগ কমিয়া আসে। হৃষীকেশবাবু রাগে অন্ধ হইয়া টেবিল চেয়ার ভাঙ্গিয়া বেড়াইতেছেন, হঠাৎ কেহ হাতের কাছে একটি কাচের গেলাস আগাইয়া দিল। তিনি তাহা ভাঙিয়া শান্ত হইলেন। এ চিত্র যেমন সজীব তেমনি সত্য।"

গল্পের বিষয়বস্তু অবশ্য গতানুগতিক, বদ্‌মেজাজী হৃষীকেশ বাবুর শিক্ষিত পুত্র হেমন্ত তাঁর মনোনীতা পাত্রী একাদশবর্ষীয়া কলাবতীকে বিবাহ না করে স্বনির্বাচিতা প্রতিমাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করায় ক্রুদ্ধ হৃষীকেশবাবু হেমন্তকে শুধু ত্যাজ্য পুত্র রূপে ঘোষণা করেননি তাঁর ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে সব সংস্রব ছিন্ন করার জন্য পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু এই বদরাগী কর্তাই যখন জেনেছেন তাঁর পুত্রবধূ সন্তান সম্ভবা, তখন নিজে হেমন্তর বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে সাদরে সসম্মানে বধূটিকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে এসেছেন। আবেগপ্রবণ বাঙালীর জীবনে ও সাহিত্যে এমন ঘটনা নতুন নয়, কিন্তু উপস্থাপনার চারুত্বে পরিচিত বিষয়বস্তুই উপভোগ্য রসপরিণতি লাভ করেছে।

ভেন্‌ডেটা [১৩৪১] ঃ গল্পটিতেও দুটি 'টাইপ' চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বাংলার পল্লীতে বা শহরাঞ্চলে অনেক সময়েই প্রতিবেশী দুই ধনীপরিবারের গৃহকর্তাদের মধ্যে অতীতে ঘটে যাওয়া কোনও তুচ্ছ ঘটনার জের টেনে বংশানুক্রমিক শত্রুতা ধারাবাহিক ভাবে চলতে থাকে। শেষপর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে দীর্ঘকাল পোষিত বৈরিতার অবসান ঘটে। আলোচ্য গল্পের উপজীব্য এইরকমই— এ-গল্পের ওল গোবিন্দ ঘোষ ও কুঞ্জ-কুঞ্জর করের নাম দুটিই শুধু নয়, তাদের অকারণ কলহপ্রবণতা, পরিণত বয়স্ক এই ব্যক্তিদ্বয়ের শিশুসুলভ অপরিণত আচরণ, রেগে গেলে দুজনেরই ভুল হিন্দীতে ক্রোধ প্রকাশের চেষ্টা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য রীতিমত হাস্যোদ্রেককারী। নিজ নিজ বহির্মহলে এই দুই কর্তা যখন প্রতিপক্ষকে জব্দ করার নব নব পরিকল্পনা রচনায় মত্ত তখন দুই অন্দরমহলে গৃহিণীদের প্রশ্রয়ে ও প্রেমের দেবতার ইচ্ছায় ওল-গোবিন্দ-পুত্র প্রাণগোবিন্দ ও কুঞ্জ-কুঞ্জরের কন্যা সুধা পরস্পরের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়েছে। অতঃপর উলুধ্বনির মাধ্যমে শুধু দুটি মিলনোৎসুক হৃদয়ই মিলিত হয়নি, দুটি বিবদমান পরিবারের মধ্যেও মিলনের সেতু রচিত হয়েছে। সুতরাং 'কর্তার কীর্তির' মত ভেন্‌ডেটাও মধুর পরিসমাপ্তি লাভ করেছে।

বহুবিঘ্নানি [১৩৪০] ঃ 'বহুবিঘ্নানি'তেও সুন্দর 'হিউমার' পরিবেশিত হয়েছে। ফুলশয্যার রাতে মিলনোন্মুখ বর বধূ প্রণয়ালাপের মাধ্যমে যখনই পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে পৌঁছাতে চেয়েছে, তখনই কোনও এক অজ্ঞাত উৎস থেকে ধ্বনিত হয়েছে 'খবরদার', 'এই ও কি হচ্ছে', 'দাঁড়াও তো মজা দেখাচ্ছি' প্রভৃতি নিষেধ সূচক ও ভর্ৎসনাপূর্ণ শব্দ ও বাক্য। স্পষ্ট মনুষ্যকণ্ঠ, অথচ ধারে কাছে কোনও মানুষের অস্তিত্ব নেই। সুতরাং নববিবাহিত নিখিলেশ ও ললিতার মনে বিস্ময় ও লজ্জার সঙ্গে প্রবল কৌতূহলেরও সঞ্চার হয়। অসাধারণ এই গল্পের প্রাক্‌-সমাপ্তি পর্ব পর্যন্ত এই মজাদার মেজাজটি ধরে রেখে শেষ পর্যন্ত লেখক প্রকৃত রহস্যের উন্মোচন ঘটিয়েছেন। জানা গেছে নবদম্পতির প্রথম মিলন রাতে বারংবার বহুবিঘ্নাণির স্রষ্টা কোনও মানুষ নয়, একটি পাহাড়ী ময়না। রসিক পাঠকের কাছে এই গল্পের রসাবেদন কখনও নিষ্ফল হয় না।

গ্রন্থকার [১৩৪০] ঃ 'গ্রন্থকার' গল্পেও কৌতুক পরিবেশিত হয়েছে বাস্তব বিষয়কে কেন্দ্র করে। সর্বকালে সর্বদেশের সমাজেই এক শ্রেণীর লোক থাকে যারা মিথ্যা বলায় সিদ্ধহস্ত। অনৃত ভাষণের অসামান্য পারদর্শিতায় তারা দিনকে রাত করতে পারে।

চলতি কথায় এদেরই তো বলা হয় 'গুলবাজ'। 'গ্রন্থকার' গল্পের গ্রন্থকার অর্থাৎ পাঠক-কুলের জনপ্রিয়তাধন্য 'নীলরক্ত' উপন্যাসের লেখক প্রদ্যোত রায় কলকাতাগামী একটি লোকাল ট্রেনের 'ইণ্টারক্লাস'-কামরায় দুই সপ্রতিভ গুলবাজের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তাদের মধ্যে প্রথমজন প্রৌঢ় ও দ্বিতীয় জন তরুণ। দুজনেই পর্যায়ক্রমে কামরার অন্যান্য যাত্রীদের কাছে 'নীলরক্ত' উপন্যাসটিকে কেন্দ্র করে কল্পিত মিথ্যার রঙিন ফানুস উড়িয়েছে। গল্পটির কৌতুক তুঙ্গে উঠেছে তখনই, যে মুহূর্তে উক্ত গ্রন্থের প্রকৃত গ্রন্থকার প্রদ্যোত রায় উপযুক্ত প্রমাণ সহ তাদের সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করেছেন, মিথ্যায় গড়া সেই কাচের স্বর্গ ভেঙে যাওয়ায় প্যারীদা অর্থাৎ প্রৌঢ় ব্যক্তিটি গ্রন্থকারের দিকে হিংস্র ভাবে তাকিয়েছেন, আর তরুণটি প্লাটফর্মে গাড়ি থামতেই ভিড়ের মধ্যে দ্রুত অন্তর্ধান করেছে।

জটিল ব্যাপার [১৩৪২] : 'জটিল ব্যাপার'-এর নায়ক ঘটনাচক্রে একটি কৃত্রিম জটা লাভ করেছিল। সেই জটার সাহায্যে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে স্ত্রীকে ভয় দেখিয়ে আমোদ পাওয়ার দুর্বুদ্ধি তার মনে হঠাৎই জেগেছিল। সেই সূত্রেই ছদ্মবেশে নিজের গৃহে উপস্থিত হয়ে স্ত্রীর কথাবার্তা শুনে তার মনে হল তার গৃহিণীটি অন্যাসক্তা। আসলে নায়কের পত্নী প্রমীলা তার স্বামীর ছদ্মবেশের ছলনাটুকু ধরে ফেলেছিল বলেই সেও পাল্টা অভিনয় করে কিছুটা জটিলতার সৃষ্টি করেছিল—শেষপর্যন্ত প্রমীলার অকপট স্বীকারোক্তির সাহায্যেই নায়কের মনের সন্দেহের কাঁটা ও অভিমানের মেঘ দুই-ই দূরে সরে গেছে। 'জটিল ব্যাপার'-এ মানবমনের সূক্ষ্ম জটিলতার আভাস দেওয়ার চেষ্টা আছে বলেই হয়তো এ গল্পে উতরোল হাস্য সৃষ্টি সম্ভব হয়নি, কিন্তু গল্পটি যে সরস সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সন্দেহজনক ব্যাপার [১৩৪৩] : 'সন্দেহজনক ব্যাপার'-এর সূচনায় লেখক যদিও মন্মথ নামে এক যুবকের সম্পর্কে পাঠকের মনে সন্দেহের ধন্দ লাগিয়ে দেন কিন্তু গল্পটির ঘটনা পরম্পরায় প্রমাণিত হয় মন্মথ আদৌ হত্যাকারী নয়, সে প্রেমিক এবং প্রেমের জন্য মানুষ কতখানি স্বার্থত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধন করতে পারে তা মন্মথের আচরণেই প্রতিভাত হয়। সে রামদয়ালবাবুর নাতনী পুঁটুর হৃদয় জয় করার জন্য রামদয়ালের ভৃত্য সাজতেও কুণ্ঠিত হয়নি। এই গল্পে আদ্যন্ত লঘুরস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

প্রতিদ্বন্দ্বী [১৩৪২] : 'প্রতিদ্বন্দ্বী'-তে নারী ও পুরুষকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বিবাহ নামক সংস্কারটিকে উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতারই পূর্ণ বিকাশ রূপে ঘোষণা করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক নৃসিংহবাবুর আশ্রয়ে প্রতিপালিত হয় দুটি অনাথ কিশোর-কিশোরী—তাদের একজন তাঁর শ্যালিকা-পুত্র নীরেন ও অপরজন তাঁর ভগিনী-কন্যা মিলু। এদের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রথম থেকেই বিদ্বেষপূর্ণ। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের কলহের কৌশল পরিবর্তিত হয়েছে বটে, কিন্তু তীব্রতা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি নৃসিংহবাবু তাঁর থিয়োরীর সত্যতা প্রমাণ করার জন্য তাই সতত বিবদমান দুটি তরুণ-তরুণীর মধ্যে বিবাহের যোগসূত্র রচনা করেছেন। গল্পে মিলু ও নীরেনের ঝগড়া কখনও সুনির্বাচিত শব্দযুক্ত গদ্যে, কখনও বা ছন্দোময় পদ্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই দৃষ্টান্তগুলির থেকে বোঝা যায় কলহের ব্যাপারে উভয়েই সমান পারদর্শী এবং কলহতৃষ্ণা নিবৃত্তির

জন্য তারা দুজনেই দুজনার কাছে অপরিহার্য। অর্থাৎ এককথায় বলা যায় নীরেন ও মিলুর জুটি রাজযোটক। আলোচ্য গল্পে হাস্যরসের অপর উৎস স্বয়ং নৃসিংহবাবু। শরদিন্দু তাঁর প্রকৃতির অদ্ভুত খামখেয়ালিপনার পরিচয় দিয়ে এবং তাঁর আকৃতির একটি রেখাচিত্র এঁকে আমাদের আমোদের উপকরণ যুগিয়েছেন—বিশেষতঃ তাঁর মস্তকের একটিমাত্র কেশের প্রতি তাঁর সযত্ন পরিচর্যার ব্যাপারটি রীতিমত কৌতুককর। লেখকের বর্ণনা থেকে জানা যায়—

"প্রাতঃকালে স্নান করিয়া তিনি সেটিকে চিরুনী দিয়া আঁচড়াইতেন তারপর বুরুশ দিয়া মস্তকের উপর শোয়াইয়া দিতেন।"

প্রতিদ্বন্দ্বী গল্পে শরদিন্দুর পরিহাসপ্রিয় মনটির বুদ্ধিদীপ্ত প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

দন্তরুচি [১৩৪৪] : "দন্তরুচি'-তে Humour বা করুণ হাস্যরসের স্পর্শ পাওয়া যায়। বিপত্নীক নীরদবাবুর বয়স যাইহোক তাঁর দেহটি মজবুত, মস্তকও কেশ বিরল নয় কেবল তাঁর দাঁতগুলি তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। তাদের অকাল পতনে দন্তহীন হয়ে নীরদবাবু নকল দাঁত ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। এহেন নীরদবাবু যে যুবতীটিকে দেখে পুনর্বার দার পরিগ্রহের বাসনায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন তাঁর নাম সুদতি দেবী—সার্থক নামা এই রমনী। তাঁর সুগঠিত সুবিন্যস্ত, কুন্দশুভ্র দন্তপংক্তি থেকে বিচ্ছুরিত উজ্জ্বল হাসিই নীরদবাবুকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। কাহিনীর পাত্র-পাত্রী উভয়ের হৃদয়েই প্রণয়ের অনুভূতি যখন যথেষ্ট প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে তখন এক সামান্য দুর্ঘটনার সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে শুধু নীরদবাবুই দন্তহীন নন, সুদতি দেবীও প্রকৃতপক্ষে দন্তহীনা। তাঁর মুক্তোর মত সুদৃশ্য দাঁতগুলি আসল নয়, নকল। প্রকৃতির নিয়মে যে বার্ধক্য স্বাভাবিক ও অনিবার্য তাকে অস্বীকার করে বিগত যৌবনকে ধরে রাখার হাস্যকর প্রয়াস মানবজীবনের অন্যতম ট্র্যাজেডি। যৌবন ক্ষণস্থায়ী অথচ মোহগ্রস্ত মানুষ জীবনের সেই পলাতক পরম লগ্নটিকে বেঁধে রাখার জন্য কত না কৌশল, কত না ছলনার আশ্রয় নিচ্ছে। কিন্তু সত্যকে তো এড়ানো যায় না। সেই নিষ্ঠুর সত্যের সম্মুখীন হয়ে 'দন্তরুচি'-র সুদতি দেবীর কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা জানা যায় না বটে, কিন্তু যে দাঁতের টানে সুদতি-প্রীতি তা সম্পূর্ণ নকল সেকথা জেনে নীরদবাবুর পাগল হয়ে যাওয়ার ঘটনা হাসির আবরণে জীবনের সকরুণ বেদনাকেই আমাদের কাছে তুলে ধরে।

প্রেমিক [১৩৪৪] 'প্রেমিক' গল্পে এক অভিনব প্রেমের পরিচয় সকৌতুকে পরিবেশিত হয়েছে। একটি যুবকের নাম বিমান ও একটি যুবতীর নাম অনিন্দ্যা। দুজনের চরিত্রেরই একটি সাধারণ মিল—সারমেয় প্রীতি। বিমান কুকুর ভালবাসে কিন্তু তার নিজস্ব কুকুর নেই। অনিন্দ্যা 'ঝুমঝুম' নামে একটি 'সায়ামীজ' জাতীয়া সারমেয়-নন্দিনীর স্বত্বাধিকারিনী। এই ঝুমঝুমকে কেন্দ্র করেই কোনও এক পার্কে বিমান ও অনিন্দ্যার পরিচয় ঘটে। অনিন্দ্যা 'হিরণ্ময়ী শাললতার মত জঙ্গমা, স্ফুট-বিকশিত-যৌবনা।'—সুতরাং গল্পের পাঠক অনুমান করে বিমানের তরুণ হৃদয় অনিন্দ্যার রূপের বন্ধনে বাঁধা পড়েছে। লেখকের বর্ণনা কৌশলও এই অনুমান দৃঢ়তর হওয়ার উপযুক্ত ইন্ধন যুগিয়ে গেছে—তাই গল্পের শেষে যখন দেখা যায় অনিন্দ্যা নয়, তার কুকুর

ঝুমঝুমই বিমানের ভালবাসার পাত্রী, অনিন্দ্যা হরণে নয়, ঝুমঝুম হরণেই কাহিনীর পরিসমাপ্তি তখন এই অপ্রত্যাশিত চমকটুকু উপভোগ্য রসস্ফূর্তি ঘটায়। অবশ্য এ রস একেবারেই লঘু।

নাইট ক্লাব [১৩৪৫] : 'নাইট ক্লাব' গল্পর আদিতে ও মধ্যভাগে অত্যাধিক স্ত্রী-স্বাধীনতার বিপদ ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নারীগণের আবেগ উচ্ছ্বাসের পরিচয় কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে পরিবেশন করা হলেও-গল্পের শেষাংশে রোমান্সের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

নারীর মূল্য [১৩৪০] ও প্রেমের কথা [১৩৪৩] : দুটি ক্ষেত্রেই আধুনিক তরুণ-তরুণীর প্রেমাবেগের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। দুটি গল্পই বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে লেখকের পারদর্শিতার স্বাক্ষর বহন করে।

কুতুবশীর্ষে [১৩৪৫] : গল্পটিতে শরদিন্দুর রসবোধের পরিচয় মেলে। দিল্লীর কুতুব মিনারের ঐতিহাসিক খ্যাতি বিশ্বব্যাপী। আলোচ্য গল্পে অবশ্য এই সুউচ্চ মিনারটি অভিভাবকদের ফাঁকি দিয়ে একজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকার গোপন মিলনস্থল রূপে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে 'কুতুবশীর্ষে' পৌঁছে দেখা গেছে সেখানে এক তরুণ সাহেব আগে থেকেই মূর্তিমান রসভঙ্গের মত উপস্থিত। পিতার সতর্ক প্রহরা কোনমতে এড়িয়ে, অগুণতি সিঁড় ভেঙে কুতুবচূড়ায় ওঠার শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করেও প্রেমিকের সঙ্গে বহুপ্রত্যাশিত নিভৃত সাক্ষাৎ তৃতীয় ব্যক্তিটির উপস্থিতিতে ব্যর্থ হয়ে গেল দেখে প্রেমিকা 'বিন্দু' ম্লান মুখে বিদায় নিয়েছে। তার আগে অবশ্য মূর্তিমান বিঘ্ন সেই সাহেবের উদ্দেশ্যে 'মুখপোড়া ড্যাক্রা।'—প্রভৃতি সুললিত সম্ভাষণ জানিয়ে যেতে ভোলেনি। তার প্রস্থানের পর তার প্রেমিক এক বিস্ময়কর সত্যের মুখোমুখি হয়েছে—সে জেনেছে পাঁচবছর বয়স থেকেই শান্তিনিকেতনের ছাত্র এই সাহেবটি বাংলা ভাষায় যথেষ্ট দক্ষ এবং কুতুব শীর্ষে সে এসে উপস্থিত হয়েছে কোনও অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, প্রেমিকা 'ফ্যানি'র সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যই তার এই প্রতীক্ষা। তার সমস্যাও ঐ বাঙালী প্রেমিকটির মতই তীব্র, কারণ স্বজাতি হওয়া সত্ত্বেও এই বাংলা-জানা সাহেব যুবকটিকে তার প্রিয়তমার পিতৃদেব একেবারেই পছন্দ করেন না। তাই এই লুকোচুরি। এখানে হাস্যরস ঠিক চরিত্রকেন্দ্রিক নয়, বরং বলা যায় বিশেষ পরিস্থিতি-নির্ভর।

অযাত্রা [১৩৪৫] : সাধারণ মানুষ জ্ঞানে ও অজ্ঞানে একাধিক সংস্কারের দাসত্ব করে থাকে। বিশেষতঃ বাড়ী থেকে যাত্রা করার মুহূর্তে পাঁজিপুঁথির নির্দেশ অনুসারে শুভ ও অশুভ লক্ষণের বিচার অনেকেই করেন। 'অযাত্রা' গল্পের রামবাবু এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদেরই সুযোগ্য প্রতিনিধি। সবচেয়ে মজার কথা এই যে নানাবিধ সংস্কার মানতে গিয়েই মোহগ্রস্ত ব্যক্তিদের কাজের প্রভূত ক্ষতি হয়, সময়ের অপচয় ঘটে কিন্তু তবুও তাদের ভুল ভাঙে না। যে অন্ধ বিশ্বাস তাঁদের পক্ষে ক্ষতিকর তাকেই তাঁরা অবুঝের মত প্রাণপণে আঁকড়ে থাকতে চেষ্টা করেন। জীবশ্রেষ্ঠ হয়েও মানুষের এই মূঢ়তা, এই ভ্রান্তিকেই শরদিন্দু রামবাবুর কীর্তিকলাপের মাধ্যমে অম্লমধুর ব্যঙ্গরসে অভিষিক্ত করেছেন।

যস্মিনদেশে [১৩৪৭] **ঃ** 'যস্মিনদেশে'র তপেশচন্দ্র বিশ্বাসের আচরণকেও গল্পচ্ছলে তির্যক ব্যঙ্গে বিদ্ধ করা হয়েছে। তপেশ যখন কলকাতার বাসিন্দা ছিল তখন প্রতিবেশী ও বন্ধুদের ঠাট্টায় অতিষ্ঠ হয়ে বহু চেষ্টাতেও তার বাঙালী-বৌ-এর পাড়া-বেড়ানো স্বভাবের সংশোধন করতে পারেনি। তাই সেই লঘু দোষের জন্য সে তার স্ত্রীকে গুরুদণ্ড দিয়েছে—রাগের বশে তাকে নিঃশব্দে পরিত্যাগ করে সুদূর বম্বেতে পাড়ি জমিয়েছে। তারপর বোম্বাই শহর থেকে কিছুটা দূরবর্তী অঞ্চলে সে শুধু একটি হোটেলই খোলেনি, এক ঘাটি-জাতীয়া রমণীকে বিয়ে করে সংসারও পেতেছে। পরিত্যক্তা প্রথমা পত্নীর কোনও খোঁজও সে রাখেনি, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, যে বহির্মুখী স্বভাবের জন্য তপেশ তার বাঙালী বৌকে পরিত্যাগ করেছিল, প্রায় সেই একই ধরণের আচরণের জন্য প্রবাসজীবনে ভিন্ জাতীয়া স্ত্রীকে কোনও প্রকার শাস্তি তো দেয়ই নি, উপরন্তু লেখকের কাছে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে। কারণ, সেদিন বাংলার সামাজিক পটভূমিতে যে স্ত্রী-স্বাধীনতা নিন্দনীয় ছিল, সুদূর বোম্বাইয়ের জনজীবনে সেই ঘটনাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। সমাজের মুখ চেয়ে, সামাজিক নিন্দা-প্রশংসার কথা ভেবে দুর্বলচিত্ত বাঙালী কেমন করে মনুষ্যত্ব, বিবেক, হৃদয়-ধর্ম সব কিছু বিসর্জন দিতে পারে 'যস্মিনদেশে'তে সেই মূঢ়তার দিকেই অঙ্গুলিসংকেত করা হয়েছে।

স্বর্গের বিচার [১৩৪৫] **ঃ** এ গল্পেও ব্যঙ্গের স্পর্শ আছে। বাস্তবে মানব সমাজে মানুষের আদালতে অহরহ অধর্মের জয় ও ধর্মের পরাজয় ঘটেছে। ক্যাবলার জীবনকাহিনীর মাধ্যমে কিছুটা লঘু ভঙ্গীতে সমাজের সেই অবিচার ও ভণ্ডামি তুলে ধরা হয়েছে।

গ্যাঁড়া [১৩৫১] ক্ষুদ্রায়তন এই গল্পে মনুষ্য-স্বভাবের একটি বিশেষ দিকের পরিচয় কৌতুকের সঙ্গে উদ্ঘাটিত হয়েছে। সাজপোষাক দেখে যাকে সম্ভ্রান্ত বলে সমীহ জাগে, যাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শনের চিন্তায় মন ব্যাকুল হয়, ঘটনাচক্রে যদি জানা যায় সেই ব্যক্তি আসলে বৃত্তির দিক দিয়ে নিম্নস্তরের তখনই সম্ভ্রমের ব্যবধান ঘুচে গিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে যায়। তাই কন্যার বিবাহদিনে ছোট শ্যালকের সঙ্গে আগত, আপাদমস্তক শৌখিন ও মূল্যবান পোষাকে সজ্জিত বলিষ্ঠ চেহারার যুবকটিকে শ্যালকের কোনও ধনীবন্ধু ভেবে গল্পের বক্তা যখন কীভাবে তার যোগ্য আপ্যায়ন করবেন ভেবে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছেন এমন সময় তিনি জানতে পারলেন 'গ্যাঁড়া' নামক ঐ যুবকটি খাজা তৈরীর ব্যাপারে ভাগলপুরের সেরা কারিগর। বক্তা ভদ্রলোকটির সমস্যা দূর হয়েছে। তিনি তাকে 'গ্যাঁড়া' এবং 'তুমি' বলতে আর বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি। এক মুহূর্ত আগেও যার দিকে সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন, পরিচয় জানার পর তার উদ্দেশেই আদেশের সুরে বলে উঠেছেন—

> "বেশ, বেশ, তাহলে আর দেরী নয়, গ্যাঁড়া তুমি কাজে লেগে যাও। বিকেল থেকেই বড় বড় অতিথিরা আসতে আরম্ভ করবেন—চিংড়িদহের কুমার বাহাদুর, স্যার ফজলু—দেখো ভাগলপুরের নিন্দে না হয়।"

'ভক্তিভাজন' [১৩৫৮] **ঃ** গল্পে একজন সুরাসক্ত ব্যক্তির দেখা পাওয়া যায় তাঁর নাম রাগাঞ্জা। এ কাহিনীর ঘটনাস্থল বোম্বাই শহরের উপকণ্ঠস্থ একটি পল্লী। বাড়ীর

সামনের চায়ের দোকান থেকে অবিরাম ভেসে আসা চটুল হিন্দী গানের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তিতে লেখকের জীবন যখন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে অথচ এই অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কোন পথই তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না, তখন আপাতশান্ত মোটরমিস্ত্রী রাগাপ্পাই হঠাৎ রুদ্ররূপ ধারণ করে এই দুঃসহ পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়েছে। মত্ত অবস্থায় গানের উৎসস্থল অর্থাৎ 'শ্রীনিবাস হিন্দু হোটেলে' গিয়ে আসবাবপত্র ভাঙচুর করার অপরাধে তার জেল হয়েছে বটে, কিন্তু চায়ের দোকানের গ্রামোফোনে সেই বিরক্তিকর গান আর বাজেনি। সুরার প্রভাবে মত্ত ব্যক্তিকে কেউই শ্রদ্ধার চোখে দেখেন না, কিন্তু এই শ্রেণীর মানুষরাই প্রয়োজন হলে শান্তিপ্রিয়, নিরীহ ভদ্রলোকদের অপরের অন্যায় জুলুমের হাত থেকে রক্ষা করতে কতখানি সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে 'ভক্তিভাজন' গল্পে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।

ভালবাসা লিমিটেড [১৩৪৩] : শরদিন্দুর লেখা এই গল্পে প্রসন্ন কৌতুক নয়, প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গই প্রাধান্য লাভ করেছে। সংসারে একদল লোক আছে যারা আপাতদৃষ্টিতে নির্লিপ্ত, উদাসীন, মিতভাষী ও সংযত চরিত্রের মানুষ কিন্তু যথাসময়ে তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হলে দেখা যায় নির্লিপ্ততা তাদের ছদ্মবেশ মাত্র। তারা শুধু চতুর নয়, অত্যন্ত ধূর্তও বটে। তাই তাদের কার্যকলাপ অপ্রত্যাশিত চমক সৃষ্টি করে। 'ভালবাসা লিমিটেড'-এর চার অংশীদার তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টরদের মধ্যে আপাতবিচারে সাধুপদই সর্বাপেক্ষা নিরেস। সাজসজ্জায় সে তেমন আধুনিক নয়, উপরন্তু তার মাথায় একটি ক্ষুদ্র টিকি পর্যন্ত আছে। এই কোম্পানী সিনেমার ব্যবসা আরম্ভ করার পর ছবির ভাবী নায়িকা 'নবায়মানা তরুণী' ছলনাদেবীকে দেখে ভালবাসা লিমিটেডের অন্য তিন অংশীদারের যখন একেবারে আত্মহারা তখন কোম্পানীর খাজাঞ্চি সাধুপদ সম্পূর্ণ নির্বিকার। কালক্রমে দেখা গেছে সুরূপা, নৃত্যগীত পারদর্শিনী নায়িকার জন্য নায়ক ললিত এবং খল-নায়ক বাসুদেবের মত সে নায়িকাটির সঙ্গলাভের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়নি বটে কিন্তু ছলনাদেবী সাধুপদর সঙ্গেই অন্তর্ধান করেছেন। কারণ সাধুপদর চটকদার রূপ বা আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদ কিছুই ছিল না বটে কিন্তু যা ছিল ছলনাদেবীদের তাই তো প্রয়োজন। খাজাঞ্চি সাধুপদর হাতে ছিল কোম্পানীর অঢেল টাকা। সরস গল্প হিসেবে 'ভালবাসা লিমিটেড' এককথায় অনবদ্য।

বরলাভ [১৩৪৩] : ঘটনা ও পরিস্থিতিগত সাদৃশ্য না থাকলেও 'বরলাভ' গল্পটি পাঠকালে রবীন্দ্রনাথের 'ইচ্ছাপূরণ' গল্পের কথা মনে পড়ে যায়। গল্পটি কিছুটা fantasy জাতীয়। সারদাচরণ বাবুর মতো আমরাও যদি দেবীর বরে একদিনের জন্যও মানুষের মুখ দেখেই তার মনের প্রকৃত ভাব বুঝে নিতে পারতাম তাহলে এ পৃথিবী সত্যি সত্যিই একটা পাগলা গারদে পরিণত হত। মানুষের 'মুখে মধু হৃদে বিষ'-এর পরিচয় এ গল্পে সাফল্যের সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে।

তন্দ্রাহরণ [১৩৪৪] : হাসির গল্প 'তন্দ্রাহরণ'-কে নির্দ্বিধায় শরদিন্দুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে গণ্য করা যায়।

আলোচ্য কাহিনীর নায়িকা পৌণ্ড্র বর্ধনের রাজকুমারী তন্দ্রা। তিনি অষ্টাদশী এবং সুন্দরী। তাঁর 'ফুটন্ত রূপ, বিকশিত যৌবন' তবু তাঁর মনে সুখ নেই। কারণ তাঁর সঙ্গে যাঁর বিবাহ স্থির হয়েছে সেই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের যুবরাজ চন্দ্রানন মাণিক্য রূপে, গুণে অতুলনীয় শুধু তাঁর একটিমাত্র ত্রুটি তাঁর ভাষা দুর্বোধ্য—তিনি বাঙাল।

"ইসে এবং কচু এই দুইটি শব্দের বহুল প্রয়োগ সহযোগে তিনি যাহা বলেন তাহা কাহারও বোধগম্য হয় না।"

উপায়হীনা তন্দ্রা তাই কাউকে কিছু না জানিয়ে সখী নন্দার প্রণয়ীর সঙ্গে পালিয়ে যেতে চেয়েছেন 'অন্য কোথা অন্য কোনখানে'। তারপর গোপনে সেই তরুণ কন্দর্পের কাছে উপস্থিত হয়ে তিনি বুঝেছেন সেই রূপবান পুরুষ আসলে তাঁরই ভাবী বর চন্দ্রানন মাণিক্য, যার সঙ্গে বিবাহের ভয়ে তন্দ্রা অন্য পুরুষের সঙ্গে পলায়ন করতেও রাজী ছিলেন। সুচতুর যুবরাজ তাঁর সঙ্গে বিবাহে অনিচ্ছুক রাজকুমারীকে হরণ করে স্বদেশে নিয়ে যাওয়ার জন্যই মধুর ষড়যন্ত্রের জাল পেতেছিলেন। এদিকে চন্দ্রাননকে প্রত্যক্ষ করে ও মুখের ভাষা স্বকর্ণে শুনে তাঁর প্রতি তন্দ্রার বিরূপতা দূর হয়ে গেছে। যে ভাষাকে কেন্দ্র করে এত জটিলতা, এত সমস্যা সেই 'বাঙাল ভাষা' সম্পর্কেই তন্দ্রাকে বলতে শুনি—

"যুবরাজ, কী সুন্দর তোমার ভাষা, যেন মধু ঝরে পড়ছে। কত দিনে আমি এ ভাষা শিখতে পারব ?"

প্রত্যুত্তরে চন্দ্রানন তাঁকে ভাষা-শিক্ষা সম্বন্ধে আশ্বস্ত করে জানতে চেয়েছেন—

'তোমাগোর ও কচুর ভাষা একমাসে ভুইলা যাইতে পারবানা ?'

এই বিশেষ বাচনভঙ্গী আয়ত্ত করতে রাজকুমারীর যে খুব বেশী সময় লাগবে না তার প্রমাণ পাওয়া যায় সেই মুহূর্তেই যখন সুখাবিষ্ট কণ্ঠে তন্দ্রা উত্তর দেন 'পারমু'।

পূর্বঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশের) ও পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতিগত ব্যবধানকে কেন্দ্র করে 'বাঙাল' ও 'ঘটি'র লঘু কলহ আমাদের সমাজে সুপরিচিত। 'তন্দ্রাহরণ'-এর কেন্দ্রীয় সমস্যা অনেকটা সেই রকমই, কিন্তু অন্তরে প্রেমের সঞ্চার হলে কোন বাধাই যে বাধা নয়, সেই চিরন্তন সত্যই এই গল্পে রমণীয় ভঙ্গিতে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

'তন্দ্রাহরণ'-এর চরিত্রগুলি কাল্পনিক হলেও এর আধা-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি অত্যন্ত সজীব। প্রকৃতপক্ষে দূর অতীতের পটভূমিতে স্থাপিত হওয়ার ফলেই কাহিনীটির কেন্দ্রীয় সমস্যা এতখানি চিত্তাকর্ষক হয়েছে। পূর্বঙ্গীয় ভাষার অবিকৃত অথচ কৌতুকপূর্ণ প্রয়োগে 'তন্দ্রাহরণ' একটি রসোত্তীর্ণ গল্প।

'ভূতোর চন্দ্রবিন্দু' [১৩৫২] : 'ভূতোর চন্দ্রবিন্দু' একটি উপভোগ্য গল্প। আমাদের পরিচিত সমাজে সংসারে এমন এক ধরনের লোক আছে যারা একগুঁয়ে ও নির্বোধ। এদের বশীভূত করতে হলে এদের থেকেও বদমেজাজী, একরোখা কোনও ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন। সেই অতিবাস্তব সত্যই 'ভূতোর চন্দ্রবিন্দু' গল্পে ভূতো ও তার স্ত্রী ক্ষান্ত ওরফে পুষ্পরানীর আচরণের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে।

নূতন মানুষ [১৩৫৪] গল্পে একটি ছোট্ট শিশুর মুখ-নিঃসৃত নানা শব্দকে কেন্দ্র করে কৌতুকের সৃষ্টি করা হয়েছে। নেপালচন্দ্র তার নবজাত পুত্রের মুখে দিনের পর দিন বিচিত্র কলধ্বনির মধ্যে নানাদেশের ও নানা জাতির ভাষা শুনেছে। 'পেস্তা', 'ইডালি', 'নিপ্পি' প্রভৃতি নানান শব্দ শুনে নেপালচন্দ্র শিশুটি তার-ই আত্মজ কিনা সে বিষয়ে ক্রমশঃই সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছে। শেষে একদিন ছেলের মুখে 'ল্যাংচা' শব্দটি স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হতে শুনে নেপালচন্দ্র আশ্বস্ত হয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে—কারণ 'ল্যাংচা' বাংলা শব্দ। পরিসরের দিক দিয়ে অত্যন্ত ক্ষুদ্র এই গল্পটিতে কৌতুকরস পরিবেশনের অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায়। নবীন শিশুর উদ্দেশ্যহীন অস্ফুট কলধ্বনির অর্থ আবিষ্কারের চেষ্টা যে কতখানি মূঢ়তা এই গল্পে সেই ভ্রান্তির প্রতিই লেখকের কৌতুক কটাক্ষ বর্ষিত হয়েছে।

'কা তব কান্তা' [১৩৬৮]ঃ অধিকাংশ চাকুরীজীবীর ক্ষেত্রেই কর্মসূত্রে বদলির ব্যাপারটি রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। 'কা তব কান্তা' তে এই পরিচিত বিষয়বস্তুই অভিনব পরিণতি লাভ করেছে। চির আনন্দের দেশ দক্ষিণ আমেরিকার প্রেক্ষাপটে এ কাহিনী রচিত। করঞ্জ ও কিঙ্কিনী, উন্মেষ ও উন্মনা এই চারজন যুবক-যুবতী 'কা তব কান্তা'র পাত্র পাত্রী। সখ্যরসে ও প্রণয়মাধুর্যে ভরপুর তাদের জীবন। চারিটি মানুষের এই সুখের জীবনে করঞ্জের বদলির আদেশকে কেন্দ্র করে সহসা ছন্দপতনের উপক্রম ঘটল। কারণ করঞ্জপত্নী কিঙ্কিনী তার সাধের বাগান ছেড়ে তীব্র শীতের রাজ্য লেনিনগ্রাডে যেতে কিছুতেই রাজী নয়। অথচ স্ত্রীকে এক রাজ্যের দূতাবাসে ফেলে রেখে অন্য রাজ্যের দূতাবাসে গমন করা নাকি সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ ব্যাপার। শেষপর্যন্ত অভিন্নহৃদয় যুবক দুটি বউবদলের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পেয়েছে। কিঙ্কিনী উন্মেষের স্ত্রীরূপে আমেরিকাতেই থেকে গেছে। আর করঞ্জের সঙ্গিনীরূপে উন্মনা আকাশপথে লেনিনগ্রাডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে।

কখনও বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে, কখনও উপস্থাপনার কৌশলে শরদিন্দুর লেখা ভালবাসা [১৩৫১], সন্ন্যাস [১৩৫৯], বনমানুষ [১৩৬০], আদায় কাঁচকলায় [১৩৬০], শ্রেষ্ঠ বিসর্জন [?] প্রভৃতি গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য। কোনও কোনও ক্ষেত্রে যেমন, 'ঝি' [১৩৫১], 'আরব সাগরের রসিকতা' [১৩৫৭] প্রভৃতি গল্পে পরিবেশিত হাস্যরস বস্তুনিষ্ঠ হলেও কিছুটা স্থূল ও নিম্নমানের। শেষোক্ত গল্পদুটির সাহিত্যমূল্য তাই অকিঞ্চিৎকর।

আলোচ্য প্রসঙ্গের উপসংহারে একথাই বলা যায় যে শরদিন্দুর লেখা প্রত্যেকটি কৌতুককাহিনীই শিল্পমূল্যে হয়তো প্রথম শ্রেণীর নয়, কিন্তু বিষয়বস্তুর সারল্যে জনমনোরঞ্জনের দুর্বার শক্তিতে সাধারণ পাঠকের পক্ষে এগুলি দারুণ আকর্ষণীয়।

পঞ্চম অধ্যায়

সামাজিক গল্প

শরদিন্দু-সৃষ্টি-সম্ভার শুধু প্রাচুর্যে নয়, বৈচিত্র্যেও সুসমৃদ্ধ। কারণ ব্যোমকেশের কীর্তি কথা, ঐতিহাসিক রোমান্সসমূহ, অলৌকিক অতিপ্রাকৃত গল্পাবলী এবং কৌতুক-কাহিনী সৃজনেই তাঁর প্রতিভা নিঃশেষিত হয়ে যায় নি, তিনি রচনা করেছেন আরও বহু ছোটগল্প এবং একাধিক উপন্যাস যেগুলি বাস্তব সমাজের প্রেক্ষাপটে, বাস্তব নরনারীর সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা-আকাঙ্ক্ষার বাঙ্ময় প্রতিলিপি। বর্তমান অধ্যায়ে স্বল্প পরিসরে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা উক্ত শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য কাহিনী সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে সর্বপ্রথমে উল্লেখ করা যায় প্রণয়মূলক গল্পগুলির কথা। শরদিন্দুর লেখা একাধিক গল্পে চিরপুরাতন প্রেম নব নব রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। সেই প্রেম কখনও স্নিগ্ধ-মধুর, কখনও বা তার গতি বক্র-কুটিল।

শীল-সোমেশ (১৩৩৮), ইতর-ভদ্র (১৩৩৮), হাসিকান্না (১৩৪৪), সেকালিনী (১৩৫২), কানু কহে রাই (১৩৬১) প্রভৃতি গল্পে প্রেমের মাধুর্যময়, সমর্পণ-উন্মুখ রূপ মর্মস্পর্শী।

প্রণয়-কলহ [১৩৪৪] বিবাহ-উত্তর জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মান-অভিমানের ছন্দময় প্রকাশ লেখকের সরস মনের পরিচয় বহন করে, আঙ্গিকগত পার্থক্য থাকলেও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে প্রণয়-কলহের প্রায় অনুরূপ গল্প 'মনে মনে' (১৩৪০)।

'এমন দিনে' [১৩৬৫] গল্পেও এক দম্পতির কথা তুলে ধরা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মানসী' কাব্যের 'বর্ষার দিনে' কবিতায় লিখেছেন—

"এমন দিনে তারে বলা যায়
এমনি ঘন ঘোর বরিষায়।"—

উদ্ধৃত পংক্তি দুটিতে কবিগুরু বর্ষণমুখর দিনকে যে না-বলা বাণীর উপযুক্ত প্রকাশ কাল রূপে নির্দেশ করেছেন তা নিঃসন্দেহেই তাঁর রোমাণ্টিক কবিমনের রসোচ্ছল প্রকাশ কিন্তু শরদিন্দুর 'সমীর' ও 'ইরা' 'এমন দিনে, তাদের যে অকথিত-বাণী পরস্পর পরস্পরের কাছে নিবেদন করেছে তা তাদের প্রাক্-বিবাহ জীবনের দুটি গোপন অভিজ্ঞতার কথা। অতি তুচ্ছ সে দুর্বলতা তবু সেই সূত্রে দুজনেরই মনে যেন কিছু গ্লানি জমে ছিল—আজ পারস্পরিক স্বীকারোক্তির মাধ্যমে তারা স্বস্তি অনুভব করেছে—লেখকের ভাষায়—

'আজ তাহারা যেমন পরিপূর্ণভাবে পরস্পরকে পাইয়াছে এমন আর পূর্বে কখনও পায় নাই, তাহাদের মাঝখানে যেটুকু ফাঁক ছিল তাহা নিবিড়ভাবে ভরাট হইয়া গিয়াছে।'

মেঘদূত [১৩৫৩] : 'মেঘদূত'-এর ব্রতীন—তপতীও বিবাহিত দম্পতি। একই গৃহে তাদের বসবাস। কিন্তু অন্তরে তারা মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের যক্ষ ও যক্ষপ্রিয়ার মতই বিরহ-সন্তপ্ত। তাদের পূর্ণ মিলনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে

গুরুর কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি যার ফলস্বরূপ বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েও ভারতবর্ষ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত উভয়কেই ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে। এই প্রতিশ্রুতিকে ঘিরেই এক বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যায় দুজনের চিত্তেই চাঞ্চল্যের সূত্রপাত ঘটে। একদিকে ব্রহ্মচর্য পালনের কঠিন শপথ, অন্যদিকে মনে মনে পরস্পরের নিবিড় সঙ্গ কামনা—নায়ক-নায়িকার চিত্তে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বিচিত্র দ্বন্দ্ব আলোচ্য গল্পটিকে বিশেষ তাৎপর্য দান করেছে।

গোপন কথা [১৩৫০] ও প্রেম [১৩৭২] গল্পদুটি প্রায় সমগোত্রের। উভয়-ক্ষেত্রেই নায়ক নায়িকার পারস্পরিক সম্পর্ক অল্প কালের আলাপেই অনুভূতির গভীর স্তরে পৌঁছে গেছে। কিন্তু সেই মধুর সম্পর্ককে বিবাহের গতানুগতিক বন্ধনে আবদ্ধ না করে মনোলোকে তাকে দিয়েছে অমরত্বের মহিমা। দুটি গল্পই ছোটগল্প হিসেবে রসোত্তীর্ণ।

রোমান্স [১৩৪৭] ঃ শরদিন্দুর লেখা রোমান্টিক আবেশ মাখানো আর একটি গল্পের নাম 'রোমান্স'। এ কাহিনীর অবিবাহিত, সঙ্গীহীন নায়ক ছোটনাগপুরের অখ্যাত নামা এক স্টেশনে গোধূলিবেলার অপরূপ আলোয় ট্রেনের জানালায় হঠাৎ দেখা একটি তরুণীর মুখকে কেন্দ্র করে দিনের পর দিন কত স্বপ্নের জালই না বুনেছে, সেই এক পলকের দেখা মুখটি আর একবার দেখতে পাবার প্রত্যাশায় সে প্রতিদিন ছুটে গেছে স্টেশনে। অবশেষে বারো দিন পর নায়ক তার 'মনের বনচারিণী'র সাক্ষাৎ পেয়েছে—

'লাল চেলিতে তাহার সর্বাঙ্গ ঢাকা. সিঁথিতে অনভ্যস্ত সিন্দুর লেপিয়া গিয়াছে। চোখের চাহনি তেমনিই স্বপ্নাতুর।'

—বাস্তবের নিষ্ঠুর ঝঞ্ঝাঘাতে কল্পলোকের আকাশকুসুমটির ধরণীর ধূলায় ঝরে পড়ার এই ব্যথামেদুর কাহিনীটি নিঃসন্দেহেই মর্মস্পর্শী।

অভিজ্ঞান [১৩৪২] ঃ অভিজ্ঞান গল্পের নায়কের প্রেমের স্মারক চিহ্নটি কালিদাসের সুপ্রসিদ্ধ নাটকের অনুরূপ একটি স্মারক অঙ্গুরীয় নয়, হীরের তৈরী একজোড়া কর্ণভূষণ—কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞানের গুরুত্ব ও ভূমিকাগত সাদৃশ্য অবশ্যই লক্ষণীয়। কালিদাসের প্রসিদ্ধ নাট্যকাহিনী অনুসারে ধীবরের কাছ থেকে স্বনামাঙ্কিত আংটিটি ফিরে পেয়ে মহারাজ দুষ্মন্তের মনে পড়েছিল তার প্রত্যাখ্যাতা প্রিয়তমা শকুন্তলার কথা, আর শরদিন্দুর গল্পের নায়ক দুর্বাসার অভিশাপে নয়, এক ট্রেন দুর্ঘটনার প্রভাবে সাময়িকভাবে বিস্মৃতি রোগাক্রান্ত হয়ে ভুলে গিয়েছিল তার স্ত্রী অরুণাকে। দুষ্মন্তের মত সেও নিজ স্ত্রীকে পরস্ত্রী ভেবে যখন প্রস্থানোদ্যত, তখন হীরের দুল জোড়া দেখে স্মৃতিভ্রষ্ট নায়ক তার পূর্বস্মৃতি ফিরে পেয়েছে। বিস্মৃতির দিনগুলিতে তার জীবনের সঙ্গিনী 'সুনন্দা'কে কেন্দ্র করে ত্রিভুজ প্রেমের দ্বন্দ্ব সৃষ্টির অবকাশ অবশ্য ছিল কিন্তু গল্পকার সেই জটিলতার পথে পাঠককে নিয়ে যাননি। স্বামী স্ত্রীর পুনর্মিলনেই কাহিনীর সরল পরিসমাপ্তি।

বিদ্রোহী [১৩৪২] ও 'স্বখাত সলিলে' [১৩৪২] নামক গল্পযুগ্মের নায়ক দেবব্রত। সমস্ত সংস্কারেরে বিরুদ্ধে বিদ্রোহী এই যুবকটি কেবল একটিমাত্র মানবিক অনুভূতিতেই বিশ্বাসী, তার নাম প্রেম। তার মতে "......বিবাহ কৃত্রিম বন্ধন। যেখানে প্রেম আছে সেখানে বিবাহ নিষ্প্রয়োজন, যেখানে তা নেই, সেখানে বিবাহ একটা বীভৎস

পাশবিকতা।" তার এই অতি উদার ও প্রগতিশীল মতাদর্শের তাৎপর্য তার সমসাময়িক, মধ্যবিত্ত সমাজের গতানুগতিক মূল্যবোধে আস্থাবান, সাধারণ যুবকদের পক্ষে বোঝা শক্ত, তাই দেবব্রত তাদের সমালোচনা ও বিদ্রূপের পাত্র। কিন্তু দেবব্রতর উদারতা যে ভণ্ডামি নয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় নিতান্ত অপরিচিতা, অপরের রক্ষিতা এক নির্যাতিতা নারীকে নির্দ্বিধায় নিজের বাড়ীতে স্থান দেওয়ার এবং পরিণামে তাকেই ভালবেসে বিবাহ করার ঘটনায়। তার এই মহত্ত্বের মূল্য দেওয়ার মতো মানসিকতা আমাদের সংকীর্ণ সমাজ-ব্যবস্থায় একান্তই দুর্লভ তাই 'খাত সলিলে' গল্পে দেখা যায় দেবব্রত বাংলাদেশের পরিচিত পরিবেশ ত্যাগ করে সুদূর মধ্যপ্রদেশে গিয়ে বসবাস সুরু করেছে। কিন্তু কালক্রমে তার মতো দৃঢ়চিত্ত মানুষও সন্তানদের কথা ভেবে সামাজিক পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে পারেনি। সে অনুভব করেছে বাস্তবের এক কঠিন সত্য—"কিন্তু একথাও ঠিক যে মানুষ একলা থাকতে পারেনা ; তাই সমাজ যত অবিচারই করুক, তাকে নিয়ে কারবার করতে হয়।" গল্পদুটিতে লেখকের জীবন-দৃষ্টির গভীরতা পরিস্ফুট হয়েছে। ব্যক্তির জীবনে সমাজের অনতিক্রম্য প্রভাবকে তিনি সাফল্যর সঙ্গেই তুলে ধরেছেন।

'বিদ্রোহী'র অনিমা প্রথম জীবনে কুলত্যাগিনী ও অপরের রক্ষিতা হয়েও দেবব্রতের ঔদার্যে সুস্থ জীবনবৃত্তে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, কিন্তু 'পতিতার পত্র' (১৩৬৬) গল্পের সুলোচনা গৃহস্থ-কন্যা হওয়া সত্ত্বেও কাশীর কোনও এক কুখ্যাত স্থানে পতিতা বৃত্তি অবলম্বন করে জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছে। যে তাকে বিবাহের প্রলোভন দেখিয়ে এ পথে ঠেলে দিয়েছে তার উদ্দেশ্য কিন্তু আত্মসুখ চরিতার্থ করা নয়, সুলোচনার মোহে অন্ধ বন্ধুকে দেশোদ্ধারের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হতে না দেওয়ার জন্যই সে সুলোচনার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে বন্ধুর জীবন পথ থেকে এই বাধাস্বরূপিনীকে বহুদূরে সরিয়ে দিয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে কত শহীদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে কিন্তু সুলোচনার মত মেয়েদের চোখের জলের হিসাব কেই বা রাখে! শরদিন্দু সুলোচনার পত্রের মাধ্যমে আমাদের সেই নির্মম সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার সুযোগ দিয়েছেন। গল্পের আঙ্গিকটি অবশ্য অভিনবত্বের দাবী করতে পারে না। পত্রের মধ্যে দিয়ে গল্প বলার কৌশলটি নতুন নয়। 'পতিতার পত্র' নামটি শুনলে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র'-র কথা মনে পড়ে যায়, যদিও উভয়ের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

অষ্টমে মঙ্গল [১৩৬১] গল্পে এক নিম্নশ্রেণীর যুবকের সুগভীর পত্নী-প্রেম প্রকাশ পেয়েছে। সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী মঙলুর প্রথমা এবং দ্বিতীয়া—দুই স্ত্রীই চিররুগ্না। কিন্তু সে কারণে মঙলুকে বিন্দুমাত্র বিরক্ত বিব্রত বা রূঢ় হতে দেখা যায় না, বরং তাদের সুস্থ করে তোলার জন্য তার আপ্রাণ প্রয়াস রীতিমত বিস্ময়কর। মঙলুর স্ত্রী-ভাগ্য সুপ্রসন্ন নয় বটে কিন্তু তার স্ত্রীদের স্বামী ভাগ্য নিঃসন্দেহেই ঈর্ষাযোগ্য।

অমাবস্যা [১৩৭৬] গল্পে দীপনারায়ণ, রাজমোহন, রণবীর, পুষ্পা ও পূর্ণিমা এই পাঁচটি চরিত্র। অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত এই নরনারীদের কেন্দ্র করেই লেখক প্রেমের কান্ত কোমল, ঈর্ষাকুটিল উভয় বৈশিষ্ট্যই ফুটিয়ে তুলেছেন। শেষ পর্যন্ত মধুর রসেই

কাহিনীর সমাপ্তি ঘটেছে। বক্তব্যের গভীরতার অভাবে গল্পটির সাহিত্য-মূল্য নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর।

একথা অনস্বীকার্য যে অলংকার শাস্ত্রোক্ত নবরসের মধ্যে শৃঙ্গার রস পরিবেশনেই শরদিন্দুর সমধিক আগ্রহ—প্রেমের গল্প লিখতেই তিনি সব থেকে বেশী ভালোবাসেন কিন্তু নরনারীর যৌথ জীবনে প্রেমহীনতার ছবি আঁকতেও তিনি যে কত পারদর্শী তার পরিচয় পাওয়া যায় 'আংটি', পিছুডাক', যুধিষ্ঠিরের স্বর্গ', 'স্ত্রী-ভাগ্য' 'কালস্রোত' প্রভৃতি গল্পে। এই সকল গল্পের নারী চরিত্রগুলি একই জাতের—এরা কেউই প্রেম বা দাম্পত্য সম্পর্কের প্রতি একনিষ্ঠ নয়—কিন্তু এদের জীবন পরিণামের ক্ষেত্রে বিচিত্র পার্থক্য রয়েছে।

'আংটি' [১৩৪০] গল্পের ক্ষেত্রমোহন মিষ্টভাষী জুয়াচোর, তার বৃত্তি অতি হীন কিন্তু সে তার স্ত্রী চপলাকে সত্যিই ভালবাসে এবং গভীর ভাবে বিশ্বাস করে। তাই চপলার আঙুলে নরেন চৌধুরীর হীরের আঙটি দেখে ক্ষেত্রমোহন চাপাগলায় আর্তনাদ করে ওঠে "এ আঙটি তুমি কোথায় পেলে! তুমি কোথায় পেলে!" বিস্ময় ও সংশয়ের যুগ্ম অভিব্যক্তিতে তীক্ষ্ণ এই প্রশ্নের মাধ্যমে কাহিনীর পরিসমাপ্তি 'আঙটি'কে ছোটগল্প হিসেবে রসোত্তীর্ণ করে তুলেছে।

পিছুডাক [১৩৪৯] : এ গল্পের ঘটনাস্থল "বাংলাদেশের কোনও একটি বড় রেলওয়ে জংশনে প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণীর মেয়েদের ওয়েটিং-রুম।" এখানেই লক্ষ্ণৌয়ের সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা কেশব বাঈজীর সঙ্গে শান্ত, নম্র গৃহবধূ রমা ও তার দুরন্ত শিশুপুত্রটির দেখা হয়। রমার সঙ্গে আলাপচারিতার সূত্রে কেশববাঈ তার অসামান্য যশ, জীবিকার্জনের অবাধ স্বাধীনতা ও অতুল ঐশ্বর্য নিয়ে মুখে যত গর্বই করুক না কেন তার একদা স্বেচ্ছায় ছেড়ে আসা গৃহ জীবনের প্রতি পিছুটান, কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা ও সন্তান বুভুক্ষু হৃদয়ের গভীর বেদনা কিছুতেই গোপন থাকেনি। গল্পের শেষ মুহূর্তে যখন কেশব বাঈ আকস্মিক ভাবেই তার স্বামীর দেখা পায় এবং বুঝতে পারে রমা আসলে তার স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী তখন তার তীব্র মানসিক প্রতিক্রিয়ার বর্ণনায় লেখক পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।

কালস্রোত [১৩৭৫] : বাস্তবরস সমৃদ্ধ এই গল্পে সুষমা ও তার অভিভাবকেরা গ্রন্থ-প্রেমিক, নির্লিপ্ত চরিত্র মথুরানাথকে ফাঁদে ফেলে তাদের হীন উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করে বটে, কিন্তু যে স্রোতে ভেসে যায় 'জীবন যৌবন ধন মান' সেই কালস্রোতই একদিন সুষমাকে তার পরিত্যক্ত পুত্র সত্যবানের কাছে পৌঁছে দেয়, সেই সূত্রেই সে পায় তার অপরাধের যথোপযুক্ত মূল্য—সন্তানের নিদারুণ ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা।

'যুধিষ্ঠিরের স্বর্গ'—গল্পের রম্ভা চলচ্চিত্র জগতের রুপোলী হাতছানিতে মুগ্ধ হয়ে স্বামী যুধিষ্ঠিরকে পরিত্যাগ করেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে তার ভুল বুঝতে পেরেছিল বলেই যুধিষ্ঠিরের প্রেমের স্বর্গে তার প্রত্যাবর্তন ঘটেছিল।

স্ত্রী-ভাগ্য [১৩৬৭] গল্পের উষা পাঠক ছলনাময়ী, বহুবল্লভা। তবু ধীরাজ এই দুশ্চরিত্রা নারীটির সঙ্গেই সংসার যাত্রা নির্বাহের জন্য পরম আগ্রহী। এ কি পত্নী-

প্রেমের এক বিরল দৃষ্টান্ত ? না তা নয়, ধীরাজের ঊষা-প্রীতি প্রেমবশতঃ নয়, সংস্কার প্রণোদিত। ঊষা পাঠকের চরিত্র যা-ই হোক্ না কেন, ধীরাজের বিশ্বাস ঐ নারীটি অতি পয়মন্ত, স্ত্রী ভাগ্যেই তার উন্নতি। তাই সে অবিশ্বাসিনী পত্নীকেই তার চাই।

'সাক্ষী' [১৩৬৫] গল্পের কালীময় ঘোষের আচরণ কিন্তু অন্যরকম। নিজের স্ত্রী দামিনী অন্যপুরুষে আসক্তা জেনে কালীময় প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তার পত্নীর প্রেমিক মোহিতমোহনের স্ত্রী অন্নপূর্ণার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে তার বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছিল কিন্তু মুখরা অন্নপূর্ণা ছিল প্রকৃত সৎচরিত্রা, তাই তার সরব প্রতিবাদে নিজের কু-অভিপ্রায় ধরা পড়ে যায় দেখে কালীময় অন্নপূর্ণাকে খুন করে। একদিকে মোহিত ও দামিনীর দুর্দম বাসনা, অন্য দিকে কালীময়ের হিতাহিত জ্ঞানশূন্য প্রতিশোধ স্পৃহায় বিনষ্ট হয় নিরপরাধা অন্নপূর্ণার জীবন। ব্যোমকেশ স্রষ্টা শরদিন্দুর হাতের ছাপ এখানে স্পষ্ট।

শরদিন্দু বিরচিত কয়েকটি গল্পে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের বিচিত্র টানা পোড়েন কিঞ্চিত মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার সৃষ্টি করেছে—এই ধরণের গল্পগুলির মধ্যে 'ছুরি', 'জোড়-বিজোড়, 'বড় ঘরের কথা', 'সুতমিত রমণী' প্রভৃতি সাবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্ত্রীর নিস্পৃহ, নিরুত্তাপ আচরণ হেতু স্বামীর বাসনার অতৃপ্তিজনিত ক্ষোভ—এই একান্ত জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার সুন্দর প্রতিফলন ঘটেছে 'ছুরি' (১৩৫২) ও 'জোড়-বিজোড়' (১৩৫৮) গল্পে। প্রথম গল্পে নায়ক নগেনের অবচেতন মনে যখন তার ক্ষণযৌবনা স্ত্রী ক্ষণিকার প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা পুঞ্জীভূত হয়ে চলেছে, তখন একটি অত্যাশ্চর্য 'ছুরি' ক্ষণার রক্তের মূল্যে নগেনের মুক্তির পথ প্রশস্ত করেছে। আপাত বিচারে সেই ছুরিটিকে যতই অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন মনে হোক না কেন আসলে জৈব কামনার অতৃপ্তিই যে নগেনের সমস্ত চিত্ত বিক্ষোভ ও অপরাধ-সম্পাদনের মূল কারণ তার প্রমাণ লেখকের এই উক্তি—

"নগেন আবার বিবাহ করিয়াছে। নূতন বধূটি সুন্দরী নয়, কিন্তু উজ্জ্বল যৌবনবতী।"

'জোড় বিজোড়' গল্পে নির্মলের সমস্যাও নগনের সমস্যার অনুরূপ। বিবাহের ছ-বছর পর যখন নির্মল ও নির্মলার উচ্ছ্বসিত প্রেমের নদীতে নির্মলার পক্ষ থেকেই যেন ভাঁটার টান সুরু হয়েছে তখন নির্মল সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবেই দ্বিতীয় বধূকে ঘরে এনেছে—এই ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে নায়কের এই দ্বিতীয় বিবাহ কি দ্বিতীয়ার প্রতি প্রেম ? না প্রথমার প্রতি নিষ্ঠুর প্রতিশোধ স্পৃহার বহিঃপ্রকাশ ?

'বড় ঘরের কথা'য় (১৩৬০) যে কথাটি পাঠককে জানানো হয়েছে বাংলা সাহিত্যের পক্ষে তা এমন কিছু অভিনব নয়। সে তুলনায় 'সুত-মিত-রমণী' গল্পটি বহুলাংশে উৎকৃষ্ট। এ গল্পের গুরুচরণের প্রতিবেশী ডাক্তার ভদ্রলোকটির সঙ্গে গুরুচরণ-পত্নী সুরমার যে অবৈধ সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল তার আয়ু কয়েক মুহূর্ত মাত্র—এবং এর পশ্চাতে কোনও পূর্বকল্পনাও ছিল না, যা ঘটেছিল তা নিতান্তই আকস্মিক। এই ঘটনার পরিণাম স্বরূপ সুরমার পুত্র পঙ্কজের জন্ম। পঙ্কজের প্রতি গুরুচরণের বাৎসল্য সাধারণের দৃষ্টিতে কিছুটা অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়। কিন্তু

গল্পের শেষে বোঝা যায় সুত পঙ্কজ, মিত্র ডাক্তার এবং রমণী সুরমা—এরা কেউই যে তার আপন নয় একথা গুরুচরণ জানে। তবু অপরের রাজ্যপাটে রাজা হয়ে বসার জন্য তার কী ঐকান্তিক প্রচেষ্টা! কিন্তু গুরুচরণকে লেখক একেবারে দ্বন্দ্বহীন করে আঁকেননি। পঙ্কজের যখন পাঁচ-বছর বয়স, তখন তার জন্মের প্রকৃত রহস্য জানার পর কিছুদিনের জন্য গুরুচরণের আচার আচরণে প্রশান্তি ও ধৈর্যের অভাব চরিত্রটিকে বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে।

'পলাতক' [১৩৭৩] গল্পের কমলেশ আর কিষ্টোলাল (১৩৭২) গল্পের কিষ্টোলালের সমস্যা ভিন্ন ধরণের। স্ত্রীর অসহনীয় আচরণ ও প্রভুত্বব্যঞ্জক মনোভাব নিরীহ কমলেশকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। তার ফলে সে একদিন সেই দাম্পত্য রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য শহর কলকাতা ছেড়ে পাড়ি জমালো অনেক দূরে। সেই কলুষ-মুক্ত অকৃত্রিম পরিবেশ ও ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের সরল অকপট ব্যবহার কমলেশের বিক্ষুব্ধ চিত্তে এনে দিল প্রশান্তির প্রলেপ। আদিবাসী কন্যা লখিয়াকে বিবাহ করে জীবনে এই প্রথম প্রকৃত সুখের স্বাদ অনুভব করল।

কমলেশের আচরণে তবু যুক্তির পারম্পর্য খুজে পাওয়া যায়। কিন্তু গোল বাঁধে 'কিষ্টোলাল'কে নিয়ে। অভিজাত পরিবারের সন্তান হয়েও তার আভিজাত্যের মোহ নেই। তার স্ত্রী আলপনা অনিন্দ্যসুন্দরী, অথচ কিষ্টোলালের মন গৃহ-বিমুখ। তার 'দিল কি পিয়ারী' জানকী সুশ্রী বটে, কিন্তু রূপের বিচারে সে আলপনার নখের যোগ্য নয়। মানব চরিত্র যে কী জটিল! তার অন্তর্নিহিত রহস্য যে কত দুর্জ্ঞেয় কিষ্টোলালের জানকী-প্রীতি ও আলপনা-বিরাগ তারই জ্বলন্ত উদাহরণ।

শরদিন্দুর লেখা 'অপরিচিতা' (?) 'শুক্লা একাদশী' (১৩৪৪), 'নিশীথে' (১৩৪৬) 'ইচ্ছাশক্তি' (১৩৫১ প্রভৃতি গল্পের উপসংহার পর্ব নিঃসন্দেহেই চমকপ্রদ।

'অপরিচিতা' গল্পের নায়ক যে নারীর নিদ্রামগ্ন, আলস্য-শিথিল রূপ দেখে মুগ্ধ, সে আসলে তারই চিরপরিচিতা জীবন-সঙ্গিনী।

'নিশীথে' গল্পে বিবাহের পূর্ব রাত্রে রূপলেখাকে কারও আগমন-প্রত্যাশায় অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষারতা দেখে তীব্র কৌতূহলে উৎকণ্ঠিত চিত্ত পাঠক-পাঠিকা গল্পের পরিণতি অংশে পৌঁছে বুঝতে পারে রূপলেখার সঙ্গে নিভৃত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগত আগন্তুকটি তার প্রেমিক নয়, অগ্রজ।

'ইচ্ছাশক্তি' গল্পে লেখক সম্ভবত ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই তাঁর চুরি যাওয়া অতিপ্রিয় কলমটি ফিরে পান।

'শুক্লা একাদশী' গল্পে বিনয়ের বাঁশীর সুরের মাধ্যমে পাশের বাড়ীর বিনতার সঙ্গে একটি মধুর বন্ধন গড়ে ওঠে, স্বপ্নমুগ্ধ বিনয় ভবিষ্যতের রঙীন সুখ স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়ে, কিন্তু গল্পের সমাপ্তি মুহূর্তে তার সেই আবেগ-বিহ্বলতা নিমেষে শূন্যে মিলিয়ে যায় কারণ বিনতার উক্তির থেকে বোঝা যায় এই তরুণীটি অনূঢ়া নয়, অভাগিনী বিধবা।

প্রেম ও অপ্রেম ছাড়াও মানবজীবন ও মানবচরিত্রের আরও বিভিন্ন দিকের ওপর

শরদিন্দু-প্রতিভার আলোকসম্পাত ঘটেছে। কোনও কোনও গল্পে তথাকথিত ভদ্র, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অসাধুতার মুখোশ খুলে দেওয়া হয়েছে (চিন্ময়ের চাকরী), কোথাও বা বিত্তে, সৌন্দর্য্য নিঃস্ব মানুষের মনেও যৌবনের স্বপ্ন নেশাকে তুলে ধরা হয়েছে (ঘড়ি-দাসের গুপ্ত কথা), কোথাও বিগত যৌবন পুরুষের মনে প্রবল রোমান্স পিপাসকে কেন্দ্র করে বিপর্যয় ও লাঞ্ছনার চিত্র আঁকা হয়েছে (কল্পনা)। শরদিন্দুর লেখা একাধিক গল্পে আপাতদৃষ্টিতে নিম্নশ্রেণীর ইতরজনের অদ্ভুত কৃতজ্ঞতাবোধের প্রকাশ ঘটেছে (মন্দ-লোক, মটরমাস্টারের কৃতজ্ঞতা, আর একটু হলেই)।

'গীতা' [১৩৬১] গল্পে গীতার নবমূল্যায়ণ করা হয়েছে।

'পূর্ণিমা' [১৩৫৪] গল্প দেখানো হয়েছে যে পূর্ণচন্দ্রের শুভ্র জ্যোৎস্না জগতে আনন্দদায়িনী, সেই পরিপূর্ণ চন্দ্রলোকই বিকারগ্রস্ত মানুষের মনে হত্যার নির্মম নেশাকে জাগিয়ে দেয়।

দিগ্‌দর্শন [১৩৫২] গল্পের বৈকুণ্ঠবাবু গুরুত্বপূর্ণ মামলায় জিতে গিয়েও এক সংস্কারের প্রভাবে বেদনায় ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েন। কারণ জীবনে এই প্রথম তাঁর পাশাখেলা ব্যর্থ হয়েছে। পাশার হারজিত থেকে তিনি নিজের জীবনে জয় পরাজয়, শুভাশুভের আগাম ইঙ্গিত লাভ করতেন কিন্তু সেই দিগ্‌দর্শন আজ সার্থক হল না, হঠাৎ যেন সে বানচাল হয়ে গেছে।—

"বৈকুণ্ঠের মনে হইল আজিকার এই পরম পরিপূর্ণ আনন্দের দিনে একটি আজীবনের বন্ধু উহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।"

অপদার্থ [১৩৬১] গল্পে লেখক দেখিয়েছেন তথাকথিত অপদার্থ অলস ব্যক্তিরাও মনের মত কাজ পেলে কেমন কর্মতৎপর হয়ে উঠতে পারে।

গোদাবরী [১৩৬৯] গল্পের পৌঢ় রামকানাইবাবু কিশোরী গোদারবীকে বিয়ে করেন প্রেমপ্রীতি বা দয়া-দাক্ষিণ্যের বশবর্তী হয়ে নয়, এ বিবাহ রামকানাই বাবুর ভোজন-সুখ অব্যাহত রাখার জন্য।

একূল ওকূল [১৩৪২] গল্পে সাধুচরণ সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হন, আবার বহু বছর বাদে সন্ন্যাসীর জীবন পিছনে ফেলে সংসারে ফিরে আসেন। কিন্তু সাবালক পুত্রের কর্তৃত্বপূর্ণ পরিবারে নিজেকে মানিয়ে নিতে না পেরে 'একূল ওকূল' দুকূল হারা সাধুচরণ আবার পথকেই সঙ্গী করে নেন।

মানবী [১৩৬৭] গল্পের 'দেবী' তার শক্তি, বুদ্ধি ও সহনশীলতায় পাঠকের অন্তরে শ্রদ্ধার আসন লাভ করে, তবে এধরণের চরিত্র বাংলা সাহিত্য নূতন নয়।

ভাল লাগে শরদিন্দু সৃষ্ট দুই বালক চরিত্র'কে—এদের একজন বিজয়ী'র [১৩৩৮] নিতাই, অপরজন 'ভল্লুসদার'-এর [১৩৪১] ভল্লু। বিশেষতঃ 'ব্রহ্মচারী ব্রতধারী' কাকার ব্রতভঙ্গ করার জন্য কাকিমার দুঃখে বিগলিত-প্রাণ, ছবছর বয়স্ক ভল্লুর দুর্ধর্ষ দুঃসাহসিকতার ধারাবিবরণী পরম উপভোগ্য।

বাঘিনী (১৩৫২), হেমনলিনী (১৩৬৩), চিড়িকদাস (১৩৬৮) এই তিনটি গল্পে মানুষের সঙ্গে মনুষ্যেতর প্রাণীর বিচিত্র সম্পর্কের চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। এই

গল্পগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য—'বাঘিনী।' লৌকিক প্রেমের জগতে প্রেমিকা যেমন তার প্রিয়জনের জীবনে অপর কোনও নায়িকার অস্তিত্ব সহ্য করতে পারে না, শরদিন্দুর 'বাঘিনী'র চরিত্রেও তদনুরূপ ঈর্ষা ও অধিকারবোধের প্রকাশ ঘটেছে। 'রূপদমন' নামে যে তরুণটির সঙ্গে সবার অলক্ষ্যে বাঘিনীর প্রীতি-মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তার জীবনে বিবাহসূত্রে নববধূর আবির্ভাব বাঘিনী সহ্য করতে পারেনি। তাই তার তীব্র ভালবাসা প্রবল হিংসায় রূপান্তরিত হয়েছে। রূপদমনের স্ত্রীর নাগাল সে পায়নি, কিন্তু গ্রামের একাধিক স্ত্রীলোককে হত্যাকরে নারীজাতির প্রতি তার নির্মম প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করেছে। 'বাঘিনী'র প্রেম ও প্রতিহিংসার বলিষ্ঠ ও জীবন্ত পরিচয় গল্পটিকে দারুণ আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

'হেমনলিনী' একটি সারমেয় কন্যা। ইচ্ছা না থাকলেও অবস্থা বিপাকে বৈদ্যনাথ বাবু এই কুকুর শিশুটিকে তাঁর বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছিলেন, এই অবলা জীবটির প্রতি একটু মায়া যে পড়েনি তা নয়, কিন্তু কাহিনীর শেষে পৌঁছে এক অভাবনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'তে হয়—দেখা যায় হেমনলিনী তার প্রভুর চরণে নয়, একেবারে স্নেহ-ক্রোড়ে সমাদরে স্থান লাভ করেছে—প্রকৃতপক্ষে এই আসনটি সে পেয়েছে বিনামূল্যে নয়, বৈদ্যনাথবাবুর পরম উপকারের বিনিময়ে। না, চোর কে নয়, সে বিতাড়িত করেছিল তার প্রভুর শান্তিপূর্ণ অজ্ঞাতবাস-জীবনে আবির্ভূতা মূর্তিমতী বিঘ্নস্বরূপিনী প্রভু-পত্নীটিকে। লঘুচালে গল্পটি শেষ হলেও হেমনলিনীর প্রতি বৈদ্যনাথ বাবুর ক্রমবর্ধিত অথচ অনুচ্ছ্বসিত স্নেহের পরিচয়টুকু সুচিত্রিত।

'চিড়িকদাস' [১৩৬৮] ছোট একটি কাঠবেড়ালিকে কেন্দ্র করে লেখা মিষ্টি মধুর গল্প।

অমরবৃন্দ (১৩৪০), শাদা পৃথিবী (১৩৫৩), প্রিয় চরিত্র (১৩৬৭)—লঘুভঙ্গীতে লেখা এই সুখপাঠ্যগুলিকে গল্প হিসেবে নয়, রম্যরচনা রূপে গণ্য করাই বোধহয় সমীচীন। এই ধরণের নিবন্ধ লেখকের ভূয়োদর্শিতা, কল্পনা-কুশলতা ও গভীর রসবোধের পরিচয় বাহী।

শরদিন্দু-প্রতিভার অফুরান উপাচারে বাংলা ছোট গল্পর সুবর্ণ-প্রতিমা যে শোভা ও সম্পদ উভয়েই লাভ করেছেন সে কথা বলাই বাহুল্য। মূলতঃ জটিলতামুক্ত, সরস, প্রসন্ন জীবন দৃষ্টির গুণেই তিনি পাঠককুলের প্রিয় লেখক। অগভীর, অকিঞ্চিৎকর বক্তব্যকেও উপস্থাপনার কৌশলে তিনি কতখানি উপভোগ্য করে তুলতে পারেন তার প্রমাণ 'ডিক্‌টেটর' 'বুড়োবুড়ি দুজনাতে', 'স্বাধীনতার রস,' 'কিসের লজ্জা', 'বোম্বাই কা ডাকু' প্রভৃতি গল্পে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে শরদিন্দুর অধিকাংশ সামাজিক গল্পের উপাদানই সংগৃহীত হয়েছে তাঁর জীবন অভিজ্ঞতার সঞ্চয়শালা থেকে। তাই গল্পগুলির পটভূমি প্রধানতঃ লেখকের ব্যক্তি জীবনের নানা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত তিনটি ভারতীয় শহর—কলকাতা, বোম্বাই ও পুণা। এই প্রেক্ষাপটের বৈচিত্র্যজনিত রমণীয়তাও শরদিন্দু-ভক্তদের পক্ষে মূল্যবান প্রাপ্তি।

সুতরাং নিরপেক্ষ বিচারে একথা কখনই অস্বীকার করা যায় না যে প্রতিভার সীমা-বদ্ধতা সত্ত্বেও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ছোটগল্পের একজন অবিস্মরণীয় রূপকার॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

শরদিন্দুর অন্যান্য রচনা

বর্তমান অধ্যায়ে শরদিন্দু রচিত অন্যান্য রচনা যথা সামাজিক উপন্যাস, চিত্রনাট্য, নাটক, কিশোর সাহিত্য প্রভৃতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

সামাজিক উপন্যাস

স্রষ্টা শরদিন্দু একাধিক রসোত্তীর্ণ সামাজিক গল্প পাঠককে উপহার দিয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর লেখা সামাজিক উপন্যাসগুলির সাহিত্যমূল্য অকিঞ্চিৎকর। 'দাদার কীর্তি,' 'বিষের ধোঁয়া,' 'ছায়াপথিক', 'রিমঝিম',—কোনটিতেই গভীর জীবন বোধ প্রকাশ পায়নি। 'দাদার কীর্তি' তাঁর কৈশোরকালের রচনা—একে ঠিক উপন্যাস বলা যায় কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে, তবুও লেখকের প্রথম রচনা হিসেবে উল্লেখযোগ্য। কাহিনী জটিলতামুক্ত ও একমুখী, তবে তরুণ হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগের স্পর্শে এবং নায়ক কেদারের চারিত্রিক সরলতার জন্য গ্রন্থটি সুখপাঠ্য।

'বিষের ধোঁয়া' [১৩৪৫] শরদিন্দুর লেখা উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম। সমাজ-সমস্যা সম্পর্কে শরদিন্দুর বোধ খুব গভীর ও স্বচ্ছ নয়, তাঁর সামাজিক উপন্যাসগুলির ব্যর্থতার পশ্চাতে এটি একটি প্রধান কারণ। তবু তুলনামূলকভাবে 'বিষের 'ধোঁয়া'য় অনুদার সমাজনীতির বিরুদ্ধে ব্যক্তির সংগ্রাম ও সমস্যার কিছুটা বাস্তব পরিচয় লাভ করা যায়। উপন্যাসের নায়ক অবিবাহিত, তরুণ অধ্যাপক কিশোরের সঙ্গে তার ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধু তীর্থনাথের বিধবা স্ত্রী বিমলার সম্পর্ক পারস্পরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধার, কিন্তু তাদের হৃদয় যতই নির্মল হোকনা কেন সমাজের চোখে পরিকর, পরিজনহীন নির্জন গৃহে এই দুই যুবক ও যুবতীর একত্র বসবাস অনুমোদনযোগ্য নয়। অথচ দৃঢ়চিত্ত কিশোর কিছুতেই সামাজিক কুৎসার ভয়ে বন্ধুর মৃত্যুশয্যায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনে বিরত হবে না। ফলে সমাজের কাছে তাকে অনেক লাঞ্ছনা, অপবাদ সহ্য করতে হয়েছে। পরিণামে অবশ্য গতানুগতিক ভাবে সত্যের জয় ও মিথ্যার পরাজয় ঘোষিত। কিশোর ও বিমলার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত ও টানা-পোড়েন উপন্যাসটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। কিশোর, বিমলা, সুহাস, করবী, অনুপম—প্রায় প্রতিটি চরিত্রই তাদের আচার-আচরণের মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্য ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ সামগ্রিক বিচারে 'বিষের ধোঁয়া' তেমন উচ্চমানের উপন্যাস না হলেও উপভোগ্য রচনা।

ছায়া পথিক [১৩৫৬] **:** উপন্যাস হিসাবে 'ছায়াপথিক'-এর অভিনবত্ব অন্যত্র। এই উপন্যাসে শরদিন্দুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লব্ধ নানা ঘটনা অর্থাৎ বোম্বাইয়ের চিত্র

জগতের সঙ্গে যুক্ত নরনারীদের ছলনা, কপটতা ও বিশ্বাসঘাতকতার বিচিত্র কাহিনী নায়ক সোমনাথের জীবন সমস্যার মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করেছে। এরই ফাঁকে ফাঁকে মিতাভাষিণী ও অন্তর্মুখী নায়িকা রত্নাকে কেন্দ্র করে সোমনাথের অকৃত্রিম আবেগ অব্যক্ত থাকেনি। আলোচ্য উপন্যাসে চিত্রনাট্য রচয়িতা ইন্দুরায়ের চরিত্রে শরদিন্দুর আত্মপ্রক্ষেপ ঘটেছে—এই অনুমান অসংগত নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে 'ছায়াপথিক'-এর শিরেনামযুক্ত প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদই এক একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ গল্প রূপে বিভিন্ন মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, পরে সেগুলি একত্রিত করে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে পরিণত করা হয়।

রিমঝিম [১৩৬৭] শরদিন্দুর জীবনের গোধূলি পর্বের রচনা—নার্স প্রিয়ংবদার বিচিত্র অভিজ্ঞতার দিনপঞ্জী। তার অনুভূতির আলোকেই এই উপন্যাসের অন্যান্য পাত্র পাত্রীর কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নাতিদীর্ঘ এই গ্রন্থে অসংখ্য চরিত্র অনাবশ্যক ভিড় জমায়নি। কাহিনীবর্ণনায় আবেগ-উচ্ছ্বাস অপেক্ষা প্রকাশভঙ্গীর সংযম লক্ষণীয়। আঙ্গিকের দিক দিয়েও 'রিমঝিম' অভিনবত্বের দাবী রাখে।

চিত্রনাট্য

বোম্বাই প্রবাসকালে চিত্রনাট্য রচনাই শরদিন্দুর প্রধান জীবিকায় পরিণত হয়েছিল। সেই সূত্রে রচিত হয়েছিল একাধিক চিত্রনাট্য। এগুলির মধ্যে 'পথ বেঁধে দিল,' 'যুগে যুগে,' 'কালিদাস,' 'বিজয়লক্ষ্মী,' 'কানামাছি,' 'অভিসার,' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অবশ্য 'অভিসার'-এর কাহিনী শরদিন্দুর স্বকপোলকল্পিত নয়। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'অভিসার' কবিতাটিকে তিনি চিত্রনাট্যে রূপায়িত করেছিলেন। 'কালিদাস' ছাড়া অন্য চিত্রকাহিনী গুলির বিষয়বস্তু সামাজিক। 'কালিদাস' মহাকবি কালিদাসের জীবন সম্পর্কিত কিংবদন্তীকে কেন্দ্র করে রচিত।

আঙ্গিকের দিক থেকে চিত্রনাট্যের সঙ্গে উপন্যাসের নয়, নাটকেরই আত্মীয়তা অর্থাৎ নাটক ও চিত্রনাট্য উভয়ই direct art বা প্রত্যক্ষ শিল্প। আজকাল যদিও বিদেশে চিত্রনাট্য মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে, আমাদের দেশেও সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেনের মত আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চলচ্চিত্রকারদের চিত্রনাট্যও ছাপার অক্ষরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে কিন্তু চলচ্চিত্রের দৃশ্যমানতার সংযোগ ছাড়া শুধুমাত্র পাঠের দ্বারা পাঠকের কাছে এর আবেদন তেমন গভীর নয়। তবে শরদিন্দুই প্রথম বাঙালী লেখক যিনি চিত্রনাট্যকে সাহিত্যের স্তরে উন্নীত করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এই ধরনের রচনায় 'ফেড ইন', 'ফেড আউট', 'কাট', 'ওয়াইপ,' 'ডিজল্‌ভ' প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে বটে, কিন্তু যে সকল ঘটনা বা দৃশ্য পাত্র পাত্রীর অভিনয়ের মাধ্যমে পরিস্ফুট করার কথা, বর্ণনায় প্রকাশ করার কথা নয়, সাহিত্য পদবাচ্য করে তোলার জন্য তিনি চিত্রনাট্যগুলিতে সেই রকম কিছু কিছু অংশ যোগ করে দিয়েছেন। অবশ্য লেখকের আন্তরিক প্রয়াস সত্ত্বেও বিশুদ্ধ সাহিত্যের দরবারে আদৌ এদের স্থান হবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

নাটক

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটি সামাজিক নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর লেখা 'বন্ধু', 'লালপাঞ্জা,' 'পরীক্ষা,' 'ডিটেকটিভ' প্রভৃতি নাটকগুলির নাট্যমূল্য অকিঞ্চিৎকর। অধিকাংশ নাটকই পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হওয়ার জন্য লেখা। প্রণয় ও কৌতুকের সমন্বয়ে রচিত এই মিলনান্ত নাটকগুলি এক সময়ে জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিল কারণ জনমনোরঞ্জক উপাদানগুলির যথাযোগ্য পরিবেশনে শরদিন্দু ছিলেন সিদ্ধহস্ত, কিন্তু সাহিত্য হিসেবে এরা কালজয়ী হতে পারেনি। তবে সামাজিক নাটক ও উপন্যাসে লেখক যেভাবে সমকালীন সমাজে অত্যধিক স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রতি বারংবার কটাক্ষ করেছেন, তার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ঐ বিষয়ের প্রতি তাঁর বিরূপতা প্রকাশ লাভ করে।

কিশোর সাহিত্য

কিশোর মনের উপযোগী কাহিনী রচনাতেও শরদিন্দু অনায়াস সফল। কৈশোরের কল্পনাপ্রিয়তা, রোমান্স পিপাসা, অ্যাডভেঞ্চারের নেশা ও বীরপূজার মনোভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁর 'সদাশিবের কাণ্ড'গুলি রচিত। কিশোর সাহিত্য হিসেবে এগুলি সুসার্থক। এছাড়া অলৌকিকতা, দেশপ্রেম প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করেও তিনি কিশোর পাঠ্য গল্প, উপন্যাস রচনা করেছেন। ছোটদের জন্য লিখতে বসেও কাহিনীর যথাযোগ্য পরিবেশ রচনা, চরিত্রচিত্রণ ও উপভোগ্য রস সৃজনের প্রতি তাঁর সজাগ দৃষ্টি ও সযত্ন প্রয়াস অনুভব করা যায়। এই সমস্ত গুণগুলির জন্যই শরদিন্দুর রচিত কিশোর সাহিত্য পরিণত বয়স্কদের কাছেও আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য।

কাব্যচর্চা

মূলতঃ কথা সাহিত্যিক রূপে পরিচিতি ও খ্যাতি লাভ করলেও কবিতা রচনার মাধ্যমেই শরদিন্দুর সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত। মুঙ্গের জেলা স্কুলের শিক্ষক পূর্ণ-চক্রবর্তীর প্রেরণা ও উৎসাহে শরদিন্দুর প্রথম কবিতার জন্ম—তখন তাঁর বয়স চৌদ্দ বছর। শরদিন্দুর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থটিও কাব্যগ্রন্থ। কাব্যানুরাগী বন্ধু অজিত সেনের আগ্রহে বাইশটি কবিতার সমষ্টি সেই 'যৌবনস্মৃতি'র প্রকাশ কাল ১৩২৫ সন। শরদিন্দু অম্নিবাসের একাদশ খণ্ডে "গ্রন্থ পরিচয়" সূত্রে জানা যায় যে, ১৩২৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় শ্রী নীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী যৌবনস্মৃতি'র সমালোচনা প্রসঙ্গে কবি শরদিন্দুর নিসর্গ বর্ণনা নৈপুণ্য, ছন্দোচাতুর্য, ভাব মাধুর্য এবং সুললিত, সুমার্জিত ভাষার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন।

পরবর্তীকালে শরদিন্দু বিভিন্ন ধরণের গল্প উপন্যাস রচনাতেই মনোনিবেশ করেন বটে, কিন্তু তাঁর গদ্য ভাষাতেও মাঝে মাঝে কাব্যের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। এছাড়া

কোনও কোনও নাটক ও চিত্রনাট্যে সংযোজিত স্বরচিত সংগীতগুলির মাধ্যমে তাঁর কাব্য-প্রীতির পরিচয় আমাদের কাছে সুপরিস্ফুট হয় এবং সমালোচক নীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর মত আমরাও অনুভব করি যে শরদিন্দুর কবিতায় চিন্তার গভীরতা অনুপস্থিত বটে কিন্তু সূক্ষ্ম রসানুভূতির অভাব নেই।

অতএব বর্তমান অধ্যায়ের এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথাই প্রমাণিত হয় যে সাহিত্যের সকল শাখাতেই শরদিন্দু সমান কৃতিত্বের পরিচয় দিতে না পারলেও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁর প্রবল আগ্রহ ও কৌতূহল ছিল, এবং বিষয় বৈচিত্র্যই সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর সাফল্য ও জনসমাদরের প্রধান কারণগুলির মধ্যে অন্যতম।

পরিশিষ্ট
শরদিন্দুর ভাষা

স্রষ্টা শরদিন্দুর সৃষ্টিলোক পরিক্রমা সমাপ্তির প্রাক্-পর্বে তাঁর বহু প্রশংসিত ভাষা শৈলীর অনবদ্য কারুকার্যের কিছু পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে। সেই উদ্দেশ্যেই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের অবতারণা।

ভাষা শরদিন্দু-সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ। "শরদিন্দু বাবুর গল্পের গুণ বহুগুণিত করেছে তাঁর ভাষা।"[১] আচার্য সুকুমার সেন মহাশয়ের এই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যটি আশা-করি সাধারণ পাঠক থেকে সুরু করে তথ্যনিষ্ঠ গবেষক, রসিক সমালোচক পর্যন্ত সকলেই বিনাদ্বিধায় স্বীকার করে নেবেন। শরদিন্দুর এই ভাষা-সাফল্যের মূলে রয়েছে সাধু ও চলিতরীতির অপূর্ব সহাবস্থান। তাঁর লেখা সংখ্যা-গরিষ্ঠ গল্প উপন্যাসেই লক্ষ্য করা যায় সাধু ভাষার পূর্ণ ক্রিয়াপদ ও গম্ভীর-ধ্বনি তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার, অথচ তার চলন চলিতের মতই সাবলীল, সপ্রতিভ, ও লঘুছন্দ। স্রোতচঞ্চলা তটিনীর বিচিত্র কলধ্বনি তুল্য সেই ভাষা পাঠকের অন্তরে এক অনতিক্রম্য আকর্ষণের সৃষ্টি করে, আর তারই সঙ্গে জন্ম দেয় এক নূতন প্রশ্নেরও—কী নামে ডাকা যায় এই অনন্য-পূর্বাকে 'সাধু' না 'চলিত'? অথবা শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেনের যথাযোগ্য সিদ্ধান্ত অনুসরণে, বলা যায় এ ভাষার নাম 'সাধু-চলিত কিংবা চলিত সাধু।'

শরদিন্দুর ভাষা প্রাঞ্জল, ঋজু, বর্ণময়। অনর্থক জটিলতা বা বক্রগতি সৃষ্টির দিকে তাঁর বিশেষ লক্ষ্য নেই। এমন কি প্রথম পর্বের ঐতিহাসিক রোমান্স জাতীয় রচনা-গুলিতে যেখানে কী ভাবে, কী ভাষায় লেখক বঙ্কিম-প্রভাব এড়াতে পারেন নি, সেখানেও অনর্থক বাগাড়ম্বর সৃষ্টির চেষ্টা থেকে তাঁর লেখনী প্রায় মুক্ত। তৎসম শব্দের প্রতি শরদিন্দুর মধুর পক্ষপাতিত্ব আছে বটে, দু-একটি কঠিন বোধ্য শব্দও যে ব্যবহার করা হয়নি তা নয় কিন্তু অভিপ্রেত ভাব বা পরিবেশ সৃষ্টির কাজে তারা এমনই অপরিহার্য যে এই ধরনের প্রয়োগ কোথাও অবাঞ্ছিত বা অযৌক্তিক বলে মনে হয় না। যেমন 'কালের মন্দিরা' তেই প্রাত্যহিক জীবনে অপ্রচলিত বা অল্পপ্রচলিত শব্দের সংখ্যা অনেক—'কফোনি', 'প্রপাপালিকা', 'কিতব' 'কঙ্কতিকা', 'পুস্তপাল', 'অক্ষপটলগৃহ' 'তক্র' 'চষক' 'অর্হৎ' প্রভৃতি কিন্তু উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় ও যুগপরিবেশ অনুযায়ী উল্লিখিত শব্দগুলি এমনই সুপ্রযুক্ত যে এগুলিকে লেখকের অনাবশ্যক পাণ্ডিত্য প্রদর্শন রূপে চিহ্নিত করা যায় না। প্রসঙ্গতঃ তাঁর অননুকরণীয় শব্দ সচেতনতার ছোট্ট একটি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যাক্। শরদিন্দুর সাহিত্য সাম্রাজ্যে আমরা দুজন রমণীর সাক্ষাৎ পাই যাদের বৃত্তি পথ পার্শ্বে জলসত্রে অবস্থান ক'রে ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত পথিকের তৃষ্ণা নিবারণ—এ'দের একজন

[শরদিন্দু অমনিবাস ১ম খণ্ডে 'ব্যোমকেশ উপন্যাস' শীর্ষক ভূমিকা দ্রষ্টব্য।]

'কালের মন্দিরা'র সুগোপা, অপরজন 'রাজদ্রোহী'র চিন্তা। 'কালের মন্দিরা'র প্রেক্ষাপট 'পরম ভট্টারক মগধেশ্বর' স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে আর্য সংস্কৃতির প্রভাব প্রদীপ্ত ভারতবর্ষ। তাই সুগোপার পরিচয় প্রদানকালে ঔপন্যাসিক 'প্রপাপালিকা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন নির্দ্বিধায়। অপরদিকে 'রাজদ্রোহী'র ঘটনাকাল অপেক্ষাকৃত আধুনিক-ইংরেজ আমল। ঘটনাস্থল ভারতের পশ্চিম প্রান্তে আরব সাগরের উপকূলে কাথিয়াবাড় প্রদেশ। তাই 'রাজদ্রোহী'র চিন্তার পরিচয় সে "পানি হারিন্"।

শরদিন্দুর এই শব্দসচেতনার সূত্র ধরেই মনে আসে তাঁর বিষয় ও চরিত্র অনুযায়ী ভাষা প্রয়োগের অসামান্য দক্ষতার কথা। এই লেখকের অধিকাংশ গোয়েন্দা গল্পেই সাধু গদ্যরীতি অনুসৃত হলেও সে ভাষা একেবারেই মেদহীন, বুদ্ধিদীপ্ত ও বস্তুনিষ্ঠ। উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপিত করা যায় 'অমৃতের মৃত্যু'র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সূচন অংশটুকু—

"স্বাধীনতার রক্ত-স্নান শেষ করে দেশ যখন মাথা তুলিল তখন দেখিল হ্রদের উপরিভাগ শান্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তলদেশে হিংসুক নক্রকুল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বিদেশী সৈন্যদলের ফেলিয়া যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে এই নক্রকুলের নখদন্ত। রেলের দুর্ঘটনা, আকস্মিক বোমা-বিস্ফোরণ, সশস্ত্র ডাকাতি—নূতন শাসনতন্ত্রকে উদ্‌ব্যস্ত করিয়া তুলিল।"

—এ বর্ণনায় অলংকারের আমেজ আছে, তবু এখানে কাব্যরস গৌণ, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের দুর্যোগপূর্ণ, সমস্যাকণ্টকিত পরিবেশ নক্রসংকুল হ্রদের অনুষঙ্গে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আবার লেখকের উদ্দেশ্য যখন ঐতিহাসিক কাহিনী রচনা তখন তার মোহিনী কল্পনা ও শ্রুতিসুখকর বাক্‌রীতির সঞ্জীবনী মন্ত্রে জীর্ণ বিবর্ণ অতীত প্রাণবন্ত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'গৌড়মল্লার'-এর ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের অন্তর্গত একটি বর্ণনা আলোচ্য মন্তব্যের অনুকূলে সাক্ষ্য দেয়—

"বজ্র যেদিন প্রাতঃকালে কর্ণসুবর্ণে আসিয়া উপনীত হইল সেদিন নবারুণ কিরণে নগর ঝলমল করিতেছিল। চারিদিকে নবজাগ্রত নগরের কর্ম-চাঞ্চল্য, গো-রথ চল্লরিকা ঝম্পানের ছুটাছুটি। দেব দেউলে কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছে। স্নানার্থীরা ঘাটের দিকে চলিয়াছে, পূজার্থীরা মন্দিরে যাইতেছে; করণেরা তাম্বুলচর্বণ করিতে করিতে অধিকরণে চলিয়াছে। পথে পদচারিদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই অধিক, দুই চারিটি নারীও দেখা যাইতেছে।"

—লক্ষণীয় এই বর্ণনায় কোনও অলংকার নেই, দীর্ঘ বাক্যও প্রায় অনুপস্থিত, ছোট ছোট বাক্যের সাহায্যে অভিপ্রেত বক্তব্য প্রকাশের চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু যথোপযুক্ত শব্দ মন্ত্রে অতীতের কর্ণসুবর্ণ যেন পাঠকের মানসদৃষ্টির সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়।

অন্যদিকে শরদিন্দুর লেখা অলৌকিক/অতিলৌকিক গল্পগুলি পড়তে পড়তে কখন যেন সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখা মুছে যায় ভয় ও বিস্ময়ের যুগ্ম অনুভূতিতে হৃদয় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। 'রক্ত খদ্যোত' এই ধরণেরই একটি গল্প—এই গল্পে সুরেশবাবুর অভিজ্ঞতা লব্ধ এক রোমাঞ্চকর মুহূর্তের ভাষারূপ—

"আমার দৃষ্টি ছিল নিক্ষিপ্ত চুরুটটার উপর—সেটা মাটিতে পড়িবামাত্র আগুন

ছিট্‌কাইয়া উঠিল। তারপর এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিল। ছিটকানো আগুনটা মধ্যপথে দুটো আকৃতি ধরিয়া পাশাপাশি একসঙ্গে নড়িতে আরম্ভ করিল। মাটি হইতে প্রায় এক হাত উপরে থাকিয়া পরস্পরের চারি আঙুল ব্যবধানে এই ক্ষুদ্র অগ্নিগোলক দুটা এক জোড়া লাল জোনাকির মতো সম্মুখ দিকে চলিতে আরম্ভ করিল এবং মাঝে মাঝে মিট্‌মিট্‌ করিতে লাগিল।"

চরিত্রানুগ ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে কাহিনীর পাত্র-পাত্রীর চরিত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির ব্যাপারেও শরদিন্দুর কৃতিত্ব প্রশ্নাতীত। সমস্তরের, সমশ্রেণীভুক্ত, মানুষের মধ্যে এক-জনের সঙ্গে অপরজনের সূক্ষ্ম পার্থক্য তিনি অনায়াস নৈপুণ্যে পরিস্ফুট করেছেন। এই প্রসঙ্গে, প্রথমেই লক্ষ্য করা যাক্‌ ডাক্তার ঘটকের প্রতি 'দুর্গরহস্য' সমাধানের ভারপ্রাপ্ত ব্যোমকেশ ও তার বন্ধু অজিতের উক্তি। ডাক্তার ঘটক তাঁর প্রণয়িনী রজনীকেই বিবাহ করেছিলেন বটে, কিন্তু রজনীর পিতা মহীধর বাবু যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন পর্যন্ত এ বিবাহ গোপন রাখতে হবে। এ ব্যাপারে ডাক্তার ঘটকের মনে প্রচ্ছন্ন একটু ক্ষোভ আছে ঘটনাচক্রে সেকথা উপলব্ধি করে তাঁর উদ্দেশে ব্যোমকেশকে বলতে শুনি—

'বন্ধু, মনে ক্ষোভ রাখবেন না। আপনি যা পেয়েছেন তা কম লোকের ভাগ্যেই জোটে। একসঙ্গে দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য, আর পরকীয়া প্রীতির তীক্ষ্ণস্বাদ উপভোগ করে নিচ্ছেন।" ঐ একই প্রসঙ্গে অজিত বলে—"ভেবে দেখুন, শেলী বলছেন, হে পবন, শীত যদি আসে বসন্ত রহে কি কভু দূরে। ফুলের মরসুম শেষ হোক, ফল আপনি আসবে।"

ব্যোমকেশ ও অজিত দুজনেই উচ্চশিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী। কিন্তু ব্যোমকেশ সত্যান্বেষী, বাস্তব জীবনের তীক্ষ্ণ, তীব্র সমস্যাবলীর সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। তাই ব্যোমকেশের কথাবার্তা স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ—ডাক্তার ঘটককে যা বলার সে সোজাসুজিই বলেছে কোনও রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করেনি—অপরদিকে অজিত সাহিত্যিক সাহিত্য-চর্চা তার পেশা নয়, নেশা। সাজিয়ে গুছিয়ে বক্তব্যকে উপস্থাপিত করার দিকে তার সতর্ক মনোযোগ।

'অগ্নিবাণ' গল্পের দেবকুমার বাবু এবং 'মগ্ন মৈনাক'-এর সন্তোষ সমাদ্দার—এঁরা ভদ্র, সম্মানীয় ও উচ্চসম্প্রদায় ভুক্ত—একজন প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক, অপরজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও প্রভাবশালী রাজনীতিক। ঘটনাচক্রে উল্লিখিত দুজন ব্যক্তিই খুনের আসামী। কিন্তু ব্যোমকেশের সত্যান্বেষণের আলোকে অপরাধী হিসাবে ধরা পড়ার পর এঁদের তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিদ্বয়ের চারিত্রিক পার্থক্যটুকু যথাযথ ভাবে প্রকাশ করে।—

দেবকুমার বাবু বলেন—"ব্যোমকেশ বাবু? আপনিও এসেছেন? ভয় নেই—আমি আত্মহত্যা করবনা, ছেলেকে মেরেছি—মেয়েকে মেরেছি আমি খুনী আসামীর মত ফাঁসি কাঠে ঝুলতে চাই—" [অগ্নিবাণ]

অপরদিকে সন্তোষবাবু যখন বুঝতে পেরেছেন তাঁকে হেনা মল্লিকের হত্যাকারী হিসাবে চিনে নিতে ব্যোমকেশ ভুল করেনি তখন—

সন্তোষবাবুর রগের শিরা ফুলিয়া উঠিল। তিনি অসহায় বিষাক্ত চোখে চাহিয়া বলিলেন, "কি চান আপনি ? টাকা ?"

প্রথম উদ্ধৃতিটিতে কৃতকর্মের জন্য অপরাধীর গভীর অনুতাপ এবং যথোপযুক্ত শাস্তি গ্রহণের মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্তের অভিলাষ অব্যক্ত থাকে নি—কিন্তু দ্বিতীয়টিতে হত্যাকারীর বক্তব্যে অনুশোচনার লেশমাত্র নেই তার পরিবর্তে প্রকাশ পেয়েছে অর্থের দম্ভ ও সামাজিক প্রতিপত্তির অহংকার।

শরদিন্দুর ঐতিহাসিক কাহিনী সমূহেও যথোপযুক্ত ভাষা ব্যবহারের দ্বারা চরিত্র-গুলিকে মূর্ত করে তোলা হয়েছে। 'কালের মন্দিরা'য় মগধেশ্বর স্কন্দগুপ্তের বীরত্ব ও স্বদেশ প্রেম, 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ'-এ চেদিরাজ লক্ষ্মীকর্ণের স্বার্থপরতা ও আত্মাভিমান, 'তুঙ্গভদ্রার তীরে'র বিজয়নগরনৃপতি দ্বিতীয় দেবরায়ের কর্তব্যপরায়ণতা ও মর্যাদাবোধ ভাষার ঐশ্বর্যেই সুপরিস্ফুট।

কখনও কখনও নতুন ধরণের শব্দ সৃষ্টিতে এবং শব্দের অপ্রচলিত প্রয়োগের প্রতি শরদিন্দুর আগ্রহ সহজেই অনুভব করা যায়। তাই 'অগ্নিবাণ'-এ ব্যোমকেশ মুখ থেকে 'অ-জ্বালিত সিগারেট' নামিয়ে রাখে। 'দুর্গরহস্য'তে অধ্যাপক ঈশান মজুমদারের খাতাটির বিবরণ দিতে গিয়ে অজিত লেখে "যাহাদের লেখাপড়া লইয়া কাজ করিতে হয় তাহারা এইরূপ একখানি সর্বংবহা খাতা হাতের কাছে রাখে ;" 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ'এ অনঙ্গপালের সান্নিধ্যে "বান্ধুলির মুখ আকণ্ঠ রাঙা" হয়ে ওঠে।

শরদিন্দু যৌবনে বেশ কিছু কবিতা রচনা করলেও কথাশিল্পী শরদিন্দুর উজ্জ্বল কৃতিত্বের কাছে ছন্দশিল্পী শরদিন্দু ম্লান ও নিষ্প্রভ ; কিন্তু শরদিন্দুর গদ্য ভাষায় পরিমিত অথচ উপযুক্ত অলংকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর সেই অন্তর্লীন কবিসত্তার সার্থক প্রকাশ ঘটে। বক্তব্যের সমর্থনে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 'কালের মন্দিরা'র একটি কাব্য সৌন্দর্যময় উপমা—

"পুষ্পাসব গন্ধে আকৃষ্ট মধুমক্ষিকা যেমন কেবলমাত্র ঘ্রাণশক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রচ্ছন্ন ফুলকলিকার সন্নিধানে উপস্থিত হয়, চিত্রকও তেমনই পিপাসা-প্রণোদিত হইয়া একটি মদিরাগৃহের দ্বারে উপনীত হইল।"

শরদিন্দুর রোমাণ্টিক সৌন্দর্যকল্পনার অভ্রান্ত পরিচয় ধরা পড়ে 'ঝিন্দের বন্দী'র একটি অতুলনীয় কাব্যরসাশ্রিত তুলনায়……

"……দূরে পাহাড়ের একটা রন্ধ্র বহিয়া প্রকাণ্ড একটা ঝর্ণা নির্ঝরশীকরে চারিদিক বাষ্পাচ্ছন্ন করিয়া গভীর খাদে গিয়া পড়িতেছে। অস্তমান সূর্য কিরণে সেটাকে সোনালী জরি-মোড়া অপ্সরীর দোদুল্যমান বেণীর মত দেখাইতেছে।"

লেখকের শিল্প সচেতনতার একটি ক্ষুদ্র কিন্তু উজ্জ্বল পরিচয় ধরা পড়ে 'গৌড়মল্লার' উপন্যাসের একটি দৈনন্দিন জীবন থেকে আহৃত উপমায়—

"দারুকের বর্ণ ছিল ধান-সিদ্ধ-করা হাঁড়ির তলদেশের ন্যায়,"—নিকষ কালো রঙের তুলনা সাহিত্যজগতে অনেক আছে—কিন্তু এ হেন উপমা যেমন বাস্তব তেমনি অভিনব নয় কি ?

শুধু ঐতিহাসিক রোমান্সের ক্ষেত্রেই নয়, সমস্যা সংকুল, শোণিত পিচ্ছিল গোয়েন্দা গল্প-উপন্যাসগুলিতেও তিনি মাঝে মাঝেই সরস উপমার অবতারণা ঘটিয়েছেন, অথচ বিষয়বস্তুর সঙ্গে তা এমনই অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কে আবদ্ধ যে এই প্রয়োগ কোথাও কষ্টকল্পিত বলে মনে হয় না। যেমন 'চোরাবালি'তে অজিতের একটি উক্তি—

"এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, কুমার ত্রিদিবের উড়িয়া বাবুর্চি মোটর হইতে বাস্কেট নামাইয়া ইতিমধ্যে হাজির হইয়াছিল। অনতিদূরে একটা গাছের তলায় ঘাসের উপর সাদা তোয়ালে বিছাইয়া খাদ্যদ্রব্য সাজাইয়া রাখিতে ছিল। তাহাকে দেখিয়া কুলায় প্রত্যাশী সন্ধ্যার পাখির মত আমরা সেই দিকে ধাবিত হইলাম।" —এই উপমার মাধ্যমে পরিশ্রান্ত, ক্ষুধার্ত মানুষগুলির আহার্যের প্রতি আগ্রহ ঈষৎ কৌতুকমিশ্রিত ভঙ্গিতে ব্যক্ত করা হয়েছে।

শরদিন্দু শুধু উপমা প্রয়োগে বৈচিত্র্যই দেখাননি, কখনও কখনও নূতন উপমা সৃষ্টিও করেছেন। যেমন 'শুভ্রশয্যা ফেননিভ' (রবীন্দ্রনাথ/পসারিণী) অথবা 'দুগ্ধশুভ্র শয্যা' প্রচলিত কিন্তু শরদিন্দুর বর্ণনায় 'তারপর শরতের মেঘশুভ্র শয্যায় শয়ন' [কালের মন্দিরা অষ্টম পরিচ্ছেদ]।

শরদিন্দুর সাহিত্যে শুধু উপমা নয়, উৎপ্রেক্ষার ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য—

'গৃহদ্বারে তখন দুই একটি বর্তিকা জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে ; গৃহস্থের শুদ্ধান্তঃপুর হইতে ধূপ কালাগুরুর গন্ধ বাতাসে ভাসিতেছে, প্রদীপ-হস্তা পুরনারীগণ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া গৃহদেবতার অর্চনা করিতেছে। ক্বচিৎ দেবমন্দির হইতে আরতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি উত্থিত হইতেছে। দিবাবসানের বৈরাগ্য মুহূর্তে নগরী যেন ক্ষণকালের জন্য যোগিনীমূর্তি ধারণ করিয়াছে'। ['কালের মন্দিরা' পঞ্চম পরিচ্ছেদ]

'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসের প্রথম পর্বের দশম পরিচ্ছেদে ঝটিকাহতা বিদ্যুন্মালার বর্ণনা—"মুক্তবেণী চুলগুলি বিস্রস্ত হইয়া মুখখানিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল, মহার্ঘ বস্ত্রটি বালুকালিপ্ত অবস্থায় নিদ্রাশীতল দেহটিকে অযত্নভরে আবৃত করিয়াছিল। সব মিলিয়া যেন একটি শৈবালবিদ্ধ কুমুদিনী, ঝড়ের আক্রোশে উন্মূলিত হইয়া তটপ্রান্তে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।" [তুঙ্গভদ্রার তীরে, প্রথম পর্ব দশম পরিচ্ছেদ]

'ইমেজ' বা চিত্রকল্প সৃষ্টিতেও শরদিন্দুর কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। 'চিত্রকল্প' সম্পর্কে বিভিন্ন সুধীজনের বিচিত্র মতামত প্রচলিত—সেগুলির ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের অবকাশ এখানে নেই, শুধু আলোচনার একান্ত প্রয়োজনে "বাংলা কাব্যে উপমালোক" গ্রন্থের রচয়িতা শ্রদ্ধেয় ডঃ শিবচন্দ্র লাহিড়ীর মন্তব্য অনুসরণে বলি "আধুনিক ইমেজ হেঁয়ালি বা পাগলামি নয়। অখণ্ড বিচারের ক্রম সাজিয়ে গড়া অলংকারও এ নয়। বাসনালোকে মগ্ন জীবনের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা যখন ছবির আকারে সাড়া দেয় তখনই একটা ইমেজ পাওয়া যাবে।"

এই 'ছবির আকারে সাড়া' দেওয়া ব্যাপারটি শরদিন্দু সাহিত্যে বারংবার ঘুরে ফিরে এসেছে। ঐতিহাসিক গল্প উপন্যাসে তো বটেই, এমনকি তাঁর গোয়েন্দা রচনাতেও মাঝে মাঝে ইমেজের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন দুর্গরহস্যের উত্তর খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কামানের বর্ণনা—

অতীতের সাক্ষী ক্ষয়িষ্ণু দুর্গটির তোরণমুখে ভূপতিত কামানটিকে দেখিয়া কেমন যেন মায়া হয়; মনে হয় যৌবনে সে বলদৃপ্ত যোদ্ধা ছিল জরার বশে ধরাশায়ী হইয়া সে ঊর্ধ্বমুখে মৃত্যুর দিন গুনিতেছে"—

হৃতগৌরব কামানের প্রসঙ্গে মৃত্যুপ্রতীক্ষায় উন্মুখ যোদ্ধার চিত্রটি যেমন সজীব তেমনি মর্মস্পর্শী।

এইরকমই এক হৃদয়সংবেদ্য চিত্রকল্প পাওয়া যায় 'আদিমরিপু'র চতুর্দশ পরিচ্ছেদের তৃতীয় অনুচ্ছেদে—

"স্বাধীনতা আসিতেছে রক্তাক্ত দেহে বিক্ষত চরণে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ভেদ করিয়া আসিতেছে। স্বাধীনতা যখন আসিবে হয়তো মুমূর্ষু রক্তহীন দেহে আসিয়া উপস্থিত হইবে তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিতে প্রত্যেক ভারতবাসীকে হৃদয়রক্ত নিঙড়াইয়া দিতে হইবে।" —এই বর্ণনার মধ্যে থেকে একটি আহত, রক্তাক্ত মৃতকল্প মানুষের ছবি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উঠে আসে না কি ?

'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসের একটি মনোমুগ্ধকর চিত্র সৌন্দর্যময় গদ্যাংশ—

"তারপর আবার অসমতল শিলাবন্ধুর ভূমি। স্বল্পসেচন তুষ্ট জোয়ার-বাজরার শূল কণ্টকিত ক্ষেত্র। ঊর্ধ্বে চাহিলে দেখা যায় দূরে তিনটি স্তম্ভাকার গিরিশৃঙ্গ—হেমকূট মতঙ্গ ও মাল্যবন্ত আকাশে মাথা তুলিয়া যেন দূরাগত শত্রুর দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছে"—

[তুঙ্গভদ্রার তীরে, দ্বিতীয় পর্ব, প্রথম পরিচ্ছেদ]

এখানে লেখকের রচনা কৌশলে তিনটি পর্বতশৃঙ্গ মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় কৃতসংকল্প সদাসতর্ক তিন বিনিদ্র প্রহরীতে অনায়াসেই রূপান্তরিত হয়েছে।

অধিকাংশ রোমাণ্টিক লেখকের মতই নারীদেহের অপার সৌন্দর্য বর্ণনায় শরদিন্দুর আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়—তাই তাঁর নায়িকারা লৌকিক-অলৌকিক-ঐতিহাসিক যাই হোক না কেন অপূর্ব সুন্দরী—

প্রথমেই ধরা যাক্ একজন লোকজগতের অধিবাসিনীর কথা—স্বার্থবুদ্ধিতে সংকীর্ণ চিত্তা, অপরকে বিপদে ফেলার কুচক্রান্তে বিজড়িতা সেই নারী অর্থাৎ 'মগ্নমৈনাক'-এর হেনামল্লিক কিন্তু রূপের নিরিখে অনিন্দ্যসুন্দরী—

"গায়ের রঙ দুধে আলতা, ঘন সুকৃষ্ণ চুল অবিন্যস্ত হইয়া যেন মুখখানিকে আরো ঘনিষ্ঠ কমনীয় করিয়া তুলিয়াছে, ভুরু দুটি তুলি দিয়ে আঁকা।"

অলৌকিক গল্প 'শূন্য শুধু শূন্য নয়'-এর ছায়া কায়াহীনা—কিন্তু নায়ক গৌরমোহন স্পর্শ দ্বারা তার যে রূপ অনুভব করেছে তাও কম মধুর নয়—

"চোখ দুটি বেশ টানাটানা মনে হইতেছে, নাকটি সরু, ঠোঁট দুটি ভারি নরম, প্রসারে একটু বড়—"

শরদিন্দুর ঐতিহাসিক গল্প উপন্যাসের নায়িকারা তো সকলেই সৌন্দর্যদেবতার বরপুত্রী—তাদের মধ্যে কারো রূপে প্রভাতী শুকতারার স্নিগ্ধদ্যুতি আবার কারো রূপ বহ্নিশিখার তুল্য অত্যুজ্জ্বল। নারীর শান্ত-কোমল রূপমাধুরীর প্রকাশ ঘটেছে 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ'-এ চেদিরাজ-দুহিতা যৌবনশ্রীর কল্যাণী-মূর্তিতে—

"সপ্তদশ বৎসর বয়সে রাজকুমারী যৌবনশ্রীর দেহ নবোদ্ভিন্ন লাবণ্যের রসে টলমল করিতেছে, যেন এই মাত্র তিনি লাবণ্যের সরসীনীরে স্নান করিয়া আসিলেন। মন কিন্তু কৌমার্যের প্রশান্তিতে নিস্তরঙ্গ, সেখানে যৌবনসুলভ প্রগল্ভতা নাই, রাজকন্যা সুলভ গর্ব নাই। মুখখানিতে একটু মধুর গাম্ভীর্য, চোখ দুটিতে স্নিগ্ধ বুদ্ধির প্রভা। পিছন হইতে চুলের উপর সূর্যের আলো পড়িয়া একটি স্বর্ণাভ মণ্ডল রচনা করিয়াছে।"

আবার 'বিষকন্যা' গল্পে উল্কার বর্ণনা প্রমাণ করে নারীর মোহিনীরূপ পরিস্ফুটনের ব্যাপারেও শরদিন্দু কত পারদর্শী ছিলেন—

"তিনি দেখলেন, সদ্যস্নাতা উল্কা একাকিনী বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া কর্ণে কুরুবক—কোরকের অবতংস পরিতেছে। তাহার কটিতটে চম্পক বর্ণ সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র, বক্ষে কাশ্মীর-রঞ্জিত নিচোল—উত্তরীয় নাই। দর্পণের ন্যায় ললাটে কুঙ্কুম-তিলক, চরণ প্রান্তে লাক্ষারাগ, সিক্ত অবেণীবদ্ধ কুন্তলভার পৃষ্ঠে বিলম্বিত হইয়া যেন এই সম্মোহিনী প্রতিমার পটভূমিকা রচনা করিয়াছে।"

শরদিন্দুর ভাষা ও রচনাশৈলীর আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর যে দুই প্রিয় কবির কথা উল্লেখ না করলে নিবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যায় তাঁদের একজন ভারত কবি কালিদাস অপরজন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। শরদিন্দুর ইতিহাসাশ্রয়ী রচনাগুলিতে নগরীর বর্ণনা থেকে সুরু করে নারীর রূপবর্ণনা. এমন কি নরনারীর প্রণয়সম্ভাষণ পর্যন্ত সর্বত্রই কালিদাসের কাব্যানুষঙ্গ লক্ষণীয়। এছাড়া তাঁর বিভিন্ন শ্রেণীর কাহিনীতে বিচিত্র উপলক্ষে কালিদাসের কাব্য ও নাটকাদি থেকে অজস্র উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁর প্রসিদ্ধ গোয়েন্দা-কাহিনী দুর্গরহস্যের পূর্বখণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে দুটি ক্ষুদ্র গিরি চূড়ার বর্ণনা প্রসঙ্গে কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের শ্লোকাংশ গ্রহণ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক রোমান্স "তুমি সন্ধ্যার মেঘ"-এ বিগ্রহপালের প্রণয়াসক্তা যৌবনশ্রীর প্রণয়াবেগ পাঠকের কাছে পরিস্ফুট করার উদ্দেশে লেখক কালিদাসের 'রঘুবংশ' কাব্যের একটি শ্লোকের সহায়তা গ্রহণ করেছেন—

"যৌবনশ্রী প্রথম দর্শনেই হৃদয়-মন সমর্পণ করিয়াছেন; তারপর যতবার দেখা হইয়াছে প্রণয়ের আকর্ষণ ততই দৃঢ় হইয়াছে তিনি মনে মনে কালিদাসের শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বলিয়াছেন—ভূয়ো যথা মে জননান্তরেঽপি ত্বমেব ভর্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ।"

'ঝিন্দের বন্দী'র পঞ্চম পরিচ্ছেদে ঝিন্দ অভিমুখে যাত্রা পথে সেই পার্বত্য রাজ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিশেষতঃ পর্বত রন্ধ্র থেকে অবিরাম ঝরে পড়া নির্ঝরিণীর সূর্যালোকিত রূপজ্যোতি দর্শন করে উৎফুল্ল গৌরীশংকর বলে উঠেছে "সর্দার, তোমাদের রাজ্য রাজা হবার মত দেশ বটে। কুমার সম্ভব পড়েছ?—

"ভাগীরথীনির্ঝরশীকরাণাং
বোঢ়া মুহুঃকম্পিত-দেবদারুঃ
যদ্বায়ুরন্বিষ্টমৃগৈঃ কিরাতৈ—
রাসেব্যতে ভিন্নশিখণ্ডিবর্হঃ!'

শরদিন্দুর কালিদাস-প্রীতির মত রবীন্দ্র-প্রীতিরও অজস্র দৃষ্টান্ত তাঁর রচনাবলীতে

ছড়িয়ে আছে। ব্যোমকেশ ও বরদা তো রীতিমত রবীন্দ্রভক্ত—এমনকি 'প্রতিধ্বনি' গল্পে বরদার বন্ধু অমূল্যের কণ্ঠেও রবীন্দ্র-কবিতাংশ শোনা গেছে

"যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি
তাহারই খানিক
মাগি আমি নতশিরে—'

লক্ষণীয় যে এই উদ্ধৃতিগুলির কোনটিই অহেতুক কাব্যোচ্ছ্বাস মাত্র নয়—স্থান কাল ও পাত্র অনুযায়ী এগুলি এমনই সুপ্রযুক্ত যে কোথাও এদের অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয় না। বরং এই ধরনের সৌন্দর্যশোভন, অর্থগূঢ় প্রয়োগ লেখকের গভীর রসবোধের পরিচয় জ্ঞাপন করে।

আলোচনার উপসংহারে পৌঁছে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে কথাশিল্পী হিসেবে শরদিন্দুর মেজাজ সরস ও প্রসন্ন। শিল্পীর মনের এই সরস প্রসন্নতার ছোঁয়ায় তাঁর অনেক সাধারণ মানের রচনাও পাঠককে সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে লেখকদের মূলতঃ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—'গ্রেট রাইটার' ও 'গুড রাইটার'। এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি শরদিন্দু 'গুড রাইটার'দের মধ্যে 'গ্রেট'। জনপ্রিয়তার নিরিখে আজও তিনি প্রথম সারির সাহিত্যিক, আর এই নিরবচ্ছিন্ন সাফল্যের পশ্চাতে তাঁর ভাষা ও রচনাশৈলীর অবদান যে অনেকখানি সেকথা বলা বাহুল্য।